এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত্ব

এরিষ্টটলের পোয়েটিক্‌স

ও

সাহিত্যতত্ত্ব

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য

বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

+

"নৃত্য-নাট্য-সংগীত একাডেমি'র (পশ্চিমবঙ্গ)

নাট্যতত্ত্ব-ও-সমালোচনাতত্ত্বের অধ্যাপক

+

'আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবন"-এর

(স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন ও গবেষণা-কেন্দ্র)

প্রধান-অধ্যাপক

॥ ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ ॥

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলি: ৯

প্রথম মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ—কে. পাল

দাম—আট টাকা

এস. দত্ত. জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাত-৯ হইতে প্রকাশিত ও ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ রূপলেখা প্রেসের পক্ষে শ্রীঅজিত কুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার অতি শৈশবেই, অকাল মৃত্যু যাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে-
মুখে কথা না ফুটতেই, চিরতরে যাঁকে হারিয়েছি—পরের মুখের
কথা শুনে শুনে, যাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের স্মৃতিমূর্তি গড়ে
নিতে হয়েছে সেই পুরুষকারপ্রতিম মহাতেজস্বী পিতৃদেব

৺অমৃতলাল ভট্টাচার্যের

স্মৃতির উদ্দেশে—

এই গ্রন্থখানি ভক্তি-অবনত চিত্তে অর্পণ করলাম।

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা

১। নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (১ম খণ্ড)

২। ঐ (২য় খণ্ড)

৩। ঐ (৩য় খণ্ড)

৩। ঐ (৪র্থ খণ্ড)

৫। রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা

৬। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা

৭। সাহিত্যতত্ত্ব মীমাংসার ভূমিকা

৮। ক্রোচের এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা

৯। মহাকাব্য জিজ্ঞাসা

১০। নাটকের রূপ-রীতি ও প্রয়োগ

১১। ক্রোচের এস্থেটিক (যন্ত্রস্থ)

১২। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা „

১৩। বাংলা নাটক ও নাট্যকার —(তিন খণ্ডে)

১৪। হোরেসের আর্স পোয়েটিকা

নিবেদন

"গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন শক্তির আয়োজন নয়"—এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন, তারপর বাইশ বছর পার হ'য়ে গেছে, কিন্তু পনেরো আনা —এক আনা হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে এ কথা আমরা আজও বড় গলা করে বলতে পারি কি? নিশ্চয়ই পারিনে। শক্তির আয়োজনের দৈন্য আজও সমান আক্ষেপের বিষয় হয়ে আছে। যতদিন "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন" হবে না, ততদিন এ দৈন্যের অবসান কিছুতেই হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন— "শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিম্বা সে আগাছাও নয় যে মাঠেঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে"। তবু, এতবড় প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, শক্তির আয়োজন হয়েছে এবং যেটুকু হয়েছে তার অনেকটাই শৌখিন লোকে শখ করেই করেছে—প্রয়োজনর তাগিদেও কিছু কিছু হ'য়েছে। শক্তির আয়োজনের সবক্ষেত্র সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য; সাহিত্যশাস্ত্র সম্পর্কেও বটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই, সাহিত্য-শিল্পের নানা সমস্যা নিয়ে বাংলাভাষায় আলোচনা হ'য়ে আসছে। এই আলোচনার পরিমাণ যেমন একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, তেমনি এই সব আলোচনার উৎকর্ষও কম প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু এই আলোচনার প্রায় সবটাই প্রবন্ধ হিসাবে লিখিত, সুতরাং খণ্ড আলোচনা। স্বীকার করতেই হবে—সাহিত্য-শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে অখণ্ড আলোচনা অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন আলোচনাপূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ বাংলাভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে। সাহিত্য-বিষয়ক যে সব গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাদের প্রায়গুলিই মাসিকপত্রে-প্রকাশিত প্রবন্ধের সংগ্রহ অথবা বক্তৃতার-জন্য—প্রস্তুত নিবন্ধ বিশেষ। যাকে ঠিক সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক আলোচনা বলা

যায় এমন গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যে কোথায়? অকপটেই এ দৈন্য আমাদের স্বীকার করতে হবে। বাস্তবিকই, না আছে আমাদের নিজেদের-লেখা তেমন কোন মৌলিক বা স্বাধীন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-গ্রন্থ, না আছে অন্যান্য দেশের বহুখ্যাত বহু-উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থের অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদের কথা তো উঠেই না, মর্মানুবাদ পর্যন্ত নেই। এমনকি, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের মর্মসংগ্রহ বা পরিচয়টুকু পেয়ে যে সন্তুষ্ট থাকব, তারও উপায় নেই।

মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারা খুবই সৌভাগ্যের কথা। সব জাতির ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটবেই এমন নাও হ'তে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে তত্ত্বের আলোচনা হবে—পরিপাটি আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হবে—প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে এটুকু অবশ্যই প্রত্যাশা করা যেতে পারে। অন্ততঃ এটুকু প্রত্যাশা তো করা যায়ই, তে যাঁরা মৌলিকতত্ত্ব আবিষ্কার করে স্মরণীয় হ'য়েছেন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছেন, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনুবাদ-আলোচনার মাঝ দিয়ে তাঁদের তত্ত্বের ও চিন্তার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়ে দেবেন—তথা জাতীয় সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করবেন। মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্য প্রত্যেক সভ্য জাতিই তৎপর—একান্ত তৎপর। কী ঐকান্তিক এই তৎপরতা, তা' বুঝাতে ইংরেজ-জাতির দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ইংরেজী সাহিত্যে ভোজের আয়োজনের এবং শক্তির আয়োজনের কী বিরাট সমারোহ। সমস্ত দেশের উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থের অনুবাদ-আলোচনায় ইংরেজি-সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ। ইংরেজি সাহিত্য আজ কুবেরের ধনভাণ্ডার। সে ভাণ্ডারে যে প্রবেশ করতে পারে, বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্যের—দুর্লভ মণিমানিক্যের সঞ্চয় তার করতলগত। ইংরেজি যে জানে, বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যের ছাড়পত্র সে আদায় করে নিয়েছে। কী করে এমনটি হয়েছে? বলা বাহুল্য, শুধু মৌলিক রচনা দিয়ে হয়নি। হয়েছে—অনুবাদ ও আলোচনা গ্রন্থের প্রাচুর্যের ফলেই। যে ইংরেজ গ্রীক লাতিন জেনেছেন তিনি তাঁর জ্ঞানে মসগুল হ'য়ে কাল কাটাননি, এমনি করে যাঁরা ইতালী, স্পেন, জার্মানী, ফ্রান্স নানাদেশের ভাষা জেনেছেন তাঁরাও শুধু জ্ঞান রোমন্থন করেই জীবন শেষ করেননি।

তাঁরা যত জেনেছেন তত দেশবাসীকে জানিয়েছেন। বিদেশী গ্রন্থগুলির অনুবাদ আলোচনা করে ইংরেজিসাৎ করে নিয়েছেন। আত্মসাৎ না করা পর্যন্ত তাঁরা ক্ষান্ত হননি।

আর আমরা? আমাদের সৌভাগ্য—আমরা এমন একটি বৈদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠযোগ যুক্ত হয়ে আছি, যাকে জানলে বিশ্বের সব সাহিত্যকেই জানার সুযোগ হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। আমাদের দেশে যে বড় বড় পণ্ডিতের অভাব ঘটেছে, বা গ্রীক-লাতিন,—ফরাসী-জার্মান-রাশিয়ান ভাষা যাঁরা ভাল জানেন তেমন লোকের দুর্ভিক্ষ হয়েছে তা নয়। যে অভাবটি সমস্ত অভাবের মূল কারণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে তা' এই যে আমাদের দেশের পণ্ডিতরা—বিশেষজ্ঞরা মাতৃভাষার প্রতি যতখানি মৌখিক ভালবাসা দেখান, মাতৃভাষাকে ততখানি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন না—এবং বাসেন না বলেই জাতীয় সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করতে, যতখানি তাঁরা করতে পারেন, ততখানি করেন না। বাংলাসাহিত্যে শক্তির আয়োজনের অভাব যত কারণে ঘটেছে, বিশেষজ্ঞদের ঔদাসীন্য অন্যতম প্রধান কারণ।

মাতৃভাষার এই দৈন্য যে-কোন জাত্যভিমানী ব্যক্তির কাছেই পীড়াদায়ক। বিশেষতঃ যাঁরা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে চান—নানাদেশের শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান—অথচ অপর ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে সেই সব শাস্ত্রের মর্ম জানতে পারেন না, তাঁদের মর্মদাহ খুবই বেশী। সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করতে গিয়ে যখন দেখলাম বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলতে যা' আছে তা প্রায় না-থাকারই সামিল এবং যে শুধু বাংলাই জানে অন্য ভাষা জানে না, সাহিত্যতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য তার হবে না, তখন মর্মে তীব্র জ্বালাই অনুভব করেছিলাম। ১৯৪২-৪৩ সালের কথা—সঙ্কল্প করেছিলাম—আর কিছু পারি না পারি, বহু ভাষা জানি আর না জানি, বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যশাস্ত্রগুলির সঙ্গে—অনুবাদ মাধ্যমে বা আলোচনা-মাধ্যমে—যে মাধ্যমে পারি, দেশবাসীর পরিচয় ঘটাতে যথাসাধ্য

চেষ্টা করব। এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে করেছিলাম—এই চেষ্টা দ্বারা আর কিছু করতে পারি আর না পারি, পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব। পণ্ডিতরা আমার এ সামান্য চেষ্টার ত্রুটি সংশোধন করতে প্ররোচিত হলে এবং এই বিষয়ে আরো ভাল গ্রন্থ রচনা করতে উদ্যোগী হলে, অবশ্যই বাংলা সাহিত্যশাস্ত্রের পরিপুষ্টি হবে।

এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করতে, আমি প্রথম নির্বাচন করেছিলাম বেনিডেটো ক্রোচের—'এস্থেটিক' গ্রন্থখানি। প্রত্যেক অধ্যায়ের সারাংশ অনুবাদ ক'রে এবং সিদ্ধান্তগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে—আমি 'ক্রোচের এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। অতি ভয়ে ভয়ে গ্রন্থখানি খ্যাতনামা দার্শনিক—অধ্যাপক (স্বর্গত) শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে পড়তে দিয়েছিলাম। গ্রন্থখানি পড়ে তিনি আমাকে যে ভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন, যে-ভাষায় প্রশংসা করেছিলেন তা চিরকাল মনে রাখবার মতো। গ্রন্থখানি 'থিসিস্' রূপে দাখিল করার জন্য তিনিই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই বছরই ছিল আমার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির শেষ বছর। তাই ঐ বৃত্তির জন্য আমি গ্রন্থখানি দাখিল করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—পরীক্ষা ব্যাপারে বিভ্রাট ঘটায়, বৃত্তিলাভের সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে, বৃত্তিলাভের সৌভাগ্য না হ'লেও পণ্ডিতদের হাতে গ্রন্থখানি তুলে দেওয়ার সৌভাগ্য আমার শীঘ্রই হবে। খুব অল্পকালের মধ্যেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হচ্ছে।

'ক্রোচের এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা' যথারীতি পরীক্ষিত না হওয়ায় আমি আঘাত পেয়েছিলাম' সত্য, কিন্তু সেই আঘাতে আমি সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হইনি। তারপর থেকে, নতুন উদ্যমে আমি সাহিত্যতত্ত্ব এবং নাট্যতত্ত্ব অনুশীলন করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছি। একদিকে চলেছে আমার "নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার" গ্রন্থমালা রচনার কাজ—নাটক সমালোচনার কাজ—অন্যদিকে চলেছে নাট্যতত্ত্বের এবং সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা। নাট্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে, আমি 'নাট্যতত্ত্বমীমাংসা' নামক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছি এবং সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে আমি ইতিমধ্যে 'এরিস্ট-

টলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব', 'হোরেসের আর্স পোয়েটিকা' 'সাহিত্যতত্ত্ব মীমাংসার ভূমিকা' 'মহাকাব্য-জিজ্ঞাসা' এই চারখানি গ্রন্থরচনা শেষ করেছি এবং 'সাহিত্যতত্ত্ব মীমাংসা'—গ্রন্থখানি রচনা করতে ব্যাপৃত আছি। এর পর আমি নিম্নলিখিত গ্রন্থ-রচনা-পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে আত্মনিয়োগ করব। (ক) মধ্যযুগে ও রেনাসাঁয় সাহিত্যতত্ত্ব, (খ) কাণ্টের 'ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট'—পরিচয় ও সমালোচনা, (গ) হেগেলের এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা, (ঘ) ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যতত্ত্ব, (ঙ) বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যতত্ত্ব, (চ) সৌন্দর্যতত্ত্ব। (ছ) সাহিত্যশিল্পতত্ত্বে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের দান। আশা করি, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই, আমি উল্লিখিত সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলির রচনা কার্য শেষ করতে পারব এবং সঙ্কল্পটি সিদ্ধ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

যা'হোক আমার সঙ্কল্পের দ্বিতীয় সিদ্ধি—'এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব' গ্রন্থখানিকে আমি দুই পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে পোয়েটিক্সের বঙ্গানুবাদ এবং পোয়েটিক্স-সম্পর্কিত বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা—যেমন—(ক) এরিস্টটলের জীবনী ও মনীষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় (খ) পোয়েটিক্সের রচনা, (গ) বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ—বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সমালোচনায় পোয়েটিকসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে—সাহিত্য-শিল্পতত্ত্বে পোয়েটিক্সের দানের পরিমাণ নির্ধারণ করার চেষ্টা—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সিদ্ধান্তের আলোকে এরিস্টটলের সিদ্ধান্তের মূল্য যাচাই করবার চেষ্টা—সাহিত্যতত্ত্বের কোন কোন বিষয় নিয়ে এরিস্টটল আলোচনা করেছেন এবং কি আলোচনা করেছেন—তার হিসাব-নিকাশ করার চেষ্টা।

অনুবাদ পর্ব সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে—যে কারণে আমি পোয়েটিক্স অনুবাদ করেছি তা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়তঃ যে পরিমাণ গ্রীকভাষায় জ্ঞান থাকলে গ্রীক থেকে অনুবাদ করা সম্ভব সে জ্ঞান আমার নেই, সুতরাং এ অনুবাদ মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ নয়—বুচারকৃত অনুবাদ

এবং বাইওয়াটার-কৃত অনুবাদ দেখে অনুবাদ। বুচার-কৃত অনুবাদকেই আমি প্রধানতঃ অনুসরণ করেছি; বাইওয়াটার-কৃত অনুবাদ অনেকস্থলে তাৎপর্য নির্ধারণে আমাকে সাহায্য করেছে। তবে, মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ করতে বুচারের মতো বা বাইওয়াটারের মতো পণ্ডিতরা যদি ভুল করে থাকেন—আমি নিরুপায়। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে সেই সব ভুল ইংরেজি-ভাষাভাষীরা এতকাল যদি সয়ে থাকতে পারেন এবং এখনও সইতে পারেন—বাংলাভাষাভাষীরা না হয় আরো কিছুকাল —নিখুঁত অনুবাদ না হওয়া পর্যন্ত—সইবেন; যোগ্যতর লোকের হাতে আরো নির্ভুল ও নিখুঁত অনুবাদ হবে—এই আশা আমি সর্বদাই পোষণ করি। তৃতীয়তঃ এ দাবী আমি অবশ্যই করছি—বাংলা-ভাষায় পোয়েটিক্সের অনুবাদ এই প্রথম। ভারতের অন্য কোন ভাষাতে এরূপ অনুবাদ আছে কি না জানা নেই। তা' না থাকলে ভারতীয় ভাষায় পোয়েটিক্সের অনুবাদ এই প্রথম। চতুর্থতঃ পোয়েটিক্সের রচয়িতা, রচনা, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, নানা দেশে পোয়েটিক্সের প্রসরণ, সাহিত্য-সমালোচনার উপর প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যথাসম্ভব ব্যাপক আলোচনা করেছি এবং তাতে পোয়েটিক্স-সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। এই সকল তথ্যের অনেকগুলি আমি স্পিনগার্ন-রচিত 'লিটারারি ক্রিটিসিজিম ইন্ দি রেনাসাঁ'-নামক বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি। ইতালীতে, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে এবং স্পেনে পোয়েটিক্সের প্রবেশ ও প্রসার কখন এবং কার কার চেষ্টায় ঘটেছে—এ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত গ্রন্থখানিই আমার প্রধান সহায় হয়েছে। এক সঙ্গে এত তথ্যের সমাবেশ, ইংরেজি-ভাষায়-অনূদিত পোয়েটিক্সের কোন সংস্করণেও করা হয়নি। একত্র এত তথ্যের সমাবেশ এই প্রথম—এ দাবীটুকু আমি অবশ্যই করতে পারি।

দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ 'সাহিত্যতত্ত্ব'-পর্ব সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই—সাহিত্যতত্ত্বের বিবিধ জিজ্ঞাসা বা সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে পোয়েটিক্সের আলোচনা, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তের আলোকে পোয়েটিক্সের দানকে

যাচাই করে দেখার চেষ্টা—এর আগে এমন পরিকল্পিতভাবে কেউ করেছেন বলে জানা নেই। অন্ততঃ বাংলাভাষায় যে কেউ করেননি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সহৃদয় পাঠক অবশ্যই দেখতে পাবেন—ইংরেজি ভাষাতে যিনি পোয়েটিক্‌স নিয়ে প্রথম এবং সার্থক আলোচনা করেছেন সেই মনীষী বুচার মহাশয়ও এরূপ পরিকল্পনায় আলোচনা করেননি। মাথা পেতেই এ কথা মেনে নিতে হবে—পোয়েটিক্‌স-আলোচনায় বুচার মহোদয়ের দান অবিস্মরণীয়। বুচারের আগে, আর কেউ ইংরেজি সাহিত্যে পোয়েটিক্‌সের এত ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করেননি। এই কারণে বুচার ইংরেজি-ভাষাভাষী জগতের কাছে শুধু পূর্বাচার্যই নন, অতিশ্রদ্ধেয় একজন পথিকৃত। বুচার মহোদয়কে আমি পূর্বাচার্যের মর্যাদা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। শুধু নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকিনি, বুচার তাঁর "Aristotle's theory of poetry and fine art"-গ্রন্থে পোয়েটিকস সম্পর্কে যে আলোচনা এবং যে-ভাবে আলোচনা করেছেন তা' অতি সংক্ষিপ্ত আকারে—পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তিনি কি কি অধ্যায়ে আলোচনাকে ভাগ করে নিয়েছেন, প্রত্যেকটি অধ্যায়ে মোটামুটি কি কি সিদ্ধান্ত করেছেন—এক কথায়, উক্ত গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয়—আমি পাঠককে জানাতে চেয়েছি। দু'টি উদ্দেশ্যে আমি এ কাজ করেছি: প্রথম উদ্দেশ্য—বুচারের মতো একজন পণ্ডিতলোকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাঙালী-পাঠকের পরিচয় স্থাপন করা—সঙ্গে সঙ্গে বুচারের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যোজনা করে আমার গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—বুচারের আলোচনা পটভূমিতে রেখে, তাঁর সমালোচনার সঙ্গে আমার সমালোচনার ঐক্য ও পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলো। কৌতূহলী পাঠক অবশ্যই দেখতে পাবেন—বুচারের সঙ্গে যেখানে আমি এক সেখানেও ষোল আনা এক নই; বুচারকে অনুসরণ করেও ব্যাখ্যায় ও প্রমাণ-প্রয়োগে তাঁকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার এবং বুচারের অধ্যায়-বিভাগ পরিকল্পনা পাশাপাশি রেখে দেখলেই আমার মনে হয় ঐক্য-পার্থক্যের মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাতে পারে।

বুচার-কৃত 'অধ্যায়'-বিভাগ	আমার অধ্যায়-বিভাগ
১। শিল্প ও প্রকৃতি (Art and nature)	১। শিল্প ও কাব্যশিল্পের লক্ষণ (Defintion of Art and Literature)
২। শিল্পের সংজ্ঞা হিসাবে—"অনুকরণ (Imitation as an Æsthetic term)	২। সৃষ্টি-ব্যাপার (Process of creation)
৩। কাব্যিক সত্য (Poetic Truth)	৩। সৃষ্টির প্রেরণা :(Art impulse)
৪। চারুশিল্পের উদ্দেশ্য (End of Fine Art)	৪। সৃষ্টির উদ্দেশ্য (Purpose of Art)
৫। শিল্প ও নীতি (Art and Morality)	৫। (ক) শৈল্পিক আনন্দ (Æsthetic Pleasure) (খ) শৈল্পিক সৌন্দর্য (Æsthetic Beauty)
৬। ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য (Function of Tragedy)	৬। শিল্পে-সাহিত্যে শ্রেণীবিভাগ (Classification of Art and Literature)
৭। নাটকীয় ঐক্য-বিধি (Dramatic unity)	৭। কমেডি (Comedy)
৮। ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক (Ideal Tragic Hero)	৮। ট্র্যাজেডি (Tragedy)
৯। ট্র্যাজেডিতে বৃত্ত ও চরিত্র (Plot and character in Tragedy)	৯। মহাকাব্য (Epic)
১০। কমেডির সাধারণী করণের ক্ষমতা (Generalizing Power of Comedy)	১০। সমালোচনা (Criticism)
১১। গ্রীক সাহিত্যে সার্বজনীনতা (Universality in Greek poetry)	১১। সাহিত্যে-মতবাদ (ইজিম্) ('Isms'in Art)

প্রথমতঃ—বুচার মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয়-অধ্যায় এবং আমার প্রথম অধ্যায়—"শিল্প ও কাব্যশিল্পের লক্ষণ", আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হতে পারে। কিন্তু বিষয়ে এক হ'লেও, উভয়ের মধ্যে ঐক্য অপেক্ষা পার্থক্যের মাত্রাই বেশী পাওয়া যাবে। শিল্প সম্পর্কে ধারণা, প্রাক-এরিস্টটল গ্রীসে কি ছিল, এরিস্টলে কি আছে এবং পরবর্তীকালে তাতে কি ও কতখানি পরিবর্তন এসেছে,—এই ধরনের আলোচনা বুচার ঠিক করেননি। আমি হোমার থেকে কাব্যস্বরূপ-জিজ্ঞাসার রূপটি অনুসরণ করে এসেছি। আজ পর্যন্ত সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞার মধ্যে যে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে তাদের পরিপ্রেক্ষিত এরিস্টটলের সিদ্ধান্তকে পরীক্ষা করে দেখেছি। এই হিসাবে আমার আলোচনা এবং বুচারের আলোচনা, নামে এক হলেও কার্যত পৃথক। আমার আলোচনার ব্যাপ্তি অনেক বেশী।

দ্বিতীয়তঃ—"সৃষ্টি ব্যাপার" অধ্যায়ে—যে সব সমস্যা তুলে তুলে আমি আলোচনা করেছি—বিশেষতঃ সৃষ্টি ব্যাপারে অবচেতন মনের ক্রিয়া সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তা' বুচারের আলোচনায় অস্ফুটাকারেও স্থান পায়নি; সেই দিক দিয়ে এই অধ্যায়টিকে সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনা বলা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ "সৃষ্টির প্রেরণা"—অধ্যায়টিও সম্পূর্ণ নতুন আলোচনা। এই অধ্যায়ে আমি, প্রেরণা সম্পর্কে পোয়েটিক্‌সের সিদ্ধান্ত কি—তা' নিয়ে যেমন আলোচনা করেছি, তেমনি পরবর্তীকালে এ নিয়ে যত নতুন নতুন মতবাদ দেখা দিয়েছে, তাদেরও সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষার, শুধু—বাংলাভাষার কেন ইংরেজি ভাষারও—কোন সাহিত্য-শাস্ত্রে, এর আগে, বিষয়টি এত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়ে কি না বিশেষজ্ঞরা তা' বিচার ক'রে দেখবেন।

চতুর্থতঃ—বুচার মহাশয়ের "চারুশিল্পের উদ্দেশ্য এবং "শিল্প ও নীতি" এই দুই অধ্যায়ের সঙ্গে আমার "সৃষ্টির উদ্দেশ্য"—অধ্যায়ের ঐক্য অনায়াসেই সকলের চোখে পড়বে, কিন্তু যা' অত অনায়াসে চোখে পড়বে না এবং যেখানে উভয়ের পার্থক্য খুবই প্রকট তা' এই যে, আমি আলোচনা-প্রসঙ্গে, "কলাকৈবল্যবাদ" এবং 'প্রয়োজন-বাদ'—এই দুই মতবাদের দ্বন্দ্বের

ধারাবাহিক ইতিহাস যেমন দিয়েছি, তেমনি তত্ত্বগত আলোচনার দ্বারা সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টাও করেছি। বলা বাহুল্য বুচার এসব আলোচনায় প্রবেশ করেননি।

পঞ্চমত:—"শৈল্পিক আনন্দে"র (æsthetic pleasure)—স্বরূপ সম্বন্ধে আমি যে আলোচনা করেছি, বুচারের গ্রন্থে তেমন আলোচনা করা হয়নি। আমি দেখাতে চেয়েছি, এ বিষয়ে এরিস্টটল যে সিদ্ধান্ত করেছেন—সেইটিই সত্যের বেশী কাছাকাছি। পোয়েটিক্‌স-আলোচনায় এসব বিষয় এত খুঁটে খুঁটে আগে কেউ বিচার করেছেন কিনা—আমার জানা নেই।

ষষ্ঠত:—"শিল্পে ও সাহিত্যে শ্রেণী-বিভাগ" অধ্যায়ের আলোচনায় আমি শ্রেণী-বিভাগের সূচনা ও ক্রমবিকাশের রূপটি উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি,—পোয়েটিক্‌সের রচনাকালে গ্রীকসাহিত্যে নানা প্রজাতির (species) উদ্ভব ঘটেছে, এরিস্টটলের পরেও, সাহিত্যে নতুন নতুন প্রজাতির জন্ম হ'য়েছে ; কালক্রমে পুরাতন প্রজাতির মধ্যেও উপবিভাগ দেখা দিয়েছে এবং এই সব উপজাতিদের কোন-কোনটির আভাস এরিস্টটলের মন্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। বুচারের গ্রন্থে এ বিষয়ে পরিপাটি কোন আলোচনা করা হয়নি। সুতরাং এই অধ্যায়টিকেও এক হিসাবে নতুন যোজনা বলা যেতে পারে।

সপ্তমত:—'কমেডি'—আলোচনার ক্ষেত্রেও, সহৃদয় পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন—কমেডির স্বরূপ এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে আমি যে আলোচনা করেছি, বুচারের আলোচনায় তার অনেক কথাই বলা হয়নি। "হিউমার" ও "স্যাটায়ার" সম্বন্ধে এবং হাস্যরসের স্বরূপ নিয়ে যতটুকু আলোচনা করেছি, তাতে অনেক নতুন কথা বলার তথা পোটিক্‌সের কমেডি-আলোচনাকে অধিকতর-আলোকিত করবার চেষ্টা ব্যক্ত হয়েছে।

অষ্টমত:—ট্র্যাজেডির আলোচনা। শ্রদ্ধেয় বুচার ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা' চারিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যেমন—(ক) ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য (খ) নাটকীয় ঐক্য-বিধি (গ) ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক (ঘ) ট্র্যাজেডির বৃত্ত ও চরিত্র। আমি ট্র্যাজেডি-আলোচনাকে নিম্নলিখিত

পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি। (১) ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (২) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা (৩) ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু (৪) ট্র্যাজেডির নায়ক (৫) ট্র্যাজেডির রস (৬) ট্র্যাজেডির উপসংহার (৭) ট্র্যাজেডির উপাদান ও গঠন (৮) শ্রেণী বিভাগ (৯) ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামা। আমার এই আলোচনা যে ব্যাপকতর—এ কথা নিশ্চয়ই বলে বুঝাতে হবে না। তারপর ট্র্যাজেডির রস, উপসংহার, শ্রেণীবিভাগ এবং ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামা এই সব পরিচ্ছেদে যে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, বুচারের আলোচনায় তারা উপযুক্ত স্থান পায়নি। 'ট্র্যাজেডির রস'—সম্পর্কে আমি যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি, আশা করি, বিশেষজ্ঞরা তার মধ্যে অনেকখানি মৌলিক প্রয়াসের পরিচয় পাবেন। ট্র্যাজেডিতে "pity" এবং "pathos"-এর স্থান আছে কি না—এ নিয়ে আমি যে আলোচনা করেছি তা' অবশ্যই নতুন প্রচেষ্টা বলে গৃহীত হবে। ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগ পরিচ্ছেদেও আমি এমন অনেক কথা বলেছি যা নতুন। আমার আগে—কেউই এদিকে এতখানি আলোকপাত করেননি। যেমন, 'মেলোড্রামা'-শ্রেণীকল্পনার বীজ যে ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগের মধ্যেই অস্ফুটাকারে পাওয়া যায়—এদিকে আমিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গেই আমি দেখাতে চেয়েছি—অধ্যাপক নিকল ট্র্যাজেডির রস সম্পর্কে—যে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন, এরিস্টটলের 'কমপ্লেক্স ট্র্যাজেডি'র লক্ষণটি সেই সিদ্ধান্তকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করেছে।

নবম অধ্যায়ে আমি "মহাকাব্যের স্বরূপ" সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বুচার 'মহাকাব্য' সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি। ফলে এ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নতুন যোজনা। এ অধ্যায়ে, প্রথমে পোয়েটিক্‌স-গ্রন্থে মহাকাব্যের স্বরূপ বিষয়ে যে আলোচনা আছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং তার পরে—রেনাসাঁ-যুগে এবং পরবর্তী যুগে মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণে কি কি নতুন চেষ্টা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের এবং বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রচেষ্টাও শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে—আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, পোয়েটিক্স—আলোচনায় সেই বিষয়ে এর আগে কেউ এত গুরুত্ব দেননি। এই বিষয়টি হচ্ছে—"সমালোচনা-বিধি।" বুচার এ বিষয়ে একেবারেই নীরব। আমি বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি—পোয়েটিক্সে 'সমালোচক' এবং 'সমালোচনা-বিধি' সম্বন্ধে এমন অনেক মন্তব্য আছে, যাদের সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে, মোটামুটিভাবে সমালোচনা-সূত্র তৈরী করা সম্ভব। সমালোচনা সম্পর্কে এরিস্টটল যে কয়টি কথা বলেছেন তা' সংক্ষিপ্ত হলেও উল্লেখযোগ্য। এ অধ্যায়েও আমার মূল পরিকল্পনা-অনুসারে, আমি পরবর্তী সূত্র সিদ্ধান্তগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। সমালোচনায় যে যে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হয়েছে—সমালোচকদের মধ্যে যে যে বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাদের মোটামুটি একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। 'ঐতিহাসিক সমালোচনা-পদ্ধতি—এমন কি মার্কসবাদী সমালোচনা-বিধি সম্বন্ধেও—আলোচনা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গেই, সমালোচনা ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতার ফলে যে সব গোঁড়ামি দেখা দিয়েছে, তাদের সমালোচনা করেছি এবং সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি।

একাদশ অধ্যায়ের আলোচনাও সম্পূর্ণ নতুন। বাস্তববাদ, আদর্শবাদ প্রভৃতি মতবাদের বীজ পোয়েটিক্সে এবং আরো প্রাচীন সমালোচনায় কি ভাবে পাওয়া যায়, সাহিত্যে বাস্তবতা এবং আদর্শবাদিতা বলতে কি বুঝায়—এরিস্টটল কি বুঝেছেন—পরবর্তীকালে এ নিয়ে কি নতুন সিদ্ধান্ত দেখা দিয়েছে—বাস্তবতা-সমস্যার সমাধানের কি চেষ্টা হ'য়েছে—এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এখানে যথাসম্ভব আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সাহিত্য-বিচারে যত উল্লেখযোগ্য মতবাদ দেখা দিয়েছে তাদের একটি তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। "ইজিমে" উৎস সন্ধানে পোয়েটিক্স—পরিক্রমা এই প্রথম এবং পোয়েটিক্সে বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের উৎস আবিষ্কার করাও বোধ হয় এই প্রথম।

পরিশেষে আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ

সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থ নয়, মুখ্যতঃ পোয়েটিক্‌সের সমালোচনা—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় "Revisionary Criticism"—সেই জাতীয় সমালোচনা। সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে পোয়েটিক্‌সের দানের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি এখানে উল্লিখিত ও যথাসম্ভব আলোচিত হয়েছে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র সাহিত্যতত্ত্ব-গ্রন্থে যতখানি পরিপাটি ও বিস্তারিত আলোচনা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক, এখানে ততখানি প্রত্যাশা করলে লেখকের উপর অবিচারই করা হবে। 'পোয়েটিক্‌স'-গ্রন্থে সাহিত্যতত্ত্বের নানা জিজ্ঞাসা ও উত্তর কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এইটিই এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বা গবেষণার বিষয়—এ কথা যিনি ভুলে যাবেন, তিনি গোড়াতেই ভুল করে বসবেন—"এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত্ব"—এই নামকরণের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অগ্রসর হবেন। 'পোয়েটিক্‌সে সাহিত্যতত্ত্ব' নামকরণ করলে নিশ্চয়ই এত কথা বলার কারণ থাকতো না। প্রথমে আমি এই নামই দিয়েছিলাম। কিন্তু বঙ্গবাসী কলেজের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রণব সেন এম, এ, পাণ্ডুলিপি পড়ার পর বর্তমান নামটি নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল—এই গ্রন্থ মুখ্যতঃ 'পোয়েটিক্‌সে'র আলোচনা হলেও, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্বেরও আলোচনা হয়ে উঠেছে। "পোয়েটিক্‌সে সাহিত্যতত্ত্ব" নামকরণ করলে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে যে ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হবে না। তাঁর যুক্তি উপেক্ষা করবার মতো নয় বলেই—"এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত্ব" নামকরণ করেছি। আশা করি সহৃদয় পাঠক নামের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁরা আমাকে উৎসাহ উপদেশ ও গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন—তাঁদের মধ্যে আমার পূজ্যপাদ গুরু অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী, পরমশ্রদ্ধাস্পদ ভূতপূর্ব রামতনু—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু, বর্তমান রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি

সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ও খ্যাতনামা সমালোচক ডাঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ঐ কলেজেরই ইংরেজি-সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীতারক সেন, বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী, অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সাহা, অধ্যাপক শ্রীননীলাল সেন, অধ্যাপক শ্রীসুশীল জানা, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌখিক একটা ধন্যবাদ দিয়ে এঁদের অকৃত্রিম প্রীতির অমর্যাদা করতে চাইনে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারক সেন মহাশয়, তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে, যে আন্তরিকতার সঙ্গে কয়েটি সমস্যাস্থল পড়ে দেখেছেন এবং যেভাবে আমার সমাধানের সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং আলোচনা শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন—তাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি।

অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় শুধু প্রেরণা যুগিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যা' করবার সমস্তই তিনি করেছেন। তবে তাঁর চেষ্টার সঙ্গে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয়ের এবং বেঙ্গল পাবলিশার্সে'র অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক আগ্রহ যুক্ত না হলে, এত বড় একখানি গ্রন্থের এত শীঘ্র প্রকাশ কিছুতেই সম্ভব হতো না। এঁদের সকলেরই কাছে আমি ঋণী হয়ে আছি। সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'মানসী প্রেসে'র কর্মসচিব এবং কর্মচারীদেরও—বিশেষতঃ শ্রীদিনেশচন্দ্র গুণ ও হরিপদ ঘোষ মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মুদ্রণকার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে এঁদেরই সহযোগিতার ফলে। প্রেসের কর্মসচিব শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "প্রুফ" দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ না করলে এত শীঘ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারতো না।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদের হাত এড়ানো সম্ভব হয়নি। তবে

এইটুকুই মন্দের ভাল—তেমন মারাত্মক ভুল কিছু নেই। গ্রন্থের শেষে 'শুদ্ধিপত্র'—জুড়ে দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করিনি। আশাকরি, সহৃদয় পাঠক সমস্ত রকম অপরাধ ক্ষমা করবেন।

তত্ত্ব-রসিকদের উপর বিচারের ভার দিয়ে আমি নিবেদন 'ইতি' করছি।

বঙ্গবাসী কলেজ
কলিকাতা
জুলাই, ১৯৫৬

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থকারের নিবেদন

'এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব'—গ্রন্থের মতো নীরস তত্ত্বমূলক গবেষণা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমি গ্রন্থকার হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই সুযোগে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই সব পাঠকদের উদ্দেশ্যে, যাঁদের আগ্রহে এই দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে। আমার আনন্দের বিশেষ একটি কারণ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুমোদিত পাঠ্য গ্রন্থের তালিকায় স্থান না পাওয়া সত্ত্বেও, গ্রন্থখানির প্রথম মুদ্রণের হাজার কপি বই ফুরিয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন হয়েছে। এর জন্য এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক 'বেঙ্গল পাবলিশার্স'কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দ্বিতীয় প্রকাশক "জাতীয় সাহিত্য পরিষদ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নাট্যকার শ্রীসুনীল দত্ত মহাশয়কেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় সংস্করণে যতখানি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে চেয়েছিলাম তা' করতে পারিনি। পরিমার্জনের মাত্রা সন্তোষজনক এবং পরিবর্ধন যথেষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু একেবারেই কিছু হয়নি তা' বলব না। পরিশিষ্টে পোয়েটিক্সের কয়েকটি জটিল প্রশ্নের বিশেষ আলোচনা করেছি। আশা করি, পাঠকরা ঐ আলোচনা থেকে পোয়েটিক্সের গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করবার আলো খুঁজে পাবেন। বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁরা পরিশিষ্টের আলোচনায় পোয়েটিকসের কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

আমি জানি, আমার আলোচনা শেষ কথা নয় বা সম্পূর্ণ নির্দোষও নয়, তবে এও জানি এবং সেইটিই একমাত্র সান্ত্বনা যে আজও পর্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি যার প্রত্যেকটি কথা শেষ কথা হয়েছে, প্রত্যেকটি লোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা যদি এই গ্রন্থখানি পাঠ করে সামান্যতমও আনন্দ পেয়ে থাকেন আমি মনে করি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আমার প্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীমান্ রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়ে

এবং সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ শিবদাস চক্রবর্তী এবং শ্রীযুত অজিত ভট্টাচার্য ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আচার্যদের নমস্কার এবং বন্ধুবান্ধব ও পাঠকগোষ্ঠীকে প্রীতি জানিয়ে আমার নিবেদন শেষ করছি।

'ক্ষীরোদা-স্মরণ'
সুভাষনগর
দমদম গোরাবাজার
কলিকাতা-২৮

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯

॥ আলোচনা-সূচী ॥

প্রথম পর্ব (অনুবাদ পর্ব)

দ্বিতীয় পর্ব

(সাহিত্য-শিল্পতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় পোয়েটিক্‌সের দান)

॥ এরিষ্টটলের জীবনী ও মনীষা ॥

মহাকালের সোনার তরীতে সোনার-ধান তুলে দেওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য খুব কম জাতিরই হয়েছে। সভ্যতার প্রথম প্রভাতে, এই পরম গৌরবের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য যারা লাভ করেছে, তাদের মধ্যে গ্রীসের নামটি, শুধু যে বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য তাই নয়—চিরস্মরণীয়। প্রাচ্যে ভারতবর্ষ, প্রতীচ্যে গ্রীস, সোনার তরীতে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের সোনার ধান থরে-বিথরে সাজিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিকই—ভৌগোলিক বিস্তারের দিক দিয়ে, গ্রীস সত্যই "একখানি ছোট্টক্ষেত"; কিন্তু সেই ছোট্ট ক্ষেতখানিতে মানব-মনীষার সোনার ফসল ফলেছে বিস্ময়কর প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে। গ্রীস তাই মানব-সংস্কৃতির অন্যতম আদি পীঠস্থান। এ কথা সত্য বটে যে গ্রীসের দিগ্বিজয়ী রাজশক্তির মহিমা 'সন্ধ্যারক্তরাগ সম তন্দ্রাতলে লীন হয়ে গেছে। গ্রীসের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা আজ নগণ্য; সে হিসাবে গ্রীস আজ মৃত। কিন্তু তবু গ্রীস কীর্তিশরীরে আজও জীবিত আজও মহিমান্বিত। একথা সত্য; জগৎ-সভায় সামরিক সন্ধি-বিগ্রহের ব্যাপারে আজ গ্রীসের কোন বড আসন নেই, এসব সভায় কেউই আজ তাকে সভয়ে স্মরণ করেনা কিন্তু একথাও সত্য—যেখানেই সংস্কৃতির স্মরণোৎসব, সেখানেই গ্রীসের জন্য একখানি উচ্চ আসন সংরক্ষিত আছে। গ্রীসের গৌরব তার রাজশক্তির মহিমায় নয়, গ্রীসের গৌরব—তার দার্শনিকের ও কবির কীর্তিকলাপে—তার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পের স্মরণীয় উৎকর্ষে। গ্রীস প্রমাণ করেছে—তস্য হি জীবিতং শ্রেয়ঃ মননেন হি জীবতি—মনন দিয়েই গ্রীস মৃত্যুকে জয় করেছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের হেলেন চরিত্রের অনুকরণে বলা যেতে পারে—"গ্রীসের গৌরব—সক্রেটিস ও ডিমস্থিনিসে, প্লেটো ও এরিস্টটলে, হোমর ও ইয়ুরিপিডিসে। গ্রীসের গৌরব ফিডিয়াস ও লাইকর্গাসে, সাফো ও

পেরিক্লিসে, হিরোডোটাস ও ইস্কাইলিসে। গ্রীসের গৌরব—অসভ্য ইয়ুরোপখণ্ডে সূর্যের মত কিরণ দেওয়ায়—যেমন ভারত আর্য্যযুগে এসিয়ায় আলো দিয়ে এসেছে।"

গ্রীসের এই কীর্ত্তিকণ্ঠহারের মধ্যমণি, মনীষী এরিস্টটল—প্লেটোর একাডেমি মূর্ত্তিমান প্রজ্ঞা 'nous'। এরিস্টটল থ্রেসের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা নগরে ৩৮৪ খৃঃ পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

(জীবনী)

এই নগরটি ম্যাসিডোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এথেন্স-নগরীর দুই শত মাইল উত্তরে অবস্থিত। তাঁর পিতা নিকোমেকাস ম্যাসিডোনের রাজা এবং আলেকজাণ্ডারের পিতামহ দ্বিতীয় আমিনটাসের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। এরিস্টটলের কৈশোর এবং যৌবনের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। একের মতে তিনি পৈতৃক ধন-সম্পত্তি, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করতে গিয়ে উড়িয়ে দেন, উপবাস এড়াবার জন্য সৈন্য-বিভাগে যোগদান করেন, আবার স্ট্যাগিরায় ফিরে এসে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ৩২ বৎসর বয়সে, প্লেটোর কাছে দর্শন পড়বার জন্য এথেন্স গমন করেন। অন্যের মতে—১৮ বৎসর বয়সে তিনি এথেন্সে যান এবং প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্লেটোর "একাডেমি"তে তিনি আট বৎসর (অন্যমতে বিশ বৎসর) অধ্যয়ন করেন এবং প্লেটোর মৃত্যুকালে পর্য্যন্ত (৩৪৭-৮ খৃঃ পূঃ) এথেন্সে থাকেন॥

প্লেটোর মৃত্যুর পরে এরিস্টটল কিছুকাল দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং "আতারনিউস্"এ বন্ধু (অন্যমতে একদা-ছাত্র এবং পরে আতারনিউসের টাইরাণ্ট") হারমিয়াসের কাছে যান। হারমিয়াস শুধু শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন না, নিজের ভগিনীকে (কেহ বলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী) সম্প্রদান করে—গুরুকৃত্য সমাপন করেন। এই ঘটনার একবৎসর পরে ম্যাসিডোনের অধিপতি ফিলিপ তাঁকে আহ্বান জানান এবং আলেকজাণ্ডারের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। আলেকজাণ্ডারের বয়স তখন মাত্র তের বৎসর। তিন বৎসর শিক্ষাদীক্ষার পরে অর্থাৎ ষোল বৎসর যখন আলেকজাণ্ডারের বয়স, তখন তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ৩৩৫ খৃঃ

পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত, (৭ বৎসর) এরিস্টটল ম্যাসিডোনিয়ায় থাকেন এবং ঐ বৎসরেই তিনি এথেন্স প্রত্যাবর্তন করেন।

৩৩৫ খৃঃ পূঃ থেকে ৩২৩ খৃঃ পূঃ—পর্য্যন্ত (৩২৩ খৃঃ পূঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়) তিনি এথেন্সে থাকেন এবং এই বার বৎসরের মধ্যেই তিনি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। এরিস্টটলের বিদ্যাপীঠের নাম—"লাইসিউম"—এপোলোর অন্যনাম লাইসিউসের নামে উৎসর্গীকৃত ব্যায়ামাগারটি। এই লাইসিউমের বৃত্তাকারে-নির্মিত ছায়াশীতল পথে চ'লতে চ'লতে তিনি বক্তৃতা করতেন। অন্তরঙ্গদের কাছে তিনি সকালে জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করতেন, আর বহিরঙ্গের কাছে অপরাহ্ণে রাজনীতিক, অলংকার প্রভৃতি সহজবোধ্য বিষয়ে বক্তৃতা করতেন।

কিন্তু এভাবে তিনি বেশী দিন অতিবাহিত করিতে পারেন না। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এথেন্স ম্যাসিডনের আধিপত্য অস্বীকার করে' বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এরিস্টটল এতদিন আলেকজাণ্ডারকে সমর্থন করে আসছিলেন। এই সমর্থনের মূলে ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শন—ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রের বিলোপ তথা কেন্দ্রীভূত-শাসন—একক একটি গ্রীক রাষ্ট্রের কল্পনা। এথেন্সবাসীরা এই কল্পনাকে সুনজরে তো দেখেইনি, বরং এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েই এসেছে। আলেকজাণ্ডার যখন এথেন্সের মধ্যস্থলে এরিস্টটলের মূর্ত্তি স্থাপন করেন, তখন এথেন্সের অধিবাসীরা বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারেনি। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর—এথেন্সের সমস্ত আক্রোশ আলেকজাণ্ডারের বন্ধু এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। এরিস্টটলও হ'ন প্রধান একটি লক্ষ্য। আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারী এন্টিপেতায় (এরিস্টটলের বন্ধুও বটে) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন বটে, কিন্তু এথেন্সবাসীর উদ্দাম স্বাধীনতাস্পৃহার কাছে অভিযান নিস্ফল হয়ে যায়। এই পরাজয়ের পরে ইউরিমেডন-নামক প্রধান পুরোহিত মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে এরিস্টটলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। অভিযোগে বলা হয়—এরিস্টটল যুবকদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে উপাসনায় ও যাগযজ্ঞে কোন ফল

হয় না—বেগতিক দেখে দার্শনিক চরম প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেন—বিজ্ঞের মত পলায়ন করেন এবং যাবার সময় নাকি বলে যান—দ্বিতীয়বার তিনি এথেন্সকে দার্শনিক হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হ'তে দেবেন না। এথেন্স ত্যাগ করে এরিস্টটল চালকিসে (chalcis) উপস্থিত হন এবং সেখানেই পীড়িত হ'য়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ডাওজিনিস লায়েরতিয়াসের মুখে শোনা যায় —এরিস্টটল গভীর নৈরাশ্যে 'হেমলক' বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন। (গ্রোটের ও জেলারের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। যা'হোক, আত্মহত্যাই করুন বা না করুন, ৩২২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এরিস্টটল ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ভাবে এক বছরের মধ্যেই গ্রীস তার শ্রেষ্ঠ রাজা, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং শ্রেষ্ঠ বাগ্মীকে (ডিমস্থিনিস্) হারায়।

প্লেটোর একটি কথায় এরিস্টটল সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়েছে—এরিস্টটল ছিলেন তাঁর একাডেমির **"নৌস্"** (nus)—মূর্ত্তিমান মনীষা

মনীষা

প্লেটোর মুখেই শোনা যায়—এরিস্টটলের আবাস ছিল যেন একক পাঠ্য-কেন্দ্র ("the house of the reader") নাট্যকার ইউরিপিডিসের পরে একমাত্র এরিস্টটলেরই ছিল —পুঁথিশালা।—(তখনকার দিনে এই গ্রন্থ বিশাল সংগ্রহ খুবই দুর্লভ বস্তু) সার্বভৌম পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব'লে যিনি ভবিষ্যৎ কালে বন্দিত হবেন তাঁর বিদ্যার তৃষ্ণা সাধারণের চেয়ে পৃথক হবে এটাই স্বাভাবিক। এই অসাধারণত্ব না থাকলে, উত্তর-প্রদেশীয় একটি বালককে এথেন্সের প্লেটোই বা "নৌস্" ব'লে—মূর্তিমান মেধা ব'লে জয়পত্র দেবেন কেন?

এই অসাধারণত্বের মূলে আর যত কারণই থাক—একটি কারণ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই কারণেই—এরিস্টটলের পারিবারিক পরিবেশ। এরিস্টটলের বাবা ছিলেন ডাক্তার। ভৈষজ-বিজ্ঞানের সেবা যিনি করেছেন তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কার প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়। দার্শনিক সংস্কার থেকে থাকে, তা নিশ্চয়ই এই যে, দার্শনিকরা যুক্তির বা চিন্তার রাজ্যে সঙ্গতি স্থাপন করতে পারলেই সন্তুষ্ট, আর বৈজ্ঞানিকরা বস্তুর স্বরূপকে জানতে চান। তার অর্থক্রিয়াকারিত্বের হিসাব-নিকাশ করে—বস্তুর ব্যবহারিক উপযোগিতা

পরিমাপ করে করে এবং বস্তু-স্বরূপ-জ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে চান। দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিক-তত্ত্বপ্রবণ, বৈজ্ঞানিক —বস্তু-তত্ত্বপ্রবণ। এইরূপ এক বৈজ্ঞানিক-সংস্কারসম্পন্ন পরিবারের ছেলে এরিস্টটল। এই সংস্কারের নিয়ন্ত্রণের ফলেই, এরিস্টটলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী গড়ে উঠে—এরিস্টটল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার অধিকার ও গৌরব লাভ করেন এ অনুমান অমূলক নয়। খুব সম্ভব এই সংস্কারের প্রাবল্যেই, শেষ পর্যন্ত গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে ফাঁটল ধরে যায়—প্লেটোর মতের সঙ্গে এরিস্টটল মত মেলাতে পারেন না। তাঁর কাছে যদিও "Dear is plato তবু dearer is truth"। যেখানে গুরুর দৃষ্টি "আইডিয়াল"এ নিবদ্ধ, সেখানে শিষ্যের কাছে 'আইডিয়াল'—"আইডিয়া"-মাত্র—নাম মাত্র, 'রিয়েল' কিছু নয়; বস্তু-নিরপেক্ষভাবে আইডিয়ালের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। যুক্তির তীব্র আলোকের সামনে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত এরিস্টটলের শান্তি নেই। কানে শোনা নয়, চোখে দেখা চাই!—এই বাতিক, মনে হয়, জ্ঞানতৃষ্ণারোগের চরম লক্ষণ। এই লক্ষণটিই প্রকাশ পেয়েছে একদিকে গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে—যেখানে যে-আলোচনা আছে তা' জেনে নিয়ে আরো জানার পথটিকে প্রশস্ত করবার চেষ্টার মধ্যে। অন্যদিকে বাস্তব প্রমাণের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে পৌছানোর মধ্যে। এরিস্টটলের বড় বৈশিষ্ট্য, এক কথায় বলতে, এই "বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী"। (পোয়েটিক্‌স আলোচনায় এই বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গীই বেশী পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে)।

এরিস্টটলের মতো সার্বভৌম পণ্ডিত খুবই দুর্লভ। এরিস্টটলের পরে হার্বার্ট স্পেন্সার পর্যন্ত এত বড় সার্বভৌম পাণ্ডিত্য নাকি আর একটিও পাওয়া যায় না। কেউ বলেন—তাঁর গ্রন্থসংখ্যা চারশত, কেউ বলেন—হাজার। যদিও এই রচনার খুব কমই অবশিষ্ট আছে—তবু তা যেন একটা গ্রন্থশালা। নিম্নে এরিস্টটলের রচনার একটি তালিকা দেওয়া যাচ্ছে।

রচনা

(ক) "লজিক"-বিষয়ক ঃ—

১। Categories

২। Topics "Organon"
৩। Prior নামে পরে সঙ্কলিত
৪। Posterior Analysis
৫। Propositions
৬। Sophistical Refutations

(খ) বিজ্ঞান বিষয়ক :—

১। Physics
২। On the Heavens
৩। Growth and decay
৪। Meteorrology
৫। Natural History
৬। On the Soul
৭। The parts of Animals
৮। The movements of Animals
৯। The generation of Animals

(গ) সাহিত্য-শিল্প বিষয়ক

১। Rhetorics
*২। Poetics

(ঘ) দর্শন বিষয়ক

১। Ethics
২। Politics
৩। Metaphysics

উল্লিখিত রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারা যায়—এরিস্টটল কত বড় সার্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন। দার্শনিক-প্রবন্ধকার উইল ডুরাণ্ট মহাশয় এই সার্বভৌমত্ব দেখে বিস্মিত হয়েছেন এবং রচনাগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ

করে বলেছেন—'Here, evidently, is the Encyclopedia Britannica of Greece", তাঁর অনুকরণে, আমাদের ভাষায় আমরা বলতে পারি "গ্রীসের বিশ্বকোষ"। এই সব রচনায় ভুল ভ্রান্তি কি আছে না আছে সে বিচার পরের কাজ—আগের কাজ এক বাক্যে স্বীকার করা—এরিস্টটল মানব মনীষার এক বিরাট সমারোহ—বিশ্বরূপ দর্শন। প্লেটোর মত যাঁর গুরু তিনি চিরধন্য-ভাগ্যবান পুরুষ। এরিস্টটলের মত যাঁর শিষ্য প্লেটোও ধন্য—। তাঁর গুরু-জন্ম চিরসার্থক। প্লেটো বড় না এরিস্টটল বড় ঐ প্রশ্নের মীমাংসা যাঁরা করতে চান করুন। কিন্তু যাঁরা প্লেটোর ডায়ালোগ পড়ার পরে এরিস্টটলের লেখা পড়বেন তাদের একথা স্বীকার করতেই হবে—সত্য-বটে যে প্লেটোর রচনায় এমন অনেক কিছু আছে—বিশেষতঃ কবিত্ব—যা এরিস্টটলের নেই। কিন্তু এও সত্য—এরিস্টটলের মধ্যে যে নৈয়ায়িক বিচার এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে তা প্লেটোর রচনায় নেই। জনৈক দর্শনপ্রিয় লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে—"Instead of giving us great Literature in which philosophy is embodied (and obscured) in myth and imagery, Aristotle gives us science, technical, abstract and concentrated······we can hardly speak of any science to day without employing terms which he invented···(46 Page—The story of philosophy.) এখানেই এরিস্টটলের বৈশিষ্ট্য। যীশুখ্রীষ্টের জীবনী-লেখক মনীষী রেনান্ (Renan) যে বলেছেন—Socrates gave philosophy to mankind and Aristotle gave it Science' তা অতিশয়োক্তি বা কথার কথা নয়। সক্রেতিসের আগেও দর্শন ছিল, এরিস্টটলের আগেও বিজ্ঞান ছিল—তাঁদের পরেও দর্শন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এ কথাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এরা যে ভিত্তি রচনা করেছেন তার উপরই দর্শন-বিজ্ঞানের বিরাট প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের সংহিতাকারের যে স্থান গ্রীসের ইতিহাসে এরিস্টটলেরও সেই স্থান। সমস্ত বিদ্যাকেই তিনি সূত্র-ভাষ্যের রূপে শাস্ত্রের আকার দিতে চেষ্টা করেছেন। এই দিক দিয়ে তিনি

গ্রীসের সংহিতাকার এবং সংহিতাকার শুধু এক বিষয়েই নয়—সর্ব্ববিষয়ে। এরিস্টটলে গ্রীক্-সাগরসঙ্গম—সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা এসে তাতে মিশেছে।

পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, সাহিত্যশিল্প শাস্ত্র—কোনও শাস্ত্রই তাঁর আলোচনার গণ্ডী থেকে বাদ পড়েনি। একটি শাস্ত্র তো তাঁরই উদ্ভাবনী শক্তির চিরস্মরণীয় নিদর্শন হয়ে আছে। *"লজিক" বা তর্কশাস্ত্র এরিস্টটলের অক্ষয় দান। আর কিছু না লিখলেও, শুধু এই একটি কারণেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। যুক্তিশাস্ত্র যিনি প্রবর্ত্তন করেছেন—এবং অধ্যাপনা করেছেন, তাঁর মধ্যে যুক্তি-প্রবণতা যে থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য হলেও বলা দরকার—এরিস্টটলের এই যুক্তি-প্রবণতা নৈয়ায়িক বিচার-বিশ্লেষণরূপে তাঁর সমস্ত রচনায় অনুপ্রবেশ করেছে। একদিকে বিজ্ঞান-চর্চা থেকে এসেছে তথ্য-সংগ্রহের প্রবণতা, অন্যদিকে তর্কশাস্ত্র থেকে এসেছে—নৈয়ায়িক সঙ্গতি স্থাপনের ব্যগ্রতা। ফলে এরিস্টটলের আলোচনা যেমন হয়েছে তথ্য-সমৃদ্ধ তেমনি হয়েছে—ন্যায়সঙ্গত।

বলা নিষ্প্রয়োজন—এরিস্টটলের সার্বভৌম পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই—প্রকৃত প্রস্তাবে, তেমন প্রয়োজনও নেই। এরিস্টটল কত বড দার্শনিক, বা কত বড় বৈজ্ঞানিক—এ প্রশ্ন আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য—পোয়েটিক্‌স-গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে, সাহিত্যে-শিল্পতত্ত্বে এরিস্টটলের অবদানটুকু নির্দ্ধারণ করা। এই কাজ করতে হলে অবশ্যই এরিস্টটলের দার্শনিক সংস্কার বা দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ সুবিদিত, যাঁর যেমন সংস্কার এবং দৃষ্টিকোণ তাঁর তেমন বিচার ও সিদ্ধান্ত। প্লেটো ও এরিস্টটলের আলোচনার মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে—পার্থক্য অবশ্যই আছে—সে পার্থক্য ঘটেছে এই কারণেই যে প্লেটোর মানসপ্রকৃতি ও এরিস্টটলের মানস-প্রকৃত এক নয়। ইচ্ছায় জ্ঞানে ও অনুভবে—এক কথায় সংস্কারে, দু জনে স্বতন্ত্র। মননের পার্থক্য ঘটে—প্রধানতঃ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য এবং সেইখানেই উভয়ের মৌলিক

পার্থক্য। অতএব এরিস্টটলের দার্শনিক দৃষ্টিকোণটির পরিচয় অতি সামান্ত ভাবে দিলেও একটু দেওয়া দরকার এবং বিশেষতঃ দরকার এই কারণে যে দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রভাব সাহিত্য-শিল্পতত্ত্ব বিচার এড়িয়ে থাকতে পারে না। 'সৃষ্টির প্রেরণা সৃজনী-প্রতিভা' প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় এই প্রভাব শুধু যে সবচেয়ে বেশী তা নয়, বলা যেতে পারে' অপরিহার্য॥

পরাতত্ত্বের আলোচনায় নিখুঁত নৈয়ায়িক সঙ্গতির প্রত্যাশা করলে হতাশ হতে হবে—এ কথা বোধ হয় আজও সত্য। তারপর যুগের কথাটাও সব সময় এরিস্টটলের মনে রাখতে হবে। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল। সুতরাং পরাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এরিস্টটলের নির্দ্ধারণ করতে হলে প্লেটোর মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে। যাঁরাই এরিস্টটলের পরাতত্ত্বের আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করেছেন। আমরাও মহাজনের পথ ধরে চলব। সেইটুকু উল্লেখ করেই সন্তুষ্ট থাকব।

"Amicus plato, sed magis amica veritas"—প্লেটো প্রিয়, সত্য প্রিয়তর—এমন একটু ভূমিকা করে নিয়ে, এরিস্টটল গুরুর—'Idea'র ধারণা সমালোচনা করেছেন।

প্লেটো বলেছেন—বিশ্বের সমস্ত বিশেষের মূলে আছে সামান্য আইডিয়া এবং সেই সামান্যের পরা-আদর্শ (archetype), ঈশ্বরের মনের মধ্যে বিরাজ করছে। এই "সামান্যের" বাস্তব সত্তা নিয়েই গুরুশিষ্যের মধ্যে মতভেদ। গুরুর মতে, সামান্যের বিশেষ-নিরপেক্ষ বাস্তব সত্তা আছে! শিষ্যের মতে, তার বাস্তব সত্তা নেই; "সামান্য" একটা মানসিক ধারণামাত্র, বিশেষই বাস্তব। সামান্য নামমাত্র (nomina) বস্তু [res···things] নয়। মনুষ্যত্বের কোন বাস্তব সত্তা নেই—বাস্তব সত্তা আছে মানুষের অর্থাৎ বিশেষ একটি ব্যক্তির। এই মত-পার্থক্য অবশ্যই মৌলিক এবং উপেক্ষণীয় নয়। বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল মহাশয় এরিস্টটলের পরাতত্ত্বকে—"Plato diluted by common sense" বলে যতই উপেক্ষা করুন, এরিস্টটলের বক্তব্যটি অতখানি উপেক্ষা করার মতো নয়। ধর্মী আগে না ধর্ম আগে, "ধর্মী"-নিরপেক্ষ ধর্মের অস্তিত্ব সম্ভব কি না—এই সব প্রশ্ন থেকে আজও পরাতত্ত্ব মুক্ত হয়নি এবং প্লেটোবাদী এবং এরিস্টটল-

বাদীরা যে বিপরীতমুখী ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বের মধ্যেই তার বড় প্রমাণ রয়েছে। ভাববাদকে প্লেটোপন্থা বলা গেলে বস্তুবাদকে বলা চলে—অবশ্য অতি সাধারণ অর্থে এরিস্টটল পন্থা। প্লেটো সত্য কি এরিস্টটল সত্য এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবেশ না করেও আমরা এই কথাটি বলতে পারি—যেখানে প্লেটোর মতবাদে অতিপ্রাকৃত রহস্যের যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে, সেখানে এরিস্টটল ধর্মের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার না করে, বস্তু-সত্তাকে অতিপ্রাকৃত রহস্যের আওতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। একে অতিপ্রাকৃত-প্রবণতা, অন্যে অতিপ্রাকৃত-বিমুখতা "প্লেটো সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করতেন সামান্যকে এরিস্টটল বিশেষকে"—(পাশ্চত্ত্য দর্শনের ইতিহাস)—এই উক্তির মধ্যে এরিস্টটলের বৈশিষ্ট্যের রূপ এবং আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ-নিরপেক্ষ সামান্য সম্ভব নয়—একথা যিনি বলেন, 'ঈশ্বর' স্বীকার করা সত্ত্বেও তাকে প্রথম বস্তুবাদী বলে স্বীকার করলে কোন দোষ হয় বলে মনে হয় না। এরিস্টটল 'form'—(রূপ) এবং matter-এর (বস্তু) সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে রূপ ও বস্তুকে তন্মাত্র হিসাবে দেখার কথা থাকলেও, একথা বলা চলে না—রাসেল যেমন বলেছেন—যে তিনি শেষপর্য্যন্ত প্লেটোর সামান্য বাদকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন—আইডিয়ার পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করে নিয়েছেন। শ্রীযুক্ত তারক রায় মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়--"বিশেষকেই তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করেন নাই"। (পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস)।

অতিপ্রাকৃত-বিমুখতা শুধু সামান্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকারের মধ্যেই যে ধরা প'ড়েছে তা নয়—বস্তুর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাখ্যার মধ্যে এবং ঈশ্বর-কল্পনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে। এরিস্টটলের পরাতত্ত্ব যে জীববিজ্ঞানের প্রভাব গড়ে উঠেছে; উইল ডুর‍্যান্ট মহাশয়ের বিবৃতি উদ্ধার করলেই বুঝতে পারা যাবে। "Everything in the world is moved by an inner urge to become something greater than it is Everything is both the "form" or reality which has grown oun of something which its matter or raw material

....Matter, in its widest sense, is the possibility of form ; form is the actuality, the finished reality of matter .... Form is not merely the shape. but the shaping force an inner necessity and impulse which moulds mere material to a specifc figure and purpose... ...Nature is the conqeust of matter by form, the constant progression and victory of life। বিশ্বের 'সৃষ্টি-স্থিতি-লয়' ব্যাপারের মূলে কোন দেবতার ইচ্ছা বা লীলার হাত নেই। এরিস্টটলের দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত বটে কিন্তু সে ঈশ্বর সাংখ্যের পুরুষেরই মতো অজ নিষ্ক্রিয় ও চৈতন্য স্বরূপ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তাঁর কোন হাত নেই। তাঁর মর্য্যাদা শুধু গতির 'প্রথম কারণ' হিসাবে—"Primum mobile immotum—prime mover unmoved") এরিস্টটলের এই ঈশ্বর সম্পর্কে উইল ডুরাণ্ট মহাশয় সরস ভঙ্গীতে লিখেছেন—Pcor 'Ariastotelian God !—he is a roi faincant a do-nothing king ; "the king reigns, but he does not rule" মনীষী রাসেলও উক্ত ঈশ্বরকে একটি ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়েছেন—"we must infer that God does not knew of the existance of our sublunary world"। এই উদাসীন ও অকেজো 'ঈশ্বর' কল্পনার কারণ কেউ কেউ মনে করেন—"Aristole's subtle way of saving himself from Anti Mocedonian hemlobk" হেমলক বিষ এড়াবার সূক্ষ্মকৌশল যা'হোক—এরিস্টটলের দর্শনে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্তু 'স্বধর্ম-অনুসারেই' পূর্ণ অভিব্যক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব-জগৎ তার 'এণ্টেলেকির' অন্তর্নিহিত আবেগে বিবর্ত্তনশীল প্রত্যেক বস্তুর অভিব্যক্তি ঘটছে তার অন্তর্নিহিত স্বভাব, গঠন ও উদ্দেশ্যের বশে। প্রত্যেক বস্তু বিশেষ বিশেষ পরিণতির টানে (Entelecheia) অভিব্যক্ত হয়ে থাকে (everything is guided in a certain direction by-its nature and entelechy)। "এণ্টেলেকেইয়া"--শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। এই ক্রমপরিণামের ধারণার মধ্যে বিবর্ত্তনবাদী চিন্তার মধ্যে সংস্কার নিহিত

আছে। এই সংস্কার এরিস্টটলের মনের অন্যতম বৈশিষ্ট। (ট্র্যাজেডির বা কমেডির ক্রমবিকাশ আলোচনায় এই সংস্কারই সক্রিয় হ'য়েছে)।

পরাদর্শনের আর বেশী গভীরে প্রবেশ না করে, এবার অমরা এরিস্টটলের দার্শনিক সংস্কার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি কথা বলতে পারি :—

(ক) এরিস্টটলের মন ছিল অতিপ্রাকৃত বিমুখ—ফলে, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাপারের মূলে তিনি কোন দৈব-শক্তির ইচ্ছা কল্পনা করেন নি। তাঁর দর্শনে—'Divine providence coincdes completely for Aris totle with the operation. of natural causes' —(zeller).

(খ) এরিস্টটলের মনে বিবর্ত্তনবাদী সংস্কার ক্রিয়াশীল।

(গ) এরিস্টটলের মন নৈয়ায়িকের মতো যুক্তি-প্রবণ এবং বৈজ্ঞানিকের মতো বিশ্লেষণ পরায়ণ এবং তথ্যনির্ভর।

॥ পোয়েটিক্স গ্রন্থের রচনা—অনুবাদ ও প্রভাব ॥

এরিস্টটলের রচনার কালানুক্রম নির্দ্দেশ করার চেষ্টা কেউ কেউ না করেছেন এমন নয় (Shule—History the Aristotelian writings. দ্রষ্টব্য) কিন্তু ফল যে খুব সন্তোষজনক হয়েছে এ কথা বলা যায় না। কোন্টা এরিস্টটলের নিজের রচনা আর কোন্টাই বা এরিস্টটলের দেওয়া বক্তৃতার সংগ্রহ, তা' জোর করে বলা মুস্কিল। তবে একটি বিষয়ে সকলেই নিশ্চত যে এরিস্টটলের নামে যে-সব গ্রন্থ চলছে, তার প্রেরণা বা মূল কর্ত্তৃত্ব এরিস্টটলেরই যে হাতেরই লেখা হো'ক মাথা যে এরিস্টটলেরই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর জীবিত-অবস্থায় **"লজিক ও রেটোরিক"** ছাড়া অন্যকোন গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তার ঠিক কোন্ বৎসর পোয়েটিক্স গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাও জানবার উপায় নেই। এবে

এইটুকু অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না যে, ১৩৫ খৃঃ পূঃ থেকে ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে এরিস্টটলের অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়। পোয়েটিক্‌সও এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ বার বছরের মধ্যে কোন একটি বছরে রচিত হয়। অবশ্য আলেকজাণ্ডারকে তিনি কি কি পড়িয়েছিলেন—পড়াবার জন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কি না এমন প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে অনুমানকে একটু প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

পোয়েটিক্‌সের পরবর্ত্তী ইতিহাস

এরিস্টটলের মৃত্যুর পরে, পোয়েটিকসের কি দশা হ'য়েছিল তা ঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁর অনেক লেখার মতোই, 'পোয়েটিক্‌স, গ্রন্থখানিকেও তিনি সংশোধিত করে যেতে পারেনি। খুব সম্ভব পরবর্ত্তী ঐ অসংশোধিত রূপেই আলেকজন্দ্রাস্থিত পণ্ডিতদের কাছে বইখানি পরিচিত ছিল। 'কমেডি' পরিচ্ছেদ কবে মূল বই থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল সে ইতিহাসটুকু অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে—বলার প্রমাণ কিছু কিছু আছে—যে খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই বাইজান্তিয়ুম প্রভৃতি গ্রীক্‌-উপনিবেশ কেন্দ্রগুলি পোয়েটিক্‌সের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল।

অনুবাদ

গ্রন্থখানি প্রথম সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয়। সীরয় ভাষা থেকে আবু-বাশ্‌শর (Abu-Baschar) আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন (৯৩৫ খৃঃ)

দুই শতাব্দী পরে মুসলমান দার্শনিক এভারীয়িস (Averroes) পোয়েটিকসের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করেন। এই বইখানি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, হেরমান (Hermann) নামক জনৈক জার্মান লাতিনে অনুবাদ করেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে করেন স্পেনের-অন্তর্গত টরটোসার মার্ণ্টিনাস (Mantinus)। হেরমানের গ্রন্থখানি মধ্যযুগে চলিত থাকলেও, খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারনি। "রোজায় বেকন" বইখানি উল্লেখ ও সমালোচনা করেন—এবং দান্তে বোকাচিও এবং পেত্রার্কাও বইখানির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে এরিস্টটলের পোয়েটিক্সকে সকলেই 'লুপ্তরত্নের উদ্ধার'

বলেই মনে করেছেন। সেগ্নি (Segni) (ইতালীয় ভাষায়-অনুবাদক) বলেছেন "বহুকাল পরিত্যক্ত ও অবহেলিত গ্রন্থ। এর দশবৎসর পরে বার্নার্ডো ট্যাসো বলেছেন—"বহুকাল অজ্ঞাত অবস্থার ছায়ায় কবরস্থ থাকার পরে"। যা হোক এ কথা সত্য যে যখন জর্জিও ভল্লা (Georgio valla) ভেনিস নগরে ১৪৯৮ খৃঃ গ্রন্থখানি লাতিন—অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন সকলেই নূতন আবিষ্কার বলে গ্রন্থখানিকে সমাদর করেছিল। এর পর ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে মূল গ্রীকপাঠসহ অনুবাদ—এলডাইন রেটোরিস্ গ্রেইকি (Rhetores graeci) প্রকাশিত হয়। তখনও, সমালোচনা সাহিত্যের পোয়েটিক্সের প্রভাব তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অলেচ্ছান্দ্রো দে পাজ্জি (Alessandro, deg'pazzi)—মূল পাঠ সহ সংশোধিত লাতিন অনুবাদযুক্ত একত্র সংস্করণ প্রকাশ করার পর থেকে—সমালোচনা-সাহিত্যে এরিস্টটলের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে।

তারপর ১৫৪৮ খৃঃ রোবারটেল্লি (Robertelli) মহাশয় লাতিন-অনুবাদ সহ পোয়েটিক্সের টীকাভাষ্য সমন্বিত একত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং পর বৎসরেই ইতালীয় ভাষায় "বার্নার্ডো সেগ্নি" গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন। সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত, পোয়েটিক্সের অনুবাদ এবং টীকা ভাষ্য রচনার ধারা বয়ে আসছে এবং সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষতঃ নাট্য-তত্ত্বের আলোনায়, এরিস্টটলের কথা না বলা অনেকটা শিবহীন যজ্ঞের মত ব্যাপার।

নিম্নে পোয়েটিক্সের বিভিন্ন সংস্করণ ও অনুবাদের একত্র তালিকা (বুচার-কৃত) দেওয়া যাচ্ছে। এই তালিকা থেকেই বুঝা যাবে পোয়েটিক্স নানাদেশে এবং নানা যুগে কতখানি খ্যাতি ও গুরুত্ব লাভ করছে।

১। ভল্লা । Valla. (G)—লাতিন অনুবাদ ১৪৯৮ (ভেনিস) [এলডাইন পাঠ্য—"রেটোরিস গ্রেইকি—(১৫০৮) ॥]

২। পাজি [Pazzi—A)]—এরিস্টটেলিস্ পোয়েটিকা……(১৫৩৬)

৩। ত্রিন্‌কেভেলি (গ্রীকপাঠ)—১৫৩৬ (ভেনিস্)

৪। রোবারটেলি [Robertelli (Fr)]—"ইন লিব্রুম এরিস্টোটেলিস ডি আর্টে পোয়েটকা এক্সপ্লানেসানেস্"—১৫৪৮

৫। সেগ্নি [Segni (B)]—"রেটোরিকাই পোয়েটিকা এরিস্টোটেলে ট্রাডোত্তে ডি গ্রোকো ইন লিঙ্গুয়া ভল্‌গারে"—১৫৪৯ (ফ্লোরেন্স)

৬। মগ্‌গি [Maggi (V)]—"ইন্‌ এরিস্টটেলিস লিব্রুম ডি পোয়েটিকা এক্‌সপ্লানেশানেস্‌"—১৫৫০ (ভেনিস্‌)

৭। ভেত্তোরি [Vettori-(P)]-"কম্‌মেন্‌টেসানেস ইন প্রাইমাম লাইব্রাম এরিস্টোটেলিস দে আর্টে "পোয়েটারুম্‌"—১৫৬০ (ফ্লোরেন্স)

৮। কস্টেলভেট্রো [Castelvetro—(L)]—পোয়েটিকা দ' এরিস্টো-টেলে ভালগারাইজ্জেতা ১৫৭০—ভিয়েনা

৯। পিক্কোলোমিণি [Piccolomini—(A)]—"এম্নোটেসানি নেল্‌ লাইব্রো ডেল্লা পোয়েটিকা দ' এরিস্টোটেলে, কোন্‌ লা ট্র্যাডুশানে ডেল্‌ মেডেসিমো লাইব্রো ইন্‌ লিঙ্গুয়া ভোলগারে (১৫৭৫)

১০। কসৌবোন্‌ [Casaubon (I)]—১৫৯০ (লেডেন)

১১। হেইনসিয়ুস [Heinsius (D)]—১৬১০ (")

*১২। গৌলস্টোন [Goulston (T)]—লাতিন অনুবাদ (লণ্ডন), ১৬২৩, কেম্ব্রিজ—১৬৯৬

১৩। দেশিয়ের (Dacier)—লা পোয়েটিক ট্র্যাদুইট আঁ ফ্রান্সে আভেক্‌ দেশ্‌ রিমার্কস্‌ ক্রিটিক্‌স। প্যারিস—১৬৯২

১৪। ব্যাতুক্স (Batteux)—লে ক্যতর কোরাট্রেস্‌ পোয়েটিকস দ্য এরিস্টোতে, হু হোরেস, দে ভিদা, দে দেসপ্রেয়ো, অবেক লেস ট্রেডাকশান এ দে বিমারক্‌ পর লা বেব ব্যাতুকস—প্যারিস—১৭৭১

১৫। উইনস্ট্যানলি—পোয়েটিক্‌স-এর ভাষ্য—অকস্‌ফোর্ড (১৭৮০)

১৬। রেইজ (Reiz)—ডি পোয়েটিকা লাইবের"—লাইবজিক্‌ ১৭৮৬

১৭। মেতাস্তেশিও [Metastsio—(P)—"এসট্রাত্তো ডেল্‌ আর্টে পোয়েটিকা দ' এরিস্টোটেলে এ কনসিডেরেশানি সু লা মেডেজিমা প্যারিস—১৭৮২

*১৮। টোয়াইনিঙ [Twining—(T)—এরিস্টটলস্‌ ট্রিটিজ অন্‌ পোয়েট্রি, ট্র্যানস্লেটেড্‌ : উইথ নোটস অন্‌ দি ট্রানস্লেশান এ্যাণ্ড অন্‌দি আরজিনাল;

এ্যাণ্ড টু ডিসার্টেশান অন পোয়েটিকাল এ্যাণ্ড মিউজিকাল ইমিটেশান: **লণ্ডন**—১৭৮৯

১৯। **পাই** (এইচ জে)—পোয়েটিকসের ভাষ্য—আধুনিক কাব্য থেকে উদাহরণ তুলে ভাষ্য প্রয়োগ—পরিশিষ্টে—নূতন এবং সংশোধিত অনুবাদ সংযোজিত ॥ লণ্ডন—১৭৯২

২০। **তিরহুইট** (Tyrwhitt) ডি পোয়েটিকা লিবের (**অক্‌সফোর্ড**) ১৭৯৪

২১। **কুহ্‌লে : জে : টি :**—ডি পোয়েটিকা লিবের (গটিঙ্গেন) ১৭৯৪

২২। **হেরমান** (গডফ্রে) "আরস্‌ পোয়েটিকা কুম কমেণ্টারিস্‌ (লাইপৎজিগ্‌) ১৮০২

২৩। **গ্রাফেনহাম্‌** (ই, এ, ডবলু)—"ডি আরটে পোয়েটিকা লিক্রম্‌ **দেনো** রিসেনস্থইট কমেণ্টারিস ইলুসটাভিৎ ১৮২১, লাইপ্‌জিগ

২৪। **রাউমের** (Raumer) উবের ডি পোয়েটিক ডেশ্‌ এরিস্টটলস্‌ উণ্ড-জাইন্‌ ফেরহল্‌টনীস্‌ ৎস্থডেন নত্রর্ণ ড্র্যামেটিকের্ণ (বের্লিন)—১৮২৯

২৫। **স্পেঙ্গেল** (Spengel)—উবের এরিস্টটলস্‌ পোয়েটিক এভাণ্ডলুঙ্গেন ডের মুনসেনের একাডেমি। ফিলজাফি-ফিললজি—(মিউনিক)—১৮৩৭

২৭। **রাইটের** (Ritter) আদ্‌ কোডিসেস্‌ এস্তিকুয়োস্‌ রিকগ্‌নিতাম্‌ লাতিনে কনভার্সাম কমেণ্টারিও ইলুসত্রেলাম্‌ এডিভিত ফ্রান্সিসাস্‌ রাইতের। (কলোন) ১৮৩৯

২৮। **ভাইল** (Weil) উবের ডি ভিরকুঙ্‌ ডের ট্র্যাজেডি নক্‌ এরিণ্টটলস ...(বেসেল) (১৮৪৩)

২৯। **এগের** (Egger)—"এছে স্থ লিস্‌তোয়ার দে লা ক্রিটিক শে লে গ্রেক স্থইবি দেলা পোয়েটিক দ্য' অরিস্টোট্‌ এ দেকস্ত্রের দে সে প্রবলেম্‌ আভেক ট্র্যাডাকশিও ফ্রাসে এ কমেণ্টের।

৩০। **বার্নেস** (জেকব)—"গ্রুণ্ডটস্থগে ডের ফেরলোরেনেন্‌ এভাণ্ডলুঙ ডেশ এরিস্টটলস উবের ভিরকুঙ ডের ট্র্যাজেডি—(ব্রেসলাউ—১৮৫৭)

৩০। **স্যাঁত্তিলের**—"পোয়েটিক ট্র্যাডুইট আঁ ফ্রাসেঁ এ্যাকম্‌প্যাগ্নে দে নোট পারপেচুয়েল—১৮৫৮

৩১। **স্ট্রহ** (Stahr)—এরিস্টটল উণ্ড্‌ ডি ভিয়রকুঙ্‌ ডের ট্র্যাজেডি

৩২। **লিপের্ট** (Liepert)—এরিস্টটল উবের ডেন্‌ ৎ্‌স ভেক ডের কুন্‌স্ট

৩৩। **সুজেমিল**—এরিস্টটলস্‌ উবের ডি ডিস্টকুন্‌স্ট গ্রীকিশ উট ডয়েট্‌শ্‌ উট মিট শ্যাক্‌ এর ক্লারেণ্ডেন এ্যানমার কুঙ্গেন (১৮৬৫)

৩৪। **ফ্যানেল** (জে) বেইট্রাগে ৎসু্‌ এরিস্টটলস্‌ পোয়েটিক (১৮৬৫)

৩৫। **স্পেঙ্গেল** (এল) এরিস্টটেলিশে স্টুডিয়েন (১৮৬৬)

৩৬। **ফ্যালেন** (জে) এরিস্টটেলিস ডি আর্টে পোয়েটিকা লিবের (বার্লিন—১৮৬৭)

৩৭। **টাইকমূলের** (জি) এরিস্টটেলিশে ফরশুঙ্গেন—
(১ম) বেইট্রাগে ৎসুর এরক্লারুঙ্‌ ডের পোয়েটিক ডেশ এরিস্টটলস
(২য়) এরিস্টটলস ফিলজফি ডের কুন্‌স্ট (১৮৬৯)

৩৮। **উবেরবেক** (এফ্‌) [টীকা-সহ জার্ম্মান অনুবাদ] ১৮৬৯

৩৯। **রাইনকেন** (জে-এইচ) এরিস্টটলস উবের কুন্‌স্ট্‌ বিশণ্ডারস উবের ট্র্যাজেডি—(ভিয়েনা) ১৮৭০

৪০। **ডোরিঙ** (এ)—ডি কুন্‌স্ট্‌লেহ্‌রে ডেস্‌ এরিস্টটল (জেনা) ১৮৭০

৪১। **উবেরবেক** (এক) এরিস্টটেলিস আর্স পোয়েটিকা আদ ফিদেম পোটিসিমাম কোডিসিস এ্যান্টিকিসিমি ১৮৭০

৪২। **বাইওয়াটার** (আই)—* 'এরিস্টোলিয়া' [ভাষাতত্ত্বের পত্রিকা —৫ম খণ্ড ১১৭, ১৪শ খণ্ড ৪০, লণ্ডন+কেম্ব্রিজ ১৮৭৩, ১৮৮৫]

৪৩। **ফ্যালেন** (জে) এরিস্টটেলিস দে আর্টে পোয়োটিকা লিবের : ইতেরুম্‌ রেসেনস্যুট এ এদনোটেশান ক্রিটিকা ঔক্‌সিট্‌ (বার্লিন —১৮৭৪)

৪৪। (ই)—ফ্যালেনের পাঠ, টীকা সহ—(অক্‌সফোর্ড ১৮৭৫)

৪৫। **খ্রাইস্ট** (ডব লু)—[রিসেনস্যুট. লাইপ্‌ৎজিগ, ১৮৭৮, ১৮৯৩]

৪৬। **বার্নেশ** (জেকব) ৎস্‌তাই এভাণ্ডালুঙ্গেন উবের ডি এরিস্ট-টেলিশে টিওরি ডেস্‌ড্রামা, বার্লিন—১৮০০

৪৭। **ব্রাণ্ডশাইড্‌** (এফ্‌)—[মূল পাঠ, জার্মান অনুবাদ টীকা ও ভাষ্য —বাইজবাডেন ১৮৮২]

*৪৮। **হোয়ার্টন** (ইঃ আরঃ) ফ্যালেন ধৃত পাঠ ও ইংরেজী অনুবাদ অক্‌সফোর্ড—১০৮৩

৪৯। **ফ্যালেন** (জে)—এরিস্টটেলিস্‌ ডির আর্টে পোয়েটিকা লিবের: —টেরটিস্‌ কিউরিস্‌ রিকগনোভিট এ এ্যাড্‌নোটেশিয়ন ক্রিটিকা ঔক্‌সিট (১৮৮৫)

৫০। **মার্গোলিথ** (ডি) "এ্যানালেক্‌টা ওরিএণ্টালিয়া এ্যাড্‌ পোয়েটিকাম্‌ এরিস্টটেলিয়াম্‌—লণ্ডন ১৮৮৭

৫১। **বেনার্ড** (সি) লা এস্থেটিক দ্য' এরিস্টোট্‌ ১৮৮৭ (প্যারিস)

৫২। **গোম্পের্জ** (টি) "ৎসু এরিস্টটলস পোয়েটিক (১ম) ভিয়েনা—১৮৮৮

৫৩। **হাইডেনহাইন** (এফ্‌)—"এভারোই প্যারাফ্রেজেসিস্‌ ইন্‌ লিব্রাম পোয়েটিকা এরিস্টটেলিল্‌ জেকব ম্যান্টিনো ইণ্টারপ্রেটে—(লাইপৎজিগ—১৮৮৯)

৫৪। **প্রিকার্ড** (এ ও)—"এরিস্টটল অন্‌ দি আর্ট অফ্‌ পোয়েট্রি ..... এ লেকচার উইথ্‌ টু এ্যাপেণ্ডিসেস্‌ (লণ্ডন—১৮৯১)

৫৫। **ক্যারোল** (এম্‌) এরিস্টটলস্‌ পোয়েটিকস্‌......(বাল্টিমোর—১৮৯৫)

৫৬। **গোম্পের্জ** (টি) এরিস্টটলস্‌ পোয়েটিক—ওয়েবার সেট্‌শ্‌ন্ট্‌ উণ্ড আইঙ্গেলেট ১৮৯৫

৫৭। ৎসু এরিস্টটলস পোয়েটিক ২য়, ৩য় ১৮৯৬

৫৮। **বাইওয়াটার** (আই) এরিস্টটেলিস ডি আর্ট পোয়েটিকা লিবের —অক্‌সফোর্ড (১৮৯৭)

৫৯। **ফ্যালেন** (জে)—হেরমেন্যুতিশে বেমের কুঙ্গেন ৎসু এরিস্টটলস পোয়েটিক……১৮৯৭

৬০। **স্পিনগার্ন** (জে. ই) এ হিস্ট্রী অফ্‌ লিটারারি ক্রিটিসিজম্‌ ইন দি রেনসাঁ (নিউ ইয়র্ক—১৮৯৯)

৬১। **টুকের (টি জি**)—এরিস্টটেলিস পোয়েটিকা (লণ্ডন ১৮৯৯)

৬২। **সেণ্ট্‌সুবেরি** (জি)—"এ হিস্ট্রী অফ্‌ ক্রিটিসিজম্‌—প্রথম খণ্ড—১৯০০

৬৩। **ফিন্‌স্‌লের** (জি) প্লেটোন্‌ উণ্ড ডি এরিস্টটেলিশে পোয়েটিক (লাইপ্‌ৎজিগ্‌—১৯০০)

৬৪। **কোর্টহোপ্‌** (ডবলু জে) লাইফ্‌ ইন পোয়েট্রি : ল ইন্‌ টেস্ট্‌ (১৯০১)

৬৫। **বাইওয়াটার** (আই)……অন্‌ সার্টেন টেকনিক্যাল টার্মস ইন এরিস্টটলস পোয়েটিক্‌স……(ভিয়েনা—১৯০২)

৬৬। **টুক্যাক্‌** (জে)—উবের ডেন এ্যারাবিশের কোমেণ্টার ডেশ্‌ এ্যাভারোয়েস ৎসুর পোয়েটিক ডেশ্‌ এরিস্টটলস্‌……১৯০২

৬৭। **ক্যারল** (**মিচেল**) এরিস্টটলস্‌ এস্থেটিক্‌স অফ্‌ পেন্টিঙ এ্যাণ্ড স্কাল্‌পচার—(জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়)—১৯০৫

৬৮। **নোক্‌** (এফ্‌) বেগ্রিফ্‌ ডের ট্র্যাজেডি নক্‌ এরিস্টটলস (বার্লিন —১৯০৬)

*এই তালিকায় বুচার নিজের নাম এবং আরো দুই-একজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি। এই তালিকাটিতে চতুর্থ সংস্করণের (১৯০৭) পূর্ববর্তী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে সকলের নাম এখানে দেওয়া হয়নি, আগেই বলা হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখান যেতে পারে—এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স—রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন বি অর্ডিনস্কি (B. Ordynsky)—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ঐ খ্রীষ্টাব্দেই **এন. জি. চেরনিশেভ্‌স্কি মহাশয়**—গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে—"পোয়েটিক্‌স অফ এরিস্টটল" নামে নিবন্ধ রচনা করেন। বুচার এদের নাম

উল্লেখ করেননি। তারপর স্পিন্‌গার্নের বা সেন্ট্‌সবেরি মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ যেখানে করা হয়েছে সেখানে—ই, মুলের মহোদয়ের—"গেশিস্টে ডের থিওরী ডের কুনস্ট্‌ বেই ডেন অল্টেন"…(২ খণ্ড) * [History of the theory of Art Among the Ancients Vol. 2 (1834-1837)] —গ্রন্থখানির উল্লেখ করা উচিত ছিল। যা করা হয়নি তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। যা করেছেন তার জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁর অসম্পূর্ণ তালিকাকে সম্পূর্ণ করবার অভিমান না রেখে আমরা পরবর্তী বা অনুল্লিখিত পোয়েটিকস সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য রচনার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতে চেষ্টা করতে পারি।

১। বুচার (এস্ ঃ এইচ)—এরিস্টটলস্ থিওরী অফ্ পোয়েট্রি এ্যাণ্ড ফাইন আর্ট (১৮৯৫)

২। বাইওয়াটার (ইনগ্রাম)—এরিস্টটল অন দি আর্ট অফ পোয়েট্রি —(১৯০৯)

৩। লেন কুপার—দি পোয়েটিক্‌স অফ্ এরিস্টটল—ইট্‌স্ মিনিঙ্ এ্যাণ্ড ইন্‌ফ্লুয়েন্স—১৯২০

৪। লুকাস (এফ ঃ এল)—'ট্র্যাজেডি'—ইন্ রিলেশান টু এরিস্টটলস পোয়েটিক্‌স (১৯২৮)

৫। অগাস্টো রোস্টাগনি—(সম্পাদিত) এরিস্টটেলি—লা পোয়েটিক —১৯৩৪

৬। মনারা ভলগিমিগলি—(সম্পাদনা)—১৯৩৪

৭। ফার্ডিনাণ্ডো এ্যালবেগিয়ানি—(ঐ)—১৯৩৪

*[তালিকা বড় না করে আমরা লেন কুপার ও আলফ্রেড্ গুডিম্যান-কৃত—A Bibliography of the poetics of Aristotle 1928 এবং মারভিন ঃ টি ঃ হেরিক—কৃত—"A supplement to Cooper and Gudeman's Bibliog A. J. P. 52, 1931—প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি]

এ পর্যন্ত যে তালিকাটি দেওয়া হয়েছে তা দেখে সকলেই অনায়াসেই এ

কথা বলতে পারেন যে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে গ্রন্থখানি নানা ভাষায় অনূদিত হয়, বড় বড় পণ্ডিতরা যার টীকাভাষ্য রচনা করেন, সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় যে গ্রন্থখানির নাম সর্বাগ্রে উল্লিখিত হয়, সে গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ—অসামান্য প্রভাবশালী গ্রন্থ। বাস্তবিকই, পোয়েটিক্‌সের প্রভাবের ইতিহাস আলোচনা করলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

"পোয়েটিক্‌স -এর প্রভাব

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—পোয়েটিকস আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতদের কাছে অপরিচিত ছিল না। খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই বাইজান্তিয়াম এবং অন্যান্য গ্রীককেন্দ্রে গ্রন্থখানি পরিচিত ছিল। প্রথমে **সিরীয় ভাষায়** পরে (৯৩৪ খৃঃ) **আরবীয় ভাষায়** এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে **লাতিন ভাষায়** অনূদিত হয়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে, গ্রন্থখানি অনেকের নিকট পরিচিত থাকলেও, যাকে বলে প্রভাব তা ঠিক ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীতে কবি চসারের একটি উক্তি থেকে মনে হয়—চসারের কালে পোয়েটিক্‌স অপরিচিত নয় (এগাথোনের 'এন্থেউস-এর উল্লেখ—প্রমাণ)।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌সের প্রভাব লক্ষণীয় রূপে দেখা যায়। ভল্লার লাতিন অনুবাদে (১৪৯৮-১৫০৪); রোবোরটেলি (১৫৪৮), মিণ্টুর্নো (১৫৫৯), স্ক্যালিগের (১৫৬১) কস্টেলভেত্রো (১৫৭০) মগ্‌গি, লোম্বার্ডি, ভেত্তোচি, পিকোলিমিনি, বিক্কোবনি, সল্‌ভিয়তি প্রমুখ ইতালীয় পণ্ডিতগণের টীকা-ভাষ্যে, পোয়েটিকসের খ্যাতি ও প্রভাব বহুধা বৃদ্ধি পেতে থাকে। **মধ্যযুগে হোরেসের "আরস পোয়েটিকা"রই ছিল একাধিপত্য।** সে আধিপত্য পোয়েটিকসের অভ্যুদয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হ'ল। হোরেসের প্রতি এতকালের যে আনুগত্য পোয়েটিকসের একাধিপত্যের পথে সেই আনুগত্যই ছিল প্রধান বাধা।

যা'হোক পোয়েটিকসের প্রভাব, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতেই, নাট্য

সাহিত্যের মধ্যে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। ত্রিসিনোর **"সফোনিসবা"** (১৫১৫) নামক নাটকে, রুসেলার **"রোসমুণ্ডা"** (১৫১৬) নামক নাটকে এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য বহু ট্র্যাজেডিতে, এরিস্টটলের সূত্রকেই যেন নিদর্শায়িত করবার চেষ্টা হয়েছে। এইসব নাটকের ভূমিকাসমূহেও পোয়েটিসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তদানীন্তন অন্যতম সার্বভৌম পণ্ডিত Caelius Rhodiginus-এর Antique Lectiones (এন্টিক লেকশানেস্ (১৫১৬) গ্রন্থেও পোয়েটিক্‌সের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে সাহিত্যতত্ত্বে পোয়েটিক্‌সের প্রভাব আরম্ভ হয় * ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে। এই বৎসরে **ত্রিঙ্কাভেলি** "গ্রীক পাঠ যুক্ত পোয়েটিক্‌সের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন, পাজ্জি প্রকাশ করেন—লাতিন-অনুবাদকে এবং ডেনিয়েলো প্রকাশ করেন তাঁর নিজের—পোয়েটিকা"। পাজ্জির পুত্র পিতার গ্রন্থখানি উৎসর্গ করতে গিয়ে যা লিখেছেন তার মধ্যে এরিস্টটল-ভক্তির প্রথম অথচ চরম নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে—লিখেছেন **"কাব্যকলার সূত্র এরিস্টটল যা আলোচনা করেছেন, তা তাঁর অন্যান্য রচনার মতই দিব্য** (divinely)"। অবশ্য এ চিত্রের একদিক। এই বৎসরেই রামুস প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—যে 'থিসিস্' (নিবন্ধ) লিখে শাস্ত্রী উপাধি (Master's degree) পান, তার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—এরিস্টটলের সূত্র ও বক্তব্য সবই ভুল। * সুতরাং ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দকে আমরা 'মোড়' বা বাঁক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

১৫৩৬-১৫৫০ পর্যন্ত—এই সময়ে ইতালীয় সমালোচক এবং কবিদের মধ্যে পোয়েটিক্‌সের সমাদর বাড়তে থাকে। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে—'পোয়েটিকস্' সমালোচনা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পোয়েটিক্‌সকে সকলেই সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। * ১৫৪৯ খ্রীঃ **মগ্‌গি** (Maggi)—প্রকাশ্য সভায় পোয়েটিকস সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মগ্‌গির ভাষ্য-সহযোগী **বার্তোলোমিও লোম্বার্ডি**, পাদুয়ার একাডেমিতে প্রকাশ্য বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হন,—কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর অনেকেই—**ভাকি, গিরালডি, সত্তিয়ো, লুইসিনো, ত্রিফোন, গ্যাব্রিয়েলি** প্রভৃতি জনসভায় পোয়েটিক্‌স্ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীতে পোয়েটিকসের উপর অনেক টীকা-ভাষ্য রচনা করা হয়—এ কথা আগেই বলা হয়েছে এবং টীকাকারদের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। সমালোচকগণ এরিস্টটলের সূত্রের প্রতি রীতিমত আনুগত্য দেখাতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে এরিস্টটল সাহিত্য-মীমাংসা রাজ্যে 'ডিক্‌টেটর'-এর স্থান অধিকার করেন। **স্ক্যালিগের-ই** প্রথম এরিস্টটলকে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলে ঘোষণা করেন। 'ভার্কি' (Varchi) বল্লেন—যাঁরা সাহিত্য-সমালোচনা করতে চান তাঁদের উচিত অবশ্য অনেক বছর ধরে এরিস্টটল পড়া। পার্টেনিও বলেছেন ট্র্যাজেডিও মহাকাব্য সম্বন্ধে এরিস্টটল ও হোরেস যে মীমাংসা করেছেন, তাই চূড়ান্ত। এ বিষয়ে স্ক্যালিগ-এর নিষ্ঠাই লক্ষণীয়। তাঁর মতে এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ সাহিত্য-বিদ্যার সনাতন বিধান। কবিদের প্রথমেই এরিস্টটলের আলোচনা পড়ে নেওয়া উচিত এবং তাঁর সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মেনে চলা কর্তব্য। তিনি ঘোষণা করেন—(১৫৬১)—এরিস্টটল সমস্ত শিল্পকলাবিদ্যার চিরন্তন বিধানকর্তা (Aristoteles imperator noster omnium bonarum artium dictator perpetuus") স্ক্যালিগেরের কৃতিত্ব এখানেই শেষ হয়নি। তিনিই প্রথম এরিস্টটলের "পোয়েটিকস" এর সঙ্গে হোরেসের 'আরস্ পোয়েটিকা', লাতিন-বৈয়াকরণদের সংজ্ঞা সূত্রাদির এবং লাতিন ট্র্যাজেডি-কমেডি-মহাকাব্যের সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেন। স্ক্যালিগের প্রভৃতির চেষ্টা যেমন, তেমনি আর একটি ঘটনাও এরিস্টটলের প্রভাব অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। **এই সময় "কাউন্সিল অফ্ ট্রেন্ট" (Council of Trent)—ঘোষণা করেন—এরিস্টটলের সূত্র, ক্যাথলিক ধর্ম শাস্ত্রের বচনের মতই, সিদ্ধবচন।**

এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্-এর প্রতিষ্ঠা দেখতে না দেখতে নানাদেশে সম্প্রসারিত হয়। সে যেন পোয়েটিক্‌স-এর এক বিজয়-অভিযান। ইতালী থেকে ফরসীদেশে; ফরাসী থেকে ক্রমে স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের সমস্ত দেশে পোয়েটিক্‌সের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা প্রসারিত হয়।

ফরাসীদেশে শিল্পে ও সাহিত্যে ইতালীর প্রভাব আরম্ভ হয়, অষ্টম চার্লসের ইতালী-অভিযানের সময় থেকে (১৪৯৪ খৃঃ)। ডু বিলে'র (Du Bellay)—"ডিফেন্‌সো" নামক গ্রন্থ (১৫৪৯) ফরাসী সমালোচনা-সাহিত্যে নূতন যুগের সূত্রপাত করে। এই গ্রন্থে, **'আরস্ পোয়েটিকা'র** প্রভাব অধিকতর বটে, কিন্তু গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ডু বিলে লিখেছেন—'কবিতার দোষ-গুণ **এরিস্টটল** হোরেস এবং পরবর্তীকালে হাইরোনিম্ ভিদা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকার কর্তৃক খুব নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। এই উল্লেখটুকু স্মরণীয়। কারণ এর আগে সাহিত্যশাস্ত্রে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৫৪১ খৃঃ প্যারিসে পোয়েটিক্‌সের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হলেও, তা কেনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এর পরে—ডু বেলে'র একটি ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে পোয়েটিক্‌সের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর ১৫৫৫ খৃঃ মোরেল (Guillaume Morel) (প্যারিসে) পোয়েটিক্‌সের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে (স্ক্যালিগেরের পোয়েটিক্স প্রকাশের আগের বছর) পোয়েটিক্‌সের প্রভাব কতখানি হয়েছিল তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। এরিস্টটলের রচনার একখণ্ড পাঠ্য-সংগ্রহ তৈরী করা হয় এবং তাতে প্রথমেই স্থান দেওয়া হয় পোয়েটিক্‌সকে।

ফ্রান্সে পোয়েটিক্‌সের প্রসার

১৫৭২ খৃঃ jean de le Taille—বলেছেন—"মহান এরিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্‌সে এবং তাঁর পরে হোরেস, তাঁর মত এত সূক্ষ্মভাবে না বলতে পারলেও,—আমার চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে এবং যথেষ্টমাত্রায় বলেছেন"। স্ক্যালিগেরের প্রভাব ফরাসীদেশে ঠিক কখন বিস্তারিত হয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে আমরা এ কথা বলে রাখতে পারি—ইতালীয় ভাষ্যকারদের টীকা-ভাষ্য ফরসীদেশেও পোয়েটিক্‌সের প্রতিষ্ঠা-বেদী রচনা করে দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সমালোচক ও কবিদের কাছে এই সব টীকা-ভাষ্যের সমাদর প্রায় পূজার আবেগেই পরিণত হয়। **রেসিন্, কর্ণেই** প্রমুখ বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থকার ভাষ্য-গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করেন, খুব যত্ন করে পড়েন এবং তাদের গ্রন্থের মুখবন্ধে এবং সমালোচনায় ঐ সব ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেন। এমন কি

টীকা লিখে লিখে ঐ ভাষ্য-গ্রন্থগুলি প্রকাশও করেন। র‍্যাপিনের "রিফ্লেক্শান্স স্যুর ল-আর্ট পোয়েটিক" (১৬৭৪) এর ভূমিকাতে যে, সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাস বিবৃত আছে তার অধিকাংশই এই সব ইতালীয় ভাষ্যকারদের কথা। ডেসিয়ে (১৬৯২) ব্যাতু (১৭৭৮), রিতের (১৮৩৯) এগের (১৮৪৯), স্যাঁস্তিলে (১৮৫৮) প্রভৃতির পোয়েটিক্স-বিষয়ক রচনা পোয়েটিক্সের ধারাবাহী প্রভাবেরই পরিচয় বহন করছে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যে মোটামুটি পাঁচটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। **প্রথম পর্যায়ে—অলঙ্কার বিচারের প্রাধান্য—** লিওনার্ড কোক্স-এর আর্টে অর ক্রাফ্‌টে অফ্‌ রেটোরিক"—(১৫২৪) নামক ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে এর সূচনা। পরবর্তী-গ্রন্থ উইল্‌স কৃত "আর্ট অফ রেটোরিক" (১৫৫৩)। এই গ্রন্থখানিকে ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম সমালোচনা পুস্তক বলে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার—**রোজার আস্কাম্‌** এবং তাঁর গ্রন্থ **'স্কুলমাস্টার'** (১৫৬৩, ১৫৬৮)। এই গ্রন্থের সমালোচনা অংশের জন্য তিনি ইতালীর পণ্ডিতদের কাছে ঋণী—। ইতালীয় রেনাসাঁর ঢেউ ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছতে খুব বেশী দেরী করেনি। এই ঢেউ দুইভাবের দোলা সৃষ্টি করে। স্রষ্টাদের মধ্যে এই ঢেউ রোমান্টিক দোলা সৃষ্টি করে। টটেল্‌—"Tottel Miscellany" নামক পুস্তকে এইভাবের প্রথম আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। আর সমালোচকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় ক্লাসিকাল প্রবণতার দোলাটি। আস্কাম এই দিক দিয়ে—ইংলণ্ডের প্রথম ক্লাসিকপন্থী।

ইংলণ্ডে পোয়েটিক্সের প্রসার

দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা চলে—শ্রেণী-বিভাগের বিশেষতঃ ছন্দোবিচারের যুগ। এই যুগের সূত্রপাত করেন—Gascoigne-তাঁর "Notes of Instruction concerning the making of verse" গ্রন্থে (গ্রন্থখানি রোনসার্ডের—এব্রেজি ডিলে-আর্ট পোয়েটিক ফ্রাসেঁ (১৫৬৫) গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত) তারপর, পুত্তেনহাম—কৃত "আর্ট অফ ইংলিশ'পোয়েজি" বুলোকর-কৃত "ব্রিফ গ্রামার" হার্ভে-লিখিত "লেটারস্‌" ওয়েব লিখিত—"ডিস্‌কোর্স অফ্‌ ইংলিশ পোয়েট্রি।"

* তৃতীয় পর্যায়ে—সাহিত্যের দার্শনিক বিচার আরম্ভ হয় এবং তার সূত্রপাত করেন—**ফিলিফ সিড্‌নী** তাঁর বিখ্যাত, "ডিফেন্স্ অফ্ পোয়িজি" গ্রন্থে (১৫৯৫)॥ চতুর্থ পর্যায়ের প্রবর্তক **বেন্ জনসন**—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের—সমালোচক-সম্রাট। আর পঞ্চম অধ্যায় (১৭শ শতাব্দীর শেষার্ধ) আরম্ভ হয়—ফরাসী প্রভাবের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে—হব্‌সের কাছে ডেভনান্টের পত্রাবলীতে—হবসের উত্তররাজির মধ্যে (১৬৫১)

ইংলণ্ডে এরিস্টটলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—তৃতীয় পর্যায় থেকে। সিডনীর—"ডিফেন্স অফ্ পোয়িজি"—পড়লে অবশ্যই মনে হবে যে তিনি এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌সের সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত এবং পোয়েটিক্‌সের দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি আলোচনা করেছেন। বেন্ জনসন মহাশয়ের সঙ্গে পোয়েটিক্‌সের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। এরিস্টটলকে তিনি "সমালোচক ডিকটেটর" বলতে রাজি না হলেও সমালোচনা-ক্ষেত্রে এরিস্টটলের মনীষাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। তারপর, ড্রাইডেন মিলটন ডেনিস প্রমুখ কবি-সমালোচকরাও পোয়েটিক্‌স্ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন। **ড্রাইডেন ও ডেনিসের** পরে, পোয়েটিক্‌স **ডাঃ জনসন** মহোদয়ের সমাদর লাভ করে। তাঁর "কবিজীবনী"তে পোয়েটিক্‌স পাঠের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাঁর চক্রে যাঁরা বসতেন তাঁদের মধ্যে **ওয়ার্টন** মহাশয়ের এরিস্টটল ভক্তি প্রসিদ্ধ॥ পরবর্তী যুগে পোয়েটিক্‌স আলোচনার ধারা সমানভাবেই চলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে—পাই (১৭৮৮), টুওয়াইভি (১৬৯৯), তিরহুইট (১৭৯৪); এবং পরবর্তী শতাব্দীতে—**টেল্‌র** (১৮১১), **বুচার, ফ্যালেন, বাইওয়াটার, রোটাগনি ভল্‌গিমগল্** এবং **গুডিমান** প্রভৃতির টীকা-ভাষ্য এবং বহু লেখকেরা নিবন্ধ-প্রবন্ধাদি এরিস্টটলের প্রভাবের ধারা বহন করে এসেছে।

ইংরেজ লেখকদের মধ্যে যাঁরা পোয়েটিক্‌সকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে—এডিস্‌ন, ম্যাথু আরনল্ড, বেটি, বার্ক, কোলরিজ, কঙ্‌গ্রিভ্, ফিল্ডিং্ গ্রে, হেল্‌লাম্, কেব্‌ল্, নিউম্যান, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, জর্জ এলিয়ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জোসেফ ওয়ার্টন মহাশয় পোয়েটিক্‌স সম্বন্ধে যে

উক্তিটি করেছেন তা উল্লেখ করে আমরা ইংলণ্ডে পোয়েটিক্সের প্রভাব-সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করতে পারি।

তিনি লিখেছেন—"To attempt to understand Poetry without having diligently digested this tieatise would be as absurd and impossible as to pretend to a skill in geometry without having studied Euclid" (Easay on pope 3d edi 171.) ১৫৬০ খৃঃ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত, সমগ্র ইউরোপে, এরিস্টটলই ছিলেন সাহিত্য-শিল্পতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, পোয়েটিক্স ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিকগ্রন্থ।

স্পেনে পোয়েটিক্সের প্রসার

ইতালীতে ষোড়শ শতাব্দীতে এরিস্টটল-অনুশীলনের যে আবেগ আসে এবং যার ফলে পোয়েটিক্সের অনুবাদ ও টীকা-ভাষ্য রচনার এক বিরাট সাহিত্যিক প্রচেষ্টা দেখা দেয়, তা' শুধু ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ড-কেই প্রভাবিত করে না স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানী প্রভৃতি নানা দেশে প্রভাব বিস্তার করে। স্পেনে, সাহিত্য-সমালোচনা বলতে যা বুঝায়, তা আরম্ভ হয়েছে যোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং লেখা হয়েছে ইতালীয় ভাষ্যকারদের টীকা-ভাষ্যকে ভিত্তি করেই। রেঞ্জিফো—কৃত "আর্টে পোয়েটিকা এস্‌পেনোলা" (১৫৯২) যে এরিস্টটল, স্ক্যালিগের এবং অন্যান্য ইতালীয় পণ্ডিতদের 'উপর ভিত্তি করেই লেখা তা' গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করেছেন। পিন্‌সিয়ানো'র "ফিলসোফিয়া এন্টিগুয়া পোয়েটিকা" ও (১৫৯৬) একই ভিত্তিতে রচিত। তারপর, ক্যাসকেলেস—তাঁর "টেবলাস পোয়েটিকাস্‌" (১৬১৬), গ্রন্থে পূর্বাচার্য হিসাবে, মিণ্টুর্নো, গিরাল্‌ডি, সিন্তিও, মগ্‌গি, রিকোবনী কস্টেলভেত্রো, রোবোরটেলি, এবং স্বদেশীয় পিন্‌সিয়ানোর নাম করেছেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, স্পেনদেশে সাহিত্য সমালোচনা-শাস্ত্র ইতালীর বিশেষতঃ পোয়েটিকসের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে।

জার্মানীতেও সাহিত্য শিল্প বিষয়ক আলোচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতালী থেকেই ধার করা। ফেব্রিকিয়াস্‌ তাঁর "ডি রে পোয়েটিকা" (১৫৮৪) গ্রন্থে, মিণ্টুর্নো পার্টেনিও, পণ্টেনুস্‌ প্রভৃতির কাছে স্পষ্টভাবেই ঋণস্বীকার

করেছেন। তারপর, ওপিৎস্ (opitz) যে সাহিত্য-শিল্প সমালোচনা দ্বারা জার্মান-সাহিত্যে নবজীবনের সূত্রপাত করেছিলেন তার ধারা, ডেনিয়েল হাইনসিয়াস—রোনসার্ড—স্ক্যালিগারের ধারা বেয়ে ইতালীয় ভাষ্যকারদের—

জার্মানীতে পোয়েটিক্‌সের প্রসার

বিশেষতঃ পোয়েটিকস্-এর উৎস থেকে নেমে এসেছে। পোয়েটিক্‌স জার্মানীতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বড় প্রমাণ 'লেসিঙ্'-এর একটি মন্তব্য—'যদিও, এই আলোকের যুগে আমাকে লোকে উপহাস করতে পারে তবু আমি এ কথা বলবই—আমি পোয়েটিক্‌সকে ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞার মতই আভ্রান্ত বলে মনে করি (হম্বুর্গ-ড্রামাটার্জি...১০১,১০৪)॥ তারপর, অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে পোয়েটিক্‌স নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার তালিকাও প্রভাবের পক্ষেই সাক্ষ্য দেবে। (তালিকা দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে উপসংহারে বলা যায়—ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌সের প্রভাব শেষ হয়ে যায়নি। সাহিত্যতত্ত্ব, বিশেষতঃ নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরাই কোন গভীর আলোচনা করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই 'পোয়েটিক্‌স'-এর শরণ না নিয়ে পারেননি। বিংশ শতাব্দীতেও, (ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব আলোচনার জন্য তো বটেই) এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌সের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান সংরক্ষিত রয়েছে।

এরিস্টটল-রচিত

পোয়েটিক্‌স

(বঙ্গানুবাদ)

পোয়েটিক্স্

[বিষয়-বিশ্লেষ]

*১। **'অনুকরণ'** (মাইমেসিস্), কাব্য সংগীত, নৃত্য, চিত্র ও ভাস্কর্য, সর্ববিধ কলার সামান্য ধর্ম। এই সকল কলার মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য ঘটে রীতি ও বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের ফলে। অনুকরণের রীতি—ছন্দ, ভাষা, সঙ্গতি বা সুর—কোথাও তা একক কোথাও বা যৌগিক।

*২। **অনুকরণের-বিষয়বস্তু**। অনুকরণধর্মী কলা-সৃষ্টিতে উচ্চ এবং নিম্ন দুইজাতীয় বিষয় উপস্থাপিত হয়। কাব্যে ট্র্যাজেডি ও কমেডি বিভাগের ভিত্তি—বিষয়ের উচ্চতানীচতা-ভেদ।

*৩। **অনুকরণ রীতি** ॥ কাব্য রূপের দিক দিয়ে তিন প্রকার হতে পারে—নাটককল্প বর্ণনাত্মক, বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক (গীতিকবিতা অন্তর্ভুক্ত) বা বিশুদ্ধ নাটক। প্রসঙ্গতঃ নাটকের নাম ও উৎপত্তি আলোচনা।

*৪। **কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে, কাব্য সৃষ্টির মূলে দুটি কারণ দেখা যায়—অনুকরণ-বৃত্তি এবং সঙ্গতি-বোধ ॥ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, কাব্য প্রথম অবস্থায় দুই ধারায় প্রবাহিত—এই দুই গতি-প্রবণতা দেখা যায়—হোমারের কাব্যে। ট্র্যাজেডিতে ও কমেডিতে উচ্চতর শ্রেণী-বিভাগের সাক্ষ্য রয়েছে। এখানে ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশের স্তরগুলি উল্লিখিত হয়েছে।

*৫। **'হাস্যোদ্দীপক'-এর লক্ষণ**—কমেডির উৎপত্তি ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মহাকাব্য (এপিক) ও ট্র্যাজেডির মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য নির্ধারণ (পরিচ্ছেদটি খণ্ডিত)

*৬। **ট্র্যাজেডির লক্ষণ**—ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গ—তিনটি বহিরঙ্গ যথা, দৃশ্য (Spectacle) গীত (Song) ও রচনা (diction)। তিনটি অন্তরঙ্গ, যথা বৃত্ত (Plot), চরিত্র (Characters) ও ভাবনা (Thought)। বৃত্ত বা ঘটনার উপস্থাপনা মুখ্য অঙ্গ। চরিত্র ও ভাবনার স্থান তার পরে।

*৭। বৃত্ত অবশ্যই পূর্ণাবয়ব, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উপযুক্ত-আয়তন হবে।

*৮। বৃত্ত অবশ্য 'একক' হবে। বৃত্ত-ঐক্য বলতে, নায়ক-ঐক্য নয় 'ঘটনা-ঐক্য' বুঝায়॥ বৃত্তের অংশগুলি অঙ্গাঙ্গিযোগে-যুক্ত হবে।

*৯। (বৃত্তের আলোচনা) নাটকীয় ঐক্যে পৌছতে হলে ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা শৈল্পিক সত্যকেই উদ্দেশ্য করতে হবে; কারণ—কাব্য প্রকাশ করে 'সামান্য'কে, ইতিহাস প্রকাশ করে 'বিশেষ'কে। ঘটনা বিন্যাসে সম্ভাব্য ক্রম বা আবশ্যিক ক্রম সম্বন্ধীয় আলোচনা। ঐক্যহীনতার জন্য কয়েকটি বৃত্তের নিন্দা। সর্বোৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডিরসের নিষ্পত্তি, 'অনিবার্য এবং 'অপ্রত্যাশিতে'র সংমিশ্রণের ওপর নির্ভর করে।

*১০। (বৃত্ত আলোচনা-প্রসঙ্গ) সরল এবং যৌগিক বৃত্তের লক্ষণ

*১১। (বৃত্ত আলোচনা...) পরিস্থিতি-বিপর্যাস, অভিজ্ঞান—ট্র্যাজিক বা শোচনীয় ঘটনার লক্ষণ ও ব্যাখ্যান।

*১২। ট্র্যাজেডির বৃত্তাঙ্গ-সংখ্যা নিরূপণ—প্রোলোগ, এপিসোড প্রভৃতি...(খুব সম্ভব প্রক্ষিপ্ত)

*১৩। (বৃত্ত-আলোচনা-প্রসঙ্গ) ট্র্যাজিক ঘটনার স্বরূপ—নায়কের ভাগ্য-বিপর্যয়, এবং চরিত্র আদর্শ ট্র্যাজেডির পক্ষে কতখানি উপযোগী। বিষাদান্ত পরিণামই 'যেমন কর্ম-তেমন-ফল'—পরিণতি (পোয়েটিক জাস্টিস্) অপেক্ষা অধিকতর ট্র্যাজিক।. 'যেমন কর্ম-তেমন ফল' পরিণাম জনসাধারণের খুব প্রিয়, এবং কমেডিরই উপযুক্ত।

*১৪। (বৃত্ত-আলোচনা) ট্র্যাজেডির রস—ভয়ানক ও করুণ বৃত্তের ভেতর থেকেই অভিব্যক্ত হওয়া চাই। দৃশ্য অথবা নিছক ঘটনার দ্বারা রসসৃষ্টি করা ট্র্যাজেডি—ধর্মের প্রতিবন্ধী। ট্র্যাজেডি-রসের তীব্র নিষ্পত্তির জন্য উপযোগী শোচনীয় ঘটনার দৃষ্টান্ত।

*১৫। ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের (নৈতিক উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি হিসাবে) স্থান। নৈতিক চরিত্র চিত্রণের উপাদান। চরিত্রে তথা বৃত্তে অবশ্যম্ভাবিতা বা সম্ভাব্যতার নিয়ম প্রয়োগ—অতিপ্রাকৃত দেব-দেবীর আবির্ভাব (ডিউস এক্স মেসিনা) [অপ্রাসঙ্গিক এস্থলে] কি উপায়ে চরিত্র আদর্শায়িত হয়।

*১৬। (বৃত্ত-আলোচনা) প্রত্যভিজ্ঞান (Recognition)—উহার নানা প্রকার দৃষ্টান্ত।

*১৭। ট্র্যাজেডি-রচয়িতাদের জন্য **কার্যকরী নির্দেশ**

(ক) দৃশ্যটিকে চোখের সামনে রাখা এবং নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর সহিত একাত্মক হওয়ার জন্য নিজে নিজে অভিনয় করা আবশ্যক।

(খ) উপকাহিনী সংযোজনা করবার আগে ঘটনাটির রেখারূপটি এঁকে নেওয়া। প্রসঙ্গত মহাকাব্যের উপকাহিনীর সঙ্গে ট্র্যাজেডির উপকাহিনীর বৈসাদৃশ্য দেখান হয়েছে।

*১৮। ট্র্যাজেডি—রচয়িতাদের জন্য আরো নির্দেশ।

(ক) কাহিনীর জটিলতা-সৃষ্টি এবং উপসংহার বিশেষ সতর্কতা বিশেষতঃ উপসংহার (ডিনুমেণ্ট) বিষয়ে।

(খ) সম্ভবমত কাব্যোৎকর্ষজনক নানা উপাদানের সংযোজন।

(গ) মহাকাব্যের মত ঘটনাবাহুল্য দ্বারা ট্র্যাজেডি-বৃত্তকে ভারাক্রান্ত না করা।

(ঘ) 'সমবেত-সংগীতকে (কোরাস) সংলাপের মতই অবিচ্ছেদ্য বা অন্তরঙ্গ অঙ্গে পরিণত করা।

*১৯। ট্র্যাজেডিতে **ভাবনা** বা মনীষা এবং **বচনশৈলী** বা ভণিতি অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত নাটকীয় বাক্‌বিন্যাসের মধ্যেই ভাবনা প্রকাশ পায়। বচনশৈলী প্রধানতঃ কাব্যকলার অপেক্ষা আবৃত্তি রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

*২০। বচনশৈলী বা সামান্যত বাচনিক প্রকাশ। বাক্যের পদ প্রভৃতির বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য ব্যাকরণগত বিষয় (সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত)।

*২১। কবি—ভণিতি (diction)। কাব্যের প্রয়োজনীয় শব্দ ও বাগ্‌রীতি—বিশেষতঃ রূপকও অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ্যের লিঙ্গ নির্ণয়ের বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদে, খুব সম্ভব প্রক্ষিপ্ত।

*২২। (কবি-ভণিতি) কাব্যে ভাষার ওজোগুণের সহিত স্পষ্টতার সংযোগ।

*২৩। **মহাকাব্য**। 'ঘটনা-ঐক্য'-ব্যাপারে ট্র্যাজেডির সঙ্গে ঐক্য আরো; এখানেই ইতিহাসের সঙ্গে তার পার্থক্য।

*২৪। (মহাকাব্য-আলোচনা) ট্র্যাজেডির সঙ্গে আরো অন্যান্য বিষয়ে ঐক্য—যে যে বিষয়ে পার্থক্য তা পরিসংখ্যাত এবং দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত। যথা—(১) কাব্যের আয়তন (২) ছন্দ (৩) অবিশ্বাস্য কল্পনাকে সম্ভাব্যের রূপ দেওয়ার কৌশল।

*২৫। কাব্যের বিরুদ্ধে সমালোচকের অপকর্ষের অভিযোগ—অপকর্ষগত প্রশ্নের উত্তর। বিশেষতঃ কাব্য-সত্য কথাটির তাৎপর্যের ব্যাখ্যা…লৌকিক সত্য হতে কাব্য-সত্যের পার্থক্য।

*২৬। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মূল্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা। ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে যে ত্রুটির অভিযোগ করা হয় তা ট্র্যাজেডির স্বগত ধর্ম নয়। এর উৎকর্ষ অধিক বলেই দুইয়ের মধ্যে ্যাজেডিরই স্থান উচ্চে।

* [বুচার-কৃত অনুবাদের—Analysis of Contents অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে]

এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স

১

আমি কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং প্রত্যেকটি জাতির বিলক্ষণ ধর্ম নির্দেশ করে, তার নানা জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। উৎকৃষ্ট কাব্যের জন্য বৃত্তের গঠনটি কেমন হওয়া চাই, যে সকল অঙ্গ-উপাদান নিয়ে কাব্য গঠিত তাদের কত সংখ্যা, কি প্রকৃতি এবং এমনি সব কিছুই যা যা এই জিজ্ঞাসার পরিধির মধ্যে পড়ে, অনুসন্ধান করে দেখতে চাই।

শিল্পের স্বরূপ ও সাহিত্য-শিল্প

মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি—কমেডিও—এবং ডিথাইর‍্যাম্বিক কবিতা এবং বাঁশির ও বীণার নানারূপ সংগীত, সামান্য ধর্মের দিক দিয়ে অনুকরণেরই নানা উপায়। তবে এদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য তিনটি বিষয়ে:—**অনুকরণের মাধ্যম, অনুকরণের বিষয়, এবং অনুকরণের রীতি** প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন।

যেমন করে অনেক লোক দেখা যায় যাঁরা (সচেতনভাবে কলাকৌশল প্রয়োগ করে অথবা শুধু অভ্যাস অনুশীলন দ্বারা) বর্ণ ও রেখার মাধ্যমে বা স্বরের মাধ্যমে নানা প্রকার বিষয় অনুকরণ ও উপস্থাপনা করে থাকেন, তেমনি উল্লিখিত কলাগুলিতে মোটামুটিভাবে অনুকরণ নিষ্পন্ন হয় ছন্দ, ভাষা বা সঙ্গতির একক অথবা সামবায়িক উপায়ে।

যেমন, বাঁশীর ও বীণার সংগীতে সুর-সঙ্গতি ও লয় প্রয়োগ করা হয়; তেমনি এদের সঙ্গে যাদের প্রকৃতিগত ঐক্য আছে সেই সব কলাতেও—যেমন মেষপালকের—বাঁশীর গান। নৃত্যে একমাত্র ছন্দই থাকে, সুর থাকে না। নৃত্যেও ছন্দোলয়ে চরিত্র, হৃদয়াবেগ এবং ঘটনা অনুকৃত হয়।

সাহিত্য-শিল্প

অন্য এক কলা আছে যা একমাত্র ভাষা দ্বারাই অনুকরণ করে; সে ভাষা গদ্য অথবা পদ্য। আবার সে পদ্যে নানামাত্রার ছন্দের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে অথবা একটিমাত্র ছন্দও থাকতে পারে।

কিন্তু এ পর্যন্ত এর কোন নামকরণ করা হয়নি। এমন কোন সামান্য শব্দ বা সংজ্ঞা নেই যা দিয়ে আমরা একই সঙ্গে একদিকে সোফ্রোনের এবং জেনার্কাসের একাঙ্কিকা-অনুকৃতিকে (মাইমস্) এবং সক্রেটিসের উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধে-রচিত সংলাপকে, অন্যদিকে আয়াম্বিকছন্দের, এলিজিয়াক-ও অনুরূপ ছন্দের কাব্য-কৃতি সমূহকে বুঝাতে পারি। লোকে অবশ্য ছন্দের নামের পিছনে "স্রষ্টা" বা "কবি" শব্দ যোগ করে থাকে এবং বলে—এলিজিয়াক (শোকগাথার) কবি বা এপিক কবি (অর্থাৎ ষট-মাত্রার কবি) *যেন অনুকরণই

কাব্যের বিলক্ষণ লক্ষণ

কবির বিলক্ষণ ব্যাপার নয়, পদ্য লিখলেই নির্বিচারে সকলকেই কবি বলা চলে। এমন কি যখন ভৈষজ্য-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ বা প্রকৃতি-বিজ্ঞানও পদ্যে লেখা হয় তখনও যথারীতি লেখককে কবি আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু হোমার এবং এম্পিডোকল্‌সের মধ্যে ছন্দের ঐক্য ছাড়া আর কোন বিষয়েই ঐক্য নাই; সুতরাং একজনকে কবি বলাই উচিত আর অন্যকে কবি না বলে পদার্থতত্ত্ববিদ বলাই সঙ্গত। এই সূত্র অনুসারেই এমন কি, যদি কোন লেখক

তাঁর কাব্যিক অনুকরণে, চেইরিমোন (chaeremon) যেমন তাঁর "সেণ্টুর" এ (Centaur) সব রকম ছন্দের এক খিচুড়ি পাকিয়েছেন, তেমনি সব রকম ছন্দ মিলিয়েও ফেলেন তাহলেও তাঁকে কবি নামেই অভিহিত করা উচিত। এই পার্থক্য-বিষয়ক আলোচনা এই পর্যন্তই।

তারপর আবার এমন কয়েকটি কলা-শিল্প আছে যারা উল্লিখিত সব কয়টি উপায় অবলম্বন করে থাকে ; যেমন—ছন্দ, সুর এবং মাত্রা। 'ডিথাইরাম্বিক —কাব্য 'নোমিক—কাব্য এবং ট্র্যাজেডি-কমেডিও, এই জাতের কলা। তবে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম দুই শ্রেণীত উপায়গুলি সংযুক্তভাবে প্রযুক্ত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এখন একটি পরে অন্য আর একটি—এমনি ভাবে প্রযুক্ত।

অনুকরণ-মাধ্যমের বা উপায়ের ভিত্তিতে কলা-সমূহের পারস্পরিক পার্থক্য এইটুকু।

রূপায়ণে আরোপ

যেহেতু অনুকরণের বিষয় (সাংসারিক) কর্মরত ব্যক্তি আর ব্যক্তিগুলি উচ্চ বা নিম্ন দুই শ্রেণীর একটি হবেই (নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে এই বিভাগের যোগ আছে ; ভালো-মন্দ ভেদ নৈতিক পার্থক্যেরই লক্ষণ); সেই হেতু অনুসিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে আমরা মানুষকে উপস্থাপিত করব লৌকিক জীবনে যেমন দেখা যায় তার চেয়ে **উন্নততর রূপে**, নতুবা **হেয়রূপে**, নতুবা **যথাযথরূপে**। চিত্র-শিল্পেও একইরীতি দেখা যায়। **পলিগনোটাস** (Polygnotus) মানুষকে লৌকিক-রূপের চেয়ে মহত্তর রূপে অঙ্কন করেছেন। **পৌসন্‌** (Pauson) এঁকেছেন হেয় করে এবং **ডাওনিসিয়াস** (Dionysius) এঁকেছেন—যথাযথ রূপেই।

সুতরাং না বল্লেও এ কথাটা স্পষ্ট যে প্রত্যেকটি উল্লিখিত অনুকরণ-মাধ্যমে এই বৈচিত্র্য থাকবে এবং পৃথক ধরনের বস্তু অনুকরণ করতে গিয়ে পৃথক শ্রেণী হয়ে দাঁড়াবে। এইরূপ বৈচিত্র্য এমন কি নৃত্যে বংশীবাদনে এবং বীণাবাদনেও দেখা যায়। তেমনি ভাষা ব্যাপারেও—সে ভাষা গদ্যই হোক

বা গীতবিহীন পদ্যই হো'ক। দৃষ্টান্ত যেমন,—**হোমার** মানুষকে উন্নততর করে রূপ দেন, **ক্লিওফোন** (Cleophon) দেন যথাযথ রূপ আর ব্যঙ্গ কবিতার আবিষ্কর্তা থেসীয় **হেগেমন** (Hegemon) এবং 'দেইলিয়াড' (Deiliad) লেখক **নিকোকারিচ** (Nicochares) লৌকিক রূপ অপেক্ষা হেয়রূপ দিয়ে থাকেন। ডিথাইরাম্বিক এবং নোমিক কাব্য সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এখানেও বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করা যায়—যেমন **টিমোথিউস্‌** (Timotheus) এবং **ফিলোকসিনাস** (Philoxenus) তাঁদের "সাইক্লোপস্‌" (Cyclopes) রচনা করেছেন ভিন্ন রীতিতে। ট্র্যাজেডি ও কমেডির মধ্যেও একই পার্থক্যলক্ষণ। কমেডির উদ্দেশ্য মানুষকে বিকৃত বা হেয় রূপে উপস্থাপিত করা, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য, লৌকিক জীবনে যেরূপ দেখা যায় তদপেক্ষা উন্নত রূপে উপস্থাপিত করা।

৩

অধিকন্তু তৃতীয় একটি পার্থক্য আছে—যে **রীতিতে** বিষয়বস্তুকে অনুকরণ করা হয় সেই রীতির। কারণ মাধ্যম এক হলেও এবং বিষয়বস্তু এক হলেও কবি এক **বর্ণনায়** অনুকরণ করতে পারেন—হোমারের মত অন্য ব্যক্তির মুখে বর্ণনা দিয়ে বা নিজের মুখেই বর্ণনা করে, অথবা সমস্ত পাত্র-পাত্রীকে **দর্শকের সম্মুখে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল রূপে** উপস্থাপিত করতে পারেন।

রচনা-রীতি

তা'হলে যে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি—এই হল শৈল্পিক অনুকরণের ত্রিবিধ পার্থক্যের ভিত্তি—**মাধ্যম, বিষয়বস্তু** এবং **রীতি**। এক হিসাবে সফোক্লিস হোমারের মতই একই বিষয়বস্তুর অনুকারী—কারণ উভয়েই উচ্চ-জাতীয় চরিত্র অনুকরণ করেন: আবার এক হিসাবে এরিস্টফেনিসের মত একই রীতির অনুকারী; কারণ উভয়েই পাত্রপাত্রীর জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল অবস্থাটি অনুকরণ করেন। এই কারণেই অনেকে বলেন—যে রচনায় ক্রিয়াশীল রূপ উপস্থাপিত সেই সব রচনাকে "ড্রামা" নাম দেওয়া হয়। একই কারণে ডোরীয়রা দাবী করে যে তারাই, ট্র্যাজেডি কমেডি উভয়েরই

আবিষ্কর্তা। কমেডি আবিষ্কারের দাবী শুধু যে খাস গ্রীসের মেগারীয়গণই করেন এবং করতে যেয়ে বলেন যে তাদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনেই কমেডির জন্ম হয়েছে—তা' নয়, সিসিলির মেগারীয়গণও করে থাকেন; কারণ কবি এপিকারমাস—যিনি সিওনাইডিস এবং ম্যাগনিসেরও পূর্ববর্তী—সেই দেশেরই অধিবাসী। ট্র্যাজেডিও সেইরূপ পেলোপন্নিসের ডোরীয়দের কেউ কেউ দাবী করে থাকেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁরা ভাষার সাক্ষ্যের কাছে আবেদন করে থাকেন। তাঁরা বলেন—পার্শ্ববর্তী গ্রামকে তাঁদের ভাষায় বলা হয়—কোমাই (Komai), এথেনীয়রা বলেন—ডিমোই (demoi)। তাঁরা মনে করেন যে 'কমেডিয়ান' নামটি "কোমাজেইন" (Komazein)—থেকে ব্যুৎপন্ন হয়নি, ঐ নাম পেয়েছে তারা এই কারণে যে নগর থেকে তারা ঘৃণাভরে বহিষ্কৃত হয়েছিল এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াত—(Kata Komas)।

তাঁরা আরো বলেন যে 'করা'-অর্থে ডোরীয় প্রতিশব্দ হচ্ছে ড্র্যান্ (Dran) এবং এথেনীয় প্রতিশব্দ—'প্রাত্তেইন' (Prattein)। অনুকরণের বিভিন্ন রীতির সংজ্ঞা ও স্বরূপসম্বন্ধে এইটুকুই যথেষ্ট।

৪

কাব্যের উৎপত্তির মূলে আছে দু'টি কারণ এবং দুটির প্রত্যেকটিই আমাদের স্বভাবের অতিগভীরেই নিহিত। প্রথমতঃ অনুকরণের সহজ বৃত্তিটি মানুষের মধ্যে আশৈশবই দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর অন্যতম পার্থক্য এই যে প্রাণীর মধ্যে মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকরণশীল এবং অনুকরণ সাহায্যেই সে শৈশবের শিক্ষা গ্রহণ করে। অনুকৃত বিষয় দেখে যে আনন্দ, তা' প্রায় সার্বজনীন। অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা এর প্রমাণ পাই। * **যে সমস্ত লৌকিক বিষয় দেখে আমরা বেদনা পেয়ে থাকি, সেই সমস্ত বিষয়ই অতি যথাযথরূপে অনুকৃত হতে দেখে আমরা আনন্দ লাভ করি**; যেমন, অতি কদাকার প্রাণীর রূপ অথবা মরা দেহের রূপ।

কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা

এর কারণ আসলে এই যে কোন কিছু জানার মধ্যে যে পরম আনন্দ তা শুধু যে দার্শনিকরাই পান তা নয়, যাদের শিক্ষার শক্তি সীমাবদ্ধ সেইরূপ সাধারণ লোকেও পেয়ে থাকে। সুতরাং যে কারণে মানুষ অনুকৃতি দেখে আনন্দ অনুভব করে তা এই যে অনুকৃত বস্তু উপলব্ধি করতে গিয়ে তারা দেখতে পায় যে তারা শিক্ষা পাচ্ছে, অনেক কিছু অনুমান করছে এবং খুব সম্ভব এই কথাই বলেছে—"আহা, এই তো সেই!" আর যদি তুমি মূল বস্তুটি না দেখে থাক, তা'হলে আনন্দ হবে—অনুকরণের যাথাযথ্যের জন্য নয়—সুনির্মিতি, সুরঞ্জন অথবা অন্যান্য সদৃশ কারণের জন্য।

শৈল্পিক আনন্দ বেদনা আনন্দ দেয় কেন?

'তা'হলে দেখা গেল অনুকরণ আমাদের স্বভাবের অন্যতম সহজ বৃত্তি (বা সংস্কার)। তারপর আছে সঙ্গতি-বোধ ও ছন্দের বৃত্তি—মাত্রা ছন্দেরই অন্যতম একটি অঙ্গ। মানুষ এই প্রকৃতি-প্রদত্ত বৃত্তিকেই ক্রমাভ্যাসের দ্বারা বিশেষ শক্তিতে পরিণত করেছিল এবং (সেই শক্তির বলে) অনেক স্থূল চেষ্টার পরে, কাব্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।'

এই সময়েই লেখকের ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ফলে কাব্য দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোক মহৎ ঘটনা এবং মহাপুরুষের বা সজ্জনের ক্রিয়া-কলাপ অনুকরণ করলেন, লঘুপ্রকৃতির লোকেরা অনুকরণ করলেন—নীচজাতীয় লোকের ক্রিয়া-কলাপ। এরা করলেন প্রথমে ব্যঙ্গ রচনা আর পূর্বোল্লিখিতরা রচনা করলেন "দেবস্তুতি" ও "মহাপুরুষ-স্তুতি"। ব্যঙ্গ-জাতীয় কবিতার রচয়িতা হিসাবে হোমারের আগে আর কারো নাম পাওয়া যায় না—যদিও মনে হয় এই শ্রেণীর লেখক আরো অনেকেই ছিলেন। কিন্তু হোমারের পর থেকে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়—হোমারের নিজের **'মারগাইটিস্‌'** এবং অন্যান্য রচনা দৃষ্টান্ত। এখানে উপযোগী ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছিল। এই কারণেই, এখনও সেই ছন্দের মাত্রাকে বলা হয়—"আয়াম্বিক" বা ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা;—এই মাত্রার ছন্দেই লোকে একে অন্যকে ব্যঙ্গ করত।

কাব্যে লঘু-গুরু-ভেদ

তাই প্রাচীন কবিদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। যথা—ষন্মাত্রিক (হিরোইক) ছন্দের লেখক এবং ব্যঙ্গকরা ছন্দের লেখক।

যেমন. গম্ভীর রীতির রচনায় হোমার কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য—কারণ কেবল তিনিই কাব্যোৎকর্ষের সঙ্গে নাটকীয় রীতি মিলিয়েছেন, তেমনি তিনিই প্রথম ব্যক্তিগত ব্যঙ্গরচনার পরিবর্তে হাস্যাস্পদকে নাট্যরূপ দিয়ে কমেডির প্রধান ধারাটি সৃষ্টি করেছিলেন। ট্র্যাজেডির সঙ্গে ইলিয়াড ও অডিসির যে সম্পর্ক, কমেডির সঙ্গে তাঁর **'মারগাইটিস্'**-এরও একই সম্পর্ক। ট্র্যাজেডির ও কমেডির জন্মের পরেও দুই শ্রেণীর কবি তখনও নিজেদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসরণ করে চলছিলেন। ব্যঙ্গরচয়িতারা হলেন কমেডির লেখক এবং মহাকাব্যের কবিদের পরে এলেন—ট্র্যাজেডি-লেখকরা কারণ **নাটক শিল্পকলা হিসাবে বৃহত্তর ও উচ্চতর সৃষ্টি।**

আজ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি তার আদর্শরূপে পৌছেছে কিনা এবং ট্র্যাজেডির বিচার শুধু রচনাটুকুর হিসাব ধরেই করতে হবে অথবা তা'তে দর্শকের সাপেক্ষতা ধরতে হবে—এ অন্য প্রশ্ন। যাই হোক, ট্র্যাজেডি এবং কমেডিও, এমন অবস্থায় অতি স্থূল প্রচেষ্টামাত্রই ছিল। একের উৎপত্তি হল ডিথাইরাম্ব-রচয়িতাদের হাতে, অন্যের উৎপত্তি হ'ল—আমাদের অনেক নগরে এখনও প্রচলিত আছে যে "ফ্যালিক"-গীতি, সেই ফ্যালিক-গীতি থেকে। ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশ খুব ধীরে ধীরে হয়েছিল। প্রত্যেকটি উপাদান, ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছিল একের পর এক যোজিত হয়েছিল। অনেক পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে চলে চলে ট্র্যাজেডি তার স্বাভাবিক রূপে এসে দাঁড়াল এবং সেখানেই থেমে দাঁড়িয়েছিল।

ক্রমবিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন

এস্কিলাস্ প্রথমে **দ্বিতীয় অভিনেতা** প্রবেশ করালেন। তিনি সমবেত-গীতের প্রাধান্য কমিয়ে দিলেন এবং সংলাপকেই মুখ্য অঙ্গ করে তুললেন। সফোক্লিস্ অভিনেতার সংখ্যা বাড়িয়ে করলেন **তিন** এবং **চিত্রিত দৃশ্য** যোজনা করলেন। তারপর, ছোট বৃত্তের স্থলে যে বড় বৃত্ত গৃহীত হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ের 'স্যাটিরিক' রচনার অদ্ভুত রচনাশৈলীর স্থলে যে

ট্র্যাজেডির গুরুগম্ভীর রীতি ব্যবহৃত হয়েছে—এত খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। পূর্বে 'স্যাটিরিক' শ্রেণীর রচনায় যে 'ট্রোকায়িক' ত্রিমাত্রিক ছন্দ ব্যবহৃত হত এবং নৃত্যের সঙ্গে যে ছন্দের খুব মিল ছিল, সেই ছন্দের স্থলে আয়াম্বিক মাত্রা প্রযুক্ত হ'ল। সংলাপ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রকৃতিই উপযুক্ত মাত্রাও আবিষ্কার করে নিল। কারণ আয়াম্বিক মাত্রার ছন্দ সব মাত্রার ছন্দ অপেক্ষা কথ্যভাষার বেশী কাছাকাছি। এই ব্যাপারটী দেখলেই বুঝা যায় যে সংলাপের ভাষা প্রয়াশই অন্য মাত্রার দিকে না গিয়ে আয়াম্বিক মাত্রার পংক্তি হয়ে দাঁড়ায়। ষণ্মাত্রিক হয় খুব ক্বচিৎ এবং হয় তখনই যখন সংলাপের সুরলয় হারিয়ে যায়। উপকাহিনীর সংখ্যা বা অঙ্কের সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রথাসম্মত আবশ্যক উপকরণের সংখ্যা যোজনা সম্পর্কে ধরে নিতে হবে যে আগেই আলোচনা হয়ে গেছে। কারণ তাদের সবিস্তার আলোচনা করতে গেলে, নিঃসন্দেহ, একটি বৃহৎ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

৫

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কমেডি নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের অনুকরণ। অবশ্য নিম্ন বলতে মন্দ শব্দের পুরো অর্থটি বুঝায় না। 'হাস্যকর' 'কুৎসিতের'ই অন্যতম উপবিভাগ।* যে বিকৃতি বা কুৎসিত আকৃতি বেদনাদায়ক বা ক্ষতিকর নয় তারাই হাস্যজনক। স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—হাস্যরসাত্মক মুখোসগুলি কুৎসিত এবং কিম্ভূতকিমাকার বটে কিন্তু বেদনাদায়ক নয়।

হাসির কারণ

ট্র্যাজেডি যে সব পরিবর্তন-ক্রমের মাঝ দিয়ে চলে এসেছে এবং যাঁরা এই সব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তাঁরা খুবই সুবিদিত। অন্যপক্ষে কমেডির কোন ইতিহাস নেই, কারণ এতে কেউ আগেও তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি। অনেক পরে "আর্কণ" (Archon) 'কমিক কোরাস' রচনার মর্যাদা দান করেছিলেন। তখনও অভিনেতারা ছিল স্বেচ্ছাধীন। কমিক কবিরা 'কবি' আখ্যা পাওয়ার আগেই, কমেডি নির্দিষ্ট আকার লাভ করেছিল। কে এর জন্য মুখোস

কমেডির উৎপত্তির ইতিহাস

তৈরী করেছিল, কে প্রস্তাবনা (প্রোলোগ) যোজনা করেছিল এবং কেইবা অভিনেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল—এই সব এবং অন্যান্য বিবরণ অজ্ঞাত রয়েই গেছে। বৃত্তের কথাই ধরা যাক্—বৃত্ত এসেছিল 'সিসিলি' থেকে এবং এথেনীয় লেখকদের মধ্যে **ক্রেটিসই** প্রথম আয়াম্বিক বা ব্যঙ্গ করার ছন্দোমাত্রা ছেড়ে দিয়ে, তাঁর বিষয়বস্তু এবং বৃত্তকে সাধারণীকৃত করেছিলেন।

মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির ঐক্য ও পার্থক্য

এপিক কাব্যের সঙ্গে ট্র্যাজেডির এই বিষয়ে ঐক্য আছে যে এটাও উচ্চ ধরনের চরিত্রের ছন্দোবদ্ধ অনুকরণ। তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে মহাকাব্য একরকম ছন্দে লেখা এবং রীতির দিক দিয়ে বর্ণনাত্মক। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়েও উভয়ের পার্থক্য আছে—কারণ ট্র্যাজেডি বিষয়বস্তুকে একদিনের ঘটনার মধ্যে অথবা সামান্য একটু বেশী সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে যথাসম্ভব চেষ্টা করে; অন্যপক্ষে, মহাকাব্যের ঘটনার কোন কাল-মাত্রার সীমাবদ্ধতা নেই। এটা দ্বিতীয় পার্থক্য। যদিও প্রথম প্রথম যেমন ট্র্যাজিডিতে তেমনি মহাকাব্যে একইরূপ স্বাধীনতা ছিল।

অঙ্গ বা উপাদানের মধ্যে, কয়েকটি উভয়ের সমান; কয়েকটি বিশেষভাবে ট্র্যাজেডিরই। সুতরাং কোন্‌খানি ভাল ট্র্যাজেডি বা কোন্‌খানি মন্দ ট্র্যাজেডি এ যিনি জানেন, তিনি মহাকাব্য সম্বন্ধেও জানেন। মহাকাব্যের সব উপাদান ট্র্যাজেডির মধ্যে আছে কিন্তু ট্র্যাজেডির সব উপাদান মহাকাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না।

৬

যে কাব্য ষণ্মাত্রিক ছন্দে লেখা হয় তার সম্বন্ধে এবং কমেডির সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। এখন, আগে যে সব কথা বলা হয়েছে তা থেকে ট্র্যাজেডির একটা মোটামুটি সংজ্ঞা তৈরী করে নিয়ে ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ট্র্যাজেডি—**'গুরুত্বপূর্ণ'** **'সমগ্র'** এবং **'বিশেষ আয়তনের'** ঘটনার

অনুকরণ ;—(অনুকরণের) ভাষা সর্বপ্রকার কাব্যিক অলংকারে ভূষিত—নাটকের বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ রকম অলংকার প্রযুক্ত, (অনুকরণের) রীতি কার্যাত্মক—বর্ণনাত্মক নয় ; (অনুকরণের) উদ্দেশ্য করুণরস এবং ভয়ানক রস উদ্রিক্ত করা তথা উক্ত আবেগগুলির মোক্ষণ করা। "অলঙ্কারে ভূষিত ভাষা" বলতে আমি সেই ভাষার কথা বলেছি যাতে ছন্দ, সঙ্গতি এবং সংগীত ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। "বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ রকম" বলতে আমি এই বুঝাতে চাই যে কোন অংশ শুধু ছন্দে প্রকাশিত, কোন কোন অংশ গানের সাহায্যে প্রকাশিত।

ট্র্যাজেডির লক্ষণ

এখন, 'ট্র্যাজিক' অনুকরণ ব'লতে যখন বুঝায় ব্যক্তির কর্মরত অবস্থার রূপ, তখন স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত, প্রথমতঃ, এ হবেই যে দৃশ্যসজ্জা ট্র্যাজেডির অন্যতম অঙ্গ। তারপর গান এবং বাচন (*বচনশৈলী বা ভণিতি)। কারণ এরাই হল অনুকরণের মাধ্যম। বাচন (Diction) বলতে আমি বুঝি—শুধু শব্দসমূহের মাত্রাগত বিন্যাস। আর সংগীতের অর্থ সকলেই বুঝে।

তারপর ট্র্যাজেডি কার্যের বা ঘটনার অনুকরণ। কার্য বলতেই কার্যের কর্তার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে এবং কর্তা তারাই যারা চিন্তা ও চরিত্রের বিলক্ষণ গুণের অধিকারী। কারণ এই গুণগুলি দিয়েই তো আমরা কার্যগুলিকে বিশেষিত করে থাকি এবং এইগুলি—চিন্তা ও চরিত্র—সেই স্বাভাবিক কারণ যা থেকে কার্যের উৎপত্তি ঘটে থাকে ; আর এই কার্যের পরেই শেষ পর্যন্ত সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে। সুতরাং বৃত্ত হচ্ছে কার্যের অনুকরণ :—আর বৃত্ত বলতে বুঝি—ঘটনার বিন্যাস। 'চরিত্র' বলতে বুঝি—সেই ধর্মটি যা থাকার ফলে ব্যক্তিতে আমরা গুণ আরোপ করে থাকি। চিন্তার অবকাশ সেখানে যেখানে কোন সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করা হয়, অথবা সাধারণ সত্যকে স্থাপিত করা হয়। প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে, সুতরাং ছয়টি অংশ আছে আর এতেই ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য রয়েছে—যথা ; **বৃত্ত, চরিত্র, বচন, চিন্তা, দৃশ্য, গান**। এই অংশের মধ্যে **দুটি**—অনুকরণের মাধ্যম **একটি**

ট্র্যাজেডির অঙ্গ

রীতি এবং **তিনটি** অনুকরণের বিষয়। এই কয়টিতেই তালিকাটি সম্পূর্ণ। এই সব উপাদান, আমরা বলতে পারি, প্রত্যেকটি কবিই প্রয়োগ করেছেন, বস্তুতঃ প্রত্যেক নাটকেই দৃশ্য, চরিত্র, বৃত্ত, সংলাপ. গান ও চিন্তা দেখা যায়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—ঘটনার সংগঠন। কারণ ট্র্যাজেডি তো মানুষের অনুকরণ নয়,—**ঘটনার অনুকরণ এবং জীবনের অনুকরণ আর জীবনের রূপ কার্যেই প্রকাশিত** এবং এর পরিণতি হচ্ছে একটা কার্য-পদ্ধতি, গুণমাত্র নয়। এখন, চরিত্র মানুষের গুণাবলীর নিয়ামক বটে, কিন্তু কার্যের ফলেই মানুষ সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং নাটকীয় ঘটনার উদ্দেশ্য চরিত্রের উপস্থাপনা নয়, চরিত্র ঘটনার বা কার্যেরই আনুষঙ্গিক। অতএব, ঘটনা এবং বৃত্তই ট্র্যাজেডির মুখ্য লক্ষ্য ; আর লক্ষ্যই হচ্ছে সর্বপ্রধান বিষয়। তারপর, ঘটনা ব্যতীত ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয় না। কিন্তু চরিত্রের অভাব ঘটলেও ট্র্যাজেডি হতে পারে।

আধুনিক কবিদের অনেকেরই ট্র্যাজেডি চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে অসার্থক রচনা। কবিদের পক্ষে, সাধারণভাবে এ কথাটা—অনেকক্ষেত্রেই সত্য। চিত্র-শিল্পেও একই অবস্থা এবং এখানেই জিউকসিস্ ও পোলিগ্‌নোটাসের মধ্যে পার্থক্য। পোলিগ্‌নোটাস চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন সুন্দর ; জিউক্‌সিসের রীতিতে নৈতিকগুণের অভাব দেখা যায়। আবার যদি তুমি এমন সব কথার পর কথা গেঁথে যাও, যা চরিত্রকে সুন্দর প্রকাশ করে এবং বচনশৈলীর ও চিন্তার দিক দিয়েও যা সুসম্পন্ন, তাহলে তা' দিয়ে তুমি ঠিক তেমন বেশী খাঁটি ট্র্যাজিক সংবেদনা সৃষ্টি করতে পারবে না, যেমনটি পারবে সেই নাটক দিয়ে, যাতে এই সব বিষয়ের দুর্বলতা থাকলেও, ভাল বৃত্ত আছে এবং শিল্প-সুন্দর ঘটনা-বিন্যাস আছে। এ ছাড়াও ট্র্যাজেডির আবেগজনক উপকরণের মধ্যে যা' সর্বাপেক্ষা শক্তিমান—সেই "পেরিপেতেইয়া" বা পরিস্থিতি—বিপর্য্যাস এবং প্রত্যভিজ্ঞান দৃশ্যগুলি বৃত্তেরই অংশ। আরো একটি প্রমাণ এই যে নতুন শিল্পীরা বৃত্ত গঠন করতে শেখার আগেই, বচনশৈলী এবং যথাযথ চরিত্র চিত্রণে পাকা হাতের

পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রথমদিককার কবিদের পক্ষে এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

তাহ'লে—বৃত্তই (প্লট) প্রধান উপাদান, বলা যেতে পারে ট্র্যাজেডির আত্মা। চরিত্রের স্থান দ্বিতীয়। চিত্রাঙ্কনেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। অতিসুন্দর সুন্দর রঙ যেমন-তেমন ভাবে লেপে রাখলে ততখানি আনন্দদায়ক হবে না যতখানি আনন্দদায়ক হবে চিত্রের খড়িমাটি-আঁকা রেখারূপটি। সুতরাং ট্র্যাজেডি কোন একটি ঘটনার অনুকরণ এবং ঘটনাকে লক্ষ্য করে, ব্যক্তির অনুকরণ।

ক্রম-অনুসারে তৃতীয় হচ্ছে—**চিন্তা** অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্ভব ও সঙ্গত কোন-কিছু বলার ক্ষমতা। বক্তৃতায় এ রাজনীতি-কলার এবং অলঙ্কার-প্রয়োগ কৌশলের ব্যাপার। এইজন্যই দেখা যায়, প্রাচীন কবিরা চরিত্রদের মুখে প্রচলিত লৌকিক ভাষা দিয়েছেন এবং আধুনিকরা দিয়েছেন—আলঙ্কারিকের ভাষা।

চরিত্র তাই যা নৈতিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে—দেখিয়ে দেয় ব্যক্তি কোন্ রকমের বস্তু পছন্দ করে আর কোন্ বস্তু অপছন্দ করে। যে সংলাপে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয় না অথবা যাতে বক্তা কোন কিছু কামনা করে না বা কোন কিছু বর্জন করতে চায় না, তা চরিত্রদ্যোতক নয়। অন্যপক্ষে **চিন্তা** দেখা দেয় সেখানেই যেখানে কোন কিছুর ভাব বা অভাব প্রমাণ করা হয় অথবা কোন সাধারণ সূত্র স্থাপন করা হয়।

পরিসংখ্যাত উপাদানগুলির মধ্যে চতুর্থ—**বচনশৈলী** (ডিকশান্)। এর অর্থ, আগেই যা বলা হয়েছে—শব্দের মধ্যে অর্থ-শক্তির প্রকাশ; পদ্যে এবং গদ্যে এর তাৎপর্য একই।

অবশিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে **গানের** স্থান, অলঙ্করণ হিসাবে প্রধান।

দৃশ্যসজ্জার বাস্তবিকই নিজস্ব একটা আবেগ-গত আকর্ষণ আছে, কিন্তু সমস্ত উপাদানের মধ্যে এর শৈল্পিক মূল্য কম এবং কাব্য-কলার সঙ্গে সবচেয়ে কম সম্পর্ক। কারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ট্র্যাজেডির শক্তি, প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা এবং অভিনেতার সাহায্য ব্যতিরেকেই উপলব্ধি করা যায়।

অধিকন্তু, দৃশ্যসজ্জার উদ্দীপনা কবিশক্তি অপেক্ষা মঞ্চ-যন্ত্রীর কলা-কৌশলের উপরেই বেশী নির্ভর করে।

৭

এই সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত করার পরে এখন **বৃত্তের আদর্শ গঠন** সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক, কারণ বৃত্তই ট্র্যাজেডিতে প্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয়।

আমাদের লক্ষণ অনুযায়ী—ট্র্যাজেডি ঘটনার অনুকরণ এবং যে ঘটনা সম্পূর্ণ, সমগ্র এবং বিশেষ আয়তনসম্পন্ন। কারণ এমন 'সমগ্র' হতে পারে যার হয়ত আয়তনের ক্ষীণতা আছে। **সমগ্র** বলতে বুঝায় এমন একটা কিছু যার **আদি মধ্য ও অন্ত** আছে। **'আদি'** অর্থ—যা ঠিক অন্য কোন পূর্বভাবী কারণের কার্যরূপ নয় অথচ যার পরে অন্য কিছু স্বাভাবিক ভাবেই থাকে বা এসে যায়। অন্যপক্ষে **'অন্ত'** বলতে বুঝায় এমন কিছু যা অন্য কোন কিছুর পরে, হয় অনিবার্যভাবে অথবা নিয়মানুসারে স্বাভাবিক-ভাবেই আসে, কিন্তু যার পর আর কোন ঘটনা (আকাঙ্ক্ষা) থাকে না। **'মধ্য'** বলতে বুঝায়—যা কোন কিছুর পরবর্তী এবং কোন কিছুর পূর্ববর্তী। সুতরাং সুগঠিত কোন বৃত্ত যেখানে সেখানে সুরু যেখানে সেখানে শেষ হতে পারবে না—এই নিয়ম মেনে চলবে।

তারপর কোন সুন্দর বস্তুকে—সে বস্তু জীবন্ত দেহই হোক অথবা নানা অঙ্গের-সংযোগে-গঠিত কোন অঙ্গীই হোক—শুধু যে অঙ্গন্যাসের দিক দিয়ে সুসমঞ্জস হতে হবে তা নয়, বিশেষ আয়তনযুক্তও হতে হবে। কারণ

সৌন্দর্য বিচার

সৌন্দর্য নির্ভর করে আয়তনের এবং সামঞ্জস্যের উপরে। এই কারণেই অতিক্ষুদ্র জীবদেহ সুন্দর হতে পারে না; যেহেতু অতিক্ষণিকের জন্য চোখে ধরা পড়ে বলে বস্তুটিকে স্পষ্টাকারে দেখাই যায় না। আবার যা অতি বিশাল আয়তনযুক্ত তাও সুন্দর হতে পারে না। কারণ, চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে বস্তুটির সমগ্রটুকু গ্রহণ করতে পারে না বলে, বস্তুর এককত্ব ও সমগ্রতা দর্শকের কাছে ধরা পড়ে না। যেমন দৃষ্টান্ত ধরা যাক—এমন একটা বস্তু যা হাজার মাইল লম্বা।

অতএব, যেমন সজীব দেহের জন্য বিশেষ পরিমাণের আয়তন আবশ্যক—এমন আয়তন যা সহজেই একদৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায়, তেমনি বৃত্তেও বিশেষ পরিমাণ দৈর্ঘ্য—যে দৈর্ঘ্য সহজেই স্মরণে রাখা যায়—আবশ্যক।

দৈর্ঘ্য-সীমায় প্রথা ও নাটকের স্বগত প্রকৃতি

তবে, নাট্যপ্রতিযোগিতায় এবং দৃশ্যাত্মক উপস্থাপনায় দৈর্ঘ্য-সীমা বেঁধে দেওয়া শিল্পসূত্রের আওতার মধ্যে পড়ে না। কারণ যদি এমন নিয়ম প্রচলিত থাকত যে এক সঙ্গে একশত ট্র্যাজেডির প্রতিযোগিতা হবে, তা হলে অভিনয়-অনুষ্ঠান জল ঘটিকাযন্ত্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। বাস্তবিক শোনা যায় পূর্বে নাকি এমনিই হোত। কিন্তু নাটকের নিজস্ব প্রকৃতি দ্বারা যে সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে তা এই :—দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে তত বেশী সুন্দর হবে বস্তুটি—আয়তনের দিক দিয়ে যদি অবশ্য সমগ্ররূপটি সুস্পষ্টাকারে ফুটে উঠে। এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে নির্দেশ দিতে হলে আমরা বলতে পারি যে—আদর্শ আয়তন সেই সীমার মধ্যে আছে—যা'তে, সম্ভাব্যতার ও আবশ্যিকতার সূত্র অনুসারে বিন্যস্ত ঘটনাপরম্পরার মাঝ দিয়ে মন্দভাগ্য থেকে ভালোভাগ্যে এবং ভালোভাগ্য থেকে মন্দভাগ্যে পরিবর্তন দেখান সম্ভব হয়।

৮

ঐক্য

'বৃত্ত-ঐক্য' বলতে কিন্তু,—যেমন কেউ কেউ মনে করেন—'নায়ক-ঐক্য' বুঝায় না। কারণ, একজন মানুষের জীবনে অসংখ্য বিচিত্র ঘটনা ঘটে—এবং তাদের একটা ঐক্যসূত্রে বাঁধা সম্ভব নয়, তেমনি একজন মানুষের নানারকমের কাজ আছে যাঁদের মিলিয়ে আমরা একটি ক্রিয়া (action) সৃষ্টি করতে পারিনে। এই কারণেই, বোধ হয়, যে সকল কবি—হিরাক্লেইড্, থেসেইড্ এবং এই ধরনের কাব্য রচনা করেছেন তাঁরা ভুল করেছেন। তাঁরা মনে করেন—যেহেতু হিরাক্লিস্ একই ব্যক্তি, হিরাক্লিসের কাহিনীতে সুতরাং ঐক্য আছে। কিন্তু

হোমার যেমন অন্যান্য বিষয়েও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণের অধিকারী, তেমনি এখানেও—শিল্পিদৃষ্টিতেই করুন আর সহজাত প্রতিভার ফলেই করুন—মনে হয়, অতি সুন্দরভাবে সত্যটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'অডিসি' রচনা করতে গিয়ে তিনি অডিসিউসের সমস্ত অভিযান—কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করেন নি; যেমন—পারনাসাসের উপর আঘাত, অতিথি সমাবেশে পাগলামির ভাণ করা ··এমন সব ঘটনা যাদের মধ্যে কোন অনিবার্য বা সম্ভাব্য যোগ নেই।

তিনি অডিসি এবং ইলিয়াড রচনা করেছিলেন এমন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যা আমাদের ধারণায়-'**একক**'। সুতরাং যেমন অন্যান্য অনুকরণ-ধর্মী শিল্পে অনুকৃত বস্তুটি একক হলে অনুকরণ একক হয়, তেমনি ঘটনার অনুকরণ যে বৃত্ত, তাকেও অবশ্য একটি ঘটনাকেই অনুকরণ করতে হবে এবং সে ঘটনা হবে তেমন একটি 'সমগ্র রূপ' যার অঙ্গের সংযোগ-সম্বন্ধ হবে এমন যে, কোন একটি অঙ্গ অস্থানে বসালে বা অপসারিত করলেই, সমগ্র রূপটি বিযুক্ত সন্ধি ও ব্যাহত হয়ে পড়বে। কারণ কোন বস্তুর সদ্ভাবে বা অভাবে যদি কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন না দেখা যায় তা হলে সে বস্তুটি সমগ্ররূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে সংযুক্ত নয়।

৯

আগে যে সব কথা বলা হয়েছে তাতে এ কথাটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, যা ঘটেছে তারই বিবরণ দেওয়া নয়—কবির কাজ, যা ঘটতে পারে, আবশ্যিকতা ও সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে যা সম্ভব, তাই বিবৃত করা। কবি এবং ঐতিহাসিকের পার্থক্য পদ্যে-লেখার বা গদ্যে-লেখার পার্থক্য নয়। হেরোডোটাসের রচনা পদ্যেও লেখা যেতো এবং ছন্দ থাকা সত্ত্বেও যেমন, ছন্দ না থাকলেও তেমনি, রচনাটি ইতিহাসই হতো। আসল পার্থক্য এখানেই যে একজন বর্ণনা করেন—**যা ঘটেছে**, অন্যে করেন **যা ঘটতে পারে**। সুতরাং কাব্য

ইতিহাস ও কাব্যের পার্থক্য

ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর দার্শনিকতাময় এবং মহত্তর সামগ্রী। কারণ কাব্য প্রকাশ করতে চায়—'সামান্য'কে (Universal), ইতিহাস প্রকাশ করে—'বিশেষ'কে (Particular)।)('সামান্য' বলতে আমি এই মনে করেছি—কেমন করে বিশেষ শ্রেণীর লোক বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্ভাব্যের ও আবশ্যিকের নিয়ম অনুসারে কিছু বলবে বা কিছু করবে। পাত্র-পাত্রীকে বিশেষ বিশেষ নাম দিয়ে দিয়ে, কাব্য এই সামান্য-সত্যেই পৌছতে চায়। 'বিশেষে'র দৃষ্টান্ত যেমন—যা' এলসিবিয়াডিস করেছিলেন বা ভোগ করেছিলেন। কমেডিতে এ খুব স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে কবি, প্রথমতঃ, সম্ভাব্যের নিয়ম-অনুসারে, বৃত্তটি গঠন করেন এবং তারপর বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক নামগুলি বসিয়ে দেন—ব্যঙ্গকারীদের সঙ্গে পার্থক্য এই, তারা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সম্বন্ধে লেখে। কিন্তু ট্র্যাজেডি লেখকরা আজও, প্রকৃত নামই ব্যবহার করেন এবং এই যুক্তিতেই করেন যে, যা সম্ভব তা বিশ্বাস্য ; যা ঘটেনি তাকে আমরা অতিসহজেই সম্ভব বলে মনে করতে পারিনে : কিন্তু যা ঘটেছে তা সশরীরেই সম্ভব হয়েছে, অন্যথা ঘটাই সম্ভব হতো না।) তবু (অবশ্য এমন কয়েকখানি ট্র্যাজেডিও আছে যাতে প্রখ্যাত নাম একটি কি দুটি মাত্র, বাকী সব কাল্পনিক। আবার অনেকগুলিতে কোনটিই সুবিখ্যাত নয়—যেমন এ্যাগাথনের 'এ্যানথিউস'। এতে ঘটনা এবং নাম উভয়ই কল্পিত তথাপি আনন্দ তারা কম দেয় না। সুতরাং ট্র্যাজেডির প্রচলিত বিষয়বস্তু—পরম্পরাগত কাহিনীগুলির মধ্যেই, আমরা সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সীমাবদ্ধ থাকব না। বাস্তবিক তা করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। কারণ, জানা বিষয়গুলি পর্যন্ত, অল্প কয়েকজনের কাছেই জানা এবং তবু তারা সবাইকেই আনন্দ দিয়ে থাকে।)* যে কথাটা দাঁড়াচ্ছে তা এই যে কবিকে বা স্রষ্টাকে, পদ্যের লেখক অপেক্ষা কাহিনীর রচয়িতাই হতে হবে, কারণ সে কবি যেহেতু সে অনুকরণ করে এবং যা সে অনুকরণ করে তা—ঘটনা। এমন কি, সে যদি ঐতিহাসিক বিষয়ও নির্বাচন করে বসে, তাহলেও সে কবির মর্যাদাই পাবে ; কারণ কোন ঘটনা যা প্রকৃতই ঘটেছে তা যে সম্ভাব্য ও সম্ভবের সঙ্গে মিলে যেতে পারবে না এমন

কোন কথা নেই; ঘটনার মধ্যে ঐগুণ থাকাতেই সে তাদের কবি বা স্রষ্টা।)

সবরকম বৃত্তের বা ঘটনার মধ্যে,—"এপেইসোডিক" বৃত্তই সবচেয়ে হেয়। আমি সেই বৃত্তকে "এপেইসোডিক" বলছি যাতে কাহিনীগুলি বা অঙ্কগুলি, সম্ভাব্য বা আবশ্যিক পারম্পর্যের ধার না ধেরেই, একের পর এক চলতে থাকে। মন্দ কবিরা নিজেদের অক্ষমতার জন্যই এরূপ বস্তু রচনা করেন আর শক্তিমানরা রচনা করেন অভিনেতাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য। প্রতিযোগিতার জন্য দেখ্‌নাই রচনা লিখতে গিয়ে, তারা বৃত্তকে তার সাধ্যের বাইরে নিয়ে, টেনে লম্বা করেন এবং ফলে স্বাভাবিক পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু ট্র্যাজেডি তো শুধু একটা সম্পূর্ণাঙ্গ ঘটনারই নয়, ভয় বা শোচনা উদ্রিক্ত করে এমন ঘটনারও অনুকরণ। এরূপ রস-পরিণতি তখনই সর্বোৎকৃষ্ট-রূপে পাওয়া যায় যখন ঘটনারাজি আকস্মিকভাবে এসে হাজির হয়, এবং সংবেদনার তীব্রতা আরো বেশী হয়, সেখানেই, যেখানে, একইকালে তারা, কার্যকারণ—নিয়তভাবে, একে অন্যকে অনুসরণ করে। অকারণ ঘটনা অথবা আকস্মিক ঘটনার চেয়ে এইভাবে ঘটনা ঘটলেই ট্র্যাজিক চমৎকারিত্ব অধিকতর বেশী হবে! এমন কি যুগপৎ ঘটনাগুলিও তখনই বেশী চিত্তাকর্ষক হয় যখন তার মধ্যে একটা পরিকল্পনার আভাস ফুটে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা অর্গোসের সেই মাইটিসের মূর্তিটির (Mitys) কথা বলতে পারি যেটা, তার হত্যাকারী যখন উৎসব দেখছিল তখন তার মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তাকে হত্যাও করেছিল। ঐরূপ ঘটনাকে শুধু দৈবাৎ বলে মনে হয় না। সুতরাং এই নিয়ম-অনুসারে বৃত্ত গঠন করলেই সর্বোত্তম বৃত্ত হবে।

১০

বৃত্ত—সরল অথবা যৌগিক। কারণ বৃত্ত যাদের অনুকরণ সেই লৌকিক জগতের ঘটনাতেও স্পষ্টত এই বিভাগ দেখা যায়। পূর্বোল্লিখিত নির্ধারিত অর্থে যে ঘটনা একক এবং ক্রম-বিন্যস্ত, সেই ঘটনাকেই আমি 'সরল' বলছি,

এক্ষেত্রে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে বিনা পরিস্থিতি-বিপর্যাসে এবং বিনা প্রত্যভিজ্ঞানেই। যৌগিক ঘটনা বলা যায় তাকেই, যাতে ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে থাকে ঐরূপ কোন বিপর্যাস, বা প্রত্যভিজ্ঞান অথবা ঐ দুটোই। এই শেষের ব্যাপারগুলি বৃত্তের ভিতরকার গঠন থেকেই গড়ে উঠা উচিত; যাতে মনে হবে—যা ঘটছে তা পূর্ববর্তী ঘটনারই সম্ভাব্য বা অনিবার্য পরিণতি। কোন ঘটনা অন্য ঘটনার পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী (অকারণ বা সকারণ)—এটা মস্ত পার্থক্যের ব্যাপার।

১১

(**'পরিস্থিতি—বিপর্যাস'** একরকমের পরিবর্তন—যাতে ঘটনা, সম্ভাব্য ও আবশ্যিকের নিয়মাধীন হয়েও, তার বিপরীত কোটিতে যেয়ে দাঁড়ায়। যেমন ঈডিপাসে; দূত আসে ঈডিপাসের মনটাকে প্রফুল্ল করতে এবং মাতৃ-সম্পর্কিত আতঙ্কের হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করতে কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে সে উল্‌টো ফলই সৃষ্টি করে।) তেমনি লীন্‌সিউসেও (Lynceus); লীনসিউসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দনৌসও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে—মানে, হত্যা করবার জন্য যাচ্ছে, কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাচক্রের ফল হয় এই যে দনৌস নিহত হয় এবং লীনসিউস বেঁচে যান।

(**প্রত্যভিজ্ঞান**—নাম থেকেই বুঝা যায়—এক ধরনের পরিবর্তন—অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে পরিবর্তন। এর ফলে,—কবি-নির্ধতির হাতে যে-সকল ব্যক্তির সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে অনুরাগ বা বিরাগ সৃষ্টি হয়। সেইটিই সর্বোত্তম 'প্রত্যভিজ্ঞান' যেটি পরিস্থিতি-বিপর্যাসের সঙ্গেই যুগপৎ দেখা দেয়; যেমন ঈডিপাসে। অবশ্য, অন্যান্য রকমারিও আছে। এমন কি, অতি তুচ্ছ অচেতন পদার্থও প্রত্যভিজ্ঞানের নিমিত্ত হতে পারে। আবার কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন একটি কাজ সত্যই করেছে কি না, তাও আমরা প্রত্যভিজ্ঞান বা আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু যে প্রত্যভিজ্ঞান বৃত্তের বা ঘটনার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত, তা আগেই বলা হয়েছে—ব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞান। এই জাতীয় প্রত্যভি-

জ্ঞানের সঙ্গে ঘটনা-বিপর্যাস যুক্ত হলে—**ভয়** অথবা **শোচনা** উদ্রিক্ত করবেই। আর যে সব ঘটনায় এরূপ সংবেদনা জাগায়, তারাই তো, লক্ষণানুসারে, ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য বিষয়। অধিকন্তু এরূপ পরিস্থিতির উপরেই, ভাল অথবা মন্দ ভাগ্যের ব্যাপার নির্ভর করে।

তা'হলে প্রত্যভিজ্ঞান যখন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয়, তখন, এমন হতে পারে যে একজন অপরজনের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাত হল—আর ঐ অপরজন আগেই পরিচিত, অথবা এমন প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে যাতে উভয়তই পরিচয় আবশ্যক। যেমন, ইফিজেনিয়া অরিস্টিসের কাছে পরিচিত হল—পত্রের মারফতে; কিন্তু ইফিজেনিয়ার কাছে অরিস্টিসকে পরিচিত করতে, আরো একটা প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাপার আবশ্যক।

তাহলে বৃত্তের দুইটি অংশ—পরিস্থিতি-বিপর্যাস এবং প্রত্যভিজ্ঞান—অকিস্মিকতার কৌতূহলে ভরা। তৃতীয় অংশ—দুর্ভোগ-দৃশ্য। এই দুর্ভোগ দৃশ্য সাংঘাতিক বা বেদনাজনক ঘটনা; যেমন মঞ্চের উপরেই মৃত্যু, দৈহিক যন্ত্রণা, আঘাত প্রভৃতি।

১২

যে সমস্ত অংশকে ট্র্যাজেডির 'অঙ্গ' বলে গ্রহণ করতে হবে তাদের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এখন আমরা আসছি—'সন্ধি' অংশগুলিতে—যে কয় অংশে ট্র্যাজেডিকে ভাগ করা হয় সেই সব পৃথক পৃথক অংশে; যথা—

সন্ধি বিভাগ

প্রোলোগ, এপিসোড্, একসোড্ কোরাস-গান। শেষেরটি আবার দুইভাগে বিভক্ত—**প্যারোড্** এবং **স্টেসিমোন্**। এইগুলি সব নাটকেই থাকে—কোন কোন নাটকের অবশ্য "মঞ্চ থেকে অভিনেতাদের গান" এবং "কোম্মই"—এই দুই বিশেষত্ব দেখা যায়।

* **প্রোলোগ** বলতে বুঝায় ট্র্যাজেডির সেই গোটা অংশ যা প্যারোড-নামক কোরাসের আগে থাকে। দুই কোরাসের মধ্যে যে অংশটি থাকে তাকে বলা হয় "**এপিসোড**"। **একসোড** বলতে বুঝায় সেই অংশটি যার পরে আর কোন কোরাস-গীত নেই। কোরাসের মধ্যে প্যারোড হ'চ্ছে প্রথম

সমবেত সংগীত আর স্টেসিমোন সেই কোরাস-গীতি, যার ছন্দ এনাপেস্ট-মাত্রিক বা ট্রোকায়িক-ত্রিমাত্রিকা নয়।

কোমোস্‌ হ'চ্ছে—কোরাস ও অভিনেতাদের সমবেত বিলাপ। যে সমস্ত অংশকে ট্র্যাজেডির অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে হবে তাদের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এখানে সন্ধি-অংশগুলি—অর্থাৎ যে পৃথক পৃথক অংশে ট্র্যাজেডি বিভক্ত—তারা পরিগণিত হল।

১৩

যা' আগেই বলা হয়েছে তারই ধারা ধরে, আমরা এখন এইসব আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি—বৃত্ত গঠন করতে গিয়ে কবি কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন, কি কি বর্জন করবেন এবং কি কি উপায়ে ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ সংবিৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

আদর্শ ট্র্যাজেডির গঠনটি সরল নয়, যৌগিক পরিকল্পনায় হওয়া উচিত। অধিকন্তু এর উচিত ভয়ানক ও করুণ-রসাত্মক ঘটনার অনুকরণ করা ; যেহেতু এটাই হল ট্র্যাজিক অনুকরণের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং স্পষ্ট অনুসিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই—প্রথমতঃ যে ভাগ্য পরিবর্তন রূপায়িত হবে তা' কোন ধার্মিক ব্যক্তির, ঐশ্বর্য সম্ভোগ থেকে দুঃখ দুর্ভোগে পতনের দৃশ্য হবে না, কারণ এতে না জাগায় করুণা, না জাগায় ভয়, এ শুধু আঘাতই দেয়। আর তা কোন মন্দ ব্যক্তির, দুঃখদুর্ভোগ থেকে ঐশ্বর্য সম্ভোগে উত্থানের দৃশ্যও হবে না ; কারণ ট্র্যাজেডির আত্মার পক্ষে এর চেয়ে বড়ো প্রতিকূল আর কিছুই হতে পারে না। এর মধ্যে ট্র্যাজিকত্বের কোন ধর্মই নেই ; এ না তৃপ্ত করে নৈতিক বোধকে না জাগায় শোচনা বা ভয়কে। আবার অতিশয় শয়তানের পতন দেখানোও ঠিক নয়। এই ধরনের বৃত্ত, অবশ্য, নৈতিক বোধকে তৃপ্ত করবে বটে, কিন্তু শোচনা বা ভয় দুটোর কোনটাই উদ্রিক্ত করবে না। কারণ করুণা জাগে অনুচিত দুর্ভোগ দেখে, আর ভয় জাগে আমাদের মত মানুষের বিপর্যয় দেখে।

সুতরাং এরূপ ঘটনা ভয়ানক বা করুণ কোন রসেরই হবে না। তাহলে

অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ চরিত্র যা এই দুই অতিকোটিকের মাঝখানে—এমন ব্যক্তির চরিত্র যিনি অতি সৎস্বভাব ও ন্যায়নিষ্ঠ ন'ন, তবু তার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটানো হবে—পাপের বা নীচতার দ্বারা নয়, ভ্রান্তি বা দুর্বলতার দ্বারা। তিনি হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি খুবই প্রখ্যাত এবং ঐশ্বর্যশালী—ঈডিপাস্, থিয়েস্টিস্ অথবা ঐরূপ পরিবারেরই বিখ্যাত কোন ব্যক্তির মত ব্যক্তি হবেন।

সুতরাং সুগঠিত বৃত্ত হবে উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দ্বৈত নয়, যা কেউ কেউ বলে থাকেন—হবে একক (বা অদ্বৈত)। ভাগ্যের পরিবর্তন হবে মন্দ থেকে ভালর দিকে নয়, হবে বিপরীত দিকেই ভাল থেকে মন্দের দিকে। এই পরিবর্তন ঘটবে—যে ধরনের চরিত্রের কথা আমরা বলেছি তেমনি চরিত্রের অথবা তদপেক্ষা আরো ভালো চরিত্রের—পাপের পরিণতির ফলে নয়, কোন একটা বড়রকমের ভুলের বা দুর্বলতার ফলে। মঞ্চের অভিনয়-অনুষ্ঠান আমাদের মত সমর্থন করে। প্রথমতঃ কবিরা তাদের চোখের সামনে যে কাহিনীই পেতেন তাই গ্রহণ করতেন। এখন, উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডিগুলি, অল্প কয়েকটি পরিবারের কাহিনীর উপরে গড়ে উঠেছে—এ্যাল্‌কমেইয়ন, ঈডিপাস, অরিস্টিস্, মিলিগার, থিয়েস্টিস, টেলিফাস এবং অন্যান্য এমন সব ব্যক্তির ভাগ্যবিপর্যয়ের উপর যাঁরা **ভয়ানক কিছু করেছেন** অথবা **ভয়ানক দুর্ভোগ ভোগ করেছেন**। সুতরাং শিল্প-সূত্রের হিসাবে আদর্শস্থানীয় হতে হলে ট্র্যাজেডির গঠন এরূপ হওয়াই চাই। সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে নাটক লিখেছেন বলেই এবং নাটকগুলির অনেকখানিই বিয়োগান্ত বলে যাঁরা ইউরিপিডিসকে নিন্দা করেন তাঁরা ভুল করেন। এটাই হল আমাদের মতে, খাঁটি উপসংহার। বড় প্রমাণ এই যে নাট্যমঞ্চে এবং নাট্য-প্রতিযোগিতায় এই ধরনের নাটকগুলি ভালভাবে অভিনয় করতে পারলে রস-সংবেদনার দিক দিয়ে সবচেয়ে ট্র্যাজিক হ'য়ে থাকে। ইউরিপিডিস যদিও বিষয়বস্তুর সাধারণ সংযোজনায় নির্দোষ ন'ন তবু কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ট্র্যাজিক (বা করুণ)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সেই জাতের ট্র্যাজেডি কারো কারো মতে যা নাকি

প্রথম শ্রেণীর। অডিসির মতো এতে দ্বি-সূত্রের বৃত্ত আছে এবং ভাল ও মন্দ লোকের ভাগ্যে বিপরীত পরিণাম দেখান হয়েছে। একে যে সর্বোত্তম বলা হয় তার কারণ দর্শকদের দুর্বলতা। কবি এখানে রচনায় শ্রোতাদের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর এর যে শৈল্পিক আনন্দ তা ঠিক খাঁটি ট্র্যাজিক আনন্দ নয়। এ কমেডিরই উপযুক্ত, যেখানে অরিস্টিস ও এইগিস্‌থাসের মত ঘোর শত্রুরাও উপসংহারে বন্ধুর মত মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়—কেউ কাকে নিধনও করে না বা কেউ কারো হাতে নিহতও হয় না!

১৪

ভয় এবং করুণা, দৃশ্য-সজ্জা প্রভৃতি উপায় দ্বারাও উদ্রিক্ত করা যেতে পারে; কিন্তু তারা নাটকের আভ্যন্তরীণ গঠন থেকেও উদ্রিক্ত হতে পারে—আর এই উপায়ই হ'চ্ছে উৎকৃষ্টতর এবং বড় কবির পরিচয়। কারণ বৃত্তটি এমনভাবে গড়তে হবে যে চোখের সাহায্য ব্যতিরেকেও, গল্পটি যার কাছে বলা হবে, সে ঘটনা শুনে ভয়ে শিউরে উঠবে এবং করুণায় গলে যাবে। ঈডিপাসের কাহিনী শোনার পরে আমাদের মধ্যে এই সংবিৎই জাগে। কিন্তু শুধু দৃশ্য দিয়ে এই সংবিৎ জাগানো শৈল্পিক উপায়ের দিক দিয়ে হীন এবং বাহ্য সাহায্যের ওপর নির্ভর করা। যাঁরা দৃশ্য দ্বারা ভয়ানকের বোধ না জাগিয়ে বীভৎসের বোধ জাগাতে চান তাঁরা ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য বিষয়ে একেবারেই আগন্তুক; কারণ আমরা ট্র্যাজেডির কাছে সব রকম আনন্দ দাবী করতে পারিনে, সেইটাই দাবী করব যেটা তার দেয়। যেহেতু, কবি যে আনন্দ সৃষ্টি করবেন তা' আসবে করুণ এবং ভয়ানকের অনুকরণ থেকে; বলা বাহুল্য ঘটনাগুলিকে এই ধর্মান্বিত করতেই হবে।

মেলোড্রামার বীজ

এবার নিরূপণ করা যাক—কোন্ কোন্ অবস্থা আমাদের কাছে ভয়ানক বা করুণ বলে মনে হয়।

এই ভাব জাগাতে পারে যে সব ঘটনা, তা অবশ্যই ঘটবে তেমন সব ব্যক্তির মধ্যে যারা হয় বন্ধু, না হয় শত্রু না-হয় একে অন্যের প্রতি উদাসীন।

শত্রু যদি শত্রুকে হত্যা করে তা হলে কার্যে বা উদ্দেশ্যে করুণা জাগানোর মত কিছু থাকে না। উদাসীন ব্যক্তি সম্বন্ধে একই কথা। কিন্তু যখন ট্র্যাজিক ঘটনা এমন লোকের মধ্যে ঘটে যারা পরস্পরে নিকট আত্মীয় বা প্রীতির সম্পর্কে-সম্বদ্ধ, যেমন, যদি কোন ভাই তার ভাইকে হত্যা করে বা হত্যা করতে চায়—পুত্র পিতাকে, মাতা সন্তানকে, পুত্র তার মাতাকে হত্যা করে বা করতে চায় অথবা এই ধরনের কাজ কেউ করে—এইরূপ পরিস্থিতিগুলি কবির খুঁজে খুঁজে নেওয়া উচিত। তিনি বাস্তবিক প্রচলিত কাহিনীর কাঠামোকে অর্থাৎ তথ্যকে বিবৃত করতে না পারেন। তথ্য, যেমন,—ক্লাইটেমনেস্ত্রা অরিস্টিস্ কর্তৃক এবং এরিফাইলে এ্যাল্‌কমেইয়ন দ্বারা নিহত হয়েছিলেন—কিন্তু তাকে নিজের কল্পনা-আরোপ দেখাতে হবে এবং প্রচলিত বিষয়বস্তুতে কলা-কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। 'কলা-কৌশল প্রয়োগ' বলতে কি বুঝায় স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যাক।

প্রাচীন কবিরা যেমনটি করেছেন—কাজটা, সজ্ঞানেই এবং ব্যক্তির পরিচয় জেনেই করা হচ্ছে—এমন দেখান যেতে পারে। এমনি ভাবেই ইউরিপিডিস মিডিয়াকে দিয়ে তার সন্তানদের হত্যা করিয়েছেন। অথবা ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটানো যেতে পারে—এবং তা ঘটানো যেতে পারে অজ্ঞাতসারে এবং পরে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সূত্রটি আবিষ্কৃত করা যেতে পারে। সফোক্লিসের ঈডিপাস এর দৃষ্টান্ত। এখানে অবশ্য ঘটনাটি আসল নাটকের বাইরে তবে এমন দৃষ্টান্তও আছে যেখানে নাটকের ঘটনার মধ্যেই এরূপ ঘটেছে। কেউ অবশ্য এস্টাইডেমাসের এ্যাল্‌কমেইয়নের অথবা আহত অডিসিউসের টেলিগোনাসের দৃষ্টান্ত দিতে পারে। তারপর তৃতীয় একটি ধরনও দেখা যায়—ব্যক্তির পরিচয় জানা সত্ত্বেও কাজ করতে উদ্যত হওয়া এবং তারপর আর না করা। চতুর্থ ধরন—যখন কেউ অজ্ঞানবশতঃ, যে কাজের কোন ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয় এমন কাজ করতে উদ্যত হয় এবং কাজটি করবার পূর্বেই পরিচয় আবিষ্কার করে ফেলে। এই কয়টিই সম্ভাব্য উপায়।

কারণ, কাজটি হয় করানো হবে নতুবা করানো হবে না। আর তা

করানো হবে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে। কিন্তু এই উপায়সমূহের মধ্যে —পরিচয় জেনেও কাজ করতে উদ্যত হওয়া এবং তারপর না করা সব চেয়ে নিকৃষ্ট। এ আঘাত দেয় কিন্তু ট্র্যাজিক হয় না। কারণ কোন বিপত্তিই ঘটে না। কাব্যে এ সব খুব কমই দেখা যায় অথবা দেখাই যায় না। একটি দৃষ্টান্ত যেমন পাওয়া যায় এন্টিগোনে, যেখানে হেইমন ক্রিয়োনকে বধ করবার জন্য শাসায়। অন্য এবং উৎকৃষ্টতর উপায়টি হচ্ছে—কাজটি ঘটানো। আরো ভালো—যদি কাজটি অজ্ঞাতসারে করা হয় এবং করার পরে আবিষ্কার করা হয়। এখানে মনে আঘাত দেওয়ার মত কিছুই নেই, অথচ আবিষ্কার একটা চমৎকার বিস্ময় সৃষ্টি করে। শেষটিই সবচেয়ে ভাল। যেমন ক্রেসফনটিস-এ মেরোপ তার পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে চিন্‌তে পেরে, প্রাণ বাঁচিয়ে দেয়। তেমনি ইফিজেনিয়াতে ভাইকে বোন ঠিক সময়ে চিনে ফেলে। তারপর 'হেল্লে'তে পুত্র মাকে ত্যাগ করবার মুখেই তাঁকে চিনে ফেলে। এই কারণেই, কয়েকটি পরিবার —সেকথা আগেই বলা হয়েছে,—ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু যুগিয়েছে। বিষয়-বস্তুর-সন্ধানে-রত কবিরা, এই সকল কাহিনীতে ট্র্যাজিক ধর্ম সঞ্চার করতে যে সমর্থ হয়েছেন—তাতে কোন শিল্প-কৌশলের হাত নেই, এই সব কাহিনী অনেকটা পড়ে-পাওয়া। সুতরাং যে সব ঘরের ইতিহাসে এ ধরনের মর্মস্পর্শী ঘটনা আছে, কবিরা সেই সব ঘরের কাহিনী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

ঘটনার সংবিন্যাস সম্বন্ধে এবং খাঁটি বৃত্তের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যথেষ্টই বলা হয়েছে।

১৫

চরিত্র সম্পর্কে, চারটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত এবং প্রধানতঃ চরিত্র **ভালো** হওয়া চাই। এখন, যে কথা বা কাজ কোন রকমের নৈতিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তাই চরিত্র ব্যঞ্জক; চরিত্র তখনই ভালো যখন উদ্দেশ্যটিও ভালো। এই সূত্রটি প্রত্যেক শ্রেণী সম্পর্কেই আপেক্ষিকভাবে প্রযোজ্য।

এমন কি একটা স্ত্রীলোকও ভালো হতে পারে—একটা ক্রীতদাসও ভালো হতে পারে, যদিও স্ত্রীলোক ব্যক্তি হিসাবে নিম্ন জাতীয় এবং ক্রীতদাস সম্পূর্ণ অপদার্থ। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়—**ঔচিত্য**। শৌর্য-বীর্য পুরুষের সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীলোকের শৌর্য অথবা বেপরোয়া চাতুর্য অনুচিত। তৃতীয়তঃ, চরিত্র হবে **বাস্তবিক**। ভালত্ব ও ঔচিত্য থেকে এ গুণটি ভিন্ন এবং তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ বিষয়—**সঙ্গতি**। যদিও যে জাতীয় চরিত্র অনুকরণের বিষয় নির্বাচনে প্রেরণা দিয়েছে, তা' স্বভাবত অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলেও তাকে সঙ্গতির সঙ্গে বরাবর অসঙ্গত রাখতে হবে। বিনা উদ্দেশ্যে চরিত্রকে হীন করে দেখানোর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আমাদের অরিস্টিসের মেনিলাস। কুৎসিত ও অনুচিত চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্কিলাতে অডিসিউসের বিলাপ এবং মেলানিপ্পের উক্তি। অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত—আউলিসে ইফিজেনিয়া; কারণ, সেবিকা ইফিজেনিয়ার সঙ্গে পরবর্তী সত্তার কোন সাদৃশ্যই নেই।

যেমন বৃত্তের গঠনে, তেমনি চরিত্রাঙ্কনেও কবিকে সর্বদাই সম্ভব বা সম্ভাব্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন বিশেষ চরিত্রের ব্যক্তি, সম্ভব অথবা সম্ভাব্যের নিয়ম অনুসারে, একটি বিশেষ ধরনের কথা বলবে বা কাজ করবে, যেমন বৃত্তে এক ঘটনার পর অন্য ঘটনা ঘটবে সম্ভব বা সম্ভাব্যের ক্রম রক্ষা করে। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে বৃত্তের গ্রন্থিমোচন এবং গ্রন্থি-বন্ধনও বৃত্তের ভিতর থেকেই ব্যক্ত হবে, দৈব হস্তক্ষেপ (ডিউস্ এক্স্ মেসিনা) দ্বারা ঘটানো হবে না—যেমনটি হয়েছে মিডিয়াতে, অথবা ইলিয়াডে—'গ্রীকদের প্রত্যাবর্তনে'।

'দৈব হস্তক্ষেপ' প্রয়োগ করা উচিত—যে ঘটনা নাটকের বহিরঙ্গ, তার জন্য,—সেই সব পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ঘটনার জন্য যা মানুষের জ্ঞানের সীমার বাইরে এবং যা আগে থেকেই বর্ণনা করা বা ব'লে দেওয়া দরকার। কারণ দেবতাদের আমরা সর্বদর্শী বলেই মনে করে থাকি। নাটকীয় ঘটনার মধ্যে অবশ্যই কোনরূপ অযুক্তিযুক্ত ব্যাপার থাকবে না। যদি অযুক্তিযুক্তকে কোন রকমে বাদ দেওয়া নাই যায়, তা হলে তাকে ট্র্যাজেডির বাইরেই

রাখতে হবে। সফোক্লিসের ঈডিপাসে অতি প্রাকৃতকে এইভাবেই স্থান দেওয়া হয়েছে।

তারপর যেহেতু ট্র্যাজেডি অসাধারণ স্তরের ব্যক্তির অনুকরণ, সেইহেতু ভাল চিত্রকরের আদর্শই অনুসরণ করা উচিত। তাঁরা মূলের সব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও এমন প্রতিরূপ সৃষ্টি করেন যা খুবই যথাযথ অথচ আরো সুন্দর। ঠিক তেমনি কবিও কোপনস্বভাব বা অলস ব্যক্তিকে অথবা এরূপ যাদের চরিত্রে ক্রটি আছে তাদের রূপ দিতে গিয়ে, চরিত্রের প্রকৃতিটা অক্ষুন্ন রাখবেন অথচ তাকে একটু মহনীয়ও করবেন। এইভাবেই এগাথোন ও হোমার কর্তৃক একিলিস অঙ্কিত হয়েছে।

এই সব নিয়ম কবির পালন করা উচিত। তারপর সহজ ইন্দ্রিয় উপলব্ধিকে যা' তৃপ্ত করে, সেগুলিও উপেক্ষা করা উচিত নয়। যদিও, অবশ্য, এরা কাব্যের অপরিহার্য নয়, তবু এরা কাব্যের সহযোগী। কারণ এখানেও ভুলের অনেক সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

১৬

প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাপারটা কি তা' আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবার আমরা তার প্রকার ভেদ গণনা করব।

প্রথমতঃ সবচেয়ে যেটা কম শৈল্পিক এবং যেটা প্রযুক্ত হয় শিল্প-প্রতিভার দৈন্য থেকেই, সেটা হ'চ্ছে—চিহ্ন দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞান। এদের কোন কোনটা সহজাত—যেমন বর্শা চিহ্ন—মানুষ যা ধারণ করে তাদের শরীরে ('the spear which the earth-born race bear on their bodies') অথবা সার্সিনাস তাঁর 'থিয়েস্টিস'-এ যে 'তারকা'র প্রয়োগ করেছেন। কোন কোনটি জন্মের পরে লব্ধ। এদের কোন কোনটি আবার দেহের চিহ্ন—যেমন ক্ষত-চিহ্নাদি, কোন কোনটি—বাহ্য বস্তু, যেমন গলার হার, অথবা টায়রোতে সেই ছোট একটি সিন্দুক (ark) যা দিয়ে পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন কি এগুলোকেও কৌশলে প্রয়োগ করা চাই। ক্ষত-চিহ্ন

দ্বারা অডিসিউসের প্রত্যভিজ্ঞানে—এক দিক থেকে আবিষ্কার করে ধাত্রী, অন্যদিক থেকে করে শূকরপালরা। প্রমাণের উদ্দেশ্যে কোন স্মারক সামগ্রীর ব্যবহার—বস্তুতঃ যে কোন মামুলি ধরনের প্রমাণ, সে স্মারক বস্তু দ্বারাই হো'ক আর বিনা বস্তুতেই হো'ক প্রত্যভিজ্ঞানের হেয় রীতি। ভাল রীতি হচ্ছে সেইটি যা ঘটনার গতি থেকেই ঘটে—যেমন, অডিসিতে স্নান-দৃশ্যে। তারপর ধরা যায় সেই প্রত্যভিজ্ঞানগুলো যাদের কবিরা খেয়াল খুসিমত উদ্ভাবন করেন—আর এই কারণেই তারা শিল্পকলা হিসাবে হীন। যেমন ইফিজিনিয়াতে অরিস্টিস্‌ নিজেই ব্যক্ত করেন যে তিনি অরিস্টিস্‌, সে (ইফিজিনিয়া) অবশ্য পত্রদ্বারা নিজের পরিচয় প্রকাশ করে, কিন্তু অরিস্টিস্‌ নিজেকে ব্যক্ত করেন নিজের মুখেই এবং এমন কথা বলে যা' বৃত্তের পক্ষে নয়, শুধু কবির পক্ষেই প্রয়োজন। সুতরাং এটা অনেকটা উল্লিখিত দোষেরই সগোত্র—কারণ অরিস্টিস্‌, ইচ্ছা করলে, কোন স্মারক-চিহ্ন সঙ্গে নিয়েও যেতে পারতেন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত সফোক্লিসের 'টেরিয়াসে'—মাকুর শব্দ (voice of the shuttle)।

তৃতীয় প্রকারটি—**স্মৃতির** পরে নির্ভর করে—যখন কোন বস্তু চোখে পড়ার পরে, মনে আবেগ জাগায়; যেমন, ডিকেয়িজিনিসের 'সাইপ্রিয়ানসে' —যেখানে নায়ক চিত্র দেখে কেঁদে ফেলে অথবা 'লে অফ্‌ এ্যালকিনাস'-এ অডিসিয়াস চারণদের বীণাবাজনা শুনে অতীতকে স্মরণ করে এবং কাঁদতে থাকে, এবং সেইভাবে প্রত্যভিজ্ঞান হয়।

চতুর্থ প্রকার হয়—**যুক্তি বিচারের** সাহায্যে। যেমন কোয়িফোরিতে— আমার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন একজন এসেছে, অরিস্টিসের সাথে ছাড়া আর কারো সাথে আমার সাদৃশ্য নেই, সুতরাং অরিস্টিসই এসেছে। সোফিস্ট-পন্থী পোলিইডাসের নাটকে ইফিজিনিয়া এই ভাবেই আবিষ্কার করেছে। অরিস্টিস খুব স্বাভাবিক মন্তব্য করে—'তা হ'লে এই বেদীমূলে আমার ভগিনীর মত আমাকেও মরতে হবে।' তেমনি আবার থিওডেক্‌টিসের 'টাইডিয়াস'-এ পিতা বলেন —'আমি এসেছিলাম ছেলেকে খোঁজ করতে, এসে নিজের প্রাণটাই দিতে হল। 'ফাইনেইডা'তেও স্ত্রীলোকগুলি স্থানটি

দেখেই ভাগ্যটি অনুমান করেছিল—এখানে যখন আমাদের রাখা হ'য়েছে তখন আমাদের মরতেই হবে।' তারপর, যৌগিক প্রত্যভিজ্ঞানও আছে ; তাতে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কোন একজন মিথ্যা অনুমান করে বসে—যেমন অডিসিয়াসে—দূতের ছদ্মবেশে। "ক" বল্‌ল—আর কেউ ধনুকখানা বাঁকাতে সক্ষম নয়···অতএব "খ" (ছদ্মবেশী অডিসিয়াস) মনে করল যে "ক" বোধ হয় ধনুকখানা চিনতে পেরেছে— বস্তুতঃ "ক" তা দেখেনি, এইভাবে প্রত্যভিজ্ঞান ঘটানো—"ক" ধনুকখানা চিনবে এই প্রত্যাশা মিথ্যা অনুমান।

কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রত্যভিজ্ঞান হচ্ছে—যা ঘটনার নিজস্ব ধারা থেকেই দেখা দেয়—এবং যেখানে স্বাভাবিক উপায়েই চমকপ্রদ আবিষ্কার সৃষ্টি করা হয়। এমনি আবিষ্কার দেখা যায় সফোক্লিসের ঈডিপাসে এবং ইফি-জিনিয়াতে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ইফিজিনিয়া একখানা পত্র পাঠাতে চাইবে। শুধু এই সব প্রত্যভিজ্ঞান, স্মারক-চিহ্ন বা অঙ্গদাদির কৃত্রিম উপায় বর্জ্জন করতে পারে। এর পরেই দাঁড়াচ্ছে—যুক্তি-বিচারের সাহায্যে প্রত্যভিজ্ঞান।

১৭

বৃত্ত গঠন করবার এবং উপযুক্ত শব্দার্থের সাহায্যে তাকে রূপ দেওয়ার সময়, কবির উচিত দৃশ্যটি যথাসম্ভব চোখের সামনে রাখা। এইভাবে, যথা-সম্ভব স্পষ্টভাবে—তিনি যেন ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা—এইভাবে সব কিছু দেখার ফলে—যা যা উপযোগী সব কিছুই তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন এবং যে যে অসঙ্গতি থাকবে তাও তাঁর চোখ এড়াতে পারবে না। এই ধরনের নিয়মের যে আবশ্যকতা আছে, তা সার্সিনাসের (Carcinus) দোষগুলি দেখলেই বুঝা যায়। এ্যাম্ফিয়ারাউস তখন মন্দির থেকে ফেরার পথে। পরিস্থিতিটা লক্ষ্য করেনি বলেই এ ঘটানাটিও তার চোখে পড়েনি। শ্রোতারা এই তাল-কানা দোষটিতে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হওয়ায়, মঞ্চে নাটকটি জমতে পারেনি।

তারপর, কবির নাটক রচনা করা উচিত যথাসাধ্য উপযুক্ত আঙ্গিক অভিনয় করে করে। কারণ, যে সব চরিত্র সৃষ্টি করবেন তাদের সঙ্গে সহানুভূতিতে

একাত্মক হয়ে যারা অনুভব প্রকাশ করতে পারেন তারাই বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকেন। যিনি উত্তেজিত তিনিই উত্তেজনা সৃষ্টি করতে এবং যিনি ক্রুদ্ধ তিনিই ক্রোধ সৃষ্টি করতে পারেন —অতিজীবন্ত বাস্তবতার সঙ্গে। সুতরাং কাব্য-সৃষ্টির মূলে আছে—**প্রকৃতিদত্ত শক্তি** অথবা **উন্মাদনার আবেশ**। প্রথম ক্ষেত্রে, মানুষ যে-কোন চরিত্রের সঙ্গে একাত্মক হয়ে যেতে পারে, অন্যক্ষেত্রে সে তার নিজের সত্তার বাইরে চলে যায়।

সৃজনী প্রতিভা

কাহিনী সম্বন্ধে বলা যায়, কবি প্রস্তুত কাহিনীই গ্রহণ করুন অথবা **নিজেই প্রস্তুত করে নিন**, প্রথমত কাহিনীর সাধারণ কাঠামোটা এঁকে নেওয়া উচিত, এবং তারপর উপ-কাহিনী যোজনা করা ও কাহিনীর বিস্তার করা উচিত। সাধারণ পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত 'ইফিজিনিয়া'কে দিয়ে দেখান যায়। একটি যুবতী কন্যাকে বলি দেওয়া হয়; যারা তাকে বলি দিতে নিয়েছিল তাদের দৃষ্টি থেকে যে রহস্যময় ভাবে অন্তর্হিত হয়, তাকে নিয়ে যাওয়া হয় একা ভিন্ন দেশে—যেখানে প্রত্যেক বিদেশীকেই দেবতার কাছে সমর্পণ করা হয়। এই কাজে সে নিযুক্ত হয়। কিছুকাল পরে তার ভাই এসে সেখানে উপস্থিত হয়। দৈববাণীই, যে কোন কারণে হোক, তাকে সেখানে যেতে আদেশ দেয়—এ ঘটনা নাটকের সাধারণ পরিকল্পনার বাইরে। আবার তার আসার উদ্দেশ্যও আসল ঘটনা ও ব্যাপারের বাইরে। যা হোক সে আসে, সে ধরা পড়ে এবং ঠিক যখন তাকে বলি দেওয়া হবে সেইক্ষণে সে তার পরিচয় ব্যক্ত করে। প্রত্যভিজ্ঞানের রীতিটি ইউরিপিডিস অথবা পোলিইডাস উভয়ের রীতির মতই হতে পারে! পোলিইডাসের নাটকে সে স্বাভাবিক ভাবেই আর্তনাদ করে—সুতরাং শুধু আমার বোনের ভাগ্যেই নয়, আমার ভাগ্যেও এই বলি লেখা ছিল।—আর এই কথা বলাতেই সে রক্ষা পায়।

অনুকরণবাদ বিরোধী কথা

এর পরে, নামগুলো একবার বসানো হয়ে গেলে, বাকী থাকে কাহিনীর উপধারাগুলি পূরণ করে নেওয়া। আমাদের দেখতে হবে তারা যেন মূল ঘটনার পরিপোষক হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অরিস্টিসের ক্ষেত্রে, যে পাগলামির

জন্যে সে ধরা পড়ে সেই পাগলামি আছে আর আছে শুদ্ধি যাগযজ্ঞ দ্বারা তার মুক্তি। নাটকের উপধারাগুলি ছোট ছোট, কিন্তু এরাই আবার মহাকাব্যের বিশালতা সৃষ্টি করে থাকে। তেমনি, অডিসির গল্পটি সংক্ষেপে এইভাবে বলা যেতে পারে—জনৈক ব্যক্তি বহু বৎসর ধ'রে ঘরছাড়া। পোসিডন তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখে এবং সে নির্জনে পরিত্যক্ত। এই সময় তার ঘরের অবস্থা শোচনীয়—পাণিপ্রার্থীরা তার স্ত্রীকে জ্বালিয়ে মারে এবং তার ছেলের প্রাণনাশ করবার ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে, বহু ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে সে এসে উপস্থিত হয়, কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিতও হয়। নিজের হাতেই পাণি-প্রার্থীদের আক্রমণ করে এবং তাদের মেরে ফেলে কিন্তু নিজে রক্ষা পেয়ে যায়। বৃত্তের এইটুকু হচ্ছে সারাংশ, বাকীটুকু উপধারা।

১৮

প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে দুটি পর্ব আছে—গ্রন্থি-বন্ধন এবং গ্রন্থি-মোচন বা ডিন্যুমেণ্ট॥ আসল ঘটনার সঙ্গে কিছু কিছু অবান্তর ঘটনা যোগ করে অনেকক্ষেত্রেই গ্রন্থি-বন্ধন করা হয়ে থাকে—বাকী অংশ, গ্রন্থিমোচন। '**গ্রন্থি-বন্ধন**' বলতে আমি সেই সমস্ত ব্যাপার বুঝাতে চাই যা ঘটনার আরম্ভ থেকে ভাল বা মন্দ পরিণতির দিকে যাওয়ার মোড় পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে; আর গ্রন্থি-মোচন, ঐ পরিবর্তনের আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত যা ব্যাপ্ত সেই সব ব্যাপার। যেমন, থিওডেক্‌টিসের লীনসিউসে, গ্রন্থিবন্ধন 'হচ্ছে' সেই সমস্ত ঘটনা নিয়ে যা নাটকের জন্য আগেই অনুমান করে নেওয়া হয়েছে—শিশুটিকে আবদ্ধ করা তারপর—গ্রন্থিমোচনের ব্যাপ্তি হত্যার অভিযোগ থেকে শেষ পর্যন্ত॥

ট্রাজেডির শ্রেণী-বিভাগ

ট্র্যাজেডি—চার প্রকার। **যৌগিক** [Complex] যা' সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বিপর্যাস এবং প্রত্যভিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল; **করুণ** [Pathetic] (যেখানে উদ্দেশ্য হৃদয়াবেগ উদ্রেক করা), যেমন এজাক্‌স এবং ইকসিয়োনকে নিয়ে লেখা ট্র্যাজেডিগুলি; **নৈতিক** [Ethical] (যেখানে উদ্দেশ্য কোন নীতি প্রচার করা), যেমন থিওটাইডিস

এবং পেলেউস। চতুর্থ প্রকার—**সরল** (Simple)। এখানে আমরা সেইসব কেবল দৃশ্য-চমৎকার-প্রাণ প্রকার বাদ দিচ্ছি—যার দৃষ্টান্ত রয়েছে—দি ফোরসাইডস্, দি প্রমিথিউস্ এবং হেডিসের দৃশ্যাবলী। সম্ভব হলে কবির উচিত সমস্ত উপাদানের সংযোগ সাধন করতে চেষ্টা করা, অথবা তা' না পারলে, অধিক সংখ্যক এবং প্রধান প্রধান উপাদানগুলির ; বিশেষতঃ আধুনিক কালের অহেতুক দোষদর্শী সমালোচনার সম্মুখে তো তা' করতেই হবে : আগে অন্ততঃ, কবিদের তাঁদের নিজের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রেখেই, দোষ গুণ বিচার করা হয়েছে ; আর আজকালকার সমালোচকরা চান যে, একজনই সকলের নানা দিকের উৎকর্ষকে একাই অতিক্রম করে যাবে।

কোন ট্র্যাজেডি (সৃষ্টি হিসাবে) এক বা পৃথক কিনা এ বিচারে বড় প্রমাণ হচ্ছে—বৃত্ত। সেখানেই ঐক্য যেখানে গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচন এক। অনেক কবি গ্রন্থি আঁটতে পারেন ভাল কিন্তু গ্রন্থিমোচন করেন খারাপ। দুটো কৌশলেরই উপরে অবশ্য সমানভাবে দখল রাখতে হবে।

তারপর, যে কথাটা অনেকবার বলা হয়েছে সে কথাটা কবিকে মনে রাখা উচিত—ট্র্যাজেডিকে মহাকাব্যের মত গঠন করা উচিত নয়। মহাকাব্যের গঠন বলতে, একাধিক বৃত্ত যুক্ত গঠন বুঝায়। দৃষ্টান্ত ধর, যেন সমগ্র ইলিয়াডের কাহিনী নিয়ে তোমাকে একখানি ট্র্যাজেডি রচনা করতে হবে। মহাকাব্যে, দৈর্ঘ্য থাকে বলে, প্রত্যেক অংশই তার উপযুক্ত আয়তন লাভ করতে পারে। নাটকে কবির এ প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। প্রমাণও আছে—যে সকল কবি, ইউরিপিডিসের মত একটা বিশেষ অংশ নির্বাচন না করে, ট্রয়ের পতনের সমগ্র কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন, অথবা এইস্কিলাসের মত "নিওবে"র কাহিনীর একাংশ অবলম্বন না করে সমগ্র কাহিনী গ্রহণ করেছেন, অভিনয়ের দিক দিয়ে তাদের নাটক হয় একেবারেই নিষ্ফল হয়েছে অথবা খুব কমই সাফল্যলাভ করেছে। এমন কি "এগাথোন্" (Agathon) শোনা যায়, এই একটিমাত্র কারণেই তেমন সফল হতে পারেননি। অবশ্য, পরিস্থিতি বিপর্যাস-ব্যাপারে তিনি জনসাধারণের রুচি তৃপ্ত করতে, নৈতিক বোধকে

তৃপ্ত করে ট্র্যাজেডি সংবিৎ সৃষ্টি করতে অদ্ভুত কলাকৌশল দেখিয়েছেন। এই সংবেদনা সৃষ্টি করেছেন তিনি "সিসাইফাসের" মত চতুর শয়তানকে বোকা বানিয়ে দিয়ে, অথবা দুঃসাহসী শয়তানকে পরাজিত করে। এগাথোনের সম্ভাব্যের যে ধারণা তাতে এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়।

তিনি বলেন—এও সম্ভব যে এমন অনেক কিছু ঘটতে পারে যা সম্ভাব্যের বিরুদ্ধ।

সমবেত গীতকেও অন্যতম পাত্র বলে মনে করতে হবে। তাকে সমগ্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে হবে। এবং তা' নাটকীয় ঘটনায় অংশ গ্রহণ করবে—ইউরিপিডিস যে ভাবে করিয়েছেন সেভাবে নয়, সফোক্লিসের ভাবে। পরবর্তী কবিদের মধ্যে দেখা যায় তাঁদের সমবেত গীত, প্রস্তুত নাটকের বিষয়ের সঙ্গে যত, তত অন্য ট্র্যাজেডির বিষয়ের সঙ্গেও কম সম্পর্কিত। সুতরাং তাদের গান করা হয়—'বিরাম গীতির' মত; এই প্রথাটা প্রথম এগাথোন চালু করেন। এই ধরনের বিরামপূরক সমবেত-গীত যোজনা করার এবং এক নাটক থেকে অন্য নাটকে একটা সংলাপ বা সমগ্র একটা অঙ্ক তুলে নিয়ে বসিয়ে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কী ?

১৯

ট্র্যাজেডির অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে—বাকী আছে **বাচন** ও **চিন্তার** আলোচনা। **চিন্তা** সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তাই ধরে নিতে পারি, কারণ বিষয়টি ঐ শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। বচন দ্বারা যে সব ব্যাপার সৃষ্টি করা হবে চিন্তার মধ্যে তাদের প্রত্যেকটি অন্তর্ভুক্ত—এর উপবিভাগ :—প্রমাণ ও খণ্ডন, শোচনা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি ভাব সমূহের উদ্দীপন, গুরুত্বের বা তদ্‌বিপরীতের ব্যঞ্জনা। এখন, যেখানে উদ্দেশ্য শোক, ভয়, গুরুত্ব বা সম্ভাব্যের বোধ জাগানো, সেখানে, নাটকীয় ঘটনাগুলিকে যে, নাটকীয় সংলাপকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয় সেই একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে, এ তো খুবই স্পষ্ট কথা।

পার্থক্য শুধু এই যে, ঘটনাগুলি নিজেরাই, কোন কথা না বলেই তাদের

যা' বলার তা' বলবে ; আর বচন দিয়ে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হবে তা, করবে কোন বক্তা এবং করবে তা ভাষা দিয়েই। কারণ বক্তার যা কথা তার ধার না ধেরেই যদি চিন্তা ব্যক্ত হতে পারতো, তা হলে বক্তার আর কি কাজ ?

তারপর বাচনের (Diction) কথা। এই জিজ্ঞাসার এক শাখার বিষয়—আবৃত্তি-রীতি। কিন্তু জ্ঞানের এই বিভাগটি, বক্তৃতা-কলার অন্তর্গত এবং বক্তৃতাবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের আয়ত্ত। এর মধ্যে আছে,—আদেশ, প্রার্থনা, বিবৃতি, শাসানি, প্রশ্ন, উত্তর প্রভৃতির লক্ষণ নিরূপণ। এ সব জানা অথবা না জানা কবির কলা-কৌশলের পক্ষে কোন দোষ নয়। প্রোটাগোরাস যে হোমারের উপর দোষ চাপিয়েছেন, যে তিনি—'গাও দেবী ক্রোধের কথা' এই কথা বলে, প্রার্থনা জানাতে গিয়ে আদেশ করে বসেছেন—এ দোষ কে স্বীকার করবে ? 'কাউকে কিছু করতে বলা বা না বলা—তিনি বলেন—আদেশের ব্যাপার। সুতরাং এই জিজ্ঞাসা ঠিক কাব্যের নয় অন্য কলার, এই জন্য আমরা একে বাদ দিয়ে যেতে পারি।

২০

ভাষাকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত প্রকরণে ভাগ করা যায়—বর্ণ, অক্ষর, অন্বয়ীশব্দ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিভক্তি, বাক্য বা বাক্যাংশ।

* **বর্ণ**—একটা অবিভাজ্য ধ্বনি, অবশ্য ধ্বনিমাত্রই নয় শুধু সেই ধ্বনি যা ধ্বনিসমষ্টির অংশ হিসাবে প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ পশুরাও অবিভাজ্য ধ্বনি উচ্চারণ করে ; তাদের কোনটিকে আমি বর্ণ বলছি না। যে বর্ণের কথা আমি বলছি তা' স্বর বা অর্দ্ধস্বর বা ব্যঞ্জন এই তিন রকম হতে পারে। স্বরবর্ণ—সেই সব ধ্বনি যা জিহ্বা বা ওষ্ঠের সাহায্য ছাড়াই উৎপন্ন হতে পারে। অর্দ্ধস্বর সেই ধ্বনি যা ঐরূপ কোন সাহায্যে উচ্চারিত হয়, যেমন "এস্" এবং "আর্"। ব্যঞ্জনবর্ণ—সেই সব ধ্বনি, যারা ঐরূপ কোন সাহায্য সত্ত্বেও নিজেরা উচ্চারিত হতে পারে না কিন্তু স্বরবর্ণের যোগে উচ্চারণ সম্ভব হয় ; যেমন "জি" এবং "ডি"।

উৎপত্তিস্থান এবং মুখাকৃতি অনুসারে, ঘোষ বা অঘোষ, হ্রস্ব বা দীর্ঘ, মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণ বা মধ্যপ্রাণ, এইভাবে তাদের মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়েছে। এর সবিস্তার আলোচনা ছন্দোবিদের ব্যাপার।

***অক্ষর**—ব্যঞ্জন ও স্বরের সংযোগে উৎপন্ন অনর্থক শব্দ যেমন 'গ্‌্' (GR) 'এ' (A) স্বরবর্ণ-হীন একটি অক্ষর, তেমনি 'এ'-যুক্ত হলেও 'গ্রে' (GRA) অক্ষর। কিন্তু, এই সকল পার্থক্যের বিচারও ছন্দোবিজ্ঞানের বিষয়।

*** অন্বয়ীশব্দ**—হচ্ছে সেই অর্থহীন শব্দ যা বহুধ্বনির সংযোগে সান্বয় শব্দ গঠনে, কারণ বা বাধা কোনটাই হয় না। এরা বাক্যের আদিতে, অন্তে বা মধ্যে যে-কোন স্থানেই বসতে পারে—অথবা সেই নিরর্থক শব্দ যা' সার্থক কতকগুলি ধ্বনি থেকে অর্থযুক্ত কোন শব্দগঠনে সক্ষম—যেমন amphi, perhi প্রভৃতি। অথবা সেই নিরর্থক পদ যা বাক্যের সূচনা, শেষ অথবা বাক্যবিভাগ দ্যোতনা করে—অবশ্য, বাক্যারম্ভে এ ঠিক নিজে একা বসতে পারে না—যেমন men etoe, de

*** বিশেষ্য** (Noun) যৌগিক সার্থক শব্দ যা কাল বুঝায় না, এর কোন অংশ নিজে অর্থযুক্ত নয়। কারণ, দ্বৈত বা যৌগিক শব্দে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অংশকে স্বতন্ত্র অর্থ-মর্যাদা দিইনা, যেমন থিওডোরাসে, 'দেব-দত্ত' dorhon বা দত্ত কোনটি একা অর্থসম্পূর্ণ নয়।

*** ক্রিয়া** যৌগিক সার্থক শব্দ, যা কাল বুঝায় এবং যাতে বিশেষ্যের মত, কোন একটি অংশ একা সার্থক নয় কারণ 'মানুষ' বা 'শ্বেত' বল্লে, 'কথন'-এর ধারণা জন্মে না কিন্তু 'সে চলে' বা 'সে চলেছে' বল্লে বর্তমান বা অতীত ক্রিয়ার কালটি বুঝায়।

*** বিভক্তি বা প্রত্যয়** (Inflexion)—বিশেষ্য এবং ক্রিয়া উভয়ত্র প্রযুক্ত হয় এবং 'এর' (of) প্রতি (to), প্রভৃতি সম্বন্ধ বুঝায়, অথবা সংখ্যার একত্ব বা বহুত্ব বুঝায়, যেমন মানুষ বা মানুষগুলি, অথবা বাক্যোচ্চারণে বিশেষ অভিপ্রায় বা স্বর বুঝায়, যেমন—প্রশ্ন অথবা আদেশ। "সে কি গিয়েছিল ?" এবং "যাও"—এই ধরণের ক্রিয়া বিভক্তি।

* **বাক্য বা বাক্যাংশ**—যৌগিক সার্থক শব্দ-সমষ্টি যার কোন কোন অংশ অন্ততঃ নিজেরাই অর্থযুক্ত; তবে প্রত্যেক পদসমুচ্চয়ই যে ক্রিয়া এবং বিশেষ্য দিয়ে গঠিত, তা নয়, দৃষ্টান্ত যেমন—"মানুষের সংজ্ঞা"—ক্রিয়া না থাকলেও বাক্য হতে পারে। অবশ্য তাতে তাৎপর্যবোধক কিছু থাকবেই, যেমন—"ভ্রমণেতে" অথবা; 'ক্লিওনের পুত্র ক্লিয়োন'। দুই ভাবে বাক্য বা বাক্যাংশ-ঐক্য-ধর্মযুক্ত হতে পারে—এক, একই বিষয়ের প্রকাশক হয়ে অথবা বহু অংশ সংযুক্ত হয়ে।

যেমন নানা অংশের সংযোগে ইলিয়ড এক বাক্যসমুচ্চয় এবং প্রকাশ্য বিষয়ের ঐক্যে—"মানুষের সংজ্ঞা" এক।

২১

শব্দ দুই প্রকার—একক (simple) ও যুগল (double)। "একক" বলতে আমি বুঝি সেই সব শব্দ যারা নিরর্থক উপাদান দ্বারা গঠিত, যেমন ge। 'যুগল' বা 'যৌগিক' বলতে বুঝায়—যারা একটি সার্থক ও একটি নিরর্থক উপদান দ্বারা (যদিও গোটা শব্দের মধ্যে কোন উপাদানই একা সার্থক নয়) অথবা দুটিই সার্থক উপদান দ্বারা গঠিত। এইভাবে শব্দ, গঠনে ত্রিতয়ক, চতুষ্টয়ক বা বহুসংখ্যক হতে পারে; যেমন হয়েছে ম্যাসিলীয় উক্তিগুলি—যেমন 'হার্মো-কেইকো জ্যাস্থাস' = যিনি পরমপিতা জিউসের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

প্রত্যেক শব্দ 'প্রচলিত' অথবা 'অপ্রচলিত' অথবা রূপক, অথবা আলঙ্কারিক, অথবা নতুন-তৈরী-করা অথবা সম্প্রসারিত বা সঙ্কুচিত অথবা পরিবর্তিত।

'প্রচলিত' বা 'দেশী' শব্দ বলতে আমি বুঝাতে চাই তাদের যারা কোন দেশের লোকের মধ্যে সচরাচর চলিত আছে। অপ্রচলিত শব্দ—ভিন্ন দেশের শব্দ। সুতরাং বলা বাহুল্য, একই শব্দ একই সঙ্গে অপ্রচলিত ও চলিত হ'তে পারে, তবে একই দেশের লোকের কাছে অবশ্য নয়।

Sigynon শব্দটি 'বর্শা' সাইপ্রিয়ানদের কাছে প্রচলিত শব্দ, কিন্তু আমাদের কাছে অপ্রচলিত।

রূপক হচ্ছে, সামান্য থেকে বিশেষে বা বিশেষ থেকে সামান্যে বা বিশেষ থেকে বিশেষে ধর্মের আরোপ করে অথবা উপমা অর্থাৎ সঙ্গতি ও সাদৃশ্য দ্বারা, নতুন প্রয়োগ সৃষ্টি করা। সামান্যের বিশেষ প্রয়োগ, যেমন—ওখানে আমার জাহাজখানি আছে (lies), কারণ নোঙর করে থাকা (lying at anchor) থাকার (lying) বিশেষ রূপ।

বিশেষ থেকে সামান্যে যেমন—"দশ সহস্র মহৎকার্য অডিসিউস নিশ্চয় করেছেন।" এখানে দশসহস্র অসংখ্য সংখ্যারই 'বিশেষ' এবং 'অসংখ্য' সংখ্যা অর্থে প্রযুক্ত। বিশেষ থেকে বিশেষে যেমন—ব্রোঞ্জের অস্ত্র দিয়ে প্রাণ বের করে নিল এবং অদম্য ব্রোঞ্জের জাহাজ দিয়ে জলকে দুখণ্ডে চিরে ফেল্‌ল। এখানে arhusae মানে 'বের করে নেওয়া'র স্থলে tamin ব্যবহৃত হয়েছে এবং tamin স্থলে arhusae। এর প্রত্যেকেই বের-করে-নেওয়া ক্রিয়ারই বিশেষ প্রকার। উপমিতি বা অনুপাত হয়, যখন প্রথম বাচ্যের সঙ্গে দ্বিতীয়ের সাদৃশ্য, তৃতীয়ের সঙ্গে চতুর্থের সাদৃশ্যের অনুরূপ হয়। সে ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয়ের স্থলে চতুর্থ, অথবা চতুর্থের স্থলে দ্বিতীয়কে প্রয়োগ করতে পারি। অনেক সময় যে বিশেষ শব্দটির সঙ্গে বিশেষ্য পদটির সাপেক্ষতা আছে সেই শব্দটি যোগ করে রূপককে আমরা ব্যাখ্যা করে থাকি যেমন,—এরেস্ (Ares) এর পক্ষে যেমন ঢাল, ডাওনিসাসের পক্ষে তেমনি "পেয়ালা" সুতরাং 'পেয়ালা'টিকে বলা যেতে পারে 'ডাওনিসাসের ঢাল, এবং ঢালকে বলা যায়—এরেসের "পেয়ালা"। অথবা আবার জীবনের পক্ষে যেমন বার্ধক্য, দিনের পক্ষে তেমনি সন্ধ্যা। সুতরাং "সন্ধ্যা'কে 'দিনের বার্ধক্য' এবং 'বার্ধক্য'কে "জীবনের সন্ধ্যা" অথবা এম্পিডোকলসের ভাষায়—জীবনের অস্তায়মান সূর্য বলা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্যবোধক শব্দ উহ্য থাকে, তথাপি সেখানেও রূপক থাকে। যেমন, বীজ ছড়ানোকে 'বপন' বলা হয়, কিন্তু সূর্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়া ব্যাপারটির কোন নাম নেই, তথাপি বীজের পক্ষে যেমন

বপন-ক্রিয়ার সূর্যের পক্ষে তেমনি এই বিকীরণ-ক্রিয়ার সাদৃশ্য; সুতরাং কবির উক্তিতে পাওয়া যায়—"ঈশ্বর সৃষ্ট আলোকের বপন।"

অন্য এক উপায়ে এই জাতীয় রূপক প্রযুক্ত হতে পারে। আমরা একটা নতুন শব্দ ব্যবহার করতে পারি, এবং পরে, সেই শব্দের কোন একটি অর্থ-শক্তি অস্বীকার করতে পারি; যেন "ঢাল"কে আমরা 'এরেসের পেয়ালা" না বলে বল্‌লাম—"মদবিহীন পেয়ালা" < আলঙ্কারিক শব্দ >

"নতুন-তৈরী-করা" শব্দ হচ্ছে সেই শব্দ যা' লোকের কথাবার্তায় আগে ব্যবহৃত হয়নি; কবি নিজে যা'কে নতুন প্রয়োগ করেছেন। এরূপ কয়েকটি শব্দ—যেমন ernuges 'শৃঙ্গ' স্থলে kerata = অঙ্কুরোৎপাদক, এবং areter পুরোহিত স্থলে hiereus প্রার্থনাকারী।

* শব্দ সম্প্রসারিত হয় যখন তার নিজেরই হ্রস্ব স্বরের বদলে দীর্ঘ স্বর প্রয়োগ করা হয় অথবা যখন একটি নতুন অক্ষর যোজনা করা হয়। আর শব্দের সঙ্কোচন ঘটে তখন যখন তার কোন একটা অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত—po'leos স্থলে poleo's, peleiadeo স্থলে pelei'dou' সঙ্কোচনের দৃষ্টান্ত ;kri do, ops এবং mia ginetae amphotiron o'ps

* পরিবর্তিত শব্দ—সেই শব্দ যা'তে শব্দের স্বাভাবিক রূপের একাংশ অপরিবর্তিত এবং একাংশ পরিবর্তিত হয়; যেমন dexiteron kata mexonএ dexion স্থলে dexiteron।

[বিশেষ্যরা আবার হয় পুংলিঙ্গ, বা স্ত্রীলিঙ্গ, অথবা ক্লীবলিঙ্গ। পুংলিঙ্গের শেষে থাকে (n)=(r) (s), অথবা *s*-যুক্ত কোন বর্ণ অন্তে থাকে—সে বর্ণ ps এবং x। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্বর দীর্ঘ যেমন e ও o অথবা সেই সব স্বর যার দীর্ঘীভবন সম্ভব—যেমন *a*। পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্ত্যবর্ণের সংখ্যা একই—কারণ ps এবং x 'স-যুক্ত' অন্ত্যবর্ণের সমান। সাধারণতঃ কোনও বিশেষ্যই ব্যঞ্জনে বা হ্রস্ব স্বরে শেষ হয় না। কেবলমাত্র তিনটির অন্তে থাকে—i—meli, kommi, peperi : পাঁচটির অন্তে থাকে u। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের অন্তে থাকে এই শেষের দু'টি স্বর, আর n এবং s।

২২

আদর্শ রীতি হচ্ছে তাই যা খুব স্পষ্ট অথচ হেয় (গ্রাম্য) নয়। স্পষ্ট রীতিতে শুধু প্রচলিত বা সুষ্ঠু শব্দ প্রযুক্ত হয়; এ রীতি হেয় হয়েও যেতে পারে—ক্লিওফোনের এবং স্থেনেলাসের কাব্য দেখ। অন্যপক্ষে সেই রচনাশৈলী ওজোগুণসম্পন্ন এবং সাধারণের বোধ শক্তির উর্ধ্বে, যা'তে অপ্রচলিত প্রয়োগ থাকে। 'অপ্রচলিত' বলতে বুঝাতে চাই—কদাচিৎ-প্রযুক্ত রূপক, সম্প্রসারিত প্রভৃতি ধরনের শব্দ—এক কথায় যা' স্বাভাবিক বাগ্‌ভঙ্গী থেকে পৃথক। তবে ঐ ধরনের শব্দ নিয়ে যে রীতি গঠিত, তা' হয় একটা প্রহেলিকা নতুবা দুর্বোধ্য সংকেত হয়ে দাঁড়ায়। প্রহেলিকা হয়ে উঠে যখন রূপকময় হয়, আর দুর্বোধ্য সংকেত হয় যখন অপ্রচলিতশব্দময় হয়। প্রহেলিকার ধর্ম হচ্ছে—অসম্ভব রূপ-কল্পনার মাধ্যমে সত্য ঘটনাকে প্রকাশ করা; সাধারণ শব্দের সমাবেশ করে এ করা তো সম্ভব নয়,—সম্ভব রূপক প্রয়োগ করে প্রকাশ করা। প্রহেলিকার দৃষ্টান্ত যেমন এই—দেখলাম একটা লোককে যে আর একটা লোকের দেহে আগুনের তাপ লাগিয়ে শিরিষ দিয়ে ব্রোঞ্জ এঁটে দিচ্ছে এবং এই ধরনের আরো সব উক্তি। যে রীতিতে অপ্রচলিত (বা দুর্লভ) শব্দ বেশী, সেই রীতি—দুর্বোধ্য (সাংকেতিক)। রচনারীতির জন্য, অবশ্য, এই সব উপকরণের সংমিশ্রণ আবশ্যক; কারণ অপ্রচলিত (বা দুর্লভ) শব্দ, রূপক, আলঙ্কারিক এবং উল্লিখিত অন্যান্যজাতিয় শব্দ, রীতিকে অতি সাধারণ ও হেয় স্তর থেকে উন্নততর স্তরে তুলে দেবে আর সুষ্ঠু শব্দের প্রয়োগ একে স্পষ্ট করে তুলবে। কিন্তু রীতির স্পষ্টতা যা' অতিসাধারণ থেকে বহু দূরে—তা' সৃষ্টি করতে সম্প্রসারণ, সঙ্কোচন এবং শব্দ-পরিবর্তের চেয়ে আর-কিছুই বেশী সহায়ক নয়। প্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গী থেকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরে গিয়ে, ভাষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হ'য়ে উঠবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত প্রয়োগের সঙ্গে আংশিক ঐক্য থাকায় প্রসাদগুণ বৃদ্ধি করবে। সুতরাং সেই সকল সমালোচকরা ভুল করেন যাঁরা ভাষা-প্রয়োগের এই স্বাধীনতাকে নিন্দা করেন এবং গ্রন্থকারকে এজন্য উপহাস করেন। এইজন্য, বৃদ্ধ ইউক্লিড ঘোষণা করেছিলেন যে,

ইচ্ছামত অক্ষরগুলো বাড়াতে পারলেই কবি হওয়া সহজ ব্যাপার। তাঁর নিজের রীতিতে তিনি ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গ ক'রেছিলেন—

যেমন এই পংক্তিটিতে Epicharen idon Maraathona´de badixonta.

অথবা uk a'n g ethamenos ton ekeinou elle´boron

এই অধিকারটুকু জিদ করে প্রয়োগ করতে যাওয়া, নিঃসন্দেহে হাস্যকর। কিন্তু যে কোন রূপ কাব্য-রীতিই হো'ক, তা'তে সংযম দরকার। এমন কি রূপক, অপ্রচলিত (বা দুর্লভ) শব্দ অথবা ঐরূপ কোন বাক্‌-রীতি, অসঙ্গতভাবে অথবা হাস্যকর করবার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রয়োগ করলে, একই ফল দেবে। সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারলে যে কী পৃথক ফল পাওয়া যায়, তা' মহাকাব্যের মধ্যে সাধারণ রীতির পংক্তি বসালেই বুঝা যায় তেমনি, আবার, আমরা যদি অপ্রচলিত (বা দুর্লভ) শব্দ, রূপক অথবা অনুরূপ কোন প্রয়োগ-রীতি ধরি এবং তার বদলে প্রচলিত বা সুষ্ঠু শব্দ বসাই, আমাদের কথার সত্যতা স্পষ্ট বুঝা যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এইস্‌কিলাস্‌ এবং ইউরিপিডিস উভয়েই একই 'আয়াম্বিক' ছন্দে রচনা করেছিলেন। কিন্তু ইউরিপিডিস্‌ যিনি প্রচলিত অপেক্ষা অপ্রচলিত শব্দ বেশী ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর কোন-একটি শব্দ বদলে দিলে, কোন পংক্তি হয়ত সুন্দর হয়, কোনটি লঘু হয়ে যায়। এইস্‌কিলাস তাঁর ফিলোক্‌-টেটিস্‌-এ বলেন—phage´daine<d>e mou sarhkas esthiei podos ইউরিপিডিস thoinatai 'ভক্ষণ করেন' স্থলে esthiei ভোজন করেন বসিয়েছেন। তারপর এই পংক্তিতে nun de´ m' eon oligos te kai utidanos kai aeikes এইরূপ সাধারণ শব্দ প্রয়োগ করলেই পার্থক্যটা বুঝা যাবে—nun de´ m' eon mikthos te kie asthenikos kai aeides অথবা যদি dithrhon aeikelion katatheis oligen te trapexan এর স্থলে আমরা dithron mochtheron katatheis mikaran te trapexan পড়ি eiones bo'osin, স্থলে eiones kraxousin

তারপর, এরিফ্রেডিস, সাধারণ কথাবার্তায় যে সব বচন ব্যবহৃত হয় না

সেইসব প্রয়োগ করার জন্য ট্র্যাজেডি-লেখকদের উপহাস করেছেন; যেমন দৃষ্টান্ত :—a'po domaton এর পরিবর্তে domton, apo sethen, ego de nin, peri Achilleos এর পরিবর্তে Achilleos perhi এমনি আরো। এইসব বচন প্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গীর অন্তর্গত নয় ব'লেই, এরা রীতির বিশিষ্টতাই ব্যক্ত করে। এটা অবশ্য তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে।

যেমন যৌগিক শব্দের, অপ্রচলিত (বা দুর্লভ) শব্দের এবং অন্যান্য শব্দের প্রয়োগে, তেমনি নানা রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা বড় কথা। কিন্তু সব চেয়ে যেটা বড় কথা সে হচ্ছে রূপক প্রয়োগের দক্ষতা। এটাই কেবল অন্যের কাছ থেকে শেখা যায় না। এটাই প্রতিভার লক্ষণ, কারণ ভাল উপমা-রূপক রচনা করতে হলে সাদৃশ্য দেখার চোখ থাকা চাই।

এই নানারকম শব্দের মধ্যে যৌগিক শব্দ "ডিথাইরাম্বের", অপ্রচলিত শব্দ 'হিরোইক পোয়েট্রি'র (মহাকাব্য) এবং রূপকাদি 'আয়াম্বিকে'র উপযোগী। অবশ্য 'হিরোইক পোয়েট্রি'তে সবরকম শব্দেরই প্রয়োগের অবকাশ আছে। কিন্তু 'আয়াম্বিক' ছন্দের রচনায়, যথাসম্ভব পরিচিত (কথ্য?) ভাষা থাকে ব'লে, সবচেয়ে উপযোগী শব্দ তারাই যাদের সচরাচর, এমন কি গদ্যে পাওয়া যায়। অর্থাৎ—প্রচলিত, রূপক, আলঙ্কারিক প্রভৃতি সব।

ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে এবং 'সাক্ষাৎ-ক্রিয়ার-মাধ্যমে অনুকরণ' সম্বন্ধে এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

২৩

যা বর্ণনাত্মক-রীতিতে রচিত এবং যা একবৃত্তময়, সেই কাব্যিক অনুকরণ সম্বন্ধে বলা যায়—কাহিনীটি, ট্র্যাজেডির মত, স্পষ্টভাবেই নাটকীয় সূত্রানুসারে গঠন করতে হবে। এর বিষয়বস্তু হবে এমন একটি ঘটনা যা একক, অখণ্ড ও সম্পূর্ণ—যা'তে থাকবে আরম্ভ, মধ্য ও অন্ত্য সন্ধি। এককতার দিক দিয়ে এ হবে একটা জীবন্ত জীবদেহের মতো এবং সেই আনন্দই সৃষ্টি করবে যা হবে তার স্বভাব-অনুরূপ। ঐতিহাসিক রচনার গঠন থেকে এর গঠন এখানেই পৃথক হবে যে ঐতিহাসিক রচনা স্বভাবতই একক কোন ঘটনাকে

নয়, একটি যুগকে রূপ দেয় এবং রূপ দেয় সেই যুগের এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে সেইসব ঘটনাদের—যাদের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের যোগ কমই থাকে। যেমন, সালামিসের জলযুদ্ধ এবং সিসিলিতে কার্থেজবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ একই সময়ে ঘটেছিল, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তো এক নয়। তাই, ঘটনা-পারম্পর্যে একের পর অন্য ঘটনা ঘটে বটে, কিন্তু সবক্ষেত্রে এক পরিণাম সৃষ্টি করে না। আমরা বলতে পারি,—অনেক কবির মধ্যেই এই ধরণের প্রয়োগ বিধি দেখা যায়। আবার এই বিষয়েই, কিন্তু, আগেও যা বলা হয়েছে, হোমারের অপরূপ উৎকর্ষের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কখনও ট্রয়-যুদ্ধের সমগ্রটুকু বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেননি—যদিও সেই যুদ্ধের একটা আদি বা অন্ত রয়েছে। তা করলে—বিষয়বস্তু অতি বিশাল হয়ে পড়তো এবং একদৃষ্টির পরিধির মধ্যে রাখা অসম্ভব হতো। আবার যদি তিনি একে সংযমনীয় সীমার মধ্যেও রাখতেন, তা'হলেও, নিশ্চয়ই তা ঘটনা-বাহুল্যে জটিল হয়ে দাঁড়াত। এই কারণেই, তিনি বিশিষ্ট একটি অংশকে পৃথক করে নিয়েছেন এবং তারই মধ্যে যুদ্ধের নানা কাহিনী, উপকাহিনী হিসাবে প্রবেশ করিয়েছেন—যেমন, যুদ্ধজাহাজ এবং অন্যান্য বিষয়ের তালিকা—তথা কাব্যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ করেছে। অন্য সব কবিরা, একটি সমগ্র ব্যক্তিকে সমগ্র একটি যুগকে অথবা বহু অংশযুক্ত অথচ স্বরূপতঃ একক ঘটনাকে অবলম্বন করে থাকেন। সাইপ্রিয়া'র এবং 'লিটিল ইলিয়াড'-এর লেখক এরূপই করেছেন। আর এই কারণেই যেখানে ইলিয়াড এবং অডিসি প্রত্যেকটিতে শুধু একখানির অথবা অন্ততঃ দুখানি ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু পাওয়া যায়, সেখানে সাইপ্রিয়ায় পাওয়া যায় অনেকগুলি এবং "লিটিল ইলিয়ড"-এ পাওয়া যায় আটখানি ট্র্যাজিডির—বিষয়বস্তু—অস্ত্রপ্রদান, দি ফিলোকটিটিস্, নিওপ্‌টোলেমাস, ইউরিপিলাস, সন্ন্যাসী অডিসিউস, ল্যাকোনার নারী, ইলিয়ামের পতন, রণপোত বাহিনীর প্রস্থান।

২৪

তারপর, মহাকাব্যও—ট্র্যাজেডির যত প্রকার, তত প্রকারে বিভক্ত। একেও, সরল অথবা জটিল, অথবা নৈতিক অথবা করুণ এদের একটা হতেই হবে। উপাদানও দৃশ্য এবং সংগীত বাদে একই। কারণ এতেও ঘটনা বিপর্যাস, প্রত্যভিজ্ঞান এবং দুঃখ-দুর্ভোগের দৃশ্য আবশ্যক। অধিকন্তু, ভাবনা ও রচনা-রীতি, খুব শিল্প-রুচির হওয়া চাই। এই সমস্ত বিষয়ে হোমার আমাদের আদি এবং যথেষ্ট আদর্শ। বস্তুতঃ, তাঁর কাব্যের দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। ইলিয়াড একাধারে সরল এবং করুণ, আর অডিসি একাধারে জটিল (কারণ প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাপার কাহিনীতে অনেক কাছে) এবং নীতি-মুখ্য। অধিকন্তু, রচনানীতিতে এবং ভাবনা-গৌরবে কাব্যগুলি অদ্বিতীয়।

ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যর পার্থক্যগঠন আয়তনে এবং ছন্দে। আয়তন বা দৈর্ঘ্য বিষয়ে, পূর্বেই আমরা বাঞ্ছনীয় মাত্রা নির্দেশ করে এসেছি —আদি ও অন্ত যেন এক দৃষ্টি-গ্রাসে গ্রাহ্য হয়।

এই সর্তটি, প্রাচীন মহাকাব্য অপেক্ষা অল্পতর আয়তনের কাব্যেই বেশী রক্ষিত হবে এবং যে সব ট্র্যাজেডির উপস্থাপনা এবং অধিবেশনেই সম্ভব, সেই সকল ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মহাকাব্যের অবশ্য, আয়তন বৃদ্ধি করবার এক মহান—এক বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং তার কারণও আমরা দেখতে পাই। ট্র্যাজেডিতে আমরা একই-সময়ে-ঘটিত ঘটনার ননাদিক অনুকরণ করতে পারিনে। মঞ্চের ঘটনাটুকুর এবং অভিনেতাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। কিন্তু মহাকাব্যে, বর্ণনাত্মক রীতিতে তা' লিখিত বলে, যুগপৎ যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাদের সমস্তকেই রূপ দেওয়া যায় এবং সেই সব ঘটনা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হলে, কাব্যের বিশালত্ব এবং মহত্ত্ব বৃদ্ধি করে। মহাকাব্যের এখানে এক মহা সুবিধা আছে—এবং এই সুবিধাই আবেদনের মহিমা সৃষ্টি করে, শ্রোতার চিত্তে আনন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এবং নানা উপকাহিনী এনে কাহিনীর একঘেঁয়েমি দূর করে।

একই রকমের ঘটনা, দেখতে-না-দেখতে একঘেঁয়ে হয়ে উঠে এবং এই কারণে ট্র্যাজেডি অভিনয়ে মার খেয়ে যায়।

ছন্দের সম্বন্ধে বলা যায়, 'হিরোয়িক' মাত্রার ছন্দ অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় নিজের উপযুক্ততা প্রমাণ করেছে। বর্ণনা-রীতিক কাব্য আজ যদি অন্য ছন্দে বা একাধিক ছন্দে রচনা করা হয়, তাহলে তা অসঙ্গত বলে মনে হবে। কারণ ছন্দের মধ্যে—'হিরোয়িক' সর্বাপেক্ষা 'রাজবদুন্নত' (stateliest) এবং সর্বাপেক্ষা স্থাপত্য-ধর্মী। এই কারণেই এতে অপ্রচলিত শব্দ এবং রূপকাদি সহজেই স্থান পায়; আর এই একটি বিষয় 'যা' বর্ণনারীতিক অনুকরণের বিলক্ষণ একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যপক্ষে 'আয়াম্বিক' এবং 'ট্রোকায়িক' ত্রিমাত্রিক উদ্দীপক ছন্দ—শেষেরটি নৃত্যের অনুগামী, আগেরটি—ক্রিয়া-দ্যোতক। নানা ছন্দকে মিশিয়ে ফেলা খুবই আজগুবি ব্যাপার—চেইরিমন যেমনটি ক'রেছিলেন।

এই কারণেই, 'হিরোয়িক' ছন্দ ছাড়া অন্য ছন্দে, কেউ বড় আয়তনের কোন কাব্য রচনা করেননি। যে কথা আগেই বলা হ'য়েছে—প্রকৃতি নিজেই উপযুক্ত ছন্দের নির্বাচন শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

হোমার সব বিষয়েই অনবদ্য এবং তিনি সেই একমাত্র কবি যিনি, নিজে কি অংশ গ্রহণ করবেন তা' ঠিক বুঝতে পারেন। কবির নিজের মুখে যথাসম্ভব কম কথা বলা উচিত। এ করবার জন্য তো তিনি কবি নন। অন্যান্য কবিরা সমস্তক্ষণ নিজেদেরই উপস্থিত রাখেন এবং সামান্য সামান্য বরং খুব কদাচিৎ অনুকরণ করেন। হোমার কয়েকটি কথায় মুখবন্ধ করেই কোন নর বা নারী বা অন্য পাত্র-পাত্রী উপস্থিত করেন। তাদের কারো বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যের অভাব নেই—প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চরিত্র।

ট্র্যাজেডিতে বিস্ময়জনক উপাদান আবশ্যক। বিস্ময়জনকের কার্যকারিত্ব প্রধানত নির্ভর করে—অবিশ্বাস্যের উপরে (irrational) এবং মহাকাব্যেই তার প্রয়োগের অবকাশ বেশী। কারণ সেখানে কার্য-ব্যাপৃত ব্যক্তিরা অদৃশ্য। যেমন, হেক্‌টরের পশ্চাদ্ধাবন, রঙ্গমঞ্চে দেখাতে গেলে হাস্যোদ্দীপক হয়ে উঠবে—গ্রীকরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, তা'তে যোগদান করছেনা

এবং একিলিস্‌ তাদের হটিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু মহাকাব্যে এই অসঙ্গতি চোখে পড়ে না। এখানে, বিস্ময়জনক চিত্তাকর্ষক ঃ—কারণ এর থেকেই বুঝা যায় যে প্রত্যেকে একই কাহিনী বলছেন—নিজের কথা যোগ করে করে এবং তা' এই মনে করেই যে তাঁর শ্রোতারা তাই চান। হোমারই প্রধানতঃ অন্যান্য কবিদের এইভাবে কৌশলে মিথ্যা বলার কলা শিক্ষা দিয়েছেন। এর রহস্য আছে একটা হেত্বাভাসের মধ্যে। যেমন মানুষ ধরে নেয়—যদি কোন একটি বস্তু বর্তমান থাকে বা উৎপন্ন হয়, অন্য একটিও থাকে বা হয়,—এবং মনে করে যে যদি দ্বিতীয়টি থাকে, তা'হলে প্রথমটিও থাকবে। কিন্তু এ অনুমান ভুল। সুতরাং যেখানে প্রথমটি অসত্য সেখানে প্রথমটি আছে বা ঘটছে, এ কথা বলা—অবশ্য দ্বিতীয়টি সত্য হওয়া চাই—অনাবশ্যক। এখানে মন, দ্বিতীয়টিকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং প্রথমটিকেও সত্য বলে মিথ্যা অনুমান করে বসে। অডিসির স্নান-দৃশ্যে এর একটা দৃষ্টান্ত আছে।

কাজে কাজেই অসম্ভাব্য সম্ভব (improbable possibilities) অপেক্ষা, সম্ভাব্য অসম্ভবের দিকে কবির বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত। ট্রাজেডি-কাহিনীকে কখনই অবিশ্বাস্য উপাদান দিয়ে গঠন করবে না। সম্ভব হলে, সব রকম অবিশ্বাস্যকেই বর্জন করা উচিত। অথবা সম্ভব না হলে—তার স্থান হওয়া উচিত নাটকীয় ঘটনা-ধারার বাইরে (যেমন, ঈডিপাস-এ, লায়ুসের মৃত্যু কি ভাবে হয় সে সম্বন্ধে নায়কের অজ্ঞতা)—নাটকের মধ্যে নয়, যেমন—'ইলেক্‌ট্রাতে—দূতের মুখে পাইথিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিবরণ; অথবা যেমন "মাইসিয়ান"-এ সেই লোকটি যে তেগিয়া থেকে মাইসিয়ায় এসেছে অথচ একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। এ না করলে সমস্ত কাহিনীটি নষ্ট হয়ে যেতো—এ যুক্তি হাস্যকর। প্রথম কথা হচ্ছে—তা'হলে এ রকম কাহিনী আদৌ গঠন করা উচিত নয়। কিন্তু একবার যদি কোন অবিশ্বাস্যকে প্রবেশ করানো হয় এবং একটা সম্ভাব্যের মায়া তাতে সৃষ্টি করা হয়, অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও তাকে অবশ্য স্বীকার করে নিতে হবে। অডিসির অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলির কথাই ধরা যাক—অডিসিউস যেখানে ইথাকার উপকূলে পরিত্যক্ত; এটাই যে কত অসহ্য হয়ে উঠতো, তা' কোন অল্পশক্তি কবির হাতে

পড়লেই স্পষ্ট বুঝা যেতো। কিন্তু যেমনটি আছে তাতে এই অসঙ্গতিকে কবি-কল্পনার মোহিনী শক্তি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন।

বাক্‌-কৌশলের শক্তি সেখানে হবে—ক্রিয়ার বিরামস্থলে—যেখানে চরিত্রের বা চিন্তার প্রকাশ নেই সেখানে। অন্য দিক থেকে বলা যায় অত্যুজ্জ্বল বাক্‌-বৈদগ্ধ্যের দ্বারা চরিত্র ও ভাবনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

২৫

সমালোচনার সমস্যা ও সমাধানের প্রশ্ন যত এবং যে-ধরনের উৎস থেকে উঠতে পারে তাদের নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। চিত্রকর বা অন্যান্য শিল্পীর মত, কবিও একজন অনুকরণকারী বলে স্বভাবতই তিন প্রকার বস্তুর একটিকে অনুকরণ করবে—**বস্তু যেমনটি ছিল** বা **আছে** বা **বস্তু সম্বন্ধে লোকে যেমনটি বলে** বা **মনে করে** অথবা **বস্তুর যেমনটি হওয়া উচিত**। প্রকাশের বাহন—ভাষা, হয় তা প্রচলিত না হয় অপ্রচলিত বা রূপক। ভাষার আরো ভঙ্গি-বৈচিত্র আছে—আমরা তা কবিদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি এর সঙ্গে আর একটা কথাও যোগ করে নেও—অক্রটিহীনতার মান, কাব্য-কলা এবং অন্যান্য কলার বিচারে যেমন মতবেশী এক নয়, কাব্য কলা এবং রাজ-নীতির—ব্যপারেও তেমন এক নয়। ঠিক কাব্য-কলার মধ্যে দুই রকমের দোষ আছে—কতগুলি—**অন্তরঙ্গ দোষ** কতগুলি **বহি-রঙ্গ**। যদি কোন কবি কোন একটি বিষয় অনুকরণের জন্য নির্বাচন করে, দক্ষতার অভাবে, ভুল অনুকরণ করেন তা হলে সে ক্রটি অন্তর্নিহিত ক্রটি। কিন্তু যেখানে নির্বাচনের ভুলের জন্য ক্রটি ঘটে—কবি যদি এমন কোন অশ্ব রূপ দিতে চেষ্টা করেন যে তার দুই পা'ই একই সঙ্গে উর্ধ্বে উৎক্ষেপ করছে, অথবা ঔষধ প্রয়োগে প্রয়োগ-বিধিগত ভুল করে বসেন অথবা এই ধরনের আরো কোন কলা কৌশলে ভুল করেন—সেখানে ভুলটি কাব্যের ঠিক অন্তর্নিহিত নয়। এই সব দৃষ্টি কোণ থেকেই আমাদের সমালোচকদের আপত্তি বিবেচনা করতে হবে এবং তার উত্তর দিতে হবে।

রূপায়ণের তিন রীতি

দুইপ্রকার দোষ:— অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ

প্রথমতঃ সেই সব বিষয়ের কথাই ধরা যাক যা কবির খাঁটি সৃষ্টি-কলার

মধ্যে পড়ে। যদি তিনি অসম্ভবকে রূপ দিতে চান তা'হলে তিনি একটি ভুল করেন ; অবশ্য সে ভুলকে সমর্থন করা যেতে পারে যদি তা' দিয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় (উদ্দেশ্য কি আগেই বলা হ'য়েছে) অর্থাৎ যদি তা'তে কাব্যের এই বিশেষ অংশ বা অন্য কোন অংশ অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়। হেক্টরের পশ্চাদ্ধাবন ঘটনাটি যেমন। যদি, অবশ্য, কাব্য-শাস্ত্রের বিশেষ বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না করেও, সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি ভাল বা তার চেয়েও ভাল করা সম্ভব হয় তা' হলে সে ত্রুটি সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ, সব রকমের ভুলকেই যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে।

তারপর প্রশ্ন—ত্রুটি কাব্যকলার অন্তরাত্মাকেই স্পর্শ করছে অথবা তার কোন বহিরঙ্গকে? দৃষ্টান্ত যেমন, হরিণের সিং নেই—এ কথা না জানা, হরিণটিকে অকলাসম্মতভাবে আঁকার চেয়ে অনেক কম গুরুতর ব্যাপার।

আদর্শায়ন বনাম বাস্তবায়ন

তারপর, যদি আপত্তি তোলা হয় যে বর্ণনা ঠিক যথাতথ্য হয়নি, কবি অবশ্য উত্তর দিতে পারেন—"কিন্তু বস্তুর স্বরূপ তো বস্তুর যা' হওয়া উচিত সেইটে", যেমন সফোক্লিস বলেছিলেন —যে তিনি মানুষের সেই রূপই এঁকেছেন 'যেমনটি হওয়া উচিত, ইউরিপিডিস এঁকেছেন—'যেমনটি দেখা-যায়'। এইভাবে আপত্তি খণ্ডন করা যেতে পারে। যদি অবশ্য উপস্থাপনা ঐ দুই প্রকারের কোনটিই না হয়, কবি বলতে পারেন—"লোকে বলে—বস্তুটি এইরূপ" ; দেবদেবীর কাহিনী সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য। এমন হ'তে পারে যে এই সব কাহিনী বাস্তব ঘটনা অপেক্ষা উন্নততরও নয়, আবার বাস্তব ঘটনার অনুরূপও নয়। এ সব ঘটনা সম্বন্ধে জেনোফিনিস যা বলেছেন খুব সম্ভব এরা তাই। যাই হোক—"লোকে যা' বলে তাই"। তারপর, কোন বর্ণনা বাস্তবের চেয়ে ভাল নাও হতে পারে, "তথাপি ঘটনাটি এইরূপ" [এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে —এই কথাটি উহ্য] যেমন অস্ত্র-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে—"সোজা তাদের কুঁদোর পরে দাঁড়িয়ে গেল বর্শাগুলো"। তখনকার রীতি এরূপই ছিল—যেমন এখনও আছে ইল্লিরিয়ানদের মধ্যে।

তারপর, কারো কথা বা কাজ কবি-কর্ম হিসাবে ঠিক বা বেঠিক হয়েছে

এ বিচার করবার সময়, আমরা শুধু সেই বিশেষ কথা বা কাজের দিকেই লক্ষ্য রেখে, কবি-কর্ম হিসাবে তা ঠিক বা বেঠিক সে জিজ্ঞাসা তুলবো না,. আমাদের এ সবও বিচার করতে হবে—কে সে কথা বলেছে বা সে কাজ করেছে, কাকে কখন, কিভাবে বা কি উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে; তা' অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করবার জন্য করা হয়েছে বা অধিকতর অপকর্ষ এড়ানোর জন্য করা হয়েছে।

অন্যান্য সমস্যার সমাধান—ভাষা ব্যবহারের রীতির পরে নজর রাখলেই করা যেতে পারে। আমরা একটা অপ্রচলিত শব্দ পেতে পারি—যেমন urheas men proton এখানে কবি, খুব সম্ভব urheas শব্দটি প্রয়োগ ক'রছেন 'খচ্চর' অর্থে নয়, 'প্রহরী' অর্থে। তেমনি ডোলোনের (Dolon) "কুরূপ বটে দেখতে ছিল সে"। এর অর্থ এ নয় যে তার দেহ কদাকার ছিল —অর্থ—তার মুখখানি বিশ্রী ছিল; কারণ ক্রীট্‌বাসীরা euides "সুপ্রিয়" শব্দটি সুশ্রী মুখ অর্থে ব্যবহার করে। তারপর, xoroteron de keraie "সতেজে মেশাও পানীয়"—অর্থ এ নয় যে 'কড়া ক'রে বানাও'—যেমন কড়া মাতালদের জন্য করা হয়, অর্থ—'তাড়াতাড়ি বানাও'। কখন—কখন প্রয়োগ লাক্ষণিক হয়ে থাকে, যেমন—"তখন সব দেব-নর সারারাত ছিল নিদ্রিত"--আবার তখনই কবি বলছেন—"মাঝে মাঝে সে যেমন তাকাচ্ছিল ট্রয়ের প্রান্তরে, বাঁশী-ভেরীর শব্দে সে মুগ্ধ হয়েছিল"। এখানে 'সব' লাক্ষণিক অর্থে—"অনেক" এই অর্থে ব্যবহৃত। 'সব' 'অনেকেরই' একটা প্রজাতি। তেমনি এই পংক্তিতে—"তারই একা নাই কোন কাজ", oie (একা)—লাক্ষণিক প্রয়োগ। কারণ শুধু সুপরিজ্ঞাত হ'লেই 'কেবল একমাত্র' বলা যায়। তারপর, সমাধান, স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাতের পরেও নির্ভর করে। যেমন থেসোসের "হিপ্‌পিয়াস" এই সব পংক্তির সমস্যা সমাধান করেছিলেন (didomen (dido´men) de´ oi) এবং (to me´n on´ (on') katapythetai ombro)। আবার, যতিচ্ছেদ দ্বারাও সমস্যা মেটানো যেতে পারে, যেমন 'এম্পিডোকলস'এ—যা আগে অবিনশ্বর ছিল, সহসা তা নশ্বর হ'য়ে পড়ল, যা ছিল অবিমিশ্র হ'ল মিশ্র।

অথবা দ্ব্যর্থকতা দ্বারাও হ'তে পারে—যেমন parhocheken de pleo nux এখানে pleo শব্দ দ্ব্যর্থক। অথবা ভাষার প্রচলিত ব্যবহার দ্বারাও হতে পারে—যেমন যে-কোন পানীয়কে বলা হয় oinos—মদ। এইজন্য বলা হয়েছে, গ্যানিমিড—'জিউসকে মদ ঢেলে দিলেন'—যদিও দেবতারা মদ খান না। এইভাবে যারা লোহা নিয়ে কাজ করে তাদের বলা হয়—লৌহকার chalkeas! অথবা 'ব্রোঞ্জ'-কার। একেও লাক্ষণিক প্রয়োগ বলে ধরা যেতে পারে।

তারপর, যখন কোন শব্দের অর্থে অসঙ্গতি দেখা দেবে তখন, সেই বিশেষ অনুচ্ছেদে শব্দটি কত অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, তা বিচার করে দেখতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—ব্রোঞ্জ-নির্মিত বর্শা সেখানে রাখা হ'ল—আমাদের বিচার করে দেখতে হবে—'সেখানে বাধা পাওয়ার (being cheked there) কথাটি কতভাবে ব্যবহার করা যায়। খাঁটি ব্যাখ্যা-রীতি, গ্লোকন যে রীতির উল্লেখ করেছেন, তার বিপরীত। তিনি বলেন—সমালোচকরা কতগুলি ভিত্তিহীন সিদ্ধান্তে পৌছে বসেন, তাঁরা প্রথমে বিরূপ সিদ্ধান্ত করে নিয়েই পরে তাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চান; এবং তারা যা ভেবেছেন কবি সেই কথাই বলছেন—এই কথা মনে করে নিয়েই তারা, নিজেদের কল্পনার সঙ্গে না মিললেই দোষ ধরে থাকেন। 'ইকেরিয়াস' সংক্রান্ত প্রশ্ন এইভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। সমালোচকরা মনে করেন যে তিনি ছিলেন 'লেসিডেইমন'-অধিবাসী; সুতরাং আশ্চর্যেরই কথা যে টেলিমেকাস যখন 'লেসিডেইমন'-এ গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করেই এসেছিলেন। সেফালেনিয়ান কাহিনী খুব সম্ভব খাঁটি হতে পারে—তারা বলেন যে অডিসিউস তাদের মাঝ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন এবং স্ত্রীর পিতার নাম ছিল ইকেরিয়াস নয়, ইকেডিয়াস। তা'হলে আপত্তির মূলে যে যুক্তি, তা' ভুল বিশেষ।

সাধারণতঃ অসম্ভবকে সমর্থন করতে হবে—শৈল্পিক প্রয়োজন দেখিয়ে উচ্চতর সত্যের অংগ হিসাবে অথবা 'প্রথিত ধারণা' বলে যুক্তি দিয়ে। কলায় প্রয়োজনের দিক দিয়ে, সম্ভব অথচ অসম্ভাব্য এমন ঘটনা অপেক্ষা

সম্ভাব্য অথচ অসম্ভব ঘটনাই বাঞ্ছনীয়। তারপর জিউকসিস্‌ যে ধরনের মানুষ রূপ দিয়েছেন তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব হতে পারে। আমরা বলি—হাঁ, অসম্ভব উচ্চতর সত্তা; কারণ যা আদর্শকল্প তা' বাস্তব সত্তাকে অতিবর্তন করবেই। অসম্ভবকে সমর্থন করতে আমরা আবেদন করছি—'যা' আছে বলে লোকের বিশ্বাস—তারই কাছে। এর সঙ্গে আর এইটুকু যোগ করতে চাই যে, অসম্ভব অনেক সময় যুক্তি-সঙ্গতি লঙ্ঘন করে না। যেমন বলা হয়েছে—"সম্ভাব্যের বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে—এও সম্ভব।"

বিরোধের আভাস যে স্থলে আছে, সে স্থলগুলি ঘন ঘন বিচার করতে হবে, যুক্তিখণ্ডনে যেভাবে করা হয় সেই নিয়মেই—একই প্রকরণের এবং একই অর্থে একই বিষয় প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা' লক্ষ্য রেখে। সুতরাং প্রশ্নের সমাধান করা উচিত—কবি নিজে কি বলেছেন বা বিচক্ষণের মনে কি অর্থবোধ হয়েছে, তাই বিবেচনা করে করে।

অসম্ভব ব্যাপার এবং সেইরূপ চরিত্রের হীনত্ব খুব সঙ্গতভাবেই নিন্দিত হয়, যখন তা আমদানী করার কোন আভ্যন্তরিক প্রয়োজন থাকে না। এমনি একটি অসম্ভবের নিদর্শন—যেখানে ইউরিপিডিস এইজিয়াসকে প্রবেশ করান—এবং অরিস্টিস্‌-নাটকে মেনিলাসের মন্দত্ব।

অতএব পাঁচ দিক থেকে সমালোচনাত্মক আপত্তি তোলা যেতে পারে। **বিষয়কে নিন্দা করা হয়, অসম্ভব বা অসঙ্গত বা নীতির দিক দিয়ে ক্ষতিকর বা শৈল্পিক নির্দোষতার বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল**—এই সব বলে। উল্লিখিত বারটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে হবে।

২৬

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে—মহাকাব্যের এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে কোন্‌টির রীতি উন্নত পর্যায়ের? যদি বলা যায়, অধিকতর মার্জিত কলা উন্নততর এবং সেইটাই অধিকতর সূক্ষ্ম (মার্জিত) যা'র আবেদন বিশিষ্ট শ্রোতাদের কাছে, তাহলে যে শিল্পে সব কিছুই অনুকৃত হয়, বলা বাহুল্য তা স্থূল বা অমার্জিত।

শ্রোতাদের এত জড়বুদ্ধি মনে করা হয় যে তারা যেন, অভিনেতারা যতক্ষণ তাদের গ্রহণযোগ্য কিছু পরিবেশন না করবে ততক্ষণ কিছুই বুঝবে না—এই কারণে অভিনেতারাও অস্থির অঙ্গভঙ্গী করতে যেতে উঠে। আনাড়ি বংশীবাদকরা, 'কোইট থ্রো' বাজাতে হলে স্বর কাঁপায় এবং স্বরে মীড় দেয় 'স্কাইল্লা, (Scylla) বাজাতে গিয়ে 'কোরাইফের্ডস'কে ঝাঁকানি দিয়ে থাকে। ট্র্যাজেডিতে—বলা হয়ে থাকে—একই ধরনের ত্রুটি আছে। প্রাচীন অভিনেতারা তাদের উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করেছেন তা আমরা তুলনা করে দেখতে পারি। মাইন্নিস্কাস্ ক্যাল্লিপিডিস্‌কে তার অতি অভিনয়ের জন্য, 'বানর' ব'লতেন; পিণ্ডারাস সম্বন্ধেও একই অভিমত পোষণ করা হত। মোটামুটিভাবে ট্র্যাজেডির সঙ্গে এপিকের একই সম্বন্ধ—যেমন সম্বন্ধ নূতন অভিনেতাদের সঙ্গে পুরাতন অভিনেতাদের; এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে মহাকাব্যের আবেদন শিক্ষিত শ্রোতাদের কাছে—যে শ্রোতাদের অঙ্গ-ভঙ্গীর দরকার হয় না। আর ট্র্যাজেডির আবেদন—অবিশিষ্ট জনসাধারণের কাছে। সুতরাং স্থূল বা অমার্জিত হওয়ায়, দু'য়ের মধ্যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টিই নিম্নস্তরের সৃষ্টি।

এখন, প্রথম কথা—এই নিন্দাটুকুর লক্ষ্য কাব্য-কলা নয়, অভিনয়-কলা; কারণ অঙ্গ-ভঙ্গীর আতিশয্য মহাকাব্য-আবৃত্তিতেও ঘটতে পারে, যেমনটি সোসিস্‌ট্রেটাস দেখিয়েছেন, অথবা গীতি-কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়ও হতে পারে, যেমনটি করেছেন—ওপাস্তিয়ার ম্লাসিথিউস। সব ক্রিয়াই নিন্দনীয় নয়, যেমন সব নৃত্যই নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় শুধু মন্দ শিল্পীদেরই ক্রিয়া-কলাপ। ক্যাল্লিপিডিসের মধ্যে এই দোষ ছিল; আর আমাদের সমসাময়িক অনেকের মধ্যেও আছে—দুশ্চরিত্র নারী উপস্থাপনা করার জন্য এদের নিন্দাও করা হয়েছে। তারপর ট্র্যাজেডি মহাকাব্যের মতোই বিনা অভিনয়েই রস সৃষ্টি করে থাকে; শুধু পাঠেই এর সংবেদনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তা'হলে যদি অন্যান্য বিষয়ে ট্র্যাজেডি বড় হয়, তবে এই দোষ, বলতে পারি—অন্তরঙ্গীয় নয়।

বরং (মহাকাব্য অপেক্ষা)এ উন্নততর সৃষ্টিই। কারণ এতে মহাকাব্যের

সব উপাদানই আছে—এমন কি এ মহাকাব্যের ছন্দও ব্যবহার করতে পারে—আর এর সঙ্গে আছে প্রধান সহায়ক হিসাবে সংগীত এবং দৃশ্যের কার্যকারিতা। আর এরাই সর্বাপেক্ষা তীব্র আনন্দ সৃষ্টি করে থাকে। আবার পঠনে এবং উপস্থাপনে দু'ভাবেই এর সংবেদনা খুবই স্পষ্ট হয়। অধিকন্তু অধিকতর সংকীর্ণ পরিসরে শিল্প তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে থাকে। কারণ যে আনন্দ বহুকাল ব্যাপ্তির মাঝ দিয়ে জন্মে তথা তরল হয়ে যায়, তার চেয়ে সংহত সংবেদনাজনিত আনন্দ অনেক বেশী তীব্র। দৃষ্টান্ত—সফোক্লিসের ঈডিপাস যদি ইলিয়াডের মত অত বিশাল আয়তনে রচিত হতো তা'হলে—রসপরিণতির ফল কি দাঁড়াত? উপরন্তু, মহাকাব্য-রচনার ঐক্য কম। এই ব্যাপার থেকেই তা বুঝা যায় যে যে-কোন মহাকাব্য অনেকগুলি ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু যুগিয়ে থাকে।

অতএব কবি-নির্বাচিত কাহিনীতে দৃঢ় ঐক্য যেখানে থাকবে সেখানে অবশ্যই সে কাহিনী ছোট পরিসরে রচিত হবে এবং ফলে তা কাটাছাটা বলে মনে হবে। আর তা যদি মহাকাব্যের আয়তন অনুযায়ী রচিত হয়, তা'হলে অবশ্যই তা শিথিল এবং তরল হয়ে পড়বে। এমনি ধারা আয়তন করা মানেই কিছুটা ঐক্যের হানি করা—আমি বলতে চাই—যদি কাব্য অনেক ঘটনার সমবায়ে রচনা করা হয় এবং তা করা হয় ইলিয়ড-অডিসির মতো—যাতে ছোট ছোট আয়তন বিশিষ্ট অনেক স্বতন্ত্র অংশ আছে। তবু এই কাব্যগুলি, গঠনের দিক দিয়ে, যতখানি হওয়া সম্ভব ততখানি সম্পূর্ণ; প্রত্যেকখানি যতদূর সম্ভব, একক ঘটনার অনুকরণ।

তা'হলে ট্র্যাজেডি যদি মহাকাব্য অপেক্ষা এই সব বিষয়ে মহত্তর সৃষ্টি হয় এবং অধিকন্তু শিল্পকলা হিসেবে তার বিশেষ উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করে—কারণ আগেই বলা হয়েছে প্রত্যেক শিল্পেরই যে-কোন-রকম আনন্দ সৃষ্টি করলে চলবে না, সৃষ্টি করতে হবে বিশেষ জাতীয় আনন্দ—বলা বাহুল্য যে, ট্র্যাজেডিই উন্নততর কলা-সৃষ্টি, কারণ অধিকতর নিখুঁতভাবেই সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের সাধারণ স্বরূপ সম্বন্ধে, তাদের প্রকার-ভেদ এবং অঙ্গ ও তাদের সংখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য সম্বন্ধে, যে সমস্ত কারণে কাব্যে গুণ বা দোষ জন্মে সে সম্বন্ধে, সমালোচকদের আপত্তিগুলোর যুক্তি সম্বন্ধে—এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে—তা যথেষ্ট।

সাহিত্য-শিল্পতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় পোয়েটিক্‌সের দান

সাহিত্য-শিল্প জিজ্ঞাসায় পোয়েটিক্‌সের দান সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে, প্রথমেই পূর্বাচার্য বুচারকে বিশেষভাবে স্মরণ ও বন্দনা করা দরকার। অনেক পূর্বাচার্য থাকা সত্ত্বেও বুচারকে স্মরণ করছি এই জন্য যে, বুচারের "এরিস্টটল্‌স্ থিওরি অফ্ পোয়েট্রি এ্যাণ্ড ফাইন আর্ট" গ্রন্থখানি, পোয়েটিকসের ধারাটিকে ইংরেজীভাষা-ভাষী জগতের ঘাটে ঘাটে পৌঁছে দিয়েছে। ইতালীয় ফরাসীয় ও জার্মানীয় টীকা-ভাষ্যকার ও সমালোচক-দের মূল্যবান আলোচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের অনেকেরই নেই। পোয়েটিক্‌সের সঙ্গে ভারতবাসীর যেটুকু পরিচয় হ'য়েছে তা সম্ভব হয়েছে —বুচার এবং বাইওয়াটার মহাশয়ের প্রসাদে। বিশেষতঃ এরিস্টটলের সাহিত্য-শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন তত্ত্বজ্ঞ বুচার মহোদয়। "এরিস্টটলস থিওরি অফ পোয়েট্রি এ্যাণ্ড ফাইন আর্ট" গ্রন্থখানিও এই হিসাবে পথিকৃতের মর্যাদা দাবী করতে পারে। যাঁরাই পোয়েটিক্‌স নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরাই গ্রন্থখানির শরণ নিতে বাধ্য। কারণ, পোয়েটিক্‌স সম্বন্ধে নূতন কোন কথা বলতে হ'লে, সে সম্বন্ধে কি কি বলা হ'য়েছে তার হিসাব অবশ্যই নিতে হবে। এ সম্পর্কে নূতন কথা সেইগুলিই হবে যা বুচার প্রমুখ সমালোচকরা বলতে বাকী রেখেছেন বা বলেও সম্পূর্ণ করে বলেননি। এই কারণেই আমি প্রথমে বুচার মহোদয়ের আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিতে চাই। সমালোচক বুচার, তাঁর আলোচনাকে মোট এগারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। তাঁর অধ্যায়বিভাগ নিম্নলিখিত রূপ :—

( ) প্রথম অধ্যায় :—শিল্প ও প্রকৃতি (Art and Nature)

(২) দ্বিতীয় অধ্যায় :—শিল্প-পরিভাষা হিসাবে "অনুকরণ" কথাটি (Imitation as an aesthetic Term)

(৩) তৃতীয় অধ্যায় :—কাব্যিক সত্য (Poetic Truth)

(৪) চতুর্থ অধ্যায়—চারুশিল্পের উদ্দেশ্য (End of Fine Art)

(৫) পঞ্চম অধ্যায়—শিল্প ও নীতি (Art and Morality)

(৬) ষষ্ঠ অধ্যায়—ট্র্যাজেডির উপযোগিতা (Function of Tragedy)
(৭) সপ্তম অধ্যায়—নাটকীয় ঐক্য-বিধি (Dramatic Unities)
(৮) অষ্টম অধ্যায়—আদর্শ ট্র্যাজেডির নায়ক (The Ideal Tragic Hero)
(৯) নবম অধ্যায়—ট্র্যাজেডিতে—কাহিনী ও চরিত্র (Plot and character in Tragedy)
(১০) দশম অধ্যায়—কমেডির সাধারণীকরণের শক্তি (The Generalizing power of Comedy)
(১১) একাদশ অধ্যায়—গ্রীক-সাহিত্যে—কাব্যের সার্বজনীনতা (Poetic Universality in Greek Literature)

প্রত্যেক অধ্যায়ের সার কথাগুলি সংগ্রহ করে সম্মুখে রাখলে, এই আলোচনায় কতটুকু নূতন কথা আছে তা বুঝতে সুবিধে হবে। এই উদ্দেশ্যেই, এখানে বুচারের অধ্যায়গুলির সারটুকু সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছি।

প্রথম অধ্যায়ের নাম—শিল্প ও প্রকৃতি (Art and Nature)। এই অধ্যায়ের সার কথা এই :—(১) এরিস্টটল চারুশিল্প (fine art) সম্বন্ধে কোন পৃথক গ্রন্থ লেখেননি এবং কোন তত্ত্বও প্রতিষ্ঠা করেননি। (২) শ্রেণী বিভাগের প্রবণতা থাকলেও, কাব্যের মধ্যে কোনও শ্রেণী বিভাগ তিনি করেননি। (৩) পরবর্তী কালে যে-সব শিল্প-সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাঁর মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই জাগেনি—যদিও তাঁর ভক্তদের অতিভক্তি, সব সমস্যার সমাধানে এরিস্টটলের উক্তি উদ্ধার করে থাকে। *(৪) কারুশিল্প (useful art) এবং চারুশিল্পের মধ্যে যে পার্থক্য তা প্রথমে এরিস্টটলই আলোচনা ও নির্দেশ করেন। **(৫) এরিস্টটলেই প্রথম এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে চারুশিল্প, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি প্রয়োজন-বোধ থেকে স্বতন্ত্র এক বোধের ব্যাপার। নীতি প্রচার করার বা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকে স্বতন্ত্র এর উদ্দেশ্য। (৬) শিল্পের সংজ্ঞা—শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ (Art imitates Nature)—এই সংজ্ঞাকরণে চারুশিল্প-কারুশিল্পের সামান্য ধর্মের

কোন পার্থক্য নির্দেশিত হয়নি। তেমনি এ কথাও বলা হয়নি বলে মনে হয় যে চারুশিল্প প্রাকৃতিক বস্তুরই প্রতিলিপি (Copy) বা অনুকরণ। (৩) "প্রকৃতি" বলতে এরিস্টটল বাহ্য জগতের সৃষ্ট বস্তুসমূহ বুঝেননি—প্রকৃতি, তাঁর কাছে, সৃজনী শক্তি—সৃষ্টির নিয়মতন্ত্র (creative force, the productive principle of the Universe.) (৮) কি প্রকৃতিতে, কি কাব্যে,—বস্তু (matter) ও রূপের (form) মিলনেই সৃষ্টি। (৯) প্রকৃতির অনুকরণ—এ কথাটা সাধারণ ভাবে বলা হলেও, কারুশিল্পের ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারু শিল্প, প্রকৃতির চেষ্টারই পরিপূরক; প্রকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেই তার জন্ম। "where from any cause Nature fails art steps in" কারুশিল্পের উদ্দেশ্য—'to supply the deficiencies of Nature' (politics—iv).

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম—শিল্প-পরিভাষা হিসাবে অনুকরণ শব্দটি Imitation as an Aesthetic Term)

(১) চারুশিল্প (fine art)—কথাটি গ্রীকরা ব্যবহার করেননি। তাঁদের পরিভাষা—"মাইমেটিকাই টেক্‌নাই" (অনুকারী শিল্প); মাইমেসিস (অনুকরণ-ব্যাপার)

(২) শিল্পের সামান্য ধর্ম 'অনুকরণ'—এ কথাটার প্রবর্তক এরিস্টটল নন। প্লেটোর রচনাতে কথাটি প্রথম পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তাঁর আগেও কথাটা এই অর্থেই গ্রীসে প্রচলিত ছিল।

(৩) "অনুকরণ—কথাটা শুনলেই মনে হয়—স্বাধীন কল্পনার অবসর নেই—যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং—অবস্থা। (ক) এরিস্টটল যখন বলেন "শিল্প অনুকরণ" তখন যে এই সংকীর্ণ অর্থে বলেন না, তার দৃষ্টান্ত—শিল্পীরা—"imitates things as they ought to be" (xxv) * [আরো অনেক প্রমাণ আছে। বুচার সেগুলি লক্ষ্য করেননি। এই প্রসঙ্গের আলোচনাকালে আমি সেগুলি উপস্থাপিত করব] (খ) শৈল্পিক অনুকরণের বিষয় তো শুধু বাহ্য রূপমাত্র নয়—অনুকরণের বিষয় তিনটি:—**চরিত্র, আবেগ এবং ক্রিয়া**। এগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সুতরাং শিল্পের সামগ্রী—মূল বস্তু—

মানব জীবন—জীবনের মানসিক-আত্মিক এবং শারীরিক আচরণ।

এই সূত্রানুসারে, প্রাকৃতিক বস্তু ও পশু জগৎ সাহিত্যের সামগ্রী নয়।

(৪) 'অনুকরণের—খাঁটি অর্থ—সারূপ্য (likeness)—(ওমইউমা) মূলের পুনরাকরণ (reproduction of the original)—তবে 'সংকেতন' (symbolic representation) নয়।

(৫) শিল্প-সৃষ্টি যেন—"pictures which exist for the phantasy"—(কল্পনার ছবি আঁকা)। * কল্পনা-বৃত্তি সম্বন্ধে এরিস্টটল কোন স্পষ্ট চিন্তা করেননি। কল্পনা বলতে তিনি বুঝেছেন—(ক) "the movement which results upon an actual sensation"—(খ)—এর একদিকে ঐন্দ্রিয় গ্রহণ ব্যাপার (sense) (ইন্দ্রিয় গৃহীত প্রত্যয় সমূহ), অন্যদিকে চিন্তা বা ধারণা (thought) (গ) রূপোদ্বোধক বৃত্তি—মনের মধ্যে যে সব রূপ-প্রত্যয় সঞ্চিত আছে তাদের উদ্বোধন করতে যা সক্ষম। * সুতরাং পরিভাষার অভাবে একে কল্পনা (imagination) বললেও, এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এরিস্টটলের 'creative imagination'—'সৃজনশীল কল্পনা'র ধারণা ছিল না। যে বৃত্তি শুধু গৃহীত রূপ-প্রত্যয়কেই যথাযথভাবে উদ্বোধিত করে না, রূপ ও ভাব মিলিয়ে-মিশিয়ে, নতুন জগৎ সৃষ্টি করে, এরূপ কোন বৃত্তির কথা এরিস্টটল বলেননি। [তবে বুচার পাদটীকায়, স্বীকার করেছেন—সৃজনী বৃত্তির ধারণা প্লেটো-এরিস্টটলের ছিল। কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা তাকে দেওয়া হয়নি বা কোন নামকরণও করা হয়নি। *আমিও এরিস্টটলের পোয়েটিকস থেকে প্রমাণ তুলে দেখাতে চেষ্টা করব—শিল্পসৃষ্টি স্মৃতির পুনরুদ্বোধন বা পুনরাকরণমাত্র নয়,—শিল্পসৃষ্টি কল্পনাবৃত্তিরই ক্রিয়া এবং সে কল্পনা সৃজনশীল।

(৬) শিল্প মূলের যথাযথ অনুকরণ নয়—বস্তু স্রষ্টার মনে যেরূপ প্রতিভাত হয় সেই রূপের উপস্থাপনা।

(৭) শিল্পের আবেদন—বুদ্ধিতে নয়, অনুভবে—কল্পনাবৃত্তিতে, শিল্প—সত্যের রূপাভিব্যক্তি, সত্যের ধারণামাত্র নয়।

(৮) শিল্পের জগৎ অবাস্তব বা অলৌকিক জগৎ—মায়ার জগৎ। মায়া

সৃষ্টিতে দক্ষ না হ'লে বড় স্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। মায়াঘোর বজায় রাখতে হবে বলেই—কবি : ought to prefer probable impossibilities to possible improbabilities.

(৯) বিভিন্ন শিল্প উপায়ে প্রকৃতিকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। (ক) **সংগীত** সর্বোত্তম অনুকরণকারী শিল্প—এতে জীবনের প্রকাশ অতি প্রত্যক্ষ এবং সঙ্গীতে মানব চরিত্র অনুকৃত হয়। (খ) রঙ ও রেখাও অনুকরণ করে, তবে সুরের মত অত প্রত্যক্ষভাবে পারে না। **চিত্র ও ভাস্কর্য** স্থিতিশীল উপাদানে তৈরি বলে জীবনের গতিশীল রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এদের মধ্যে বিশেষ একটি মুহূর্তের রূপটিই রূপায়িত হয়। (গ) **নৃত্য** চরিত্রের, আবেগ ও ক্রিয়াকে অনুকরণ করে। এর প্রকাশশক্তি ট্র্যাজেডির প্রকাশ শক্তি অপেক্ষা কম নয়। নৃত্য দেখে দর্শকচিত্তে সাম্য আসে, নৈতিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। নৃত্য ভাবাবেগকে প্রশমিত করে তথা চিত্ত-বিক্ষোভ দূর করে—চিত্ত শুদ্ধ করে।

*(ঘ) কাব্যের উপকরণ—ভাষা-সংকেত। রূপ-রঙকে সোজাসুজি এ প্রত্যক্ষ করাতে পারে না ; শব্দ-সংকেত দ্বারা বস্তুস্মৃতি উদ্বোধিত করে। এই শব্দ লিখিত এবং কথিত দু'রকমেই হতে পারে।

(১০) ছন্দে লিখলেই কাব্য হবে না—(যদিও রেটোরিক গ্রন্থে সাধারণ ভাবে ছন্দোবদ্ধতাকেই কাব্যের লক্ষণ বলা হয়েছে) [কাব্যের জন্য ছন্দ আবশ্যক কি না—আলোচনা (১৪৪-১৪৭)]

(১১) স্থাপত্য-শিল্পকে এরিস্টটল কারুশিল্প বলে মনে করেছেন। খুব সম্ভব এই কারণেই মনে করেছেন যে স্থাপত্য জীবনের স্থিতিশীল বা গতিশীল কোনরূপকেই অনুকরণ করে না, আর চারুশিল্প জীবনের অনুকরণ।

(১২) প্রশ্ন হতে পারে, শৈল্পিক অনুকরণ যদি প্রকৃতির চেষ্টারই পরিপূরক হয়, তবে, **কারুশিল্পের সঙ্গে চারুশিল্পের মূল পার্থক্য কোথায়?** এই প্রশ্নের উত্তর এরিস্টটল দেননি। তবে এইভাবে একটা উত্তর দাঁড় করানো যেতে পারে—প্রকৃতি সৃজনশীল একটি শক্তি, বিশেষ এক সহজ প্রেরণা বলে এই শক্তি ঊর্ধ্বতর রূপ বিকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক বিশেষ বস্তু

তার আদর্শ রূপটি অভিব্যক্ত করবার জন্য প্রবণান্বিত। **শিল্পের উৎপত্তি ঐ আদর্শ রূপের ধ্যানকে প্রকাশ করার প্রেরণা থেকে।** *কারুশিল্প প্রকৃতির নিজের উপাদান প্রয়োগ করে প্রকৃতির চেষ্টাকেই পরিপোষণ করে —মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করে। আর চারুশিল্প মানুষের প্রয়োজনের মুখ চায় না, প্রকৃতির জগৎকে ব্যবহার বা প্রয়োগ করে না। তার দেহে কোন পরিবর্তন আনে না। [Fine art sets practical needs aside, it does not seek to effect the real world to modify the actual. By mere imagery, it reveals the ideal form at which Nature aims in the highest sphere of organic existence—in the region, namely of human life……" 157]

(১৩) প্লেটোর কাছে বাস্তব ছিল—আইডিয়া। বস্তুজগৎ ঐ আদর্শেরই অনুকৃত প্রতিরূপ। কবিরা বস্তুজগৎকেই অনুকরণ করে, সুতরাং শিল্প অনুকরণেরই অনুকরণ (Copy of copy twice removed from truth Republic-x)। এরিস্টটলের কাছে শিল্প অনুকরণের অনুকরণ নয়—সত্য থেকে দু'ধাপ দূরের বস্তু নয়। বস্তু অপেক্ষা শিল্প সত্যের অনেক কাছাকাছি, কারণ শিল্প প্রকাশ করে **সামান্যকে—বিশেষকে** নয়।

(১৪) কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে এরিস্টটলের শিল্পতত্ত্ব সৌন্দর্য-তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত। সৌন্দর্য-তত্ত্ব থেকেই তাঁর শিল্পতত্ত্বের সূত্র বেরিয়েছে। একথা ঠিক নয়। সৌন্দর্য তত্ত্বের সঙ্গে এরিস্টটলের শিল্পতত্ত্বের অন্তরঙ্গ কোন যোগ নেই॥ শিল্পতত্ত্বের আসরে সৌন্দর্যকে প্লটিনাসের সময় থেকেই বড় আসন দেওয়া হয়েছে। **সৌন্দর্য-সৃষ্টিই শিল্পের উদ্দেশ্য —এ কথা এরিস্টটল বলেননি**—যদিও গঠন-সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেছেন।

তৃতীয় অধ্যায় (কাব্যিক সত্য—Poetic Truth)

(১) কাব্য মানুষের জীবনের 'সামান্য' (universal) সত্যকেই প্রকাশ করে—অবশ্য বিশেষের মাধ্যমে বা আশ্রয়ে।

(২) বাস্তব পরিবেষ্টনীর চাপ থেকে কাব্য আমাদের মুক্ত করে। বাস্তব প্রয়োজন এবং জৈবিক কামনার পরিপূরণের সঙ্গে কাব্যের কোন সম্পর্ক নেই।

(৩) যা' ঘটে বা ঘটেছে তাকে রূপ দেওয়া কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, যা ঘটতে পারে তাকে রূপ দেওয়াই কবির কাজ। এখানেই কবির সঙ্গে ঐতিহাসিকের পার্থক্য—(ক) ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতিকারমাত্র, কবির বর্ণনীয়—what may happen, what is possible according to the laws of probability or necessity। অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রকাশ করেন শুধু 'বিশেষ'কে, আর কবি প্রকাশ করেন—বিশেষের মাধ্যমে 'সামান্য'কে—(ইউনিভার্সালকে)। (কবি তথ্যের সাহায্যে সত্যের মূর্তি গড়েন। Poetry transforms its facts into truths) (খ) ইতিহাসে ঘটনার মধ্যে তথ্যের কালানুক্রমিক সমাবেশ বা বিন্যাস থাকে, আর কাব্যে তথ্য বা ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে কার্য-কারণ-সূত্রের দৃঢ় বন্ধন থাকে।

(৩) এরিস্টটলের কাছে বাস্তবতা (Vraisemblance) বাহ্যবস্তুর সঙ্গে নিছক সাদৃশ্যমাত্র নয়। যেখানে ঘটনার গ্রন্থিগুলি সম্ভাব্যের (Probable) বা অনিবার্য্যের—(Necessity) সূত্র দ্বারা গ্রথিত—আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কার্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত, সেখানেই সৃষ্টির Vraisemblance। বাস্তব অভিজ্ঞতা মিলিয়ে কাব্যের বাস্তবতা বিচার করা চলে না।

(৪) বস্তু-সত্যের সঙ্গে কাব্যিক সত্যের সম্পর্ক নিয়ে এরিস্টটল অনেকখানি আলোচনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে কাব্য **বিশেষ কোন লৌকিক ঘটনার রূপ নয়—কাব্যে রূপায়িত হয় সেই ঘটনা যা ঠিক বাস্তবে ঘটেনি—সেই আদর্শ যা অলৌকিক** (Which are not, and never can be in actual experience).

(৫) কাব্যের সামগ্রী ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারবে না—এমন নয়। যা' ঘটেছে তাতে সম্ভাব্যের বিকাশ দেখানোর অবকাশ অবশ্যই থাকতে পারে। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির কাহিনী ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু নাট্যকাররা সেই কাহিনীগুলিকে আদর্শায়িত করে কাব্যে-রূপ দান করেছেন।

(৬) কাব্যের সত্যতা বস্তুর সত্যতা থেকে ভিন্ন। যে বস্তু আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে ধরা পড়েনি, যা' কোনদিন ঘটেনি এবং কোন-কালে ঘটবেও না, তারা কাব্যের জগতে সত্য হতে পারে। কবির আসল কাজ—'to tell lies skilfully'—স্নকৌশলে মিথ্যা রচনা করা।

* কাব্যের সত্য—**সুসঙ্গতির সত্য** (Inner consistency).

(৭) কাব্যে সেইটাই মিথ্যা—যা' ঔচিত্যবোধকে আঘাত করে তথা রস নিষ্পত্তির ব্যাঘাত ঘটায়।

(৮) কাব্যের জীবন যথার্থ জীবন্ত নয়—এই অর্থেই জীবন্ত যে **জীবন্ত প্রকৃতির সাদৃশ্য বহন করে** (Semblance of a living reality)

চতুর্থ অধ্যায়—চারু শিল্পের উদ্দেশ্য (The end of fine Art).

(১) কারুশিল্পের উদ্দেশ্য—বাস্তব প্রয়োজন মোটানো ; চারুশিল্পের উদ্দেশ্য —'আনন্দ' দান করা (Give pleasure or rational enjoyment.)

(২) কমেডি একরকমের **আমোদ ক্রিয়া** (Sportive activity) খেলাধুলার—আমোদ প্রমোদের আনন্দের সঙ্গে কমেডির আনন্দের ঐক্য আছে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের শিল্প আত্মার গভীর আচরণ থেকে উদ্ভূত হয় এবং তার সঙ্গে **মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের যোগ** (Final well-being of man) থাকে। এই উচ্চাঙ্গের শিল্পের উদ্দেশ্যও আনন্দ সৃষ্টি করা বটে, কিন্তু এ আনন্দ—"Rational enjoyment in which perfect repose is united with perfect energy."

(২) শৈল্পিক আনন্দের উৎস বুদ্ধি (Reason) নয়—হৃদয়। **শিল্পের মুখ্য আবেদন—বুদ্ধিতে নয় হৃদয়ে**। এ আনন্দ—"The glow of feeling which accompanies the contemplation of **What is perfect in art**"—থেকে উপজাত।

(৪) শিল্পের আনন্দ শিল্প-স্রষ্টার ভোগের জন্য নয়—শ্রোতা ও দ্রষ্টাদের জন্য।

(৫) এই প্রসঙ্গে এরিস্টটলের কয়েকটি অসঙ্গতির উল্লেখ করা যাক—তাঁর শিল্পদর্শন-অনুসারে শিল্পের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—রূপের মধ্যে ভাব

(আইডিয়া)-কে প্রকাশ করা; এ সিদ্ধান্ত না করে, তিনি আনন্দকেই শিল্পের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং করেছেন, খুব সম্ভব এই কারণেই যে, **রস-মাত্রার দ্বারাই শেষ পর্যন্ত প্রকাশের মাত্রা নিরূপিত হয়।**

(৬) **শৈল্পিক আনন্দ শিল্পরসাস্বাদন-জনিত আনন্দ যে-কোন আনন্দ (Any chance pleasure) নয়।**

পঞ্চম অধ্যায়—শিল্প ও নীতি (Art and Morality)

(১) দু'টি মত প্রচলিত :—

(ক) কাব্যের নৈতিক উদ্দেশ্য আছে—কবি মুখ্যতঃ শিক্ষক

(খ) কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—আনন্দ সৃষ্টি করা * (এরিস্টটলই প্রথম প্রচার করেন)

(২) **স্ট্রাবো** (২৪ খৃঃ পূঃ) দুটি মতের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—**ইরাটোস্থিনিসের** মতে—কবির কাজ **মনোহরণ করা,—শিক্ষা দেওয়া** নয়। তাঁর নিজের মতে কাব্য হচ্ছে প্রাথমিক দর্শন—জীবন-প্রবেশিকা॥

(৩) **প্লুতার্কের মতে—কাব্য দর্শনের প্রস্তুতি-পর্ব।**

(৪) এরিস্টফেনিসের মতেও—কাব্যের উদ্দেশ্য আনন্দের মধ্যে দিয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া।

(৫) **'পলিটিক্স্'** গ্রন্থে এরিস্টটল স্বীকার করেছেন—শিশুশিক্ষায় কাব্য ও সঙ্গীতের কার্য—নীতিশিক্ষা দেওয়া; যুবকদের মনেও কাব্য অনেক সময় মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু এই প্রভাবের মধ্যে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নিহিত নয়। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—আনন্দ সৃষ্টি করা।

*(৬) পোয়েটিকসে কাব্যের নৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয়নি। ট্র্যাজেডির লক্ষণেও এমন কোন কথা বলা হয়নি যাতে এ কথা বলা যায়—যে—"The office of tragedy is to work upon men's lives and to make them better" *["ক্যাথারসিস"—কথাটি বুচার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বলে একথা বললেন]

(৭) সাহিত্য বিচারে—বিশেষতঃ ইউরিপিডিসের নাটক আলোচনায় —এরিস্টটল ইউরিপিডিসের মতো, নীতিগত কোন প্রশ্ন তুলেননি।

(৮) মহাকাব্যের নায়ককে বা ট্র্যাজেডির নায়ককে 'ভাল' হ'তে হবে —এখানে 'ভাল' ব'লতে—'**Goodness is of the heroic order**'—ভাল বলতে নিরীহ, সাধু বুঝায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ট্র্যাজেডির উপযোগিতা (The Function of Tragedy.)

(১) "**ক্যাথারসিস্**" (Katharsis)—ট্র্যাজেডির উপযোগিতা এই কথাটার ব্যাখ্যা নিয়ে যত কথাকথান্তর হ'য়েছে আর কোন শব্দ নিয়ে তেমনটি হয়নি। প্রচলিত অর্থ এই যে—**ট্র্যাজেডি ভাবাবেগ শোধন করে তথা চিত্তশুদ্ধি করে; অতএব ট্র্যাজেডির নৈতিক উপযোগিতা অবশ্যস্বীকৃত।**

(২) **কর্নেই, রেসিন, লেসিঙ্** প্রভৃতি এই নৈতিক ফলশ্রুতির কথাই বলেছেন। গ্যেটে এদের কথায় সায় দেননি, তবে নিজের মতটিকেও পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারেননি।

(৩) **১৮৪৭ খ্রীঃ "এইচ্ঃ বেইল"**, রেনাসাঁর পরে প্রথম এ সম্বন্ধে নতুন কথা শোনান (ভাষাতত্ত্ব-কংগ্রেস—বেল্ ১৮৪৭)। *তারপর, **১৮৫৭ খ্রীঃ জেকব বার্নেস্** (Jacob Barnays)—'প্রশ্নটি তোলেন এবং নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। বার্নেস বলেন—ক্যাথারসিস্ শব্দটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষা, অর্থ—মোক্ষণ (পার্গেশান্); দেহের ওপর ওষুধের ক্রিয়ার মত, মনের ওপর ট্র্যাজেডির ক্রিয়া—এই তাৎপর্য বুঝাতেই ব্যবহৃত। প্লেটো, বিশেষতঃ মিল্টন অনেকটা এই রকমই বুঝেছিলেন।

(৪) এরিস্টটল 'পলিটিক্স্'-গ্রন্থে (৫ম-অধ্যায় ৮ম পরিচ্ছেদ) ক্যাথারসিস্ শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন—বার্নেস মহাশয় সেই অর্থেই পোয়েটিক্স্ এ প্রয়োগ ক'রেছেন এবং ক্যাথারসিস্ বলতে বুঝেছেন —"**emotional relief**"

(৫) এ কথা বলা দরকার—যে ট্র্যাজেডিতে, করুণার ও ভয়ের মোক্ষণ (Katharsis) এবং দিব্যাবেগের (Enthusiasm)—মোক্ষণ এক ব্যাপার নয়—যদিও উভয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

(৬) আবেগ-শাস্তি ছাড়াও ক্যাথারসিস্‌ শব্দটির আরো তাৎপর্য্য আছে। এ শুধু মনস্তাত্ত্বিক কোন ব্যাপার নয়, "ক্যাথারসিস্‌"—একটা **শিল্পতাত্ত্বিক ব্যাপার** (a principle of art)।

(৭) **হিপ্পোক্রেটিসের** ভৈষজ্য বিজ্ঞানে শব্দটির অর্থ—কোন বহিরাহৃত উদ্বেজক পদার্থকে দেহাভ্যন্তর থেকে বের করে দেওয়া বা মোক্ষণ করা। এই সূত্রে প্রয়োগ করলে বলতে হবে—শোচনা ও ভয় লৌকিক জীবনে উদ্বেজক ব্যাপার—ট্র্যাজেডি এই সব ভাবকে উদ্রিক্ত করে এবং উদ্বেগ নিষ্কাশিত করে—অপসারিত করে তথা চিত্তের উদ্বেগ প্রশমিত করে। * ট্র্যাজেডির রস যতই নিষ্পন্ন হয়, ততই উদ্বেজক আবেগ বিশুদ্ধ আবেগে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হয়—"The painful element in the pity and fear of reality is purged away"- এই আবেগের বিপরিণাম (transformation) থেকেই—ট্র্যাজেডির পরিশোধক ও শান্তিজনক প্রভাব উদ্গত হয়। সুতরাং ট্র্যাজেডি, শোক ও ভয় এই দুই ভাবাবেগের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করেই ক্ষান্ত হয় না। এ শুধু ঐ দুই আবেগকে মোক্ষণই করে না, **তাদের অলৌকিক রূপ দিয়ে, শিল্পরূপের মাধ্যমে, শোধন ও শুদ্ধও করে।**

(৮) তবে শোধন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এরিস্টটল কোন কথা বলেন নি। আভাস, ইঙ্গিত থেকে 'প্রক্রিয়া'টির রূপ এইভাবে গড়ে নেওয়া যেতে পারে —ক্যাথারসিস্‌ বলতে বুঝায়—বেদনাজনক ও উদ্বেজক কোন কিছুর অপনোদন। শোচনা এবং ভয়—("রেটোরিক" দ্রষ্টব্য) এক রকমের বেদনা। ভয় হ'চ্ছে—আসন্ন কোন মারাত্মক বিপত্তির আশঙ্কা জনিত বেদনা; আর শোচনা হ'চ্ছে—যার দুর্ভোগ আমরা চাইনা এমন কোন লোকের জীবনে সমুপস্থিত কোন বিপত্তির জন্য বেদনা-বোধ। সুতরাং ভয় এবং শোচনা পরস্পর নিরপেক্ষ ভাব নয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, 'ভয়' স্থায়ীভাব থেকেই শোচনা উপজাত। অলৌকিক নাট্য উপস্থাপনায় শোচনার রূপে কোন পরিবর্তন আসেনা; পরিবর্তন ঘটে 'ভয়' ভাবটিতে।

অলৌকিক ভয়ে আমাদের মধ্যে যে কম্প বা আতঙ্ক জাগে তা সহানুভূতি জনিত স্নায়বিক ক্রিয়ামাত্র—একটা নৈর্ব্যক্তিক আবেগমাত্র।

(৮) ট্র্যাজেডিরসে শোচনা এবং ভয়ের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থাকা চাই। এরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি **শুধু করুণরসের নাটক নয়, ভয়ানক অথবা করুণরসের নাটকও নয়, বা করুণ-মিশ্র-অদ্ভুত রসের নাটক নয়; ট্র্যাজেডি ভয়ানক-মিশ্র করুণরসের নাটক; কোনটিতে "করুণে"র প্রাধান্য, কোনটিতে "ভয়ানকে"র প্রাধান্য এই যা পার্থক্য।** অবশ্য এ কথাও তিনি স্বীকার করতে যেন প্রস্তুত যে কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর ট্র্যাজেডিতে, দুটির স্থলে একটি রসও নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

(৯) রসাস্বাদনের কালে দর্শক স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডীর ঊর্দ্ধে উন্নীত হয়। ব্যক্তি স্বার্থবোধ অন্তর্হিত হয়। দর্শক অপরের অদ্ভুত দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হয় এবং সমবেদনার আনন্দ উপলব্ধি করে। * **ট্র্যাজেডি এই জন্যই আনন্দ দেয় যে ভয় ও শোচনার মধ্যে একটা বিপরিণাম ঘটে—দর্শকে শুধু ভোক্তা হিসাবেই ঐ দুই ভাবের স্পন্দন অনুভব করে।** "It is precisely in this transport of feeling, which carries a man beyond his individual self, that the distinctive tragic pleasure resides. Pity and fear are purged of the impure element which clings to them in life. In the show of tragic excitement these feelings are so transformed that the net result is a noble emotinal satisfaction." যা' হোক, এরিস্টটল তাঁর ট্র্যাজেডির লক্ষণে, ক্যাথারসিস্‌ বলতে—উদ্বেজক ভাবের শৈল্পিক রূপান্তরের কথাই বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়—নাটকীয় ঐক্য (Dramatic Unities)

(১) "ঐক্য" বলতে "**নায়ক-ঐক্য**" বুঝায় না, ঐক্য—'**ঘটনা-ঐক্য**'

(২) **ঐক্যই** কাহিনীকে ব্যক্তি-সত্তার মর্যাদা দেয়

(৩) ট্র্যাজেডির ঐক্য হবে **জৈবিক ঐক্যের** মত—একটা ভাব-আত্মার জৈবিক বিকাশের মত—কেন্দ্রীয় একটি অঙ্গীর অঙ্গ ধারণের মত (an

inward principle which reveals itself in the from of an outward whole)।

(৪) 'ঐক্য'—**বাহুল্যের** (plurality) **বিরোধী, বৈচিত্র্যের বিরোধী নয়।**

(৫) "ঐক্য"—দুই অবস্থায় থাকতে পারে, এক **অঙ্গ-বিন্যাসের কার্য-কারণ—নিয়তির** মধ্যে, দুই—**সমস্ত ঘটনাকে একটি ভাব লক্ষ্যের অভিমুখী করে** গড়ে তোলার মধ্যে।

(৬) মহাকাব্যের গঠনে বিশালতা থাকায় "ঐক্য" খুব সুনিবিড় নয়।

*(৭) এরিস্টটল একটিমাত্র ঐক্যের কথাই বলেছেন—**"কাল ঐক্য"** **"স্থান ঐক্য"**—পরবর্তী যোজনা। কর্ণেই, ডেসিয়ে, বাত্তু প্রভৃতি "কাল-ঐক্য" ও "স্থান-ঐক্য" এর প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন।

অষ্টম অধ্যায়—আদর্শ ট্র্যাজেডি নায়ক (The Ideal Tragic Hero)

(১) **অতি ভাল** কোন লোকের, ঐশ্বর্যের কোল থেকে দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্যর মধ্যে অধঃপতন—শোচনা বা ভয়, কোনটিই জন্মায় না—শুধু আঘাতই দেয়। (ট্র্যাজিক নয়)

(২) **অতি মন্দ** লোকের অভ্যুদয়—ট্র্যাজেডি রসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এসব ক্ষেত্রে, এমন কি ন্যায়ের জয় দেখার আনন্দটুকুও পাওয়া যায় না। (ট্র্যাজিক নয়)

(৩) **অতি শয়তানের** ভাগ্য-বিপর্যয়—ন্যায়ের জয় প্রতিষ্ঠা করলেও ট্র্যাজিক নয়।

*(৪) ট্র্যাজেডি-নায়ক যেমন খুব **অতি ভাল** হবেন না, তেমনি **অতি মন্দও** হবেন না। নায়কের নৈতিক মান এই দুই "অতিকোটিকে"র মধ্যবর্তী হবে।

(৫) নায়কের ভাগ্যবিড়ম্বনা ঘটবে—কোন জঘন্য দোষের ফলে নয়, ঘটবে—চরিত্রের কোন ত্রুটির বা ভুলের জন্য।

(৬) নায়কের মর্যাদা—বংশে ও ধনেমানে, উচ্চ হওয়া আবশ্যক।

(৭) **প্রশ্ন**—নির্দোষ সৎপ্রকৃতিক ব্যক্তি নায়ক হ'তে পারবে না কেন? নির্দোষ ব্যক্তির ভাগ্যবিপর্যয় কি করুণা জাগায় না?

উত্তর দেওয়া হয়:—(ক) সাধু ব্যক্তির ভাগ্যে দুঃখদুর্ভোগ যতই ঘটুক তিনি অবিচলিতভাবেই তা সহ্য করেন। এই অটল সহিষ্ণুতা **বিস্ময়কর হয়—করুণ হয় না।**

*(খ) নির্দোষ সাধুতা (blameless goodness)—নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির পক্ষে তত উপযুক্ত নয়। নাটকীয় চরিত্র বলতে—আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী চরিত্র বুঝায়—খানিকটা আবেগী একগুঁয়ে এবং অহঙ্কারস্ফীত আধিপত্য-বিস্তারী চরিত্র বুঝায়। শান্ত শিষ্ট চরিত্র আর যাই হোক নাটকীয় হয়ে উঠে না। আদর্শপরায়ণ কোন শহীদের মৃত্যুতে আমাদের মধ্যে অদ্ভুত রসই জাগে। ভয়ানক ও করুণ রস জাগে না। খাঁটি ট্র্যাজেডিতে, মর্ত মানবকেই আমরা নিয়তির সঙ্গে—সে নিয়তি বাহ্য বা আন্তর যে শক্তিই হোক—অসম সংগ্রাম করতে দেখি এবং সেই সংগ্রাম শোচনীয় হয় তখনই যখন ব্যক্তি মৃত্যু-কবলিত হয় এবং সেই মৃত্যুর ফলে বিশ্বের নৈতিক বৈষম্য বিদূরিত হয়।

এই কারণেই, যেহেতু শহীদের মৃত্যুতে ব্যক্তির নৈতিক জয়ই ঘোষণা করে, বোধ হয়, শহীদের ভাগ্যবিপর্যয় ট্র্যাজেডির রস সৃষ্টি করে না।

(৮) অতিদুর্বৃত্ত নায়ক সম্বন্ধে এরিস্টটল যা বলেছেন তা সত্য বটে, কিন্তু একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে—এই সূত্র স্বীকার করলে, এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে নাটকীয় চরিত্র সম্পর্কে **এরিস্টটল শুধু 'নৈতিক মানে'র কথাই বলেছেন।** *অপরাধের জন্য অপরাধ নিন্দনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু অপরাধকে অন্যভাবেও রূপ দেওয়া যেতে পারে। **যে অপরাধের সঙ্গে অদ্ভুত সঙ্কল্প ও বুদ্ধির মহিমা যুক্ত হয়ে থাকে, সে অপরাধের অপরাধীকে সাধারণ অপরাধী বলা যায় না—সে অপরাধী সম্ভ্রমের পাত্র বটে।** ইচ্ছা-শক্তির স্ফূর্তি বিকৃতির পথে ঘটলেও তার মধ্যে **শক্তির নিছক প্রকাশের একটা মহিমা ও বিস্ময় আছে।** এই জাতীয় ইচ্ছা-শক্তির শোচনীয় পরিণতিও আমাদের মধ্যে এক ধরণের ট্র্যাজেডি

সংবিদ্‌ বা সহানুভূতি জাগায়—অবশ্য এই সহানুভূতি জাগে—একটা **শক্তি-সম্ভাবনার অপচয় বা ক্ষতি হয়ে গেল**—এই বোধ থেকেই। এ সহানুভূতি খাঁটি সহানুভূতি নয়—অনুচিত দুঃখ দুর্দশা ভোগ দেখে যে সমবেদনা জাগে সে সমবেদনা নয়। [(রীচার্ড—তৃতীয়) দৃষ্টান্ত]

(৯) ট্র্যাজেডি নায়কের পতন ঘটবে—**"এমারতিয়া"**র ফলে। **'এমারতিয়া'** —অর্থঃ—(ক) **জ্ঞানকৃত ভ্রম** (খ) **অজ্ঞানকৃত ভ্রম** (গ) **চরিত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটি** অর্থাৎ (any human frailty or moral weekness, a flaw of character that is not tainted by a vicious purpose. মোট কথা, বড় রকমের যেকোন ভুল—তা' নৈতিকই হোক আর যাই হোক—বড় রকমের কোন স্বভাবগত ত্রুটি—এক হিসাবে তা ত্রুটি অন্য হিসেবে তা' হয়ত মহৎগুণ—এককভাবে বা একত্রে নায়কের শোচনীয় পতনের বীজ বপন করতে পারে। নৈতিক ভুল ও বুদ্ধির ভুলের মধ্যে কোন বড পার্থক্য নেই।

*(১০) ট্র্যাজিক চরিত্রের লক্ষণ সম্বন্ধে এরিস্টটল যে আলোচনা ক'রেছেন ত'ার দু'রকম সমালোচনা হ'তে পারে। এক পক্ষের বক্তব্য—"ডি এমারতিয়া"—সূত্রটিতে ট্র্যাজেডির উপযুক্ত দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না। নায়কের পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা নয়—বাহ্যশক্তির দ্বারা। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি—যেখানে চরিত্রই নিয়তি—এরিস্টটলের নিয়ম অনুসারে সম্ভব নয়। এই বক্তব্যের উত্তরে বলা যায়—যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের কাছে 'এমারতিয়া' আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়,—এমন অবস্থা—যেখানে বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা নিষ্ফল। এরূপ সংকীর্ণ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করলেও, নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে যে শক্তি-দ্বন্দ্ব দেখান আবশ্যক তা'র অসদ্ভাব ঘটে না; যেখানে বাহ্য-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় বা অন্যের ইচ্ছা-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় সেখানেও ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব সম্ভব। যদি এ কথাও বলা যায় যে **"খাঁটি ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব"** —**হয় সেখানেই যেখানে স্বভাব ও হৃদয়াবেগই নিয়তির মতো কাজ করে**, যেখানে ব্যক্তি স্বকীয়

ইচ্ছার প্রেরণায় এমন এক দ্বন্দ্বের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে যা'র দু'পক্ষেই নৈতিক শক্তি বর্তমান, সেখানেও এরিস্টটলের সূত্র খাটে। (৩২৪ পৃষ্ঠা)

*(১১) তবে—এরিস্টটলের সূত্র অল্প পরিমাণে অব্যাপ্ত ॥ তাঁর সূত্রে—**অতি ভাল এবং অতি মন্দ চরিত্রের ট্র্যাজেডিযোগ্য পরিণামের সম্ভাবনা অস্বীকৃত হয়েছে তথা দু'শ্রেণীর ট্র্যাজেডির কথা বলা হয়নি :—** একে—"antagonism between a pure will and a disjointed world"—অন্যে—antagonism, "between a grand but criminal purpose and the higher moral forces with which it is confronted"—(৩২৫)

নবম অধ্যায় (ট্র্যাজেডিতে বৃত্ত এবং চরিত্র)
[Plot and Character in Tragedy]

(১) ছয়টি উপাদানের মধ্যে. প্রথম স্থান—বৃত্তের, দ্বিতীয় স্থান—চরিত্রের, তৃতীয় স্থান—মননের বা চিন্তার।

(২) 'বৃত্ত'—অর্থে ক্রিয়া (action) এবং সেই ক্রিয়া বাহ্য ও আন্তর উভয়ই।

(৩) 'ড্রামা, কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'করা' (doing)—প্রত্যক্ষরূপে ঘটনাকে উপস্থাপিত করা। বৃত্তেই এই রূপ প্রকটিত হয়—সুতরাং বৃত্তের স্থান প্রথম—এ সিদ্ধান্ত খুবই উল্লেখযোগ্য।

(৪) এরিস্টটল 'চরিত্র' (ইথোস) বলতে ব্যক্তির নৈতিক গুণপনার (moral elements) এবং 'মনন' (ডায়ানোইয়া)—বুদ্ধি-বিচারের শক্তির কথা (intellectual element) ধরেছেন।

(৫) বৃত্তের স্থান প্রথম—এই কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। (ক) বৃত্তই নাটকীয় ক্রিয়ার-সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের হেতু। (খ) আত্মা যেমন দেহের সমন্বয়ের হেতু, বৃত্তও তেমনি নাটকের অর্থৈক্য সৃষ্টি করে। (গ) যে সব উপাদান—ঘটনা-বিপর্যাসাদি—ট্র্যাজেডির রসনিষ্পত্তির প্রধান উদ্দীপক, তা বৃত্তেরই অংশ।

(৬) অবশ্য, বৃত্তের স্থান প্রথম—এ কথার অর্থ এই নয় যে বৃত্ত হবে জটিলবন্ধ—ঘটনা-কৌতূহল-সর্বস্ব অর্থাৎ খানিকটা জটিলতা ও কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারলেই বড় নাটক লেখা হ'ল * যে ঘটনা চরিত্রের দ্যোতক বা প্রতিফলক, সেই ঘটনার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

(৭) আধুনিক মত—'চরিত্রের স্থান প্রথম'—এ কথাটাকে অন্যভাবে কেউ কেউ (ডি কুইন্সি) বলেছেন—এইভাবে বলেছেন—প্রাচীন নাটক ছিল অদৃষ্টবিশ্বাসী নাটক সেখানে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার স্থান ছিল না। আধুনিক নাটকে ঘটনা চরিত্রের অধীন ; কারণ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার মর্যাদা স্বীকৃত। * এ কথাটা সত্য নয়। কারণ গ্রীক ট্র্যাজেডিতে—ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা তথা চরিত্রের অবকাশ যথেষ্ট মাত্রায় দেখান হয়েছে। অদৃষ্ট বা দৈব, চরিত্র-সৃষ্টির বাধা হয়নি, বাধা হয়েছিল—বিষয় নির্বাচনে পরাধীনতা—পৌরাণিক কাহিনীর নির্বাচন।

(৮) আধুনিক নাটকে চরিত্র-বিকাশের প্রবণতা যতই থাক এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য :—"Plot is artistically the first necessity of the drama, For the drama, in its true idea, is a poetical representation of a complete and typical action, whose lines converge on a determined end……"(৩৬৬)

দশম অধ্যায় (কমেডির সাধারণীকরণের শক্তি)

[The Generalising power of Comedy]

(১) কাব্য, এরিস্টটল-অনুসরণে বলা যায়—মানব-জীবনের সার্বজনীন রূপটির প্রকাশ—কাব্য-জীবনকে আদর্শায়িত করে।

(২) 'আদর্শায়িত' ("idealise") কথাটা দ্ব্যর্থক—প্রথম অর্থ (ক) কোন বিষয়কে তার চিরন্তন ও স্বরূপ ধর্মে প্রকাশ করা (representation of an object in its permanent and essential aspects) ॥ পোয়েটিক্‌সে শব্দটি এই অর্থেই প্রযুক্ত।

(খ) দ্বিতীয় অর্থ—লৌকিকের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখেই, অনুরঞ্জন মিশিয়ে, বিষয়কে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করা তথা বিষয়কে রূপে রসে যথাক্রমে উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলা [The object is seized in some happy and characteristic moment, its lines of grace or strength are more firmly drawn, its beauty is heightened, its significance increased, while the likeness to the original is retained.]

(৩) 'আদর্শায়িত রূপ সৃষ্টি করা' ব'লতে নির্দোষ নিষ্পাপ চরিত্র সৃষ্টি বুঝায় না। বলা বাহুল্য—এরিস্টটলের ট্র্যাজিক-নায়ক নির্দোষ-নিষ্পাপ নয়।

(৪) এখন, আদর্শায়িত রূপ ব'লতে যদি সার্বজনীন রূপ বুঝায়, তা হ'লে বলতে হবে—কমেডি বিষয়বস্তুকে আদর্শায়িত করতে পারে না, কারণ কমেডি রূপদান করে মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি, বোকামি ও বিকৃতি।

(৫) ত্রুটি-বিচ্যুতি, বোকামি ও বিকৃতির পারমার্থিক অস্তিত্ব আছে কিনা দর্শনের বিচার্য, কিন্তু শিল্পের জগতে, যেখানে মানুষের জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করা হয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি বিকৃতিকে স্বভাবের অঙ্গ বলেই মনে করা উচিত।

সব রকম ত্রুটি-বিচ্যুতিকে না বলা হোলেও কোন কোন বিচ্যুতিকে মানুষের চিরন্তন ও স্থায়ী বিকৃতি বলা যেতে পারে। কমেডি সেই সব বিকৃতিকেই রূপ দিতে চেষ্টা করে—জীবন ও চরিত্রের অসামঞ্জস্য ব্যক্ত করে বিকৃতি ও বিচ্যুতিকে হাস্যাস্পদ করে তোলে।

(৬) ট্র্যাজেডি ও কমেডি—উভয় শ্রেণীই সামান্য ধর্মকেই রূপ দিতে চায় এবং সেই চাওয়ার মধ্যেই উভয়ের ঐক্য আছে।

(৭) কমেডিও যে মানবের 'সামান্য' রূপকেই প্রকাশ করে—এ ধারণা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর এথেন্সবাসীর ছিল না। ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ-মূলক কমেডি দেখে দেখে স্বাভাবিক ভাবেই এরূপ ধারণা দেখা দিয়েছিল যে কমেডির আমোদ, অন্যের বিকৃতি দেখে হিংসাত্মক আনন্দ পাওয়ার আমোদ।

(ক) প্লেটো তাঁর '**ফিলেবাস**' গ্রন্থে এমনি ধরনের কথাই বলেছেন। তাঁর মতে—'হাস্যোদ্দীপক' দেখে যে আনন্দ হয়, সে আনন্দ জন্মে অপরের এমন কোন দুর্দশা দেখে যে দুর্দশা বেদনা উদ্রেক করে না। (খ) **হবসের মত** (The passion of laughter is nothing else but a sudden glory, arising from a sudden conception of some eminency in ourselves, by comparison of the infirmity of others or with our own formerly) অপেক্ষা, প্লেটোর মত আরো গভীর। (খ) এরিস্টটল আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছেন হাস্যোদ্দীপকের লক্ষণটি। তাঁর মতে—**যে বিচ্যুতি বা বিকৃতি ক্ষতিকর বা বেদনাদায়ক নয় তাই হাস্যকর।** এই লক্ষণে লক্ষ্য করবার বিষয়—'malice' অর্থাৎ বিদ্বেষের অভাবটুকু (আত্ম-গরিমাবোধের অভাবটুকু)। বিশুদ্ধ হাস্যের রূপটি এরিস্টটলের লক্ষণে ধরা পড়েছে।

(৮) খাঁটি কমেডি ও ব্যঙ্গাত্মক-কমেডির যে পার্থক্য তা' এরিস্টটল নির্দেশ করেছেন। একে—মানবজীবনের সনাতন বিকৃতি আর অন্য ব্যক্তির ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়।

(৯) কমেডি জীবনের গুরুতর কোন সমস্যাকে রূপ দেয় না, রূপ দেয় জীবনের লঘু ও বিকৃত আচরণকে—জীবনের নঙর্থক রূপকে (negative side) কমেডি জীবনের সম্পূর্ণ বৃত্তটিকে—সাবজনীন মানব-প্রকৃতিকে রূপ দিতে সমর্থ নয়।

(১০) ট্র্যাজেডি ও কমেডির সীমা-রেখা আধুনিককালে খুব স্পষ্টাকারে টানা যায় না। গুরু ও লঘু একাধারেই মিশে থাকতে পারে। ব্যঙ্গ-হাসির (**স্যাটায়ার**) মধ্যে আঘাত করার বা আত্মম্ভরিতার লক্ষণ থাকে বটে কিন্তু রসিকতার (**হিউমার**) মধ্যে সহানুভূতির মিশ্রণ ঘটে এবং জীবনের গভীর-দেশের সত্য এই হাসির মধ্যে ধরা পড়ে। হিউমার **melting-point of Tragedy and Comedy'**। এই গভীরদর্শী হিউমার বা রসিকতার মধ্যেই আধুনিক কমেডির **সার্বজনীনতা** গুণটি বিরাজ করে। **রসিকের**

চোখে ব্যক্তিগত বোকামি ব'লে কিছু নেই—আছে শুধু বোকার জগতে সার্বজনীন বোকামির চেহারা।

(১১) উপসংহার—"Comedy tends to merge the individual in the type, tragedy manifests the type through the individual ……Comedy, in its unmixed sportive form, creates **personified ideals**, tragedy creates **idealised persons**".

একাদশ অধ্যায়—গ্রীক-সাহিত্যে—কাব্যিক সার্বজনীনতা

(১) **অপ্রচলিত মত :**—(ক) কল্পিত কাহিনী নিয়েও ট্র্যাজেডি লেখা যেতে পারে।

(খ) ছন্দ না থাকলেও কাব্য হতে পারে।

(গ) নাটকের ক্রমবিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

(২) কয়েকটি সাধারণ সূত্র :—

(ক) **অতি বাস্তবতা—যথাযথ অনুকরণ—নিষিদ্ধ** (pure realism is forbidden).

(খ) **অতি-আদর্শায়ন—সাংকেতিক উপস্থাপনা নিষিদ্ধ** (pure symbolism is fobidden).

(গ) **উৎকল্পনার** (fancy) স্থানও আছে—(কমেডির ক্ষেত্রে)।

(৩) গ্রীকদের কাছে কবি-প্রতিভা একধরণের উন্মাদনা। এরিস্টটল্‌ও একস্থলে কাব্য-সৃষ্টিকে--"poetry is a thing inspired" বলেছেন। অবশ্য এ উন্মাদনা যুক্তিবিবর্জিত নয়।

(৪) নারী চরিত্র অঙ্কনে গ্রীক-প্রতিভার নিপুণ দক্ষতা।

(৫) দর্শন ও কাব্যের বিবাদ—এরিস্টটলের মীমাংসা।

(৬) ইতিহাস ও কাব্যের সম্পর্ক—

(৭) উপসংহার—বাস্তব ও আদর্শের জগতের মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান গ্রীকরা স্বাকার করেনি। **আদর্শ বাস্তবের বিপরীত নয় পরিপূরক ॥**

আচার্য বুচারের আলোচনার মর্ম-সংগ্রহ সামনে রেখে এবার আমি আমার আলোচনা আরম্ভ করছি। যে কারণে আমি বুচার-কৃত আলোচনার মর্ম সংগ্রহ করেছি তা' আগেই বলে এসেছি; এখানে আর একটি কথাও যোগ করতে চাই এবং সে কথাটি এই যে. যে-কোন সহৃদয় পাঠকই এইটুকু ধরতে পারবেন যে, আমি, এরিস্টটলের বক্তব্যরাজি, সাহিত্যতত্ত্বের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর হিসাবে, শ্রেণীবিভক্ত করতে চেষ্টা করেছি এবং শুধু তা' করেই ক্ষান্ত হয়নি—এরিস্টটলের পরে, সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে কত কি বলা হয়েছে না হয়েছে—বর্তমানে সেই জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে কি কি সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়েছে—তাদের ইতিহাস ও পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাও করেছি। ফলে এই আলোচনা, শুধু যে পোয়েটিক্সের বক্তব্যেরই বিশ্লেষণ হয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-তত্ত্বের আলোচনাতেও পর্যবসিত হয়েছে।—আমি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে আলোচনাকে বিভক্ত করে নিয়েছি :—

(১) শিল্প ও কাব্যশিল্পের স্বরূপ-লক্ষণ ॥ (Definition of Art)

(২) সৃষ্টির প্রেরণা ॥ (Art impulse)

(৩) সৃজন-ব্যাপার ॥ (Creation)

(৪) সৃষ্টির উদ্দেশ্য ॥ (Function of Art)

(৫) শৈল্পিক আনন্দ ॥ (Aesthetic pleasure)

(৬) সাহিত্য-শিল্পে শ্রেণীবিভাগ ॥ (Classification)

(৭) ট্র্যাজেডি ॥ (Tragedy)

(৮) কমেডি ॥ (Comedy)

(৯) মহাকাব্য ॥ (Epic)

(১০) সাহিত্য-বিচার ॥ (Criticism)

(১১) সাহিত্যে বাস্তবতা ও অন্যান্য মতবাদ ॥ (Realism and other 'isms')

শিল্পের ও কাব্যশিল্পের স্বরূপ-লক্ষণ

[The truth is that we do not go back to Aristotle so much for the right answers as for the right questions. To ask them is the first step towards truth]—Tragedy—Lucas.

সংজ্ঞা নিরূপণ করাই বোধ হয়, বুদ্ধি-শক্তির সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। সামান্য ধর্ম (genus) নির্ধারণ করা তেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয় বটে কিন্তু যাকে বলা হয়—"বিলক্ষণ বা বৈশেষিক লক্ষণ।"—(differentia) সেই লক্ষণটি নির্দেশ করা খুবই দুঃসাধ্য কার্য এবং সেই কার্যের সাফল্যের মাত্রা যে পরিমাণে বেশী, সেই পরিমাণেই বুদ্ধির নৈয়ায়িক সামর্থ্য। অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহার করে লক্ষণ নিরূপণ করার জন্য প্রথম শ্রেণীর নৈয়ায়িক বুদ্ধি আবশ্যক। বাস্তবিক, একদিকে অব্যাপ্তি, অন্যদিকে অতিব্যাপ্তি এই দুই দোষ-রেখার মাঝখানে সংজ্ঞার ব্যাপ্তিটিতে সংযত রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। একদিকে প্রজাতির প্রত্যেক ব্যপ্তিটিতে অবিরোধে প্রযুক্ত হবে, অন্যদিকে জাতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রজাতি থেকে বিশেষ প্রজাতিটিকে পৃথক করবে—সেখানেই তো সংজ্ঞার সার্থকতা।

শিল্পের বিশেষতঃ কাব্য-শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে এবং স্বরূপ-বিচারে গ্রীক-মনীষা কতটুকু চেষ্টা করেছে এবং কতখানি সাফল্যলাভ করেছে এই পরিচ্ছেদে সেই কথাই বিবৃত করা হবে এবং বিশেষ করে আলোচনা করা হবে—এরিস্টটল কাব্য-শিল্পের স্বরূপ বিচারে সত্যের কতখানি কাছাকাছি পৌছেছেন।—বলা বাহুল্য, এ জন্য এরিস্টটলের পরবর্তী মতবাদগুলো অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।

হোমারের মহাকাব্যে 'শিল্পতত্ত্বের' আভাস

হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' মহাকাব্য গ্রীসের সাহিত্য-শিল্পের আদিম নিদর্শন। এর আগেও অবশ্য গ্রীসে জীবনের, জীবনস্পন্দনের—মানুষের জ্ঞান-অনুভব-কর্মের ইতিহাস আছে; তবে সে ইতিহাস অপরিস্ফুট—বলা চলে অনুমানগম্য। সুতরাং আদি কবি হোমার থেকেই আমরা এই জিজ্ঞাসার উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারি। একথা সত্য, আগে ভাষা পরে ব্যাকরণের জন্ম, তেমনি

আগে শিল্পসৃষ্টি—জীবনের সহজ আবেগেই অবোধপূর্বক শিল্পসৃষ্টি, পরে শিল্পতত্ত্বের উৎপত্তি। সহজ অনুভূতি বা সমবেদনা থেকেই বাল্মীকির মুখে প্রথম শোক-বচন উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তারপর তাঁর মনে প্রশ্ন জেগে-ছিল—'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'—আমি এ কি বল্লাম? এই 'কি'-র উত্তরই যুগে যুগে দেওয়া হয়ে আসছে এবং তারই নাম শিল্প-তত্ত্ব মীমাংসা। আগে সৃষ্টি পরে সৃষ্টি-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা এবং সেই সব জিজ্ঞাসার পূরণ—দর্শন।

হোমার কবি। তাঁর কাছে শিল্প-দর্শন প্রত্যাশা করা বেশী আশা করা। সত্যই তো, কাব্যে তত্ত্ব আলোচনার প্রত্যক্ষ অবকাশ কোথায়? যদি কোন তত্ত্বকথা শিল্পে এসে যায়, আসে পরোক্ষভাবে। হোমারের কাব্যেও শিল্প-তত্ত্বের আভাস যেটুকু পাওয়া যায় তা' সচেতন শিল্পতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ফল নয়, শিল্প-স্বরূপের অবোধচেতনামাত্র। ইলিয়াড মহাকাব্যের অষ্টাদশ সর্গে (Book—XVIII ; Armour for Achilles), গ্রীক-বিশ্বকর্মা হেপাইসটুস (Hephaestus) একিলিসের জন্য যে ঢালখানি নির্মাণ করেছিলেন তার বর্ণনা আছে ; সেই বর্ণনা থেকে জানা যায়—ঢালখানিতে পাঁচটি স্তর ছিল এবং তাতে চিত্তাকর্ষক নানা বিচিত্র দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছিল।

(১) প্রথমটি—সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রমণ্ডলখচিত আকাশ, আকাশের তলে পৃথিবী এবং সমুদ্রের দৃশ্য অঙ্কিত। (২) দুইটি সুন্দর নগরী (ক) একটিতে বিবাহোৎসব ও ভোজনোৎসবের দৃশ্য—বরযাত্রা ও নৃত্য-গীত-বাদ্যের দৃশ্য (খ) অন্যটিতে—যুদ্ধের দৃশ্য—যুযুধান দুইপক্ষের সামরিক সাজসজ্জার ও আস্ফালনের দৃশ্য। (৩) কর্ষিত ভূমির দৃশ্য—চাষীরা হল চালনা করছে। ভূমিটি যদিও স্বর্ণে নির্মিত, কর্ষিত ভূমি যেমন কালো দেখা যায় তেমনি কালো দেখাচ্ছে (The field, though it was made of gold, grew black behind them, as a field does when it is being ploughed. The artist had achieved a miracle.) (৪) রাজার শস্যক্ষেত্র—কাস্তে হাতে কৃষকরা শস্য কাটছে—পিছনে সারি সারি শস্যের গোছা পড়ে রয়েছে কিছু কিছু আটিবাঁধাও হ'য়েছে। রাজা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আরো পিছনে 'ওক' গাছের তলায় রাজার অনুচররা ভোজ্য প্রস্তুত করছে······(৫) দ্রাক্ষা-

কুঞ্জ—গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষা ঝুলছে। দ্রাক্ষাফলগুলো সোনার, বোঁটাগুলো কালো,—ঠেকনা-দেওয়া দণ্ডগুলো রূপোর। চারপাশে খাদ—সবুজ এনামেলের এবং তার ওদিকে বেড়া—টিনের। সরু একটা পথ—ঝুড়িতে করে ছেলেমেয়েরা আঙ্গুর ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে—পিছনে পিছনে একটি বালক বীণা বাজাতে বাজাতে চলেছে, ছেলে-মেয়েরা বাজনার তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। (৬) একপাল সরলশৃঙ্গ পশু—গোরুগুলো সোনার আর টিনের। চারজন গোপালক—তাঁদের সাথে আছে নয়টি কুকুর। পালের সামনে জুটো বন্য সিংহ একটা ষাঁড়কে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে—ষাঁড়টা চীৎকার করছে, গোপালক আর কুকুরগুলো উদ্ধার করতে ছুটে যাচ্ছে। সিংহটা ষাঁড়টাকে ছিঁড়ে ফেলে, তার রক্ত ও নাড়ীভুড়ি চাটছে—কুকুরগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

(৭) এরই পাশে দেখানো হয়েছে সুন্দর একটা উপত্যকায় বড় একটা চারণ-ভূমি, শাদালোমের মেষ চরছে, তাতে…গোলাবাড়ীর দালান ও কুঁড়ে ঘর সমূহ। (৮) নৃত্য-প্রকোষ্ঠ—হাত ধরে ধরে যুবক-যুবতীরা নাচছে—মেয়েদের পরণে পশমের কাপড়—মাথায় জড়ানো ফুলের মালা। ছেলেদের কটিবন্ধে ছোরা ঝুলছে। কুম্ভকারের চাকার মত তারা ঘুরে ঘুরে নাচছে। পাশে বিরাট এক জনতা দাঁড়িয়ে নাচ দেখছে—একজন চারণ-কবি বীণার সঙ্গে গান করছে।

(৯) ঢালখানির পরিধি ঘুরিয়ে সমুদ্রের প্রবাহ।

শিল্পী বটে! প্রকৃতির ও জীবনের প্রতিরূপ—বাস্তবকল্প প্রতিরূপ কী দক্ষতার সঙ্গেই না সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রয়োজনের সামগ্রী "ঢাল"কে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য এঁকে এঁকে 'সুন্দর'—মনোহর আনন্দের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে। শিল্পী রূপকার—রূপদক্ষ। যত রূপের বাস্তবকল্পতা তত তার চমৎকারিত্ব—তত শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা। "The artist had acheived a miracle."—হোমারের মুখে হেফাইসটুসের শিল্পনৈপুণ্যের তথা শিল্পেরও প্রথম মুগ্ধ সমালোচনা। যেন শিল্পে যত প্রকৃতের প্রতিরূপ—বাস্তবের মায়া (illusion) সৃষ্টি হয় তত শিল্পের—"miracle" চমৎকারিত্ব—তত মনোহারিত্ব,

তত আনন্দদায়কত্ব। হোমার যেন বলতে চান—শিল্প হচ্ছে প্রতিরূপ-রচনা—প্রকৃতির প্রতিরূপ—মানব-জীবনের প্রতিরূপ সৃষ্টি। কিন্তু সব শিল্পই কি, তাই? বাদ্যের তালে তালে নৃত্য ও গান—আনন্দের গনি, দুঃখের গান, গানে দেবতার প্রশস্তি—মানুষের প্রশস্তি—সেগুলি? সেগুলিও কি প্রতিরূপ রচনা? ঐ যে নগরীর দৃশ্যে—(২নং) বিবাহোৎসবের রূপ রচনা করা হয়েছে—সেই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে, বাদ্য আছে নৃত্য আছে আর আছে বিবাহ-গীতি (wedding hymn)। তারপর ৮নং দৃশ্যে—চারণ-কবিকে (minstrel) বীণা সহযোগে গান করতে দেখা যায়; এই গানও ঐ নৃত্যোৎসবের অঙ্গ, অর্থাৎ চারণ-কবি গান করে মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। চারণ-কবিরা মানুষকে আনন্দ দেয়—"make men glad",—এ কথা অডিসি-মহাকাব্যে বলা হ'য়েছে। এখন প্রশ্ন—বাদ্য-নৃত্য-গানও কি জীবনের প্রতিরূপ রচনা? বাদ্য নির্বাক ধ্বনি, নৃত্যও নির্বাক দেহভঙ্গী, গান সবাক স্বরোচ্ছ্বাস। এদের প্রতিরূপত্ব কোথায়? বাদ্য ধ্বনি-তরঙ্গ দ্বারা, নৃত্য দেহ ভঙ্গিমা দ্বারা, গান কথা ও সুরের দ্বারা, আসলে কাকে ব্যক্ত করে? এদের মধ্যে মানুষ এমন কি পায় যার জন্য তারা আনন্দিত হয়? হোমার এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত নন। আর সে প্রত্যাশাও অন্যায়। তবে আমরা হোমারের ধারণাটুকু অনুমান না করতে পারি এমন নয়—শিল্প হোমারের মতে,—প্রকৃতির ও জীবনের প্রতিরূপ-কল্পনা; শিল্পের উদ্দেশ্য—(রূপ-চমৎকার দ্বারা) আনন্দদান করা। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে হোমারের মতে—শিল্প-সৃষ্টির মূল প্রেরণা আসে "মিউজ"-এর কৃপা থেকে (ইলিয়ড ২য় সর্গ—দ্রষ্টব্য)। হোমারের এই অতিপরোক্ষ আলোচনার পরে, শিল্পের সংজ্ঞা সম্বন্ধে না হলেও, শিল্পের 'প্রেরণা' নিয়ে এবং 'উদ্দেশ্য' নিয়ে থাপছাড়া আলোচনা হয়েছে। **পিণ্ডার** (Pinder) সৃষ্টিতে দৈব প্রেরণার ও কলানৈপুণ্যের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। **হিরাক্লিটাস জেনোফেনিস** প্রমুখ দার্শনিকরা শিল্পে নীতির প্রশ্ন তুলেছেন। **থুসিডাইডস,** উত্তরসাধকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। **সিমোনাইডসের** বিখ্যাত উক্তিটি—"চিত্র হচ্ছে

নীরব কবিতা, আর কবিতা হচ্ছে মুখর চিত্র" শিল্পের সংজ্ঞা-নিরূপণের চেষ্টাকেই সাহায্য করেছে। অবশ্য এই সব মন্তব্যকে আলোচনা বল্লে একটু বেশী মর্যাদাই দেওয়া হবে। তবে এদের মধ্যে শিল্পীদের নিজেদের ধারণা যে ব্যক্ত হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আরো স্পষ্ট চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে—নাট্যকার এরিস্টফেনিসের মধ্যে। নাট্যকার তাঁর কমেডি-নাট্য "দি ফ্রগ্‌স্-" এর মধ্যে, ঈস্কিলাস ও ইউরিপিডিসের কল্পিত তর্ক-বিতর্কের সাহায্যে—শিল্পতত্ত্বের কয়েকটি সমস্যার অবতারণা করতে চেষ্টা করেছেন। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে, নাট্যকার শিল্পের সংজ্ঞা-নিরূপণের দিকে দৃষ্টি দেন নি; দৃষ্টি দিয়েছেন—কাব্য-সমালোচনার দিকে—কবির বড়ত্ব কোথায়, কাব্যের উদ্দেশ্য কি—এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করবার দিকে। এখানেও আলোচনা পরোক্ষ। ইউরিপিডিস্ যখন বলেন—"I'll match my plots and characters against him. My sentiments and language and what not: Ah! and my music too··· ··· ···" তখন মুখ্যতঃ তুলনামূলক সমালোচনার প্রশ্নই তোলেন বটে কিন্তু পরোক্ষভাবে কাহিনী-কাব্যের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কাহিনী, চরিত্র এবং ভাবাবেগ সমবায়ে, জীবনের প্রতিরূপ রচনাই যে নাট্য শিল্পের উদ্দেশ্য এ কথা মুখে না বল্লেও বুঝতে বাকী থাকে না। ইউরিপিডিস যখন বলেন—"Whether scenes and sentiments agreed with truth and Nature".—তখন মুখ্যতঃ শিল্পের বাস্তবতা-অবাস্তবতার প্রশ্নই তোলেন বটে কিন্তু পরোক্ষভাবে রস-সাহিত্যের ধর্মের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মোট কথা সাহিত্য-শিল্পের বিষয়বস্তু যে জীবনের ঘটনা ও আবেগ—এই ধারণাটি যেন এই পর্যায়ে সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (সাহিত্যের উদ্দেশ্য-আলোচনা প্রসঙ্গে এরিস্টফেনিসের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হবে)।

এরিস্টফেনিসের পরে—সক্রেটিস-শিষ্য এবং এরিস্টটল-গুরু দার্শনিক প্লেটোর আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা-নিরূপণে প্লেটোর প্রয়াস আমাদের সত্যের লক্ষ্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে! Ion'

নামক "ডায়লোগ" থেকে একটা উদ্ধৃতি তুলে আলোচনায় প্রবেশ করলে সুবিধা হবে—সক্রেটিসের মুখে প্লেটো বলছেন—কবিরা—"do no attain to excellence through the rules of any art, but they utter their beautiful melodies of verse in a state of inspiration and as it were possessed by a spirit not their own...... For a poet is indeed a thing ethereally light, winged and sacred, nor can he compose anything worth calling poetry until he becomes inspited and as ti were mad, or whilst any reason remains in him. *Eor whilst a man retains any portion of the thing called reason he is utterly incompetent to produced poetry or to vaticinate. প্লেটোর উক্তি-টি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌছনো যেতে পারে : (ক) শিল্প-সৃষ্টি দৈব-প্রেরণার আবেশের মত একটা আবেশের অবস্থায় সম্ভব (খ) আবেশ-বিভোর অবস্থার অর্থ—আবেগোদ্দীপিত অবস্থা—যে অবস্থায় বিচার-বিকল্প নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। (গ) কবিতা যুক্তি বা বুদ্ধির সৃষ্টি বা কাজ নয়—যথার্থ—আবেগর (inspiration) সৃষ্টি লক্ষণীয় এই যে, তত্ত্ব বুদ্ধি-গ্রাহ্য আর কাব্য অনুভব-সাধ্য এবং হৃদয়সংবেদ্য—এই ধারণার উদ্ভব প্লেটোর মস্তিষ্কেই প্রথম দেখা যায়। শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে রস-সাহিত্যের বিলক্ষণ পার্থক্য যেন এখানেই যে শাস্ত্রসাহিত্যের সৃষ্টি হয়—যুক্তিবিচার (Reason) থেকে, আর রসাসাহিত্যের সৃষ্টি হয়—ভাবাবেশ (inspiration) থেকে। **'রিপাবলিক'**-গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে 'শিল্পকলার বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা' থেকেও প্লেটোর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেটোর মতে—শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে অনুকরণ [imitation মাইমেসিস্] এবং সেই "imitation is a beggar wedded to a beggar and producing beggarly childan"। ভীষণ কঠোর মন্তব্য সন্দেহ নেই। কিন্তু প্লেটোর দার্শনিক দৃষ্টি কোণ ঠিকই আছে। প্লেটো এই সিদ্ধান্ত করবার আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন—'all imitation produces its own work quite removed from

truth and also associates with that element in us which is removed from insight and is its companion and is friend to no healthy or true purpose—অর্থাৎ শিল্পের জন্ম তত্ত্বজ্ঞান (truth) থেকে নয়—আবেগ থেকে, শিল্পের আবেদন তত্ত্ববুদ্ধিতে নয়—হৃদয়াবেগে এবং শিব ও সত্যের সঙ্গে শিল্পের যোগ নেই। সুতরাং—অনুকরণ নিজে সত্যের কাঙাল, সত্যে বিপরীত অন্ধ-আবেগের সাথেই তার সম্পর্ক আর তার ফলে মিথ্যারই জন্ম। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে "Ion"—ডায়লোগের মধ্যে প্লেটো কবিদের 'তত্ত্বজ্ঞানবঞ্চিত' 'যুক্তিলেশহীন' বলে ঘোষণা করেছেন বটে কিন্তু কবিরা যে সত্যলেশবর্জিত এ কথা বলেননি। দৈব-প্রেরণাবাদ স্বীকার করলে—কবিরা দৈব-প্রেরিত এ কথা মানলে, অবশ্যই এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে কাব্যও "devine as coming from the God" স্বীকার করতে হয়—Poets are the interpreters of the divinities, কবিরা ভাষ্যকার (interpreters) কবিরা মধুকর—these souls flying like bees form flower to flower and wandering over the gardens and meadows and the honey-flowing fountains of the Muses return to us laden with the sweetness of melody and arrayed as they are in the plumes of rapid **imagination they speak the truth** (Ion) কবিরা যে সবই মিথ্যা বলেন না—এ স্বীকৃতি এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে এই কথাটাও যে inspiration—একেবারে 'beggar' নয়। মনে হয় একদিকে 'আইডিয়াবাদ, অন্য দিকে—দৈবপ্রেরণাবাদ আর একদিকে যুক্তি ও আবেগের স্বরূপ বিচার—এই তিনটানায় পড়ে, প্লেটোর চিন্তা দ্বন্দ্ব-মুক্ত হতে পারেনি। আইডিয়াবাদের দিক থেকে—'imitation' সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে, দৈব প্রেরণাবাদের দিক থেকে imitation—'speak the truth' এবং যুক্তি ও আবেগের সম্পর্কের দিক থেকে—আবেগজনক ব'লে সত্যলাভের পরিপন্থী। যাহোক প্লেটো বেশ সচেতনভাবে সাহিত্য-শিল্পের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য যে 'জ্ঞানের

কথা' নয়—'ভাবের কথা'—এই ধারণার সূত্রপাত প্লেটোর মধ্যেই হয়েছে।

আর একটা কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (শিল্প অনুকরণ (mimesis)—এই কথাটির তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝতে হলে 'অনুকরণ' শব্দটির তাৎপর্য আগে বুঝতে হবে। অনুকরণ প্রকৃতির বা জীবনের প্রতিরূপ (image) রচনা—imitation "of an appearance" (Republic 340) এ পর্যন্ত বুঝতে বিশেষ বাধা নেই। শিল্পীরা—"The maker of the image the imitator, we say, has no understanding of what is, but only of what appears"—(Republic—344) কিন্তু যেখানে রূপ নাই, আছে ভাব ও ভাবাত্মক ভাবনার অভিব্যক্তি, সেখানে "অনুকরণ" কথাটা প্রযোজ্য হতে পারে কি? বলা বাহুল্য এই প্রশ্নটির মীমাংসার উপরে রূপবাদের বা কল্পনাবাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ব্যক্তিগত ভাবের প্রকাশকে কোন্ অর্থে অনুকরণ বলা যায়—অনুকরণবাদীর কাছে সব চেয়ে বড় সমস্যা এই প্রশ্নটি। (প্লেটো "রিপাবলিক" গ্রন্থে একস্থলে লিখেছেন হোমার ভেষজ-তত্ত্ব জানতেন একথা ঠিক নয়; তিনি ছিলেন "imitator of medical discourses"। "Understanding" অর্থাৎ "তত্ত্বজ্ঞান" এবং imitation "অনুকরণ-এর মূল পার্থক্য সম্বন্ধে প্লেটো সচেতন হয়েছেন দেখা যাচ্ছে। সাহিত্যে যে 'ভাবনা' প্রকাশ পায় তাও তাঁর মতে অনুকরণ—ব্যক্তিরই অনুকরণ। কোন বিষয়ের তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশ করা আর তত্ত্বের অনুকরণ করা এক কথা নয়। লক্ষণীয়—প্লেটো বলেছেন—হোমার তার কাব্যে যে ভেষজ-তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তা জ্ঞান নয়, চিকিৎসকদের আলাপ-আলোচনার অনুকরণ। অর্থাৎ অনুকরণ শুধু "রূপ"-কল্পনা নয়—ব্যক্তির ভাব-ভাবনা, আলাপ-আচরণ সব কিছুরই উপস্থাপনা—এক কথায় ব্যক্তির বা বিশেষেরই উপস্থাপনা। মনে হয় এই ব্যাপকতম অর্থেই প্লেটো 'অনুকরণ কথাটাকে প্রয়োগ করেছেন।) তা না করলে দেবস্তুতি (poetry as are hymns to the gods) প্রশস্তি কাব্য (praises of good men) সব কিছুই অনুকরণের অন্তর্ভুক্ত হবে কি করে? আমার মনে হয়—প্লেটো

এই কথাই যেন বলতে চান যে শিল্পী আবেগভরে (inspired) রূপ ভাব যা'ই প্রকাশ করুন সবই অনুকরণ ব্যাপারের অধীন। দেবস্তুতি, প্রশস্তি এবং গীতি এই অর্থেই অনুকরণ যে শেষ পর্যন্ত তারা বিশেষ বিশেষ ভাবেরই অভিব্যক্তি—ভাবেরই রূপ। আবেগের ব্যক্তি নিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই বলে যখনই তা ব্যক্ত হয় তখনই ব্যক্তির আবেগ রূপেই ব্যক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং আবেগকে রূপ দেওয়া বলতে বুঝায় ব্যক্তির আবেগেরই প্রকাশ। এই অর্থেই—গীতিকবিতা বা মনন প্রধান আধুনিক কবিতাকে —ভাবাবেগের বা ·অভিজ্ঞতার অনুকরণ বলা যেতে পারে। ব্যক্তির আবেগ রূপে তা' বিশেষ বটে কিন্তু অভিব্যক্তিরূপে তা' নৈর্ব্যক্তিক।

তবে অনুকরণ বলতে যে সাধারণত মানব-জীবনের অনুকরণ বুঝায়—এর প্রমাণও আছে। রিপাবলিক-গ্রন্থে 'অনুকরণ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে প্লেটো লিখেছেন—"Imitation, we say, imitates men acting compulsorily, or Voluntarily thinking that in the event they have done well or ill and throughout either feeling pain or rejoicing" কিন্তু প্রশ্ন না উঠে পারবে না—কাহিনী-কাব্য সম্পর্কে একথা হয়ত সত্য, কিন্তু কবি যেখানে নিজের কথা বলেন, সে ক্ষেত্রে অনুকরণ কোথায়! মহাকাব্য কাব্য এবং নাটকের ক্ষেত্রে "জীবনের অনুকরণ" কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু দেবস্তুতি বা প্রশস্তি-কবিতার ক্ষেত্রে, কবির ব্যক্তিগত ভাবাবেগের প্রকাশের ক্ষেত্রে (subjective poetry) অনুকরণ কথাটি কোন অর্থে প্রয়োজ্য? কোন চরিত্রের ভাব ও ভাবনার প্রকাশ হিবাবে, 'medical discourse'-এর মতো, অন্যান্য ভাবনাও হয়ত কাব্যে আসতে পারে কিন্তু গীতিকবিতাকে, নীতিমূলক কবিতাকে অনুকরণ বলা যাবে কোন্ অর্থে?

(প্লেটোর পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে কাব্যের বা অনুকরণের সামগ্রী—জীবনের রূপ—ব্যক্তিচরিত্র হৃদয়াবেগ এবং ঘটনা। হৃদয়াবেগ (sentiments and emotions) পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমেই ব্যক্ত হোক—অথবা কবির মাধ্যমেই ব্যক্ত হোক—এই অর্থেই তো অনুকরণ যে তাতে বিশেষ ভাবের একটা "Form"—"actual Form"—nature maker-এর হাতে-গা

"form"-এর অনুকৃতিই ব্যক্ত হয়। বিশ্লেষণ করে বল্লে এইভাবে বলা যায় যে, যখন কোন কবি আধ্যাত্মিক আবেগকে বা নৈতিক আবেগেকে বা কোন প্রেমের আবেগকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন তখনও বিশেষ ভাবের অদৃশ্য পরাদর্শকেই (actual Form) ব্যক্ত তথা অনুকরণ করতে চান। এই অর্থে ই গীতিকবিতা নীতিমূলক কবিতা এবং দার্শনিক কবিতা (এমন কি আধুনিক মনন প্রধান কবিতাও) অনুকরণ বিশেষ অর্থাৎ সামান্য সত্যেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। বাইরের দিক থেকে দেখতে যা সৃষ্টি (creation) ভিতরের দিক থেকে তা অনুকরণ (imitation) রূপ-রচনা।

মনীষী এরিস্টটল শিল্পের এই প্রচলিত সংজ্ঞাটিকেই (Art is imitation mimesis) গ্রহণ করেছেন এবং সংজ্ঞাটির তাৎপর্য স্পষ্টতর করবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টাতেই তাঁর বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এরিস্টটলের মতে = শিল্পের সামান্য ধর্ম—'অনুকরণ' (imitation)। মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ডিথিরাম্বিক কবিতা, বাঁশীর এবং বীণার সঙ্গীত—সামান্য ধর্মের দিক দিয়ে অনুকরণেরই রূপ বিশেষ। এদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য ঘটে তিন বিষয়ে—মাধ্যম (medium) বিষয়বস্তু (objects), অনুকরণ-রীতি (mode of imitation) মোটকথা, প্লেটোর মতো এরিস্টটলেরও মতে, শিল্পের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'অনুকরণ'। সুতরাং সাহিত্য-শিল্পেরও বৈশেষিক লক্ষণ—"অনুকরণ"। অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পের পার্থক্য এই যে সাহিত্যিক অনুকরণের মাধ্যম হচ্ছে—"ভাষা"। (একের সহিত অন্যের পার্থক্যের জন্য 'শ্রেণী-বিভাগ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই মাধ্যমের হিসাবে, সাহিত্যকে আমরা ভাষাশিল্প বলতে পারি। কিন্তু তাই বলে ভাষাতে যা কিছু প্রকাশ করা হয় তাই যে সাহিত্য-শিল্প অর্থাৎ রসসাহিত্য তা' নয়। এরিস্টটলই প্রথম সচেতনভাবে অন্যান্য বাঙ্ময় রচনা থেকে সাহিত্যকে পৃথক করতে চেষ্টা করেছেন।

দর্শন—বিজ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্ব বিদ্যা থেকে এবং বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তির বিবরণ—ইতিহাস থেকে, সাহিত্য কোন্ বৈশেষিক লক্ষণে পৃথক—এরিস্টটলই প্রথমে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করেন। ছন্দে লিখলেই যে

কাব্য হয় না এবং ছন্দের লেখা শাস্ত্র ও কাব্যের মধ্যে যে ধর্মগত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে—এ কথা এরিস্টটলই প্রথম স্পষ্ট করে বলেন। হোমারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক এম্পিডোকলসের এবং ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে এরিস্টটল সাহিত্য-শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণটি নির্ধারণ করতে যে চেষ্টা করেছেন তার মূল্য পরবর্তী আলোচনা ধারা দেখলেই বুঝা যায়।

প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন—"Even when a treatise on medicine or natural science is brought out in verse the name of poet is by custom given to the author ; and yet Homer and Empedocles have nothing in common but the metre, so that it would be right to call the one poet, the other physicist rather than poet"। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান বিষয়ক বা প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছন্দে লেখা হলেও লেখককে কবি বলা চলবে না। হোমার এবং এম্পিডোকলসের মধ্যে এক ছন্দ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ঐক্য নেই। হোমার কবি, এম্পিডোকলস্‌ প্রকৃতিবিজ্ঞানী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক। প্রশ্ন তা' হলে কবির সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের আসল পার্থক্য কোথায়? এরিস্টটলই যে উত্তর দিয়েছেন তাতে 'অনুকরণ'কে বিলক্ষণ লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন—বলেছেন—"as if it were not the imitation that makes the poet......অর্থাৎ কবির কাজ 'অনুকরণ'—কাব্যের বৈশেষিক ধর্ম—"অনুকরণ"।

কিন্তু এ কথা বলায়, 'অনুকরণ' শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত বিশেষ কিছু বলা হয় না। যদিও এরিস্টটল এ সমস্যা ছুঁয়ে গেছেন—বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করেননি, তবু ইঙ্গিত যা দিয়েছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যটুকু অনুধাবন করা যাক। এম্পিডোকলসের সঙ্গে হোমারের আসল পার্থক্য কোথায়? নিশ্চয়ই রীতিতে নয়, কারণ উভয়েই ছন্দে লিখেছেন; তবে কোথায়? সংক্ষিপ্ত উত্তর—'অনুকরণে'। সংক্ষিপ্ত হলেও, উত্তরটির না-বলা কথা এই যে—বৈজ্ঞানিক করেছেন তত্ত্ব-বিচার-

যুক্তি দিয়ে দিয়ে তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা, আর কবি করেছেন—রূপে-ভাবে-ভাবনায় ব্যক্তি চরিত্রের মাঝ দিয়ে জীবনের রূপ প্রকাশিত, সেই জীবনেরই প্রতিরূপ রচনা তথা রূপ ও রসের সৃষ্টি। হোমার তার কাব্যে যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলেছেন, যে 'মনন' (thought) প্রকাশ করেছেন, তা'তে মুখ্যতঃ তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নেই, আছে চরিত্রের বা ঘটনার রূপ ব্যক্ত করার চেষ্টা। সেখানেই বিশুদ্ধ মননের সঙ্গে কবি মননের পার্থক্য। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই—বোধহয় প্লেটো লিখেছেন—imitator of medical discourse। আসল কথা—দর্শনে—বিজ্ঞানে তত্ত্ব চিন্তিত হয়—বিচারিত হয়, তত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ দেওয়া হয়, আর শিল্পে—বিশ্বপ্রকৃতির অজৈব ও জৈব রূপের বৈচিত্র্যকে বিশেষরূপে ব্যক্ত করা হয়। বৈজ্ঞানিকরা আলোচনা করেন—তত্ত্ব; যুক্তির পর যুক্তি গেঁথে গেঁথে, পুরাতন সিদ্ধান্তকে খণ্ড ক'রে তাঁরা নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান। এই জাতীয় রচনায় কোন বিশেষ রূপ বা ভাবকে ব্যক্ত করা হয় না—প্রকাশ করা হয় বিশুদ্ধ চিন্তাকে, তত্ত্বের সামান্য আদর্শকে (universal। তবে কি "বিশেষ"কে বিবৃত করলেই কাব্য হবে? এরিস্টটল বলেন, না; কারণ ইতিহাস ও তো বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনের ঘটনাকে প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং দর্শন-বিজ্ঞান প্রকাশ করে চিন্তার সামান্য রূপকে, আর কাব্য প্রকাশ করে বিশেষ বস্তুরূপকে (concrete)—এ কথা বলাও যথেষ্ট নয়। বিশেষ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেই কাব্য হবে না। ঐতিহাসিকের সঙ্গে কবির পার্থক্য এই যে ঐতিহাসিকরা—relates what has happened এবং কবিরা—"what may happen"। অর্থাৎ "বিশেষ রূপ" প্রকাশ করার দিক দিয়ে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য নেই, পার্থক্য আছে বিন্যাস-রীতিতে যেখানে ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তিকে (particularকে) যথাযথভাবে বর্ণনা করেই দায়িত্বমুক্ত, সেখানে কবির কাজ—বিশেষের মধ্যে যে সামান্যের (universal) সম্ভাবনা আছে সেই সামান্যকে ব্যক্ত করা। এই কারণেই —এরিস্টটলের মতে "poetry, therefore, is a more philosophical and a higher thing than history : for poetry tends to express

the universal, history the particular"। "Universal কথাটির ব্যাখ্যা নিজেই তিনি দিয়েছেন—"By the universal I mean how a person of certain type will on occasion speak or act according to the law of probability or necessity"। এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কাব্য 'সামান্য'কে ব্যক্ত করে—এ কথার অর্থ এই যে ইতিহাসের লক্ষ্য যেখানে বিশেষ ঘটনার যথাযথ বিবরণ দেওয়া, কাব্যের লক্ষ্য সেখানে—বিশেষ রূপ-কল্পনার মাঝ দিয়ে রস সৃষ্টি করা। কবির অনুকরণের সামগ্রী—"men in action" বটে কিন্তু যে-কোন খাপছাড়া বা নিরুদ্দেশ 'action'-এর অনুকরণ নয়। কবি—'men in action'-কে রূপ দেন—জীবনের ঘটনা-সমূহকে বিশেষভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে—প্লেটোর কাঠামোতে—অর্থাৎ "arrangement of incidents'—করে নিয়ে—'action' এর একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত (whole) তৈরি করে—(A whole is that which has a beginning a middle and an end)। এই যে 'আদি-মধ্য-অন্ত'-যুক্ত একটি পূর্ণ কাহিনী বা বৃত্ত—রচনা, এর ফলেই ব্যক্ত হয় জীবনের রস রূপটি। প্রকাশের এক কোটিতে দর্শনবিজ্ঞান—বিশুদ্ধ মনন দ্বারা সত্যের 'সামান্য' রূপের ধারণা; অন্যকোটিতে কাব্য—বিশেষের রূপকল্পনার সাহায্যে 'সামান্যে'র ব্যঞ্জনা, মাঝখানে ইতিহাস—বিশেষের বিবৃতি দিয়েই যার কর্তব্য শেষ। সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রটিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে পৃথক করতে প্লেটো এবং এরিস্টটল যেভাবে সীমারেখা টেনেছেন এবং যে মীমাংসায় পৌছেছেন—তা' বহুকাল ধরে, প্রায় সমান প্রভাব নিয়েই, চলে এসেছে। শিল্পের রাজ্য যে, বিশুদ্ধ মননের ক্ষেত্র নয়—তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্র নয়, অনুভবের ক্ষেত্র—রূপ-কল্পনার ক্ষেত্র—এই ধারণা গ্রীক চিন্তার গোড়াতেই দেখা দিয়েছে। প্লেটো বলেছেন—সাহিত্য-শিল্পের সৃষ্টি হয়—আবেগ (inspiration) থেকে, তার উপস্থাপনার বিষয় ও মানুষের আবেগের জীবন, আবেদনও—মানুষের হৃদয়াবেগে। শিল্প যত যুক্তি-বিচারবর্জিত—যত তত্ত্ব-বর্জিত তত সার্থক। এরিস্টটল 'Reason'কে কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে এত আপাংক্তেয় বলে ঘোষণা করেননি বটে, কিন্তু কাব্য শিল্পের জন্ম যে ভাব-

তন্ময়তা থেকে—সহজ সমবেদনা (sympathy)—a strain of madness' বা ভাবাবেশ থেকে অর্থাৎ কাব্য-শিল্প যে মনন-বৃত্তি (Reasoning)—প্রধান সৃষ্টি নয়. আবেগ-মূলক ও কল্পনা-প্রধান সৃষ্টি—এ সিদ্ধান্তও এরিস্টটল করেছেন।

(সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্লেটো-শিষ্য এরিস্টটল কাব্য শিল্পের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে—খুব সংক্ষিপ্ত যে সংজ্ঞা দিয়েছেন ও ভাষ্য করেছেন—তথা কাব্য ও শিল্পের যে বৈশেষিক লক্ষণ (differentia) নির্দেশ করেছেন তা'তে শিল্পের উল্লেখযোগ্য ধর্মের ওপর আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছেন। বৃত্তি, ব্যাপার এবং বিষয়বস্তু এ তিন বিষয়ে কাব্য-শিল্পের যে বিশিষ্টতা রয়েছে এরিস্টটল এই তিনটি দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই কাব্য-শিল্প হৃদয়-বৃত্তি-মূলক কল্পনা-ব্যাপার-প্রধান সৃষ্টি এবং তার উপাদান রূপ ও ভাববস্তু—('এথে' = চরিত্র 'প্যাথে'—আবেগ, প্রাক্‌সিস্ = ঘটনা বা ক্রিয়া)।)

এখন দেখা যাক পরবর্তীকালে—আজ পর্যন্ত, সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা-নিরূপণে কে কি নতুন কথা বলেছেন এবং তাতে এরিস্টটল-কৃত সংজ্ঞার অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি দোষই বা কি কি ধরা পড়েছে।

এরিস্টটলের পরেই সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় যাঁর নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে সেই হোরেস্‌ও (খৃঃ পূঃ ৬৫-৮) শিল্পীকে 'imitator' বলেছেন। সুতরাং বৈশেষিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে নতুন কোন কথা বলেননি একথা বলাই বাহুল্য। তবে এ কথা যদি মনে করা যায় যে এরিস্টটলের সংজ্ঞায় অনুকরণের বিষয়বস্তু হিসাবে শুধু 'মানব-জীবন'ই (men in action) ধরা হয়েছে, তবে বলা যেতে পারে হোরেসের একটি মন্তব্যের লক্ষ্য হয়েছে এরিস্টটলের 'সংজ্ঞা'র অব্যাপ্তি দোষ দেখান।

একথা সত্য যে এরিস্টটলের আলোচনায়—চলমান মানব জীবনকেই শৈল্পিক অনুকরণের মুখ্য বিষয় বলে ধরা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে এ কথা একেবারে সত্য নয় যে—"landscape and animals are not ranked among the objects of aesthetic imitation. The whole

universe is not conceived of as the raw material of art" (Butcher-Aristotle's Theory of poetry and fine art). চারুশিল্প বা ললিতকলা মানব জীবনের প্রতিরূপ রচনা করতে প্রবণান্বিত এ কথা এরিস্টটল বলেছেন বটে, তাই বলে একথা বলেননি—প্রকৃতির অনুকরণ বা জীবজন্তুর অনুকরণ শিল্প-সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। চিত্র-শিল্প রঙ ও রেখার দ্বারা প্রকৃতির নানা দৃশ্য অনুকরণ করে—জীবজন্তুর মূর্তিও অঙ্কন করে। অনুকরণ বৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এরিস্টটল লিখেছেন —"objects which in themselves we view with pain we delight to contemplate when reproduced with minute fidelity such as the forms of the most ignoble animals and of dead bodies"। এখানে নিশ্চয়ই এ ধারণা প্রকাশ পায়নি যে জীবজন্তু কখনই শৈল্পিক অনুকরণের বিষয় হতে পারে না। তারপর, হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্য এরিস্টলের নিশ্চয় অজানা ছিল না। একিলিসের ঢালখানির দৃশ্য সমূহে প্রকৃতি পশু ও মানুষ সমভাবেই অনুকরণের বিষয়বস্তু হয়েছে। এ কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে গ্রীসে, প্রাকৃতিকবস্তুর অনুকরণকে, জীবজন্তুর অনুকরণকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এরিস্টটল এ রীতি লঙ্ঘন করেছেন বা এ বিষয় জানতেন না—এ কথা বলা যায় না। তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, এরিস্টটল-মতে, সাহিত্য-শিল্পে মানব জীবনের স্থানই মুখ্য। প্রকৃতি বর্ণনা, জীবজন্তুর বর্ণনা কাহিনীর অংশ হিসাবেই (যেমন আমাদের উদ্দীপন বিভাব) স্থান পেয়েছে।

বস্তুতঃ, সাহিত্যশিল্প শুধু যদি "men in action."-এর প্রতিরূপমাত্র হয়, তা'হলে "hymns to the Gods"—বা পৌরাণিক 'satyric' নাট্যসমূহের পাত্র-পাত্রীদের সম্পর্কে প্রশ্ন না উঠে পারবে না। দেব-দেবীর কাহিনী বাদ পড়লে ইলিয়াড প্রভৃতি মহাকাব্যেরই বা কী দশা হবে ? সুতরাং "Since the objects of imitation are in action" এই কথাটিকে একটু ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।—মানুষ যেখানে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় দেব-দেবীর

স্তবস্তুতি রচনা করছে—দেব-দেবীর ক্রিয়াকলাপকে কাহিনীর আকারে প্রকাশ করছে, সেও যেমন ভাব ও কার্যরূপে 'men in action'-এর রূপ, তেমনি মানুষ যেখানে প্রকৃতির দৃশ্যকে বর্ণ-রেখায় বা ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে তাকেও তেমনি শৈল্পিক অনুকরণ বলেই মনে করতে হবে। এ কথা সত্য—খাঁটি নিসর্গকবিতা বলতে যা বুঝায় তা' গ্রীসে তখন ছিল না; নিসর্গ তখন জীবনেরই পটভূমি এবং নিসর্গের মূল্য তখন—অন্ততঃ সাহিত্যে পটভূমির মর্যাদায় অধিক হয়নি। জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রকৃতি ও জীবজন্তু মর্যাদালাভ করেছে। যে অনুপাতে যোগ, সেই পরিমাণে মানুষের ভাবাবেগে তার স্থান এবং সেই পরিমাণেই তার কাব্যের বিষয়ীভূত হওয়ার সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'মানব প্রকাশ' নামক প্রবন্ধে এরিস্টটলকে সমর্থন করেই যেন লিখেছেন—"আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মানুষের কথা।"........ ... ... নিজের সুখ দুঃখের দ্বারাই হোক আর অন্যের সুখ দুঃখের দ্বারাই হোক, প্রকৃতি বর্ণনা করেই হোক আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর সমস্ত উপলক্ষ্য। প্রকৃতি বর্ণনাও উপলক্ষ্য। ... ... এমন কোনো বর্ণনা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না যা সুন্দর নয়, শান্তিময় নয়, ভীষণ নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানবধর্ম নেই কিম্বা যা অভ্যাস বা অন্য কারণে মানবের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে বদ্ধ নয়" ... ...
"লেখকের নিজত্ব নয়, মানুষত্ব প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল) কখনো নিজত্ব দ্বারা, কখনো পরত্ব দ্বারা। কখনো স্বনামে কখনো বেনামে, কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে। লেখক উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য" (সাহিত্য)।

হোরেসের বক্তব্য কি দেখা যাক। হোরেস সাহিত্য-শিল্পের প্রজাতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন 'But to the lyre Muse granted to sing of Gods and children of gods, and victorious boxers

and horses that win in the race and sorrows of enamoured swains and cups that free the soul" এবং এই কথাই যেন বলতে চেয়েছেন কাব্যের বিষয়বস্তু শুধু মানব-জীবন নয়—যে কোন বিষয় নিয়েই কাব্য রচনা করা যেতে পারে—এমনকি একটা 'ঘোড়া' বা মদের পেয়ালা নিয়েও। সুতরাং প্রশ্ন হবেই 'men in action'-এর ব্যাপক অর্থের মধ্যে এরাও পড়ে কি? অবশ্য একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে---শিল্পের সামগ্রী 'men in action' ছাড়া অন্য বিষয় অনুকার্য হবে না এমন কোন উক্তি তিনি করেননি।

যা'হোক, মধ্যযুগে এবং রেণাসাঁতেও প্লেটো-এরিস্টটলের সাধারণ সংজ্ঞাটির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। এ সম্পর্কে Literary Criticism in the Renaissance---গ্রন্থে লেখক স্পিনগার্ন পোয়েটিক্সের খানিকটা উদ্ধৃত করে যা' মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা যাক্---তিনি বলেছেন-' In this passage Aristotle has briefly formulated a conception of ideal imitation which may be regarded as universally valid, and which repeated over and over again, became the basis of Renaissance Criticism. (২৮ পৃঃ)। এই 'আইডিয়াল ইমিটেশন্'-এর এবং কাব্যের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই স্ট্র্যাবো তাঁর 'জিওগ্রাফি' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন—কাব্য হচ্ছে—"a kind of elementary philosophy which introducess us early to life and gives us pleasurable instruction in reference to character, emotion and action"। কথাটা সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞার উপরে নতুন কোন আলোকপাত করেছে এ কথা বলা চলে না। ডেনিয়েলো, রোবারতেলি, ফ্রেকাস্‌তেরো, ভার্কি স্ক্যালিগার, মুজিয়ো প্রমুখ ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা এরিস্টটলের মন্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন এবং কাব্য যে "ideal representation of life"—এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু—"men in action"—এই মন্তব্যটিকে কেহ কেহ সমালোচনা করেছেন এবং এরিস্টটল-

কৃত সংজ্ঞার অব্যাপ্তিদোষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সমালোচনায় পাওা ফ্রেকাস্‌তোরা (Fracastoro)। তিনি বলেন—কাব্য শুধু মানুষের জীবনেরই অনুকরণ নয়; তা' যদি হয় তবে এম্পিডোকলসের এবং লুক্রেসিয়াসের রচনা বাদ পড়ে যাবে—ভার্জিলের লেখা 'এনিড' (Aeneid) কাব্যের মর্যাদা পাবে বটে কিন্তু 'জর্জিকস' (Georgics) কাব্যের মর্যাদা পাবে না। (জর্জিকস্‌—নিসর্গ বর্ণনার কাব্য)। সব বিষয় নিয়েই কাব্য রচনা করা যায়—কাব্য করে তোলাই অবশ্য আসল কথা। বলা বাহুল্য, এখানে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে নয়, প্রকাশ-ভঙ্গিমাকেই কাব্যত্বের নিয়ামক বলে ধরা হয়েছে। হোরেসের প্রভাব এখানে সক্রিয়। ক্যাপ্রিয়ানো (ডেল্লা ভেরা পোয়েটিকা—১৫৫৫) কাব্যকে শিল্পরাজির মধ্যে বড় স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে কাব্য চারুতম কলা; সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের একত্র সমাবেশ হয় কাব্যে—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ সব কিছুর জগৎই কাব্যের বিষয়বস্তু। তাঁর মতে কবি দুই শ্রেণীর—এক 'প্রকৃতির কবি' (natural poets), দুই—''নীতির কবি" (moral poets)—তবে 'প্রকৃতিক-কবি' অপেক্ষা 'নীতির-কবি' শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ কাব্য-শিল্প অনুকরণ বটে, তবে শুধু মানব-জীবনেরই অনুকরণ নয়।

তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে শিল্প-অন্বীক্ষা বেশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন নতুন শব্দের আমদানী হয় এবং তাদের ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে রীতিমত মস্তিষ্ক-ব্যায়াম আরম্ভ হয়। wit, taste, imagination, fancy, feelings প্রভৃতি শব্দের স্বরূপ-জিজ্ঞাসায় আলোচনার আসর মুখর হয়ে উঠে। ইংলণ্ডে বেকন (১৬০৫)—হব্‌স্‌, ড্রাইডেন প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কাব্যকে কল্পনা-বৃত্তির কার্য রূপেই দেখাতে চেষ্টা করেন। ইতালীতেও কল্পনার মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরা হয়। যা'হোক, কাব্যের বৈশেষিক লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা খুব একটা যে এগিয়ে যায় এ কথা বলা যায় না। 'কল্পনাবৃত্তি থেকে কাব্যের জন্ম—এ সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে নতুন বটে কিন্তু —'মাইমেসিস্‌'-এর তাৎপর্যের বাইরে যেতে পারেনি॥ আমরা দেখি—ড্রাইডেনের রচনা সমূহের মধ্যে—"অনুকরণ"কে শিল্পের সামান্য লক্ষণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে, এবং অনুকরণ যে কল্পনাপ্রধান একটি মানসিক

ব্যাপার—এই ধারণা স্পষ্টতর হতে আরম্ভ করেছে। কাব্য কল্পনাত্মক সৃষ্টি—এ ধারণা একেবারে নতুন নয় তা' আমরা জানি। প্লেটো শিল্প সৃষ্টি ব্যাপারকে—'Reason'-মুক্ত 'inspiratin'-এর কাজ বলে মনে করেছেন এবং এ ধারণাও তার আছে যে ব্যাপারটি কল্পনাত্মক—' phantasia'-মূলক। এরিস্টটল ব্যাপারটিকে যে সম্পূর্ণ "Reason"-মুক্ত মনে করেছেন—এ প্রমাণ নেই বটে, তবু অনুকরণে Phantasia—অর্থাৎ কল্পনার হাত যে অনেকখানি, এ ধারণা এরিস্টটলেরও না আছে এমন নয়। প্লেটোর মতো এরিস্টটলও মনে করেছেন—কল্পনা আত্মার উত্তমাংশের ব্যাপার নয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন—("ডি এনিমা"—৩য় অধ্যায়) কল্পনা আমাদের ঐন্দ্রিয় উপলব্ধি স্মরণ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত হয়ে আছে এবং আমাদের "Schemata of thoughtও যোগায় এই কল্পনাই।

যদিও এই প্রসঙ্গেই আলোচনা করা দরকার—এরিস্টটল প্রভৃতির, creative imagination-এর [যে কল্পনা শুধু গৃহীত রূপ-প্রত্যয়েরই (images) সংযোগ—বিয়োগমাত্র নয়—'image making power] ধারণা ছিল কি ছিল না, তবু এ প্রসঙ্গ এখানে আমি উত্থাপন করব না। এ প্রশ্নটি পরে আলোচনা করব। এইখানে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে—শিল্প প্রধানতঃ কল্পনা-বৃত্তির সৃষ্টি এ ধারণার আরম্ভ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; আর এ কথাও সত্য নয় যে ব্যাপারটিকে কল্পনা-বৃত্তিমূলক বলায় —এরিস্টটল-কৃত সংজ্ঞা থেকে খুব বেশী দূরে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন হয়নি—পরে আলোচনা করছি। এখানে দেখাতে চেষ্টা করছি—কল্পনা বৃত্তির আবিষ্কার এবং তার স্বরূপ বিচারের আরম্ভ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম হয়নি।

Longinus (De sublime, Chap XV) এ সম্বন্ধে সচেতন। তারপর, Quintilian—কল্পনাকে আবেগাত্মক ব্যাপার বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন—কল্পনাবলেই মানস-নেত্রে রূপ সুস্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয়ে থাকে। পরবর্তী কালে, মধ্যযুগ পর্যন্ত—phantasia এবং 'imaginatio'

একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং—কালক্রমে 'imaginatio' বলতে বুঝায়—স্মরণ অর্থাৎ গৃহীত রূপ প্রত্যয়ের পুনরুদ্বোধন আর phantasia বলতে বুঝায় নানরূপকে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন রূপ সৃষ্টি।

কল্পনা ব্যাপার

ষোড়শ শতাব্দীতে দুটো শব্দের অর্থ উল্টে যায়। ফেকাস্তোরো (De Intellectione—1550) 'phantasia'-কে 'reproductive' শক্তি এবং 'imagination'কে 'Unifying power' বলে প্রচার করেন। এই শতাব্দীর শেষাশেষি এবং সপ্তদশ শতাব্দীতেও অনেকেই—কল্পনাতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। * [Montaigne—'The force of imagination—1580 pico della Mirandolla—De Imaginatione, Fyens—De Virib Imag 1680, etc.—দৃষ্টান্ত]। তা' করা হলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে শিল্পের সংজ্ঞা হিসাবে অনুকরণ ব্যাপারটিকেই সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়েছে। তবে অনুকরণ ব্যাপারটি যে কল্পনাবৃত্তির (faculty of imagination) ক্রিয়া এ ধারণাটি স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেছে। বেকন (১৬০৫) বিজ্ঞানকে বুদ্ধির ব্যাপার, ইতিহাসকে স্মৃতির ব্যাপার এবং কাব্যকে কল্পনার ব্যাপার বলে মনে করেছেন। আমরা দেখি এই খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় যে লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন ঘটে তা' কয়েকটি নতুন শব্দের যেমন wit, taste, imagination or fancy, feeling—প্রভৃতির তাৎপর্য বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশেষতঃ "wit" কথাটা নিয়ে খুবই আলোচনা করা হয় এবং "wit"—(ingegno)কে কবি-প্রতিভার আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। ইতালীতে এবং অন্যান্য দেশেও কল্পনা শক্তির স্বরূপ আলোচনার দিকে অল্প বিস্তর ঝোঁক দেখা দেয়। এ যুগের আলোচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ক্রোচে লিখছেন—"In the writings of this period imagination was often indentified with wit, wit with taste, taste with feeling and feeling with first apprehensions or imagination !—('History of Aesthetic'—"Aesthetic")। বাস্তবিকই wit ও imagination যে একই ব্যাপার, এ ধারণা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। বোলোগ্নার Matteo Pallegrini—(১৬৫০) "wit"-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"that part of the soul which in a certain way practises aims and seeks to find and create the beautiful and the efficacious"। ড্রাইডেন তাঁর 'Annus Morabilis'-এর ভূমিকায় কাব্যরচনা ব্যাপার বলতে গিয়ে লিখেছেন—'The composition of all poems is, or ought to be, of wit; and wit in the poet, or wit-writing (if you will give one leave to use a school distinction) is no other than the faculty of imagination in the writer which like a nimble spaniel, beats over and ranges through the field of memory till it springs the quarry it hunted after, or without metaphor, which searches over all the memory for the species or ideas of those things which it designs to represent" ড্রাইডেন বলেছেন—কল্পনার প্রথম আনন্দ—উদ্ভাবন (invention), দ্বিতীয় পরিকল্পনা fancy or the variation. deriving, moulding etc.) তৃতীয় আনন্দ—সুষ্ঠু শব্দযোজনা। কল্পনার দ্রুতি প্রকাশ পায়—উদ্‌ভাবনায়, সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় পরিশিল্পনায়, এবং সৌষ্ঠব প্রকাশ পায়—সার্থক শব্দপ্রযোজনায়। যা' হোক ড্রাইডেন সাধারণ ভাবে কাব্যের লক্ষণ "wit-writing"—করেছেন বটে, কিন্তু নাটকাদি কাহিনীকাব্য যে 'lively imitation of nature (Essays—68) এবং বিশেষতঃ নাটক যে—"A just and lively image of human nature. representing its passions and humours and the changes of fortune to which it is subject, for the delight and instruction of mankind". এক কথায় imitation অর্থাৎ representation of human nature"—তা'ও বলেছেন। মোট কথা —সাহিত্য-শিল্প যে অনুকরণ ব্যাপার এবং ঐ ব্যাপারটি যে কল্পনা-মূলক এই সংস্কারই এ পর্যন্ত সক্রিয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্য-শিল্পের স্বরূপ বিচারের লক্ষণীয় উদ্যম দেখা

যায়। এই চেষ্টার গতি-বিধি আলোচনা করবার আগে পূর্ববর্তী চেষ্টার একটা হিসাব-নিকাশ করে নেওয়া ভাল; তাতে, পরবর্তী চেষ্টার নূতনত্ব কোথায় এবং কতটুকু তা সহজে ধরা যাবে।

প্রধানতঃ তিন দিক দিয়ে সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা-নিরূপণে মতভেদ দেখা দিতে পারে :—

এক—মানসিকবৃত্তির বিশেষ রূপটির ব্যাপারে ;

দুই—বিষয়-বস্তুর বৈশিষ্ট্যে।

তিন—সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে।

আনন্দ বা সৌন্দর্য যাই শিল্পের উদ্দেশ্য হোক না কেন, সংজ্ঞার অপরিহার্য অঙ্গ কিনা বিচার্য বিষয় বটে। সে বিচারে এখানে প্রবৃত্ত হয়ে লাভ নেই। 'শিল্পের উদ্দেশ্য' অধ্যায়ে এর আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে "বৃত্তি" "বিষয়" এবং "উদ্দেশ্য"কে আপাতদৃষ্টিতে যত নিরপেক্ষ মনে হয়, তারা তত নিরপেক্ষ নয়। বৃত্তির সঙ্গে বিষয়ের এবং বিষয়ের সঙ্গে উদ্দেশ্যের নিগূঢ় যোগ আছে। মোটামুটিভাবে শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে বৃত্তি ও বিষয় স্থিরীকরণই আসল সমস্যা। সুতরাং সংজ্ঞা-সম্বন্ধে নতুন কথা বলতে গেলে—"বৃত্তি" এবং "বিষয়বস্তু" সম্বন্ধেই বলতে হবে।

বৃত্তি ও বিষয় সম্পর্কে প্লেটো এরিস্টটলের মতবাদ এইভাবে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে :—

	মানসিক-বৃত্তি	বিষয়
প্লেটো	(ক) অনুভব-বৃত্তি (inspiration (Reason—বর্জিত) (খ) রূপ-কল্পনা—	প্রকৃতি ও মানবজীবন—চরিত্র আবেগ—ঘটনা
এরিস্টটল	(ক) অনুভব-বৃত্তির ব্যাপার (তবে একেবারে বুদ্ধি-বর্জিত ব্যাপার নয়) (খ) রূপ-কল্পনা	প্রধানতঃ মানব-জীবনের রূপ (men in action)
হোরেস্	অনুকরণ-বৃত্তি	সব-কিছুই কাব্যের বিষয়
মধ্যযুগ ও রেনাসাঁ	ঐ	(মানবজীবন+প্রকৃতি)
সপ্তদশ শতাব্দী	Wit=(কল্পনা-বৃত্তি) faculty of imagination	প্রকৃতি ও মানবজীবনের—রূপ—ভাব—ঘটনা।

এইবার দেখা যাক, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা বিশেষ লক্ষণ (differentia) নির্ধারণে কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প-সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে এত আলোচনা হয়েছিল যে, ১৮০৪ খ্রীঃ, জঁা পল রাইকতের (Richter) মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন "Nothing swarms like aestheticians"—অর্থাৎ শিল্পদার্শনিক বের হচ্ছেন ঝাঁকে ঝাঁকে। নিম্নলিখিত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে কথাটা

মিথ্যা বলে মনে হবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য শিল্প-সমালোচকের এই তালিকাটুকু দেখলেই তা' বোঝা যাবে।

(১) স্যাপ্‌টস্‌বেরি—(১৭০৯)

(২) এডিসন (১৭১২)—["স্পেক্‌টেটর"—]

(৩) জে. পি. দে' ক্রুশাজ্‌ (crousaz)—[ত্রেইতে দু' বো (১৭১৫)]

(৪) দু' বো'—রিফ্লেক্‌শান্‌স্‌ ক্রিটিক্‌স্‌ সুর লা পোয়েজি এত্‌লা পেনতুর —১৭১৯

(৫) ফ্রানসিস্‌ হাসিসন্‌—এ্যান এনকয়ারি ইন্টু দি অরিজিনাল অফ্‌ আওয়ার আইডিয়াস্‌ অফ্‌ বিউটি এ্যাণ্ড ভারচু (১৭২৩)

*(৬) জাম্‌বাতিস্তা ভিকো—সায়েঞ্জা নুয়োভা (১৭২৫)

(৭) জেসুইট আন্দ্রে—(১৭৩২)

(৮) আলেকজাণ্ডার গট্‌লিয়েব বোমগার্টেন—'এস্থেটিক' (১৭৫০)

(৯) আবি ব্যাতু—"দি ফাইন আর্টস রিডিউস্‌ড টু সিঙ্গিল প্রিন্‌সিপিল্‌ —(১৭৪৬)

(১০) হোগার্থ—এনালিসিস্‌ অফ্‌ বিউটি—(১৭৫৩)

(১১) এডমাণ্ড্‌ বার্ক—"এ্যান্‌ এনকয়ারি ইন্টু দি অরিজিন অফ্‌ আওয়ার আইডিয়াস্‌ অফ্‌ সাব্‌লাইম্‌ এ্যাণ্ড দি বিউটিফুল"—১৭৫৬

(১২) এইচ হোম্‌—এলিমেণ্ট্‌স্‌ অফ ক্রিটিসিজিম্‌ (১৭৬১)

(১৩) আলেকজাণ্ডার গেরার্ড—এছে অন্‌ টেষ্ট্‌ (১৭৫৮)—জিনিয়াস (১৭৭৪)

(১৪) জে. জি. হার্ডার—(Herder)—(১৭৬৯)

(১৫) হামান্‌ (Hamann)—(১৭৬২)

(১৬) এ. আর. মেঙ্গ্‌স্‌ (Mengs)—(১৭৬১, ১৭৮০)

(১৭) জি. ই. লেসিঙ্‌—'লাওকুন' (১৭৬৬)

(১৮) ভিঙ্কেলম্যান (winkelmann)—১৭৬৪

(১৯) হেমস্টারহুইস্‌ (Hemsterhuis (ডাচ্‌) (১৭২০—.৭৯০)

*(২০) কাণ্ট্‌—ক্রিটিক অফ্‌ দি জাজমেণ্ট (১৭৯০)

(২১) এলিসন্‌—এছে অন্‌ টেস্ট্‌—(১৭৯২)

(২২) শিলার—লেটার্স অন্‌ দি এস্থেটিক এডুকেশন অফ ম্যান (১৭৯৫)

এই সকল দার্শনিকরা কল্পনার স্বরূপ, সৌন্দর্যের স্বরূপ, শিল্পের সঙ্গে কল্পনার এবং সৌন্দর্যের সম্পর্ক, শিল্পের সঙ্গে হৃদয়াবেগের এবং বুদ্ধির যোগ,—শিল্পের উদ্দেশ্য—এমনি নানা সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। তা'তে নতুনত্বও আছে যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে আলেকজাণ্ডার বোমগার্টেনই প্রথমে—১৭৫০ খ্রীঃ "এস্থেটিক" শব্দটি প্রয়োগ করেন। তবে, ক্রোচে মনে করেন, জামবাতিস্তা ভিকোই প্রথম এস্থেটিক জগতের স্বাতন্ত্র্য ("autonomy of the aesthetic world") দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেন এবং খাঁটি 'এস্থেটিক' ভিকোর 'নব বিজ্ঞান' থেকে সুরু হয়। কারণ ক্রোচের মতে—সৃজনশীল কল্পনা বৃত্তির (creative imagination) স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত খাঁটি এস্থেটিকের জন্ম হয়নি। এবং তা হয়নি বলেই ভিকো থেকেই এস্থেটিকের সুরু। দেখা যাক ভিকো কি করেছেন।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জাম্‌বাতিস্তা Giambatista vico—'La Scienza Nuova'-তে কল্পনাকে একটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বৃত্তি বলে প্রচার করেন এবং বলেন—কল্পনা হচ্ছে চিত্র-বাণী (pictorial language)। যুক্তি-বিচার (Reason) উন্নত চৈতন্য শক্তির ব্যাপার। কল্পনাশক্তির পরে বিচার শক্তির উন্মেষ ঘটেছে। কাব্য কল্পনার সৃষ্টি, বিচার-বিতর্কের, এককথায়, বিশুদ্ধ মননের সৃষ্টি নয়। যাই হোক, কাব্য কল্পনাবৃত্তির সৃষ্টি—ভিকোর এ কথাটা যেমন নতুন কিছু নয়, তেমনি এ কথাটাও নতুন নয় কাব্য-সৃষ্টি ব্যাপারে "Reason-এর কোন প্রয়োজন নেই। এইভাবে তত্ত্বদর্শীরা, (ভিকো থেকে কাণ্ট পর্যন্ত) শিল্পদর্শন নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। 'অনেক কথা' অনেক দিকেই গভীর আলোকপাত করেছে তাও সত্য, কিন্তু কাব্যের মূল সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্লেটো-এরিস্টটল অস্পষ্টভাবে যে সব লক্ষণ নির্দেশ ক'রেছেন তা' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কোন লক্ষণ কেউ নির্দেশ করেছেন এমন কথা বলা যায় না।

'কল্পনা'র স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা এঁরা করেছেন তা'কেও খুব নতুন বলে গ্রহণ করা যায় না। Phantasia এবং 'Imaginatio' বেশ পুরোনো ধারণা। এই দুয়ের মধ্যে যেটাই স্থাবর বা জঙ্গম হোক একের যে নতুন নতুন রূপ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে এ ধারণাও নতুন নয়। (মধ্যযুগের ও ষোড়শ শতাব্দীর ধারণা দ্রষ্টব্য)। তারপর, এস্থেটিক ব্যাপারকে—"confused cognition" বলা হোক বা "oratio sensitiva perfecta"—বলা হোক, বা কল্পনাকে—ইন্দ্রিয়-প্রতীতি ও বুদ্ধির মাঝখানেই স্থান করে দেওয়া হোক, বা সৃষ্টি ব্যাপারকে আবেগমূলক বা জ্ঞানমূলক বলা হোক—বৈশেষিক লক্ষণ সুনির্দ্দিষ্ট করার দিক দিয়ে খুব একটা এগিয়ে আসা হয়নি। ধরা যাক লেসিঙের কথা। লেসিঙ চিত্র এবং কাব্যের ধর্মের তুলনা-মূলক আলোচনা করতে গিয়ে যা' বলেছেন তা' অনেকটা এরিস্টটলেরই কথা নতুনভাবে বলা। চিত্র রূপ দেয় রেখায় ও বর্ণে স্থিতিশীল প্রাকৃতিক বস্তুকে আর কাব্য রূপ দেয় শব্দ-পরম্পরা দ্বারা গতিশীল মানব-জীবনের রূপ অর্থাৎ এরিস্টটলের ভাষায়—'men in action'। নতুনত্ব কোথায় ?

সকলের বক্তব্যকে বিবৃত করার অবকাশ এবং প্রয়োজনও এখানে নেই। এইবার দেখা যাক—অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট সাহিত্যে-শিল্পের সংজ্ঞায় কোন নতুন বিশেষ লক্ষণ যোজনা করেছেন কি না। আমরা জানি, এডমাণ্ড বার্ক তাঁর দর্শনে জ্ঞান-বৃত্তির মধ্যে তিনটি ব্যাপারের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন—এক—Sense বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়, দুই—Imagination—বা কল্পনা, তিন judgment—বা বিচার। তাঁর মতে 'কল্পনা' ব'লতে বুঝায় উপলব্ধ প্রত্যয়ের পুনরুদ্বোধনের ক্ষমতা বা "Combining these images in a new manner" অর্থাৎ উপলব্ধ ইন্দ্রিয় প্রত্যয় বা সংস্কারগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন নতুন রূপে সাজানোর ক্ষমতা। বার্কের মতেও কাব্য কল্পনা-ব্যাপার-সাধ্য আর তত্ত্ব-বিচারাদি—'judgment'—এর কাজ এখানে বলে রাখা যেতে পারে—শিল্প-কলা যে একপ্রকার জ্ঞানবিশেষ, বার্কের মধ্যেও এই ধারণার অস্তিত্ব পাওয়া যায়—(ক্রোচের মধ্যে এই ধারণাটির বিস্তারিত অভিব্যক্তি পাওয়া

যাবে)। যা'হোক, বার্ক যেমন জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে তিনটি ব্যাপার কল্পনা করেছেন, কাণ্ট তেমনি সমগ্র মানসিক বৃত্তিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রকাশ-রূপটিও নির্দেশ করেছেন। তালিকা করে দিলে বুঝতে সুবিধে হবে, তাই Critique of Judgment থেকে তালিকা উদ্ধার করে দেওয়া গেল :—

List of Mental Faculties	**Cognitive Faculties**
(I) Corgnitive faculties	Understanding
(2) Feeling of pleasure and displeasure	Judgment
(3) Faculty of desire	Reason

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কাণ্টের দর্শনে—'Reason' ও 'Judgment' কথা দু'টি প্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। 'Reason'-এর প্রচলিত অর্থ কাণ্টের 'Understanding'-এর যে অর্থ সেই অর্থ। এই অর্থেই বার্ক Judgment কথাটি ব্যবহার ক'রেছেন। যা'হোক কে কোন্ অর্থে কোন্ শব্দ ব্যবহার করেছেন এ আলোচনায় প্রবেশ না করে এখন কাণ্টের সাহিত্য-শিল্প দর্শনে প্রবেশ করা যাক।

কাণ্টের মতে মানসিক বৃত্তি তিনটি (১) জ্ঞান বৃত্তি (Knowing) (২) অনুভববৃত্তি (Feeling) (৩) ইচ্ছাবৃত্তি (Willing) এবং এই তিন বৃত্তির তিনটি 'বোধ'—রূপ :

জ্ঞানবৃত্তির	প্রকাশ	বিশুদ্ধ মননে
অনুভববৃত্তির	"	আস্বাদনে বা উপলব্ধিতে
ইচ্ছাবৃত্তির	"	নীতি-বোধে

কাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়ার ক্ষেত্র দু'টি—একটিতে 'Natural Concepts' ; অর্থাৎ প্রকৃতি-বিষয়ক জ্ঞান, অন্যটিতে Concept of freedom' নীতি-বিষয়ক জ্ঞান। এই দুই ক্ষেত্রের ভিত্তিতে দর্শনকেও দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—এক—'Theoretical' দুই—'Practical'। 'থিওরেটিকাল'-দর্শনের কাজ তত্ত্ব-নিরূপণ আর 'প্রাকটিকাল'-দর্শনের কাজ—'Prescribing laws by means of the concept of freedom'। এই দুই বৃত্তির

মাঝখানে আর একটা বৃত্তি কল্পনা করা সম্ভব—সেই বৃত্তিটির নাম—'Judgment'।

'Judgment' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাণ্ট লিখেছেন—"Judgment in general is the faculty of thinking the particular as contained under the universal অর্থাৎ 'জাজমেণ্ট' একপ্রকার চিন্তা—সামান্য তত্ত্বাশ্রিত বিশেষ বস্তু রূপের চিন্তা। এই চিন্তার কাজ বস্তু-রূপের পরা-পরিণতিকে (End বা finality of its form) ব্যক্ত করা—"Finality of nature in its multiplicity" কে ব্যক্ত করা। এই 'Reflective judgment-এর কাজ—কোন তত্ত্বে উপনীত হওয়া নয়, বস্তুর প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিচার করা বা ব্যবহার-বিধি প্রস্তুত করা নয়। এর কাজ বস্তুকে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্যক্তি-স্বরূপে দেখা। এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কাণ্ট বলেছেন—"Now this transcendental Concept of finality is neither a Concept of nature nor of freedom, since it attributes nothing at all to the object i.e , to nature, but only, represents the unique mode in which we must proceed in our reflection upon the objects of nature with a view to getting a thoroughly interconnected whole of experience and so is subjective principle in maxim of judgment' (২৩) বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়—'Subjective principle' কথাটি। কাণ্ট স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন—শিল্পধর্ম নিহিত থাকে বিশুদ্ধ আত্মসংবাদিতায় অথবা সাক্ষিকতায় (Subjectivity)—"That which is purely subjective in the representation of an object i e., what constitutes its reference to the subject not to the object, is its aesthetic quality" অর্থাৎ যে অনুপাতে বিষয়ের উপস্থাপনা Subjective—সেই অনুপাতেই উহার শৈল্পিক গুণ।

আর যেখানেই এই আত্মানুরঞ্জিত বা আত্মসংবাদী উপস্থাপনা সেখানেই অবিচ্ছেদ্যযোগে আনন্দ-বেদনা যুক্ত হয়ে থাকে—"But the subjective side

of a representation which is incapable of becoming an element of cognition, is the pleasure or displeasure (২৯) আসল কথা—'আনন্দ-বেদনা'-বৃত্তির সঙ্গেই 'Judgment' বা রূপ-সাক্ষাৎকারের নিগূঢ় যোগ—'রূপ-সাক্ষাৎকার' ব্যাপারটি অনুভবাত্মক (Subjective)।

কাণ্টের দর্শন নিয়ে অধিক আলোচনা না করে, এখন আমরা এ কথা অবশ্যই বলতে পারি যে, কাণ্ট শিল্পতত্ত্বকে দার্শনিক আলোচনার মর্যাদা দিয়েছেন—মানসিক বৃত্তি এবং তদনুসারী জ্ঞান-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন, মানসিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে শিল্প-সৃষ্টি ব্যাপারের স্থান কোথায় তা' নিয়েও অনেক সূক্ষ্ম বিচার করেছেন—এক কথায় বলা যেতে পারে কাণ্ট তাঁর 'ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট' গ্রন্থের আলোচনায়—শিল্প-তত্ত্বকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে দেখা উচিত, সেইভাবেই—খুবই বিস্তারিত আলোচনা করে দেখেছেন। কিন্তু প্লেটো-এরিস্টটলের মূল ধারণার গণ্ডী থেকে সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞাকে খুব বেশী দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন কিনা বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখা দরকার। তা' দেখলে দেখা যাবে, নিম্নলিখিত কারণে, খুব বেশী দূরে আমরা সরে আসিনি।

(ক) শিল্প বিষয়-বস্তুর তত্ত্ব নয়—বস্তুর ব্যক্তি-রূপ বা প্রতিরূপ এ ধারণা নূতন নয়।

(খ) বস্তুর যথাযথ প্রতিরূপমাত্র নয়—বস্তুর সম্ভাব্য পরা-প্রকাশের রূপায়ণ (ideal imitation) এ কথাটাও নতুন নয়।

(গ) শিল্প 'বিশুদ্ধ মনন' বা নৈয়ায়িক চিন্তার (প্লেটোর Reason) ফল নয় অনন্তরূপিণী প্রকৃতিকে (বস্তু বা মানব-জীবনে) অনুভব দিয়ে (Subjectively) অনন্ত-রূপে উপলব্ধি করার (reflective judgment)—ফল একথাও তেমন নতুন নয়।

আমরা জানি এরিস্টটল 'মাইমেসিস'-কেই শিল্পের সাধারণ লক্ষণ করেছেন এবং এই মাইমেসিসের উদ্দেশ্য—প্রকৃতির বিশেষ রূপ ব্যক্ত করা এবং এমন করে ব্যক্ত করা যাতে তার মধ্যে সামান্যের (universal) রূপ ব্যঞ্জিত হয়। তাঁর মতে এই মাইমেসিস বা বস্তুসাক্ষাৎকারমাত্রই আনন্দদায়ক

এবং শিল্পের আনন্দ এই বস্তুসাক্ষাৎকারেরই আনন্দ—বস্তুরূপকে তার পরা-প্রকাশের (কাণ্টের finality) পটভূমিতে দেখার আনন্দ। এই চিন্তা থেকে কাণ্টের চিন্তার পার্থক্য পরিমাণে বড় হলেও, আসলে খুব বেশী নয়। পরিভাষার পার্থক্য যথেষ্ট আছে—দার্শনিক চিন্তার বা বিচারের বিস্তার ও গভীরতা অনেক আছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। এরিস্টটল যেখানে বলেছেন —"মাইমেসিস" অনুকরণ—(প্রকৃতিকে বা জীবনকে তার প্রত্যক্ষ রূপের মাঝে সাক্ষাৎকার করা) কাণ্ট সেখানে বলেছেন—"জাজমেণ্ট"—"Thinking the particular as contained under the universal।" এই হিসাবে "মাইমেসিস" ও 'জাজমেণ্ট' পৃথক ধারণা নয়। নিম্নলিখিত ছক দেখলেই তা' বুঝা যাবে।

(ক) { মাইমেসিস—"বিশেষরূপ"—(মাধ্যমে)—সামান্যকে প্রকাশ
জাজমেণ্ট—"particular"—(„)—universal' কে "

(খ) { মাইমেসিস—"Reason"—সাধ্য ব্যাপার নয়
জাজমেণ্ট—Pure reason or understanding—ব্যাপার নয়

(গ) { মাইমেসিস—হৃদয়াবেগমূলক রূপ-কল্পনা
জাজমেণ্ট—'আনন্দ-বেদনা-বৃত্তিমূলক'—বস্তু-রূপ সাক্ষাৎকার
(Subjective)

এইভাবে তলিয়ে দেখলে, 'সাবজেক্টিভিটি' লক্ষণটিকে আপাত দৃষ্টিতে খুবই নতুন বলে মনে হবে বটে, কিন্তু তা হলেও, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে—হৃদয়াবেগ-মূলকতার মধ্যেই 'সাবজেকটিভিটি' লক্ষণটি নিহিত আছে। সুতরাং একথা বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি করা হবে না যে কাণ্ট 'মাইমেসিস' ব্যাপারটির মধ্যে যে সকল সম্ভাব্য তত্ত্ব নিহিত ছিল সেই সব তত্ত্বকে পরিস্ফুট করেছেন। 'সাবজেকটিভিটি'কে শিল্পের বিশেষ লক্ষণ করার মধ্যে চিন্তার উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে সত্য; কিন্তু এরিস্টটল কৃত সংজ্ঞার মধ্যে কোন গুণগত পরিবর্তন আসেনি। 'মাইমেসিস্' বলতে যেমন একাধারে শিল্পের আবেগমূলকতা, কল্পনাবৃত্তি-সাধ্যতা এবং ব্যক্তিরূপসাক্ষাৎকারকতা

সমাহৃত হয়েছে, তেমনি জাজমেণ্ট ব্যাপারটিতেও উক্ত তিন লক্ষণই একসঙ্গে ধরা পড়েছে। তবু এ কথা স্বীকার্য যে কাণ্ট—'subjectivity'কে বিলক্ষণ লক্ষণ বলে সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞাটিকে বেশ একটু পরিচ্ছন্ন করেছেন। এরিস্ট-টলের—"মাইমেসিস্" লক্ষণটি খুবই ব্যাপক। মাইমেসিসের বিষয়—"men in action"-ও ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত, কারণ subjective ও objective রচনা উভয়কেই 'men in action'-এর মধ্যে ধরতে হবে। (অবশ্য এরিস্টটল স্পষ্টভাষায় সে কথা বলেননি—নানা মন্তব্য থেকে অনুমান করতে হয়)। এরিস্টটল যা বলেননি কাণ্ট তা স্পষ্ট করে বলেছেন—দেখিয়েছেন—যেখানে প্রকৃতির বা জীবনের ব্যক্তিরূপকে উপস্থাপিত করা হয়—(এরিস্টটলের ভাষায় men in action-কে রূপ দেওয়া হয়) সেখানকার শৈল্পিকত্ব সহজেই ধরা যায়, কিন্তু যেখানে ঐজাতীয় বিশেষ বস্তুরূপ উপস্থাপ্য বিষয় নয়—উপস্থাপ্য বিষয় 'rational' ভাবনা, সেখানে ভাবনা যদি ভাবুকের হৃদয়াবেগ হিসাবেই প্রকাশ পায়, তাহলে তাকেও শৈল্পিক প্রকাশ বলে গ্রহণ করতে হবে। "Be the given representations even rational, but referred in a judgment solely to the subject (to its feeling) they are always to that extent aesthetic"—কাণ্টের এই উক্তিটি, জ্ঞানের কথাও যে কি গুণে সাহিত্য হতে পারে, সেই তত্ত্বটিকে ব্যক্ত করেছে। সুতরাং 'সাবজেকটিভিটি'কে বৈশেষিক লক্ষণ করায় রূপ ভাব ও ভাবনাকে সাহিত্য-শিল্পের বিষয় হিসাবে এক সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে তথা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর পরিধিকে বস্তু-ভাব ও ভাবনার জগতে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। উপসংহারে বেনিডেট্টো ক্রোচে কাণ্টের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে মন্তব্যটি করেছেন তা' উল্লেখ করা যাক। "This is Baumgartenism transposed to a higher key……A profound concept of imagination was entirely lacking to Kant's system and his philosophy of the spirit……he finds on place for imagination amongst powers of the spirit but places it among the facts of sensation. He knows a reproductive imagination and an

associative but he knows nothing of a genuinely productive imagination"—(Hist. of Aesthetic.)

কাণ্টের পরে শিলারের (১৭৫৯-১৮০৫) নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে শিলার একটি মতবাদের—খেলাবাদের (play theory of art) প্রবর্তক। শিলারের মত শুনতে নতুন বলে মনে হলেও তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে—কল্পনাতত্ত্ব এবং কাণ্টের নিষ্কাম আনন্দবাদের (disinterested pleasure)—সংযোগমাত্র। Stofftrieb (বস্তু প্রবৃত্তি) এবং formtrieb (রূপ-প্রবৃত্তি) আত্মার এই দুই প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টার নাম—খেলা-প্রবৃত্তি আর সেই খেলা-বৃত্তিরই কাজ—সুন্দর ব্যক্তিরূপ কল্পনা (The play-impulse refers to an object : living form or freedom in appearances)। শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা শিলারের মধ্যে নতুন পথে এগিয়েছে একথা বলা যায় না। শিলার কাণ্টেরই অনুসিদ্ধান্ত।

উনবিংশ শতাব্দীতেও—বহু কবি, বহু দার্শনিক বহু সমালোচক শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে বহু মন্তব্য করেছেন। পরিমাণের দিক দিয়ে এই সব রচনার প্রাচুর্য বিস্ময়কর, রচনার দিক দিয়ে এদের বৈচিত্র্য ও গভীরতা খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের 'সংজ্ঞা' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন কোন কথা কেউ বলেননি —পুরনো কথাকেই নতুন ও রকমারি ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর রকমারি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এত রকমারি মত-মন্তব্য বেরিয়েছে যে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে—মাথা ঠিক রাখা খুবই কঠিন কাজ। দর্শন-বিজ্ঞা-নের ব্যাপক অনুশীলনের প্রভাব চিন্তার সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এককোটিতে অধ্যাত্মবাদী দর্শনের রহস্যবাদী চিন্তা অন্যকোটিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বস্তুবাদী দর্শনের রকমারি সিদ্ধান্ত। এস্থেটিকের ক্ষেত্রে মুনিদের মহামেলা বসে যায় এবং প্রত্যেক মুনিরই কম বেশী ভিন্ন মত বা বলার ভিন্ন ভঙ্গী। এস্থেটিকেরই বা কত না উপাধি! ট্র্যান্সেন্ডেণ্টাল এস্থেটিক, মেটাফিজিকাল এস্থেটিক, পজিটিভিস্টিক এস্থেটিক, ন্যাচুরালিস্টিক এস্থেটিক, ফিজিওলজিকাল এস্থেটিক, সোজিওলজিকাল এস্থেটিক, ইন্ডাক্টিভ এস্থেটিক,

স্পেকুলেটিভ এস্থেটিক—আরো না কত এস্থেটিক। সংক্ষিপ্ত একটা নামের তালিকা দিলেই বুঝা যাবে,—নানাদেশের নানা মুনিদের সংখ্যা সামান্য নয়। তালিকা :—

ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৮০০)
শেলিঙ (১৮০২-৩)
হেগেল (১৮৩৫ প্রকাশিত)
কোলরিজ (১৮১৭)
এ শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০)
জে. এফ. হার্বার্ট (১৭৭৬-১৮৪১)
ফ্রিড্রিশ শ্লেইয়ের মেশের (১৮১৯)
ভিকটর কুঁজ্যা (১৮১৮)
থিওডোর জুফ্রয় (১৮২২)
শেলি (১৮২১)
রোস্‌মিনি
জিওবার্তি
জিমারম্যান (১৮৬৫)
হারম্যান লোৎজ্‌ (১৮৬৮)
স্মিড্‌ৎ
কে. কোস্টলিন—
ভন্ হার্টম্যান
লেভিক্
হার্টম্যান

রাসকিন
হার্বার্ট স্পেনসার
গ্রাণ্ট এলেন (১৮৭৭)
হেলম্‌হোৎস
হিপ্পোলিট তেইন (১৮৬৬-৬৯)
থিওডোর ফেকনার (১৮৭৬)
গ্রোস্ (১৮৯৪)
প্রুধো
জে. এম. গুঁয়াও (১৮৮৯)
নর্দো
লোম্ব্রোসো
ভিশের
শিবেক (১৮৭৫)
এম ডিয়েজ (১৮৯২)
থিওডোর লিপ্‌স্‌
কে. গ্রস্‌ (১৮৯২)
নীৎসে (১৮৭২)
সি-ফিডলার (১৮৮৭)
বার্নার্ড বোসাঙ্কে (১৮৯২)
টলস্টয়-প্রভৃতি।

নামের তালিকা আর বড় করে লাভ নেই। নানা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার অবকাশও এখানে নেই। আমাদের এখনকার কাজ—সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে নতুন কোন কথা কেউ বলেছেন কি না। সাহিত্য-শিল্পের প্রেরণা উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টিব্যাপার নিয়ে অনেকেই অনেক

কথা বলেছেন ; কিন্তু দেখা যাবে শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ (differentia) সম্পর্কে পুরনো কথাকেই নতুনভাবে বলা হয়েছে। কয়েকজনের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করলেই মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ—(তাঁর poetry and poetic diction (1800) প্রবন্ধে) যখন বলেন—"For all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings" তখন নিশ্চয়ই নতুন কোন কথা বলেন না, শুধু কাব্য-শিল্পের আবেগ-মূলকতা লক্ষণটির দিকেই নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এই প্রবন্ধে কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে যখন বলেন--while he describes and imitates passions..." তখন, বলা বাহুল্য—কাব্য-শিল্প অনুকরণ—এই সংস্কার থেকেই বলেন। আবার কবিবন্ধু সামুয়েল টেলর কোলরিজ্ (১৭৭২-১৮৩৪)—(তাঁর Biographia Literaria 1817 গ্রন্থে)—"feeling"-এর দিকে ঝোঁক না দিয়ে 'কল্পনা'র দিকে ঝোঁক দিয়েছেন এবং শিল্প-সৃষ্টিকে—'Secondary Imagination'-এর অর্থাৎ যে কল্পনা—প্রাথমিক কল্পনার দেওয়া প্রত্যয়কে (perception)—"dissolves, diffuses, dissipates in order to re-create"—সেই দ্বিতীয় সৃজনশীল কল্পনাবৃত্তির কাজ বলে প্রচার করেছেন কিন্তু অনুভবকেও (feeling) বাদ দেননি। তিনি কাব্যের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন—"the excitement of emotion for the purpose of immediate pleasure through the medium of beauty"। দুটো মিলিয়ে কোলরিজের মত দাঁড়ায় এই যে কাব্য সৃজনশীল কল্পনার মাধ্যমে ভাবাবেগের প্রকাশ ; সে প্রকাশে অবশ্য কবির সমগ্র সত্তাই—বুদ্ধি বাসনা, স্মৃতি-সংস্কার, আবেগ সব কিছুই—ব্যক্ত হয়।

কোলরিজের পরে শেলীর-কথা ধরা যাক্। শেলী—(A Defence of poetry 1821) নামক নিবন্ধে—কাব্যের সাধারণ সংজ্ঞা করেছেন—the expression of the imagination'। শেলী মানসিক ক্রিয়াকে (mental action) দুই ভাগে ভাগ করেছেন—এক 'Reason' দুই—"Imagination"। Reason-এর কাজ এক চিন্তার সঙ্গে অন্য চিন্তার সম্পর্ক নির্ধারণ করা ; আর imagination-এর ব্যাপারে—"mind acting upon these thoughts so

as to colour them with its own light and composing from them, as from element other thoughts, each containing within itself the priciple of its own integrity"। বিকল্পনা ও কল্পনার এই বিভাগ নতুন কোন আবিষ্কার নয়। এখানে সেই পুরাতন কথায় নতুন সাজে এসেছে—কাব্য বিচার-শক্তির প্রকাশ নয়, কল্পনার প্রকাশ—আত্মানুরঞ্জিত বিষয়ের প্রকাশ। কল্পনাত্মকতাকেই শেলী কাব্যের বিলক্ষণ লক্ষণ বলে মনে করেছেন। কবির কাজ—"to apprehend the true and the beautiful, in a word, the good which exists in the relation, subsisting first between existence and perception and secondly between perception and expression। শেলী 'কল্পনা'কে প্রাধান্য দিয়েছেন বটে, কিন্তু আবেগের দিককে একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন তা' নয়। তাঁর মতে—poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds".

তার পর,—জেমস হেনরী লে হান্ট (১৭৮৪-১৮৫৯) কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য যে প্রত্যক্ষ চেষ্টা করেছেন তা'তে (what is poetry—1844) দেখা যায়—কাব্য—"utterance of a passion for truth, beauty and power, embodying and illustrating its conceptions by imagination and fancy and modulating its language on the principle of variety in uniformity. Its means are whatever the universe contains and its ends pleasure and exaltation." অর্থাৎ (ক) কাব্য আবেগকে (সত্য-শিব শক্তির) প্রকাশ করে (খ) তত্ত্বরূপে নয়,—রূপকল্পনার সাহায্যে (গ) কাব্যের বিষয়—বিশ্বের সমগ্র বস্তু (ঘ) উদ্দেশ্য—আনন্দ ও উদ্দীপনা। এখানেও পুরনোকে নতুন ভাষার পরিচ্ছদ পরানো হয়েছে মাত্র। ম্যাথু আরনল্ড মহাশয়ের—'criticism of life'—কথাটিও এ বিষয়ে খুব নতুন আলোকপাত করে না। শাস্ত্র থেকে সাহিত্যকে কোন্‌ বৈশেষিক লক্ষণ পৃথক ক'রেছে—এই প্রশ্নের মীমাংসায় 'criticism of life' কথাটিতে তেমন কিছু নতুন কথা যোগ করে না। এই 'বৈশেষিক

লক্ষণ' নির্ধারণের চেষ্টা—পরিকল্পিত চেষ্টা—দেখা যায় ডি কুইন্‌সির (De Quincey) মধ্যে। শাস্ত্রকে ডি কুইন্‌সি বলেছেন—'literature of knowledge—সাহিত্যকে বলেছেন—literature of power'. 'There is first, the literature of Knowledge, and, secondly, the literature of power. The function of the first is—to teach, the function of the second is—to move……The first speaks to the mere discursive understanding; the second speaks ultimately it may happen, to the higher understanding or reason, but always through affections of pleasure and sympathy'। [ডি কুইন্‌সির 'mere discursive understanding'—প্লেটো এরিস্টটল—প্রভৃতির 'Reason'—কাণ্টের pure reason বা understanding] এখানে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য শাস্ত্র 'জ্ঞানের কথা', সাহিত্য—'ভাবের কথা' সহজেই মনে আসে এবং কথা দুটো যেন অনুবাদের মতই কানে বাজে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের যত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাদের শ্রেণীবদ্ধভাবে পাওয়া যায় টলস্টয়ের "what is art" !—নিবন্ধে (১৮৯৮)। মতবাদগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে টলস্টয় পূর্বপক্ষ তৈরী করে নিয়েছেন। নিম্নলিখিত শ্রেণীতে তিনি তাদের ভাগ করেছেন—(ক) "মেটাফিজিকাল ডেফিনিশান্‌স্‌"—এদের কাছে শিল্পকলা ভগবানের বা রহস্যময় সৌন্দর্যের স্বরূপের অভিব্যক্তি (খ) "ফিজিওলজিকাল-ইভোলিউশানারি" (শিলার, ডারুইন, স্পেন্‌সার, গ্রাণ্ট এলেন প্রভৃতি) এই মতে—কামবৃত্তি বা খেলাবৃত্তি থেকে শিল্পের জন্ম। স্নায়বিক উত্তেজনা তথা আনন্দ পাওয়া উদ্দেশ্য। (গ) "এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল"—ভেরোন (veron) এই দলের মুখপাত্র। রেখা, বর্ণ, গতি, শব্দ বা ভাষা দ্বারা আবেগকে প্রকাশ করা—শিল্পের উদ্দেশ্য। (ঘ) Sully-কৃত সংজ্ঞা—"production of some permanent object or passing action which is fitted not only to supply an active enjoyment to the producer, but to convey a pleasurable impression to a number of spectators or listeners quite apart

from any personal advantage to be derived from it"। টলস্টয়ের মতে উল্লিখিত মতগুলি সবই ভুল এবং শিল্পকলাকে যতক্ষণ "One of the conditions of human life" বলা না হবে—নিছক আনন্দের নিছক সৌন্দর্যের উপায় হিসাবে ধরা হবে, ততক্ষণ খাঁটি সংজ্ঞা পাওয়া যাবে না। টলস্টয়ের সিদ্ধান্ত—"Art is not, as the metaphysicians say, the manifestation of some mysterious idea of beauty or God; it is not, as the aesthetic physiologists say, a game in which man lets off his excess of stored-up energy; it is not the expression of man's emotions by external signs, it is not the production of pleasing object and above all. it is not pleasure; but it is a means of union among men joining them together in the same feeling, and indispensable for the life and progress towards well-being of individuals and of humanity" —(chap. V)। টলস্টয়ের মতে—সামাজিক-চিত্তে অনুভবকে সঞ্চার করে দেওয়াই শিল্পের বিলক্ষণ ধর্ম।—"Art is a human activity consisting in this that one man consciously by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through and that others are infected by these feelings and also experience them."

বলা বাহুল্য—সাহিত্য-শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ নিরূপণে এরিস্টটল নতুন কোন আলোকপাত করেননি। সাহিত্য-শিল্প আবেগের প্রকাশ, একথা আগে অনেকেই বলেছেন এবং প্লেটো-এরিস্টলের কাল থেকেই চলে আসছে। জ্ঞানের প্রকাশ শাস্ত্রে এবং ভাবের প্রকাশ শিল্পে—এই গণ্ডীর বাইরে টলস্টয় যেতে পারেননি। যা'হোক, এবার বিংশশতাব্দীতে প্রবেশ করা যাক। বিংশশতাব্দীতেও আমরা ঊনবিংশশতাব্দীর সবরকম প্রবৃত্তির ধারা দেখতে পাই। ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের সংগ্রামের তীব্রতা

আরো বেড়েছে। ব্র্যাড্‌লে, ক্রোচে, হুইস্‌লার রিচার্ড, কডওয়েল্‌, টমসন কর্ণফোর্থ প্রভৃতির বাক্‌ যুদ্ধে আসর বেশ গরম।

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করবার আগে এবং বেনিডেটো ক্রোচের সুবিখ্যাত মতবাদের পরীক্ষা করবার আগে, এরিস্টটলের মতবাদ সম্পর্কে—বিশেষতঃ এরিস্টটলের 'মাইমেসিস'-ব্যাপারের মধ্যে সৃজনশীল কল্পনা-শক্তির (Creative imagination) অস্তিত্ব আছে কি না এই প্রশ্নটি সম্পর্কে—আলোচনা করে নেওয়া দরকার। 'মাইমেসিস' কথাটির তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি করতে না পারায়, অনেকেই—এমন কি ক্রোচে পর্যন্ত—এরিস্টটলের দানকে লঘু করে দেখেছেন।

এ কথা আমরা আগেই বলেছি—এরিস্টটলই প্রথম দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্বসর্বস্ব রচনা থেকে সাহিত্য-শিল্পকে পৃথক করেছেন এবং করেছেন এই কথা বলেই যে সাহিত্য-শিল্পের কাজ রূপায়ণ—জীবনের অনুকরণ। কথাটি বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে যে দর্শন-বিজ্ঞানে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব আলোচিত হয় আর শিল্প ব্যক্তিরূপে-অবস্থিত এবং ক্রিয়াশীল জীবনের রূপ ও ভাবকে ব্যক্ত করে। ব্যক্তিরূপ ব্যক্ত করা মানেই—ব্যক্তির প্রতিরূপ (image) কল্পনা করা। কিন্তু 'রূপ-কল্পনামাত্রই যে শিল্প নয়, ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করে এরিস্টটল—এবং এরিস্টটলই প্রথম—কাব্যের বৈশেষিক লক্ষণটি নির্ধারণ করবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন। বিশেষকে (particular) সামান্যের (universal) মধ্যে, ঐক্যের অধীন করে, রূপ দেওয়াই কাব্যের কাজ এবং তা'তেই—কাব্য 'more philosophical than history'। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়—'as if it were the imitation that makes the poet'—এই কথাটির তাৎপর্য। আসল কথা, 'imitation' কথাটার তাৎপর্য এ নয় যে কবি শুধু ব্যক্তির দৈহিক রূপেরই প্রতিরূপ সৃষ্টি করবেন—visual image তৈরী করবেন। ব্যক্তি-রূপ অনুকরণ বলতে যেমন প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতিরূপ রচনা বুঝায়, তেমনি জীবনের (men in action)—দৈহিক-মানসিক—আত্মিক রূপের অর্থাৎ সত্তার সমস্ত রকম অভিব্যক্তিরই

প্রতিরূপ সৃষ্টি বুঝায়। একটা গোটা মানুষের অনুকরণ শুধু তার দৈহিক অবয়বের প্রতিরূপ কল্পনা নয়, দেহধারী সামাজিক মানুষ হিসাবে তার যত রকম অভিব্যক্তি সম্ভব—কর্ম অনুভব, কল্পনা ভাবনার সমবায়ে তার যে দৈহিক-মানসিক সত্তার সমগ্রতা—সেই সমগ্রতার রূপ সৃষ্টি করা। দেবস্তুতি বা প্রশস্তি কাব্যে কবির যে ব্যক্তিগত আবেগোচ্ছ্বাসের প্রকাশ, কাহিনী-কাব্যে অতখানি ব্যক্তি-সাপেক্ষতা থাকে না। তবে কাহিনী-কাব্যও তো অনুকরণ বটে এখানে তো শুধু চাক্ষুষ রূপেরই প্রতিরূপ পাওয়া যায় না। ঘটনা, ক্রিয়া, চরিত্র, ভাবনা—সব কিছুরই অনুকরণ ঘটে এবং খণ্ড খণ্ড অনুকরণের সমবায়ে একটা ঐক্যবদ্ধ জীবন-রূপের (men in action) অনুকরণ সিদ্ধ হয়। কাব্য জীবনের বা জগতের—তত্ত্ব-বিচার বা তত্ত্ব-মীমাংসা নয়, কাব্য জগতের ও জীবনের ব্যক্তি-রূপ-বৈচিত্র্যের, জীবনের স্থিতিশীল বা গতিশীল রূপের উপস্থাপনা। এই হচ্ছে 'ইমিটেশন' কথাটির তাৎপর্য। সুতরাং 'মাইমেসিস' (অনুকরণ) শব্দটি বহুব্যাপক শব্দ—সাবজেকটিভ-অবজেকটিভ রচনা বলতে আমরা যে রীতির রচনা বুঝি সব রীতির রচনা বুঝাতেই যে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে--এ কথা সব সময় এবং খুব সতর্কভাবে মনে রাখা দরকার।

এই প্রসঙ্গেই কথাটা আবার তোলা যাক—এরিস্টটল 'ইমিটেশন' বলতে প্রকৃতির যথাযথ বা যান্ত্রিক অনুকরণের ব্যাপার বোঝেননি। রূপের অনুকরণ হয়ত বা খানিকটা—যান্ত্রিক অর্থাৎ কোন বস্তুর যথাযথ প্রতিরূপ হতে পারে কিন্তু চরিত্রের অনুকরণ, বিশেষতঃ হৃদয়াবেগের অনুকরণ যান্ত্রিক হতে পারে না। এই জাতীয় অনুকরণে কবির আবেগ-ক্ষমতা বা উপলব্ধি ক্ষমতাই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

এই বিষয়েই অনেকে সন্দেহ করেছেন এবং বলেছেন—এরিস্টটল মানুষের কল্পনাবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বলেই শিল্পকে, (কাব্য-শিল্পকেও) অনুকরণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক রূপের যথাযথ প্রতিরূপ রচনা বলে ঘোষণা করেছেন। যাঁরা এরিস্টটলের 'মাইমেসিস্'কে যান্ত্রিক অনুকরণ বলে উপেক্ষা করেছেন তাঁদের সামনে নিম্নলিখিত প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাচ্ছে এবং

এই কথাটাও প্রমাণ করা হচ্ছে যে এরিস্টটল, কল্পনাবৃত্তি—যাকে 'সৃজনশীল' (creative) উপাধি দিয়ে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সেই কল্পনাবৃত্তিটি সম্বন্ধেও একেবারে অনবহিত ছিলেন না। প্রমাণ সমূহ :—

(ক) it follows that we must represent men either as better than in real life or as worse or as they are। বলাবাহুল্য "real life"—থেকে 'better' বা 'worse' করা যথাযথ অনুকরণ নয়—"as they are"ই যথাযথ রূপ সৃষ্টি। better বা worse করা কল্পনাবৃত্তি দ্বারাই সম্ভব।

(খ) 'by plot I here mean the arrangement of incidents' কথাটি লক্ষণীয় 'artistically constructed incidents'ই হচ্ছে সৃষ্টির আসল কথা। শিল্পিত গঠন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরিস্টটল বলেছেন—'action' কে complete and whole and of a certain magnitude হতে হবে। "whole" মানে—যার "has a beginning, a middle and an end" অর্থাৎ যাতে জৈবিক দেহের মত একটি ঐক্য আছে। এই "ঐক্য" (unity)—"structural union of the parts"—যান্ত্রিক অনুকরণের কাজ নয়। যে বৃত্তি দ্বারা এই কাজ সাধ্য, তাকে কল্পনাবৃত্তিই বলতে হবে।

*(গ) "it is not the function of the poet to relate what has happened, but what may happen—what is possible according to the law of probability or necessity" (ix)—এখানে এরিস্টটল কবি কর্মের ধর্ম ব্যাখ্যা করে যা বলেছেন তা এই যে কবির কাজ 'যা ঘটেছে' তাকেই রূপ দেওয়া নয়, কবির কাজ—বিশেষ ঘটনা ও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে ব্যক্তির আচরণের (শারীরিক-মানসিক-আত্মিক) সামান্য বা পরা-পরিণতি ব্যক্ত করা। ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

(ঘ) Poetry·· is a more philosophical and a higher thing than history ; for poetry tends to express the universal history the particular (ix)। এখানেই কাব্যের ধর্ম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—বলা হয়েছে, কাব্য ব্যক্তি-রূপের আশ্রয়ে—সামান্য রূপেরই অভিব্যক্তি। এরিস্টটল

"universal" বলতে অতিলৌকিক কোন রূপের কথা বলেননি। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন—By the universal I mean how a person of a certain type will on occasion speak or act, according to the law of probability or necessity। এই 'universal' শৈল্পিক পরা-রূপ অর্থাৎ—ব্যক্তিরূপের মাধ্যমে জীবনের (men in acton) ক্রিয়া, ভাব ও প্রকাশের পরা-রূপ প্রতিষ্ঠা (it is this universality at which poetry aims in the natures she attaches to the personages—(IX)।

এই পরা-রূপ বা 'সামান্য'-এর অভিব্যক্তি দেওয়া যে 'অনুকরণ' (মাইমেসিস্) নিশ্চয়ই তা যান্ত্রিক কোন ব্যাপার নয়—'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'—ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এই অভিব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে বিষয়ের অভিব্যক্তি বটে, কিন্তু আসলে—কবির আত্মসংস্কারেরই প্রকাশ ['আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি—স্মরণীয়।]

(ঙ) মাইমেসিস যে ঘটিত ঘটনার যান্ত্রিক পুনঃস্মরণমাত্র নয়, তার প্রমাণ আগেই পাওয়া গেছে। আর একটা প্রমাণ এই—এমন কাহিনী আছে—"where incidents and names alike are fictitious—অর্থাৎ ঘটনা এবং নাম উভয়ই কাল্পনিক। কমেডির কাহিনী তো কাল্পনিক হামেশাই হয়, ট্রাজেডির কাহিনীও কাল্পনিক হতে পারে। 'কাল্পনিক' কাহিনী নিশ্চয়ই যান্ত্রিক অনুকরণের কাজ নয়।

(চ) 'episodic'-বৃত্ত এবং আদর্শ বৃত্তের (প্লট) গঠনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে যা' বলেছেন তা'তেও দেখা যায় যে আদর্শবৃত্তের গঠন কল্পনা-কুশল প্রতিভার কাজ, 'air of design' এবং কল্পনারই কাজ। ঘটনাবিন্যাসে যেখানে কার্যকারণ যোগ থাকে না—থাকে শুধু পরম্পরা মাত্র, সেই বৃত্তই 'এপিসোডিক' আর যেখানে ঘটনা "follow as cause and effect" সেখানেই বৃত্তের উৎকৃষ্ট রূপ প্রকাশ পায়। এপিসোডিকে—কল্পনা দুর্বল, আদর্শ বৃত্তে কল্পনা রীতিমত সংগঠনশীল।

(ছ) কাহিনী-পরিকল্পনা (story) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন—whether the poet takes it ready made or constructs it for

himself, he should first sketch its general outline and then fill in the episodes and amplify in detail.

(ঙ) কাব্যের অনুকরণীয় বিষয় সম্বন্ধে এরিস্টটল লিখেছেন—কবি অনুকরণ করবেন—'One of three objects—things as they were or are, as they are said or thought to be, or things as they ought to be' (XXV) (বুচার—তাঁর গ্রন্থে শুধু এই যুক্তিটি উত্থাপিত করেছেন) "as they ought to be"—কে অনুকরণ করতে যাওয়াকে নিশ্চয়ই 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' ব্যাপার বলা চলে না।

এই প্রসঙ্গেই আলোচনা করা যেতে পারে—এরিস্টটলের মধ্যে যে কল্পনাবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, তার স্বরূপ কি? কোলরিজ যাকে 'secondary imagination' or esemplastic imagination বলেছেন এবং যাকে পরে 'creative imagination' বলা হয়েছে—এই কল্পনাবৃত্তি কি সেই জাতীয় কোন ব্যাপার ?

চৈতন্য ক্রিয়ার পর্যায়গুলি আমরা মোটামুটি এইভাবে সাজাতে পারি—(ক) ইন্দ্রিয়ের পথে বিষয়ের প্রবেশ তথা তদাকারা 'প্রতীতি' (sensation, perception) (খ) স্মরণ—প্রতীত বিষয়ের পুনরুদ্বোধ (গ) প্রতীতির (impression) সংযোগ-সংমিশ্রণে নূতন প্রতীতির—কল্পনা (নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি), (ঘ) মনন—এক বিষয়ের সঙ্গে আর এক বিষয়ের সম্পর্ক-বিচার, বিষয়ের স্বরূপতত্ত্ব নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপার। প্রতীতি—স্মৃতি—কল্পনা—ভাবনা (মনন) পর পর পূর্বসাপেক্ষভাবে অবস্থিত। প্রতীতি অভাবে স্মৃতি সম্ভব নয়, স্মৃতি অভাবে কল্পনা সম্ভব নয় এবং কল্পনা অভাবে ভাবনাও সম্ভব নয়। প্রতীতি ও স্মৃতি দেশ-কালাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিশেষ দেশ বা কালের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মনে উপস্থিত হয়। কল্পনা-শক্তি আসলে বিষয়ীর (Ego) সেই ক্ষমতা যা' দিয়ে সে প্রতীতি ও স্মৃতিকে দেশকাল থেকে বিযুক্ত করে নিতে পারে—এক প্রতীতির সঙ্গে আর এক প্রতীতি মিশিয়ে নতুন দেশে-কালে তাকে নানারূপে (form) ধারণা করতে পারে। আসলে, কল্পনা বিষয়ীরই একটা ক্ষমতা এবং এমন ক্ষমতা যা'

থাকায় বিষয়ী তার প্রত্যয়গুলি (impressions) নানা আকারে চেতনায় প্রতিভাত বা ধারণা করতে পারে। কল্পনা শুধু প্রতীতের স্মরণমাত্র নয়—প্রতীতকে বৃহত্তর এবং বিচিত্রতর রূপাদর্শে (pattern) ধারণা করার শক্তি। এই রূপাদর্শের ধারণা যে 'নবনবোন্মেষশালিনী' বুদ্ধি-শক্তির কাজ, তার সবটাই বোধ-পূর্বক ব্যাপার নয়। বাসনার আবেগে, প্রতীতির সঙ্গে প্রতীতির সংমিশ্রণ ঘটে, যৌগিক প্রতীতির সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই তা সৃষ্ট হয়। এই অবোধপূর্বক উন্মেষণকেই—আমরা intuition বা creative imagination—নাম দিয়ে থাকি, আর সেই সম্পূর্ণ বোধপূর্বক উন্মেষণকে—যে উন্মেষণের সঙ্গে জীবনের বাস্তব রূপের যোগ নেই—বলা হয় —fancy। secondary Imagination এবং Fancy সম্বন্ধে কোলরিজ যা বলেছেন তা' সামনে রাখলে কথা দু'টোর অর্থের পার্থক্য বুঝা সহজ হবে।

প্রথমটি—'Secondary Imagination'—'dissolves diffuses, dissipates in order to recreate ; or where this process in rendered impossible, still at all events, it struggles to idealize and to unify. It is essentially vital, even as all objects (as objects) are essentially fixed and dead.

Fancy on the contrary has no other counters to play with, but fixities and definites. The fancy is indeed no other than a mode of Memory emancipated from the order of time and space. দেখা যাচ্ছে সৃজনশীল কল্পনার দু'টো রূপ—একে প্রতীতিগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন রূপাদর্শ সৃষ্টি করা হয় ; অন্যে—অর্থাৎ যেখানে মেলানো-মেশানো সম্ভব হয় না,—সেখানে প্রতীতিসমূহকে আদর্শায়িত এবং ঐক্য-সংহত রূপ দেওয়া হয়।

আমরা দেখেছি—'to idealize and to unify'—এরিস্টটলের মতে কাব্যের (মাইমেসিসের) বিশেষ ধর্ম। 'universal' কে রূপ দেওয়া মানেই —'idealize' করা এবং "action" কে whole রূপ দেওয়া মানেই unify—করা। সুতরাং 'Secondary Imagination' ছাড়া যে শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব নয়—

এই সিদ্ধান্তই এরিস্টটল (পরোক্ষভাবে) করে গেছেন। তারপর—মেলানো মেশানোর প্রশ্ন। এক প্রতীতির সঙ্গে আর এক প্রতীতির মেলা-মেশার ব্যাপারটি—রহস্যময়। কিভাবে এবং কোথায় মিশছে—তা হিসাব করে বলা যায় না। এরিস্টটল নিশ্চয়ই এ কথা বলেননি—যে গোটা-গোটা প্রতীতি জুড়ে দিয়ে রূপ-'কল্পনা' তৈরী করতে হবে।

এই প্রশ্নটি নিয়েই, আমরা বিংশশতাব্দীর প্রখ্যাত শিল্পতত্ত্বদর্শী, বেনিডেট্টো ক্রোচের আলোচনা বিচার করে দেখতে চেষ্টা করি। ক্রোচে জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—এক—'logical Knowledge'—দুই 'intuitive knowledge'। একের উৎপত্তি—'বুদ্ধি' (intellect) থেকে অন্যের উৎপত্তি—'imagination' থেকে; প্রথমটি—'সামান্যে'র জ্ঞান, দ্বিতীয়টি—'বিশেষে'র জ্ঞান; প্রথমটি সৃষ্টি করে—concept (সংজ্ঞা) দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে—প্রতিরূপ 'image'। ক্রোচের মতে—শিল্পকলা—intuitive knowledge—'কল্পনাত্মক জ্ঞান' অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর জ্ঞানক্রিয়া। তাঁর মতে—Art is intuition আর intuition ও expression একই কথা। মাইমেসিসবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্রোচে বলেছেন—'কলা প্রকৃতির অনুকরণ'—এই বক্তব্যটির নানা অর্থ আছে। এই বাক্যটিতে অনেক সময় সত্যের কায়া অথবা ছায়া প্রকাশ পায়,—অনেক সময় অসত্যও প্রচারিত হয়। এর যথার্থ বৈজ্ঞানিক অর্থ পাওয়া যায় তখনই যখন অনুকরণ বলতে উপস্থাপন বা প্রতিভান (intuition) ধরা হয়—অনুকরণকে একপ্রকার জ্ঞান মনে করা হয়। ব্যাপারটি আত্মিক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, এই কথাটা যখন জোর দিয়ে বলা যায় তখন এই সিদ্ধান্তটিও অবধারিত হয়—কলা প্রকৃতির আদর্শায়ন (idealization)—আদর্শায়িত অনুকরণ (idealizing imitation)। ক্রোচের মন্তব্য সামনে রেখেই বলা যেতে পারে—এরিস্টটলের মতেও, মাইমেসিস কোন যান্ত্রিক অনুকরণ নয়—আদর্শায়ন (idealization)। এ কথা আগেই প্রমাণ করা হয়েছে।

সুতরাং 'Art is expression' এই সংজ্ঞা তৈরী করে ক্রোচে খুব নতুন কোন কথা বলেছেন তা' বলা যায় না। এরিস্টটল থেকে কাণ্ট পর্যন্ত যে ধারণা

চলে এসেছে, তাকেই তিনি নতুন পরিভাষা-যোগে পর্যালোচনা করেছেন। এ কথাও বলা চলে, ক্রোচে এরিস্টটলকে অনুকরণবাদী বলে উপেক্ষা দেখালেও 'মাইমেসিস' কথাটি 'ইন্‌টুইশান' কথাটি থেকে ব্যাপকতর এবং একাধারে 'কল্পনা'ও 'পরিকল্পনা'কে অন্তর্ভুক্ত করে, সত্যের অনেক কাছে এগিয়েছে। ক্রোচের 'ইন্‌টুইশান'-ব্যাপার বাইরে জ্ঞানক্রিয়া হলেও ভিতরে অনুভব-ক্রিয়া, কারণ, ইন্‌টুইশান—'reality apprehended in all its ingenuousness and immediacy in the vital impulse, in its feeling, that is to say again pure intuition'। তা'ছাড়া ক্রোচের মতে শিল্প-কলা শুধু 'expression' এবং 'we cannot or not will our aesthetic vision', সুতরাং ক্রোচের কাছে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির স্থান—logical activity-র কোন স্থান নেই অর্থাৎ পরিকল্পনার স্থান নেই। সৃষ্টি ব্যাপার যে আসলে aesthetico-logiacl ব্যাপার এ কথাটা ক্রোচে স্বীকার করেননি। ক্রোচের ইন্‌টুইশান' কথাটির মধ্যে পরিকল্পনা-শক্তির কোন অবকাশ নেই। ক্রোচের সমালোচনা এই পর্যন্তই এবং আশা করি, যথেষ্ট।

ক্রোচের পরে অনুকরণবাদের—উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করেছেন R. A. Scott James—[The Making of Literature গ্রন্থে 1928°, ed. 1946.] স্কট্ জেমস্ মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, কাহিনী কাব্যে—সে দৃশ্যই হোক আর শ্রব্যই হোক—এ কথা মানা যেতে পারে—যে কবির কাজ অনুকরণ করা—কবিরা মানুষের কায়িক ও মানসিক আচরণরাজি অনুকরণ করেন, কিন্তু এরিস্টটল গীতি কাব্যকে একটু তলিয়ে দেখলেই নাকি দেখতে পেতেন যে কবিরা সবক্ষেত্রেই জীবনের রূপ (object) অনুকরণ করেন না। একটি কবিতা তুলে (৩৪০ পৃষ্ঠায়) তিনি দেখিয়েছেন—প্রথম ৪ পংক্তিতে সামান্য বচন—অবশ্য কয়েকটি উপমাও আছে, মাঝের ৪ পংক্তিকে আসলে অনুরণ বলা যায়, আর শেষের ২ পংক্তি তো বিশুদ্ধ নীতি বচন। এই ধরনের জটিল মানসিক অভিব্যক্তিকে—যাতে কল্পনা ও ভাবনা জড়িয়ে গেছে—অনুকরণ বলা চলে কি করে? চলে না বলেই স্কট জেমস্ মহাশয় বলেছেন—"The words imitate and represent, then,

are not quite satisfactory if we wish to indicate an element that is never absent in a work of art. The word that we need is "exhibit"………The artist does not always imitate, but he always exhibits or shows·· ……………Exhibition, then is the fundamental fact in the aesthetic process. The scientist tells us; the moralist or rhetorician seeks to persuade us, the artist shows us. There we have the distinction between literature which is fine art and all other literature whatsoever. এই মতবাদটিকে, আমরা 'ইজম'—যোগ করে একজ্বিভিশানিজম্ 'Exhibitionism' —বলতে পারি। স্কট জেমস্ মহাশয়—অনুকরণবাদের যে অব্যাপ্তির ক্ষেত্র দেখিয়েছেন তা সত্য কি মিথ্যা একটু ভেবে দেখা দরকার।

প্রথমেই প্রশ্ন আসে—এরিস্টটল কি গীতি-কবিতা (lyric) সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না? দেবস্তুতি বা নরস্তুতিকে যদি কাব্য বলা হয়ে থাকে, 'thought'-কেও যদি অনুকরণের বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে (ট্র্যাজেডির ও মহাকাব্যের উপাদান বিচার দ্রষ্টব্য।) তা হলে এ কথা নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে হবে যে এরিস্টটল মাইমেসিস (অনুকরণ) কথাটি শুধু বস্তুর প্রতিরূপ-কল্পনা অর্থে ব্যবহার করেননি। জীবনের অনুকরণ—এরিস্টটলের কাছে শুধু তো দৈহিক আকৃতির অনুকরণ নয়,—ভাবাবেগের অনুকরণ এবং ভাবনারও অনুকরণ। কারণ জীবনের প্রকাশ শুধু দৈহিক চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অনুভব ও ভাবনা ক্রিয়ার মধ্যেই জীবনের আত্মিক অভিব্যক্তি। এ বিষয়ে এরিস্টটল সচেতন ছিলেন এবং ছিলেন বলেই —thought-কেও কাব্যের উপাদান বলে তিনি স্বীকার করেছেন তবে কেউ বলতে পারেন—বেশ কথা, চিন্তা (সামান্য বচন বা নীতি-বচন) যখন কোন চরিত্রের মুখে প্রকাশিত হয় তখন সে চিন্তা "men-in action" এর অনুকরণের অঙ্গ হিসাবেই আসে এবং ঐভাবে আসে বলেই তা অনুকরণ; কিন্তু কবি যেখানে, কবির ব্যক্তিগত কল্পনা ও চিন্তা প্রকাশ করেন সেখানে অনুকরণ কথাটা খাটে কি? সেখানেও কি কবি 'men in action'-কে

অনুকরণ করেন ? প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, কবি পরগত-ভাবেই অনুকরণ করুন আর আত্মগভাবেই অনুকরণ করুন, অনুকরণ শেষ পর্যন্ত 'men-in-action'-এর বিচিত্র রূপেরই অনুকরণ। পরগত অনুকরণে কবি অন্য পাত্র-পাত্রীর মুখে জীবনের রূপ ও ভাব প্রকাশ করেন আর আত্মগত অনুকরণে কবি বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবনের সম্ভাব্য প্রকাশকেই নিজের মুখে প্রকাশ করেন। উভয় অনুকরণেই ব্যক্তির মাধ্যমে সামান্য জীবনই স্বরূপতঃ অভিব‍্যক্ত হয়। এই হিসাবে, আত্মগত প্রকাশকেও—'men-in-action' বলে গণ্যকরা যেতে পারে। আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারেই করুন আর অজ্ঞাতসারেই করুন এতখানি ব্যাপক অর্থেই এরিস্টটল 'men-in-action' কথাটা প্রয়োগ করেছেন। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে—অনুকরণবাদ অব্যাপ্ত নয় এবং প্রদর্শন-বাদেরও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আর অনুকরণ ও প্রকাশের মধ্যেও কোনো ভেদ থাকে না।

কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে প্রতীচ্য মহাদেশে যে প্রচেষ্টা হয়েছে তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের প্রচেষ্টার একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। এখানেও কাব্য-শিল্পের সংজ্ঞানিরূপণে প্রশংসনীয় সূক্ষ্ম বিচারশক্তির মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। ভরত থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়েছে তা শুধু পরিমাণেই বৃহৎ নয়, গুণেও অনেক মহৎ।

ভরতের নাট্যসূত্রে এই আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং অনুকরণবাদের মতোই একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভরত নাট্যকে বলেছেন—'লোক-বৃত্তানুকরণম্ 'লোকবৃত্তানুবর্তনম্, 'ভাবানুকীর্তনম্'—এই সব বলায় এই কথাই বলা হয়েছে যে, নাট্য বা দৃশ্যকাব্যে—অর্থাৎ কাহিনী-কাব্যে জীবনের রূপকেই 'men in-action' বৃত্তবন্ধে উপস্থাপিত করা হয়। জীবনের উপস্থাপনা করতে যাওয়ার অর্থ—বিশেষ দেশ-কালের অধিকরণে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের—অর্থাৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণ রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির মাঝ দিয়ে, নানাভাব-বিক্রিয়ার ও তদনুগত ভাবনার রূপ দেখিয়ে দেখিয়ে, ব্যক্তি জীবনের পরিণতি দেখানো। জীবনকে এইভাবে অর্থাৎ বিভাব-অনুভাব

ব্যভিচারীভাব যোগে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারার নামই—জীবনের রসরূপ সৃষ্টি করা। রসবাদে—মুখ্যতঃ জীবনকেই men in-action-কেই কাব্যের উপস্থাপ্য বিষয় বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তেই পৌছানো হয়েছে যে জীবনের রূপকে খণ্ড বা অখণ্ড আকারে প্রকাশ করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টি থেকেই কাব্যের লক্ষণ করা হয়েছে—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"।

অনুকরণবাদের বিরুদ্ধে যে-সব অব্যাপ্তি নির্দেশ করা হয়েছে রসবাদের বিরুদ্ধেও সেই সব যুক্তি দেখানো হয়েছে। বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি-সমূহকে আমরা মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করে দেখাতে পারি। একদল—কাব্যের আত্মাকে দেখেছেন—প্রকাশ-রীতির form-এর মধ্যে, আর একদল—দেখেছেন বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। অলঙ্কারবাদীরা—যাঁরা বলেছেন 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ, তাঁরা বাগ্‌-ভঙ্গিমার (form) চমৎকারিত্বের মধ্যেই কাব্যের আত্মাকে দর্শন করেছেন, রীতিবাদীরা অর্থাৎ যাদের মতে—কাব্যের আত্মা হচ্ছে—রীতি (রীতিরাত্মা কাব্যস্য) এবং বক্রোক্তিবাদীরাও যাঁদের মতে—কাব্যের জীবন হচ্ছে—বক্রোক্তি (বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্) তাঁরা প্রকাশ ভঙ্গিমার (Expressive activity) মধ্যেই কাব্যত্ব দেখতে পেয়েছেন। প্রকাশভঙ্গিমার ওপর যাঁরা জোর দিয়েছেন, তাঁরা অজ্ঞাতসারে কাণ্ট-কথিত 'subjectivity'—লক্ষণটিকেও যেন ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। দর্শন-বিজ্ঞানের নৈয়ায়িকচিন্তার প্রকাশ থেকে—কাব্যের প্রকাশ পৃথক, এই প্রকাশ অলঙ্কৃত অর্থাৎ ব্যক্তিগত অনুরঞ্জনমেশানো কল্পনাত্মক প্রকাশ। মোটামুটি-ভাবে এ কথা বলা যেতে পারে—অলঙ্কারবাদী, রীতিবাদী ও বক্রোক্তিবাদী —(বস্তুধ্বনি—অলঙ্কারধ্বনিবাদীও, অন্তর্ভুক্ত) কল্পনাত্মক প্রকাশ ভঙ্গিমার ওপর অর্থাৎ form-এর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং এই কথাই বলতে চেয়েছেন—অবশ্য অজ্ঞাতসারেই—কোন রচনার কাব্যত্ব বিষয়-বৈশিষ্ট্যে নয়, প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে—কল্পনাত্মক তথা subjective প্রকাশ ভঙ্গিমায়।

উক্ত মতবাদসমূহ রসবাদের অব্যাপ্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছে—দেখাতে চেষ্টা করেছে, এমন অনেকক্ষেত্র আছে যেখানে ঠিক রস

বলতে যা বুঝায় তা নেই, অথচ কাব্যত্ব তার অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু তাদের নিজের অব্যাপ্তি-দোষও কম হয়নি। এই দ্বন্দ্বকে প্রথম সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে—ধ্বনিবাদে (ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য)। (ক) রসধ্বনি (খ) বস্তুধ্বনি (গ) অলঙ্কারধ্বনি—এই তিন রকমের ধ্বনি কল্পনা করে—রসবাদ ও অলঙ্কারবাদ প্রভৃতি মতবাদকে একটি বৃত্তের মধ্যে বাঁধবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কাব্যের লক্ষণটিকে ব্যাপকতর করা হয়েছে। যা রসাত্মক তা কাব্য বটে, কিন্তু যেখানে বস্তুর-স্বরূপ বর্ণনা থেকে, আলঙ্কারিক প্রয়োগ (expression) থেকেই আনন্দ সৃষ্টি হয়, সেখানেও তো কাব্যত্ব স্বীকার্য। যা' হোক ধ্বনিকার "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য"-লক্ষণ করে পূর্ববর্তী মতবাদগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় আনতে চেষ্টা করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন রসধ্বনি সৃষ্টিই বড কবির কাজ। অর্থাৎ বড় কবির কীর্তিবস্তু বর্ণনার জন্য নয়—অলঙ্কার-চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্যও নয়—বড় কবির কীর্তি—রস-সৃষ্টিতে। কিন্তু ধ্বনিবাদও অব্যাপ্তিদোষ এড়াতে পারেনি। কারণ "ধ্বনি" শব্দটির বিশিষ্ট তাৎপর্য যা, তাতে এমন ক্ষেত্র সম্ভব যেখানে কাব্যত্ব স্বীকৃত কিন্তু, ধ্বনি নেই অর্থাৎ ব্যঞ্জনা থেকে বাচ্যার্থের চমৎকারিত্বই যেখানে বেশী চিত্তাকর্ষক। এই অব্যাপ্তি পরিহার করবার চেষ্টা—করেছেন জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধরে। তাঁর মতে—রম্যার্থপ্রতিপাদকশব্দঃ কাব্যম্—অর্থাৎ রম্যার্থের শব্দ প্রকাশের নাম কাব্য। যেখানেই রম্যার্থ প্রকাশিত সেখানেই শৈল্পিক মূল্য (aesthetic value) সৃষ্টি হয়।

'রম্যার্থ' কথাটি খুবই ব্যাপক। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত খণ্ড ও অখণ্ড উপলব্ধির (আত্মগত ও পরগত) ক্ষেত্র পর্যন্ত রম্যার্থের ব্যাপ্তি। এই কারণেই নিসর্গ-কবিতাই হো'ক আর অতি আত্মগত মনন-প্রধান আধুনিক কবিতাই হো'ক—সব কিছুই রম্যার্থের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। [এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ডাঃ শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় এই রম্যার্থবাদকে সমর্থন করতেই কাব্যালোক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'রস-গঙ্গাধর'—রচয়িতা জগন্নাথের আলোকেই তার পথ আলোকিত হ'য়েছে।

দ্রুতি ও দীপ্তি এই দুই নামে কাব্যকে শ্রেণীবিভক্ত করে তিনি রসগঙ্গাধরের সূত্রকেই আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন]

এইবার আমরা পিছনের সমস্ত আলোচনার দিকে তাকিয়ে, সংজ্ঞা-নিরূপণের মূল সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করতে পারি। সমস্যাটিকে প্রশ্নাকারে ব'লে এই ভাবে বলা যায়—রচনা কাব্য হয়ে উঠে—অর্থাৎ কাব্যধর্মান্বিত হয় যে বৈশিষ্ট্যের ফলে, সে বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে কি সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মাঝে? না বিষয়বস্তুর মাঝে? আরো একটু বিশ্লেষণ করে বলা যাক—তবে কি (ক) শাস্ত্রের এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য যা আসে সে বিশেষ ধরনের—মানস-প্রক্রিয়ার ফলে? অথবা (খ) মানস-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বড় কথা নয়—কাব্য ও শাস্ত্রের পার্থক্য নিহিত আছে—বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে?

এরিস্টটলের মধ্যে দেখা যায়—তিনি "ব্যাপার" ও "বিষয়" দুটোর দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে ব্যাপারটি বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণ (Reason) নয়—অনুকরণ (মাইমেসিস) আর বিষয়—men-in-action—জীবনের ব্যক্ত রূপ-বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে যে সকল আলোচনা হয়েছে তাতে বিষয়বস্তুর গণ্ডী বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—বলা হয়েছে শুধু জীবন নয়—বিশ্বজগৎই অনুকরণের বিষয় এবং সৃজন ব্যাপারের বৈশিষ্ট্যের ওপরই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাব্যত্ব বিষয়-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নয় কাব্যত্ব উপস্থাপনা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। তবে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের গণ্ডী বাড়লেও এক বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত—কাব্য প্রকাশ বা অনুকরণ করে—বিষয়কে, বিষয়ের তত্ত্বকে নয়। অনুকরণ বা উপস্থাপনা মানেই বিষয়ের ব্যক্তরূপটিকে ব্যক্ত করা—জগতের বা জীবনের ব্যক্ত ও সম্ভাব্য রূপকে প্রকাশ করা। এরিস্টটল থেকে কাণ্ট ও ক্রোচে পর্যন্ত সকলেই এ বিষয়ে একমত—সকলেই ঘোষণা করেছেন—কাব্যের উদ্দেশ্য—বস্তু ও ভাবকে ব্যক্তি-রূপে (Concrete form) ব্যক্ত করা। লক্ষ্য করবার বিষয় এখানে এই যে, ব্যাপার ও বিষয়কে যতটা পৃথক করে আমরা ধারণা করি, ততটা পৃথক করা সম্ভব নয়। ব্যাপার ও বিষয় পরস্পর পরস্পরকে বিশিষ্টতা

বলতে যা বুঝায় তা নেই, অথচ কাব্যত্ব তার অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু তাদের নিজের অব্যাপ্তি-দোষও কম হয়নি। এই দ্বন্দ্বকে প্রথম সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে—ধ্বনিবাদে (ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য)। (ক) রসধ্বনি (খ) বস্তুধ্বনি (গ) অলঙ্কারধ্বনি—এই তিন রকমের ধ্বনি কল্পনা করে—রসবাদ ও অলঙ্কারবাদ প্রভৃতি মতবাদকে একটি বৃত্তের মধ্যে বাঁধবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কাব্যের লক্ষণটিকে ব্যাপকতর করা হয়েছে। যা রসাত্মক তা কাব্য বটে, কিন্তু যেখানে বস্তুর-স্বরূপ বর্ণনা থেকে, আলঙ্কারিক প্রয়োগ (expression) থেকেই আনন্দ সৃষ্টি হয়, সেখানেও তো কাব্যত্ব স্বীকার্য। যা' হোক ধ্বনিকার "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য"-লক্ষণ করে পূর্ববর্তী মতবাদগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় আনতে চেষ্টা করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন রসধ্বনি সৃষ্টিই বড় কবির কাজ। অর্থাৎ বড় কবির কীর্তিবস্তু বর্ণনার জন্য নয়—অলঙ্কার-চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্যও নয়—বড় কবির কীর্তি—রস-সৃষ্টিতে। কিন্তু ধ্বনিবাদও অব্যাপ্তিদোষ এড়াতে পারেনি। কারণ "ধ্বনি" শব্দটির বিশিষ্ট তাৎপর্য যা, তাতে এমন ক্ষেত্র সম্ভব যেখানে কাব্যত্ব স্বীকৃত কিন্তু, ধ্বনি নেই অর্থাৎ ব্যঞ্জনা থেকে বাচ্যার্থের চমৎকারিত্বই যেখানে বেশী চিত্তাকর্ষক। এই অব্যাপ্তি পরিহার করবার চেষ্টা—করেছেন জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধরে। তাঁর মতে—রম্যার্থপ্রতিপাদকশব্দঃ কাব্যম্—অর্থাৎ রম্যার্থের শব্দ প্রকাশের নাম কাব্য। যেখানেই রম্যার্থ প্রকাশিত সেখানেই শৈল্পিক মূল্য (aesthetic value) সৃষ্টি হয়।

'রম্যার্থ' কথাটি খুবই ব্যাপক। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত খণ্ড ও অখণ্ড উপলব্ধির (আত্মগত ও পরগত) ক্ষেত্র পর্যন্ত রম্যার্থের ব্যাপ্তি। এই কারণেই নিসর্গ-কবিতাই হো'ক আর অতি আত্মগত মনন-প্রধান আধুনিক কবিতাই হো'ক—সব কিছুই রম্যার্থের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। [এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ডাঃ শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় এই রম্যার্থবাদকে সমর্থন করতেই কাব্যালোক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'রস-গঙ্গাধর'—রচয়িতা জগন্নাথের আলোকেই তার পথ আলোকিত হ'য়েছে।

ক্রতি ও দীপ্তি এই দুই নামে কাব্যকে শ্রেণীবিভক্ত করে তিনি রসগঙ্গাধরের সূত্রকেই আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন]

এইবার আমরা পিছনের সমস্ত আলোচনার দিকে তাকিয়ে, সংজ্ঞা-নিরূপণের মূল সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করতে পারি। সমস্যাটিকে প্রশ্নাকারে ব'লে এই ভাবে বলা যায়—রচনা কাব্য হয়ে উঠে—অর্থাৎ কাব্যধর্মান্বিত হয় যে বৈশিষ্ট্যের ফলে, সে বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে কি সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মাঝে? না বিষয়বস্তুর মাঝে? আরো একটু বিশ্লেষণ করে বলা যাক—তবে কি (ক) শাস্ত্রের এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য যা আসে সে বিশেষ ধরনের—মানস-প্রক্রিয়ার ফলে? অথবা (খ) মানস-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বড় কথা নয়—কাব্য ও শাস্ত্রের পার্থক্য নিহিত আছে—বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে?

এরিস্টটলের মধ্যে দেখা যায়—তিনি "ব্যাপার" ও "বিষয়" দুটোর দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে ব্যাপারটি বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণ (Reason) নয়—অনুকরণ (মাইমেসিস) আর বিষয়—men-in-action—জীবনের ব্যক্ত রূপ-বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে যে সকল আলোচনা হয়েছে তাতে বিষয়বস্তুর গণ্ডী বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—বলা হয়েছে শুধু জীবন নয়—বিশ্বজগৎই অনুকরণের বিষয় এবং সৃজন ব্যাপারের বৈশিষ্ট্যের ওপরই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাব্যত্ব বিষয়-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নয় কাব্যত্ব উপস্থাপনা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। তবে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের গণ্ডী বাড়লেও এক বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত—কাব্য প্রকাশ বা অনুকরণ করে—বিষয়কে, বিষয়ের তত্ত্বকে নয়। অনুকরণ বা উপস্থাপনা মানেই বিষয়ের ব্যক্তরূপটিকে ব্যক্ত করা—জগতের বা জীবনের ব্যক্ত ও সম্ভাব্য রূপকে প্রকাশ করা। এরিস্টটল থেকে কাণ্ট ও ক্রোচে পর্যন্ত সকলেই এ বিষয়ে একমত—সকলেই ঘোষণা করেছেন—কাব্যের উদ্দেশ্য—বস্তু ও ভাবকে ব্যক্তি-রূপে (Concrete form) ব্যক্ত করা। লক্ষ্য করবার বিষয় এখানে এই যে, ব্যাপার ও বিষয়কে যতটা পৃথক করে আমরা ধারণা করি, ততটা পৃথক করা সম্ভব নয়। ব্যাপার ও বিষয় পরস্পর পরস্পরকে বিশিষ্টতা

দান করে থাকে। ব্যাপার যদি হয় নিছক "আবেগ" বিষয়ও "ভাবাবেগ" ছাড়া কিছু হ'তে পারেন, ব্যাপার যদি হয় নিছক 'কল্পনা'—বিষয়ও "কল্প-রূপ" ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, ব্যাপার যদি হয় বিশুদ্ধ মনন—বিষয় হবে সামান্য বচন বা তত্ত্ব। অর্থাৎ আবেগ থেকে আবেগের সৃষ্টি, কল্পনা থেকে রূপ ও পরিকল্পনার সৃষ্টি, মনন থেকে ভাবনার (thought) সৃষ্টি। কাণ্ট্ বা ক্রোচে যেমন "ব্যক্তি-রূপ কল্পনা" বিষয়ে একমত তেমনি আর এক বিষয়েও উভয়ে—এবং সকলেই—একমত যে ব্যাপারটি আসলে নৈর্ব্যক্তিক মনন বা যুক্তি-বিচার নয়—বিষয়কে নৈয়ায়িক যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করে জানা নয়, ব্যাপারটি আসলে কল্পনাত্মক তথা অনুভবাত্মক তথা ব্যক্তি-সাপেক্ষ (সাবজেকটিভ)। বস্তুতঃ সাবজেকটিভ মানেই যা বিশুদ্ধ মনন বৃত্তির বাইরের ব্যাপার অর্থাৎ অনুভব-মিশ্র। ক্রোচের ইণ্টুইশানও আপাত কল্পনাত্মক কিন্তু আসলে অনুভবাত্মক। (যা অনুভবাত্মক—তা সাবজেকটিভ) দেখা যাচ্ছে—মানসিক বৃত্তির ব্যাপারেও কাব্য যে বিশুদ্ধ মননের ব্যাপার নয়—কল্পনা এবং অনুভবের ব্যাপার এ বিষয়েও ঐক্য আছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে—কাব্য-সৃষ্টি ব্যাপারকে, শুধু অনুভবের এবং কল্পনার ব্যাপার বলে গণ্ডী টেনে দেওয়া যায় কি? গীতি-কবিতা অতি আত্মগত এবং প্রধানতঃ অনুভবাত্মক ব্যাপারের ফল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাকাব্য বা নাটক উপন্যাস প্রভৃতি কাহিনী-কাব্য নিছক অনুভবের ব্যাপার নয়—কল্পনা পরিকল্পনার ব্যাপার! এমন কি শুধু ব্যক্তিরূপকল্পনামাত্রও নয়, রূপ-ক্রিয়া-ভাব-ভাবনা সব কিছুর সমবায়ে জটিল ও বৃহত্তর ব্যক্তিরূপের বৃত্ত পরিকল্পনা করা। এই পরিকল্পনায়—অনুভব-কল্পনা-ভাবনা সব বৃত্তিই অংশ গ্রহণ করে থাকে। ব্যক্তি-উপলব্ধিতে-পাওয়া রূপ হিসাবে এ 'সাবজেকটিভ' বটে কিন্তু আর এক হিসাবে—অর্থাৎ বৃত্তি এখানে অধিকতর বিষয়-সাপেক্ষ বলে—অবজেকটিভও বটে।

সুতরাং ক্রোচের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলা হয়েছে সেই কথাই বলতে হবে—বলতেই হবে শিল্পসৃষ্টি aesthetico-logical-ব্যাপার। তা'হলে দেখা যাচ্ছে—শাস্ত্র 'জ্ঞানের কথা' আর সাহিত্য 'ভাবের কথা' এই ধরনের

পার্থক্য নির্দেশ যথেষ্ট নয়। কারণ সাহিত্যেও জ্ঞানের কথা অর্থাৎ সামান্য বচন, নীতিকথন, দার্শনিক মনন প্রভৃতিও থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে জে মিডিলটন মারি মহাশয়ের আলোচনা (pure poetry প্রবন্ধ ১৯৩১) উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—If would be, we think, altogether more becoming and more convincing to admit that the range of mental acts in poetry is unlimited and that the element of distinguishable thought can vary from a comprehensive proposition—we are such stuff as dreams are made on—to the most tenuous apprehension of a quality physical or spiritual or both—the plain song Cuckoo gray. What is essential is that the thought should be an intrinsic part of an emotional field in the poet's mind and that a corresponding emotional field should be excited in ourselves.

শ্রীযুক্ত মারি মহোদয়ের মতে—কাব্য শুধু আবেগ বা শুধু ভাবনার প্রকাশ নয়—কাব্য একটি সমগ্র উপলব্ধির প্রকাশ—"It is the communication of an entire experien ce." এই উপলব্ধিকে কবি—possesses it in its whole living actuality and not as a vague schema or skeleton. আর "it is rich with its own emotional flesh and blood, it is warm experience". মারি মহোদয় কবির উপলব্ধিকে 'ভাবের উপলব্ধি' বা 'জ্ঞানের উপলব্ধি'—এইভাবে ভাগ করতে নিষেধ করেছেন, কারণ "it is neither the one nor the other. Nor again it is both together. It is itself one thing sui generis". কাব্যিক উপলব্ধিতে ভাব ও জ্ঞান, দেহ ও আত্মার সম্পর্কের মত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে, শ্রদ্ধেয় মারি মহোদয় 'কাব্যিক উপলব্ধি'কে নিছক আবেগ বা নিছক জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করলেও কাব্য যে মূলতঃ আবেগপ্রেরিত—অর্থাৎ আবেগমূলক, "What is essential is that

the 'thought' should be intrinsic part of an emotional field in the poet's mind…" এই কথাটিতেই ব্যক্ত করেছেন। মোট কথা বোধ হয় এই যে কাব্যে মনন অংশ গ্রহণ করতে না পারে এমন নয়, কিন্তু তাকে আবেগের তাঁবেদার হিসাবে আসতে হবে। কাব্যে যে মনন প্রকাশ পায় তা' আসে আবেগেরই 'বিস্তার' হিসাবে—আবেগ মুহূর্তটিরই চিন্তারূপ হিসাবে—যেন সে আবেগোপলব্ধিরই একটা পর্যায়।

আত্মগত প্রকাশ রীতিতে—কবির ভাবই কল্পনায়-ভাবনায় বিস্তারিত হয়, আর পরগত প্রকাশরীতিতে পাত্র-পাত্রীর ভাবকেই কল্পনায় ভাবনায় বিস্তারিত করা হয়। ভাব থেকে ভাবনা পর্যন্ত—উপলব্ধির দৌড়। ভাবাবেগ মনের স্তরে প্রবেশ করে প্রথমেই নেয় "কল্পনা"র রূপ এবং উর্ধ্বতন স্তরে পৌঁছে "ভাবনা" রূপে প্রকাশিত হয়।

এই দিক থেকে কবি অবশ্যই তাঁর "unity of his own inward experience"-ই সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন। এই "inward experience"—না বিশুদ্ধ অনুভব না বিশুদ্ধ মনন; একটি সমগ্র উপলব্ধি—ব্যক্তি-রূপের মতো একটি উপলব্ধির রূপায়তন। (এই অর্থেই খুব সম্ভব পঞ্চাঙ্ক একখানি নাটক ক্রোচের মতে শুধু ইন্টুইশানের সৃষ্টি।)

এই হিসাবেই কেউ কেউ শিল্পের সংজ্ঞা করেছেন—"Art is experience" (ডিউই)—শিল্প উপলব্ধির প্রকাশ। উপলব্ধি বিচার নয়। অন্তরে-পাওয়া বস্তু—উপলব্ধি—বাসনাবাসিত চিত্তে বিষয়কে ভোগ করা—লাভ করা। শিল্পে-বিষয়ের স্বরূপ বিচার করা হয় না বিষয়কে স্বরূপে সাক্ষাৎকার করা হয়।

উপসংহার—কাব্য-শিল্পের লক্ষণ নিরূপণের ধারা অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে—কত না কথা, কত না বিচার মন্তব্য! Imitation copy, representation, imagination, communication, intuition, experience, exhibition—নানা মতবাদ একের পর এক দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেশেও, রসবাদ, অলঙ্কারবাদ, রীতিবাদ, ধ্বনিবাদ, রম্যার্থবাদ প্রভৃতি মতবাদ কাব্যের লক্ষণ বা আত্মাটি নিরূপণের চেষ্টা করেছে এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রশংসনীয় চেষ্টাই করেছে।

কিন্তু এই চেষ্টার ইতিহাস লক্ষ্য করলে যে বিষয়টি বেশী করে চোখে পড়ে তা এই যে—সকলেই (ক) "কাব্য-শিল্প"-সৃষ্টিকে অনুভব-কল্পনা-বুদ্ধিমেশানো যৌগিক মানসিক ব্যাপার বলে মনে করেন।

(খ) এ ব্যাপার বিশুদ্ধ মনন-ক্রিয়া নয়—'pure reason'-এর ব্যাপার নয়। বিশুদ্ধ মনন-ক্রিয়ায় ব্যক্তির নিছক জিজ্ঞাসা বৃত্তি কাজ করে। এই মননের পর্যায়কে বলা হয় "Conceptual process"—"intellectual or rational level"। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—(ক) The thinking of relations (খ) the apprehension of the general and abstract as opposed to the particular and concrete (Experimental psychology 240); অর্থাৎ যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য আত্মা একাগ্র হয় তখন আত্মার বৃত্তি স্তিমিত হয় এবং জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপটি বা তত্ত্বটি সংগ্রহ করার জন্যই আত্মা ঐকান্তিক হয়ে উঠে। ভোগবৃত্তির ক্রিয়া থাকে না এবং থাকে না বলেই বিশুদ্ধ জ্ঞানক্রিয়া ভোগবাসনানিরপেক্ষ—রাগ-দ্বেষ, সুন্দর-অসুন্দর, মঙ্গল-অমঙ্গল—প্রবৃত্তি বা বোধ থেকে মুক্ত।

শাস্ত্র সাহিত্য প্রধানতঃ এই বিশুদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়ার ফল। শুধু তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ধার করবার কাজেই এই বৃত্তির বিনিয়োগ। এই ক্রিয়ার বড় বৈশিষ্ট্য এই যে এই ক্রিয়ায় "অহং"-এর attitude-এ 'জ্ঞান-বাসনা' ছাড়া অন্য কোন বাসনা থাকে না; অর্থাৎ বিশুদ্ধ মনন ক্রিয়া অনুভব সম্পৃক্ত নয় তথা কল্পনা-সম্পৃক্ত নয়। অন্যপক্ষে কাব্য-শিল্প অনুভব-সম্পৃক্ত, সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে—রসান্বিত কল্পনা ও ভাবনা—এক কথায় রস-রূপভাবনার সমবায়—জগতের ও জীবনের রস-রূপ।

(গ) কাব্য-সৃষ্টি ব্যাপারের উক্ত বৈশিষ্ট্য থেকেই অনুসিদ্ধান্তের মত পাওয়া যাচ্ছে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য—যেমন (১) কাণ্টের "সাবজেক্টিভিটি"—লক্ষণ (২) ক্রোচের ইণ্টুইশানের—অনুভবমূলকতা-বাসনামূলকতা (reality apprehended……in the vital impulse in its feeling) (৩) বস্তুর ও ভাবের ব্যক্তিরূপ-কল্পনাকারিতা [mimesis—judgment—experience exhibition—দ্রষ্টব্য]।—কল্পনারই কাজ প্রতিরূপ বা কল্পরূপ

করা অর্থাৎ যেখানে রূপ সৃষ্টি সেখানেই কল্পনা-ক্রিয়াশীল। কল্পনা বাসনা-চালিত অর্থাৎ বাসনামূলক, আর যেখানে বাসনা সেখানেই আত্ম-সম্পৃক্তি (সাবজেকটিভিটি)। সুতরাং যেখানেই ব্যক্তি-রূপকল্পনা সেখানেই বাসনার ক্রিয়া আর সেখানেই আত্মসম্পৃক্তি বর্ত্তমান।

সুতরাং এবার অবশ্যই বলা যেতে পারে—এরিস্টটলের 'ইমিটেশন' বা 'মাইমেসিস' কথাটি—একাধারে কাব্যের দুই বৈশিষ্ট্যই নির্দেশ করছে।

(ক) মাইমেসিস্—জীবনের—(জগতেরও) ব্যক্তি রূপের আশ্রয়ে রস সৃষ্টি অতএব—মাইমেসিস কল্পনাত্মক ব্যাপার হতে বাধ্য।

—কল্পনাত্মক ব্যাপার অনুভবমূলক বলে মাইমেসিসও অনুভব-মূলক অর্থাৎ আত্মসম্পৃক্ত উপলব্ধি।

—মাইমেসিস জীবনের রূপায়ণ বলে—জীবনের ক্রিয়া বা আবেগ যেখানে ভাবনার রূপ ধারণ করে, সেই ভাবনারূপেরও রূপায়ণ, তবে—এ ভাবনা জীবনের রূপ-নিরপেক্ষ চিন্তা নয়, ব্যক্তির অভিব্যক্তিরই উপায়মাত্র।

—মাইমেসিস শুধু বস্তু-সত্তারই প্রতিরূপ ও কল্পরূপ রচনা নয়,—বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ভাব ও ভাবনার যে যে অভিব্যক্তি সম্ভব তাদেরও অনুকরণ—এ অনুকরণ আত্মগত ভাবেও যেমন হতে পারে তেমনি পারে পরগতভাবেও।

শেষ বক্তব্য এই, 'মাইমেসিস' কথাটার সঙ্গে যান্ত্রিক অনুকরণের ভাবানুসঙ্গ জড়িয়ে থাকলেও এবং গীতি-কবিতা বা আত্মগত ভাব-বিজল্পনার ক্ষেত্রে কথাটা তেমন মানানসই না হলেও, এ কথা স্বীকার করতেই হবে—এরিস্টটলের "সংজ্ঞা" সত্যের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে খুব অল্প দূরেই আছে।

সৃজন-ব্যাপার

কাব্যশিল্পের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা'তে, সৃজন-ব্যাপারের নানা দিক নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা না করা হলেও, সৃষ্টি-ব্যাপারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে অনেক কথাই বলা হয়েছে। সৃষ্টি যে প্রধানতঃ কল্পনাত্মিকা ক্রিয়ার ব্যাপার—এক কথায় বলতে গেলে 'অনুভব-কল্পনা-ভাবনা'-মেশানো ব্যাপারের ফল—অনুকরণবাদ থেকে আরম্ভ করে উপলব্ধি (experience) ও প্রদর্শন (exhibition) বাদ পর্যন্ত সমস্ত রকম মতবাদ আলোচনা করেই তা' দেখানো হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে—রস-সাহিত্যে যেখানে ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশ, শাস্ত্র সাহিত্য সেখানে নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনুকরণে বললে বলা যায়—রস-সাহিত্যে সত্যের রসরূপ অভিব্যক্ত আর শাস্ত্র-সাহিত্যে সত্যের 'তত্ত্বরূপ'—প্রকাশিত হয়। রসরূপ ব্যক্তির বাসনারঞ্জিত বাসনাসম্পৃক্ত রূপ, আর তত্ত্বরূপ—ব্যক্তিবাসনা-নিরপেক্ষ বস্তুর স্বরূপ বিচারের রূপ। 'রস-রূপে প্রকাশ' অর্থ—বাসনাপ্রেরিত, কল্পনা-রূপায়িত ভাবনা-পরিপোষিত উপলব্ধির প্রকাশ; মোটকথা এ প্রকাশ—আবেগমূলক প্রকাশ, কল্পনাত্মক প্রকাশ। অনেকেই এই কারণে বলেছেন—সাহিত্য-শিল্প আসলে কল্পনার সৃষ্টি (শেলী, ক্রোচে প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। সাহিত্য-শিল্পে ভাবনা কল্পনারই অধীন—আবেগরই 'পরিশিষ্ট' প্রকাশ অর্থাৎ 'emotional field' থেকেই তাকে আসতে হবে।

এই পরিচ্ছেদে আমরা নতুন করে আর ঐ সব কথা আলোচনা করব না; এখানে আলোচনা করব—সৃজন-প্রক্রিয়া এবং সেই প্রসঙ্গেই, সৃষ্টি-ক্রিয়া কতখানি সংজ্ঞান আর কতখানি বা নির্জ্ঞান। আপাততঃ আলোচ্য—এ সম্বন্ধে এরিস্টটলের কোন বক্তব্য আছে কি না।

(ক) এরিস্টটল স্পষ্টাকারে না বল্লেও—এ অনুমান করবার সঙ্গত কারণ আছে যে, তাঁর মতে—সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আদিতেই আছে—স্রষ্টার মনোভঙ্গীটি

(attitude)। তাঁর মতে, এই মনোভঙ্গীর বা ব্যক্তি-চরিত্রের (individual character of the writer) ভিত্তিতে স্রষ্টাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—এক ভাগে পড়েন—'graver spirits'—যারা জীবনের গভীর ও মহান রূপকে প্রকাশ করেন, আর এক ভাগে পড়েন—'trivial sort'—যাঁরা রচনা করেন প্রহসনাদি, উপরিতলের ফেণপুঞ্জ। বলা বাহুল্য—স্রষ্টার 'individual character'—থেকেই তাঁর মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়ে থাকে এবং মনোভঙ্গীই শেষ পর্যন্ত রচনার রূপ-রসের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। কমেডি সৃষ্টি বা ট্র্যাজেডি সৃষ্টি—যে রকম সৃষ্টিই হোক, তার মূলে থাকে—ঐ মনোভঙ্গী (attitude)—অর্থাৎ কি সৃষ্টি করা হবে—সেই ধারণা বা চেতনা। এই মনোভঙ্গীই যে 'বিষয়বস্তুর' নির্ব্বাচনে ও বিন্যাসে প্রভাব বিস্তার করে থাকে অর্থাৎ সৃষ্টির রূপ ও রসের গতিকে নিয়মিত করে একথা যতখানি প্রণিধানযোগ্য হওয়া উচিত তা' হয়েছে বলে মনে হয় না। কোন বিশেষ ঘটনা নিয়ে করুণরস বা হাস্যরস দুয়ের যে-কোন একটা সৃষ্টি করা যেতে পারে; সেখানে রস করুণ হবে কি হাস্য হবে তা' নির্ভর করে স্রষ্টা কোন্ দৃষ্টিতে—কোন্ মনোভঙ্গী নিয়ে ঘটনাকে দেখছেন তার ওপর। একের কাছে যা হাস্যকর, অন্যের কাছে তা' বেদনাদায়ক হতে পারে—এ কথা সকলেরই জানা।

যা'হোক এই 'attitude'কে আমরা বলতে পারি—অবশ্য মনোবিজ্ঞানীর ভাষায়—অনেকটা 'conscious adjustment of an organism to a situation'—বিশেষ অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের প্রচেষ্টা। এই attitude-এর মাঝ দিয়েই ফুটে উঠে স্রষ্টার সামাজিক বাসনা-কামনার তথা অভিযোজনের রূপটি।

এই attitude-এর পরের পর্যায়—'বিষয়-বস্তু' নির্ব্বাচন বা গ্রহণ—কোনো ভাব বা ঘটনাকে শৈল্পিক দৃষ্টির বা সঙ্কল্পের সম্মুখে স্থাপন করা। অর্থাৎ এই পর্যায়ে শিল্পীর মন—বিশেষ 'ভাবের বা ঘটনা'র সঙ্গে যুক্ত হয়—প্রবণায়িত হয়—বিষয়-তৎপর হয়। তারপর আরম্ভ হয়—কল্পনা ও পরিকল্পনার কাজ। এই পর্যায়ের সাধারণ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দেওয়া যাক—'যেমন

একটা স্থতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোন একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্ন ভাব তাহার চারিদিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতিলাভ করিতে চেষ্টা করে!" সাধারণ পরিচয় বললাম এই কারণে যে এটাই হচ্ছে সৃজনশীল কল্পনার স্বাভাবিক ধর্ম এবং কাব্য আত্মগত বা পরাগত যেমনই হোক না কেন, সর্বত্রই কল্পনার দানাবাঁধার নিয়ম অনেকটা এক। আত্ম-গত গীতি-কবিতা সৃষ্টিতে, ভাবাবেগের তরঙ্গে কী ভাবে নাচতে নাচতে এসে কল্পনা দানা বেঁধে আকৃতিলাভ করে, সে সম্বন্ধে এরিস্টটল বিশেষ কিছু বলেননি বটে কিন্তু যেখানে জীবনের পরাগত অভিব্যক্তি বিষয়াশ্রয়ী উপস্থাপনা অর্থাৎ কাব্য যেখানে 'কাহিনী-কাব্য' সেখানকার রচনা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এরিস্টটল সাধারণ নির্দেশ দিতে কুণ্ঠিত হননি; আর সেই নির্দেশ থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি, কাহিনী-কাব্য সৃষ্টিতে, কল্পনা-শক্তি কিভাবে কাজ করে এবং সে সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণাটি কি।

কাহিনী-কাব্যে কল্পনাকে সরল এবং যৌগিক অর্থাৎ কল্পনা-পরিকল্পনা দুই মূর্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। 'সরল' বলতে আমি বোঝাতে চাই—তাকেই, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'image-making'—বস্তু ঘটনা বা ব্যক্তির প্রতিরূপ সৃষ্টি; আর যৌগিক কল্পনা বলছি তাকেই যে শক্তি ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে ঘটনার একটি সম্পূর্ণ রস-বৃত্ত (whole) রচনা করে —এক কথায়, পরিকল্পনা-শক্তি। কাহিনী-কাব্য রচনার গোড়ার কাজই —"বৃত্ত-গঠন"। আর এই "বৃত্ত-গঠন" ব্যাপারটি রীতিমত 'aesthetico-logical'—ব্যাপার; অর্থাৎ বৃত্তগঠন-ব্যাপারে বিশুদ্ধ 'intuitive' process-ই থাকে তা'নয় অনেকটা 'logical process' ও কাজ করে। ক্রোচের মতো এরিস্টটল পঞ্চাঙ্ক একখানি নাটকের সৃষ্টিকে নিছক intuitive ব্যাপার বলে মনে করেননি। এ সিদ্ধান্ত তিনি করেননি যে পঞ্চাঙ্ক একখানি নাটকের মতো বড় একটি জটিলবৃত্ত একসঙ্গে মনে প্রতিভাত হয়। তিনি বৃত্ত-গঠনের জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়—বৃত্তগঠনে নবনবোন্মেষ-শালিনী বুদ্ধির প্রয়োজনই বেশী! তাঁর নির্দেশ—"As for the story,

whether the poet takes it ready made or constructs it for himself he should first sketch its general outline, and then fill in the episodes and amplify in detail" (63)। প্রথমে সাধারণ রেখা-রূপ এঁকে নেওয়া, পরে সেই রেখা রূপকে আনুসঙ্গিক কাহিনী ও ঘটনা জুড়ে পূর্ণমূর্তি দান করা—উন্মেষশালিনী এবং সংগঠনী বুদ্ধির কাজ! এক হিসাবে—এই বুদ্ধি পরিকল্পনাই বটে; যেহেতু বৃহত্তর রূপগঠনের চেষ্টা। কিন্তু ব্যাপারটি যে নৈয়ায়িক চিন্তা-মুক্ত, একথা সত্য নয়। কোন্ ঘটনা প্রাসঙ্গিক কোন্‌টি অপ্রাসঙ্গিক—এ বিচার নৈয়ায়িক বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

তবে—"In constructing the plot and working it out"—বৃত্তের সাধারণ ও বিশেষ রূপটির পরিকল্পনায়, এরিস্টটল বলেন, কবিকে সব কিছুকে চোখের সামনে দেখতে হবে—"seeing everything with utmost vividness অর্থাৎ 'কল্পনা'কেই বিশেষভাবে আশ্রয় করতে হবে। এরিস্টটল বোধহয় এই কথাই বলতে চান যে কল্পনা ও পরিকল্পনা দুটোর সাহায্যেই 'বৃত্ত-গঠন' সম্পূর্ণ হয়—পরিকল্পনা গড়ে বৃত্তের দেহ, কল্পনা তা'তে করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

এরিস্টটল 'বৃত্তগঠন' সম্পর্কে যে-ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তা'তে এ কথা মনে হতে পারে যে সম্পূর্ণ বুদ্ধি খাটিয়েই—ঘটনা সাজিয়ে গুছিয়েই বড় স্রষ্টা হওয়া সম্ভব। কিন্তু আসল কথা এই যে—এরিস্টটল তা মনে করেননি বলেই 'seeing everything with utmost vividness'—এর ওপর জোর দিয়েছেন—স্রষ্টার সহৃদয়তার (power of identification বলা যেতে পারে) কথা তুলেছেন। বাহুল্য হলেও বলা ভাল—seeing everything with utmost vividness—বিষয়ের সঙ্গে একাত্মকতা না ঘটলে—identification না ঘটলে সম্ভব নয়; নৈয়ায়িক বুদ্ধির ব্যাপার নয়। এরিস্টটল এই ব্যাপারটিকেই সৃষ্টির আসল ক্ষমতা বলে—"happy gift of nature" বলে মনে করেছেন। কবির এই দুর্লভ শক্তিকে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন—এই শক্তি যে-কোন চরিত্রের সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়ার শক্তি; এরই বলে—'a man can take the mould of any character'।

একেই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—'তন্ময়ীভবনযোগ্যতা'। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ঘটনা, চরিত্র ও ভাবের সুষ্ঠু উপস্থাপনার জন্য এরিস্টটল যে তিনটি শক্তিসামর্থ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি।

প্রথম শক্তি—(ক) seeing everything with the utmost vividness"...অর্থাৎ ঘটনা প্রভৃতিকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে চোখে দেখা (power of visualisation)। এই শক্তি যাঁর যত বেশী তাঁর ঘটনা-বিন্যাস তত নিখুঁত তত বাস্তব হয়।

দ্বিতীয় শক্তি—(খ) "take the mould of any character"—চরিত্রের সঙ্গে একাত্মক হওয়ার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা (power of identification) যাঁর যত বেশী তাঁর চরিত্র তত যথাযথ হয়।

তৃতীয় শক্তি—(গ) দ্বিতীয় শক্তিরই, তন্ময়ীভবনযোগ্যতারই বিশেষ রূপ —আবেগ-অনুভবের ক্ষমতা। হৃদয় সৃষ্টি করতে গেলে হৃদয়ের দরকার। "হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব" দরকার। এই তন্ময়ীভবনের ফলেই—"জীবনে জীবনযোগ করা" সম্ভব হয়। এরিস্টটলের মতে—'those who feel emotion are most convincing through natural sympathy with the characters they represent'। মহাকাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্য প্রভৃতি কাহিনী-কাব্য সৃষ্টিতে উক্ত তিন শক্তির অপরিহার্যত্ব যে কত, তা নিশ্চয়ই বলে বুঝাতে হবে না। এখানেই উল্লেখ করা যেতে পারে—'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' সূত্রটির তাৎপর্যের কথা। শিল্পকে আত্ম-সংস্কৃতি বলা আর কাব্যকে কবি-প্রকৃতি ও কবি-শক্তির অধীন বলা একই কথা। কবি-শক্তিই কাব্যে অভিব্যক্ত হয়। কবির মধ্যে যা নেই কাব্যে তা থাকতে পারে না। কবির অভিজ্ঞতা, কবির বাসনা, কবির বাক্‌শক্তি, কবির প্রতিভান (intuition) ক্ষমতা, কবিতা সহৃদয়তা—তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, কবির অনুভব-সামর্থ্য, কবির মনন-শক্তি—সমস্তই সৃষ্টি ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং সৃষ্টির প্রকৃতি, শেষপর্যন্ত, উল্লিখিত উপাদানসমূহের সদ্‌ভাব ও

অভাবের মাত্রা-তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। কবির মধ্যে যা'র যতটুকু অভাব, কাব্যে সেই উপাদানের ততটুকুই দৈন্য বা ঘাটতি প্রকাশ পায়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, 'কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ' এ সূত্র সত্য বলেই নেই।

তবে, সৃষ্টি-ব্যাপারে সংজ্ঞান-মনের, সংজ্ঞান ইচ্ছা-শক্তির—কাজেই যে সবটুকু নয়—এ ধারণার সূচনাও এরিস্টটলের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর আগেও অবশ্য পাওয়া যায়। তাঁর আগে প্লেটো এ কথা স্পষ্টভাষায় বলেছেন—কাব্যের জন্ম আবেগ থেকে এবং ব্যাপারটি আসলে "দৈব উন্মাদনা"র (divine madness) ফল। এরিস্টটল উন্মাদনার (strain of madness) অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেননি বটে—কিন্তু "দৈব"কে এই ব্যাপারে জড়িত করেননি। ব্যাপারটি যে একটু রহস্যময় এ বিষয়েও তিনি কম সচেতন নন। 'strain of madness'—এর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—এই উন্মাদনার সময়ে কবি—"is lifted out of his proper self" অর্থাৎ কবি যেন নিজের মধ্যে আর নিজে থাকেন না—আত্মহারা হয়ে যান—স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হন। নিজের সংস্কৃতির গণ্ডী অতিক্রম করে যান। এ শুধু চরিত্রের সঙ্গে এক হওয়া নয়—নিজের সর্ববিধ "শক্তির" মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডী অতিক্রম করে—অনুভব করা, উপলব্ধি করা, মনন করা—এক কথায় সাধ্যাতীত শক্তির বিভূতি বা ঐশ্বর্য প্রদর্শন করা। কবির 'proper self' অর্থাৎ লৌকিকসত্তার—স্বাভাবিক প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করে উধাও হয়ে যাওয়ার এই ক্ষমতা রহস্যময়—নিঃসন্দেহ।

এ কথা সত্য—সৃষ্টি-কালে সৃষ্টিকর্তা তাঁর করণীয় সম্পর্কে এবং কার্য সম্বন্ধে সচেতন না থেকে পারেন না অর্থাৎ ব্যাপারটা আসলে সচেতন প্রয়াসের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এ কথাও তো মিথ্যা নয় যে সৃজন-ব্যাপারের সবটুকু স্রষ্টার সংজ্ঞান ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত নয়। মনের মধ্যে যেভাবে রূপ ফুটে উঠে—সে ভাবটার সবটুকু স্পষ্ট নয়। বাসনা ও ঐন্দ্রিয় উপলব্ধি মিলে মিশে নতুন নতুন রূপকল্প কিভাবে অবিরাম সৃষ্ট হয়ে চলেছে সে

ইতিহাস আমাদের কতটুকু জানা ? আমরা প্রতিভাত রূপকেই দেখি—এবং তাদের সমবায়ে রূপময় রূপীকে (শিল্প) সৃষ্টি করি। কিন্তু মনের গহনে যে প্রক্রিয়া চলেছে তার খবর সংজ্ঞান 'আমি' কতটুকুই বা রাখে!

প্লেটো-এরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন যে সৃষ্টিকালে স্রষ্টার মধ্যে একটা আবেশ-বিহ্বল ভাব দেখা যায় এবং আবেশ-বিভোর অবস্থায় স্রষ্টা খানিকটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। এই আবেশ-বিভোর উচ্ছ্বসিত অবস্থাকে লক্ষ্য করেই এরিস্টটল বলেছেন—কবির মধ্যে 'strain of madness' আসে, কবি—"is lifted out of his proper self"। এই অবস্থাকেই বোঝাতে গিয়ে কৌতুকময়ীর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—অন্তর মাঝে বসি অহরহ

মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ মিশায়ে আপন সুরে
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই—কোথা ভেসে যাই দূরে

এই অবস্থাতেই—"নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায় নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা
জানিনা এনেছি কাহার বারতা কারে শুনাবার তরে।"

এর নামই—'proper self'-এর ঊর্ধ্বে বিচরণ করা। সংজ্ঞান ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের অতীত সৃষ্টি ব্যাপার বলতে এই জাতীয় সৃষ্টিক্রিয়াই বোঝায়। দৈব-আদেশ বা প্রেরণা স্বীকার না করলে নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করতে হবে—এই জাতীয় সৃষ্টি যদি সংজ্ঞান মানসিক ক্রিয়ার ফল না হয় তা' হলে নিশ্চয়ই—অসংজ্ঞান বা নির্জ্ঞান মানসিক ক্রিয়ার ফল অর্থাৎ কিভাবে 'কথা' 'ব্যথা' জাগছে সেইভাবটা সংজ্ঞান-মনের কাছে অজ্ঞাত, সংজ্ঞান মন কথার

বক্তা বা ব্যথার অনুভবকারী বটে, কিন্তু তার ইচ্ছা দ্বারা সে 'কথা' রচিত নয়, ইচ্ছা দ্বারা সে ব্যথা উদ্বোধিত নয়।

এখানেই সৃজন-ব্যাপারে আসংজ্ঞান-নির্জ্ঞান মনের কোন অংশ আছে কি না, এই প্রশ্নটি আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি—এরিস্টটল সৃষ্টি-ব্যাপারের এক দিকে—খুব সম্ভব গীতি-কবিতার উচ্ছ্বসিত আবেগের মধ্যেই—'strain of madness' লক্ষ্য করেছেন—আবেশ-বিহ্বল আত্মহারা ভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে—এ ধারণাটি বড় একটা স্থান অধিকার করেছে। এমন কি আজও, এ ধারণাকে একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

যাঁরা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি আলোচনা করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই সৃষ্টি-ব্যাপারে অবচেতন মনের ক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার করেছেন। ফ্রয়েড, য়ুঙ, বুডিন, আই. এ রিচার্ড প্রভৃতির আলোচনা লক্ষ্য করলেই উল্লিখিত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক ডাঃ সি. জি. য়ুঙ্—শিল্পকলাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন; এক শ্রেণীতে আছে 'visionary art', অন্যশ্রেণীতে আছে "psychological art"। 'Visionary art'-এর সৃষ্টির কালে, স্রষ্টার সংজ্ঞান মন অবচেতন মনের অধীন—অবচেতন মনই কর্তা, চেতন মন দ্রষ্টা মাত্র; আর 'psychological art' সৃষ্টিকালে, চেতন মন অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে' থাকে। তিনি লিখেছেন—whenever the creative force predominates, human life is ruled and moulded by the unconscious as against the active will, and the conscious ego is swept along on a subterranean current, being nothing more than a helpless, observer of events". এ সম্পর্কে তাঁর আর একটা মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য—"The secret of artistic creation and of the effectiveness of art is to be found in a return to the state of "participation Mystique"—to that level of experience at which it is man who lives and not the

individual and at which the weal or woe of the single human being does not count but only human existence". ফরাসী সমালোচক বুডিন (Boudin)—তাঁর psycho-analysis and Aesthetic-গ্রন্থে, সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাপারে নির্জ্ঞান মনের (unconscious) তো বটেই, এমন কি সামষ্টিক নির্জ্ঞানের (collective unconscious) প্রভাবও স্বীকার করেছেন।

আই. এ. রিচার্ড মহাশয়—এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'Much that goes to produce a poem is of course unconscious' অর্থাৎ কবিতা সৃষ্টি ব্যাপারের বেশ খানিকটাই নির্জ্ঞান মনের কাজ। ডি. জি. জেমস মহাশয়—রিচার্ডের কঠোর সমালোচক এবং কল্পনাবাদের সমর্থক—একস্থলে লিখেছেন—'of this higher exercise of the imagination and the understanding we are not conscious. Kant held the mind is creative in this respect without being aware of it, such activity is not, as Coleridge following Kant says—'co-existent with the conscious will.' আর মন্তব্য উদ্ধার করে সমর্থনের পাল্লা ভারি করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। দেখা যাচ্ছে—higher exercise of the imagination and understanding'কে আমরা যত সচেতন ব্যাপার বলে মনে করে থাকি তত সচেতন নয় অর্থাৎ শিল্প-সৃষ্টির এক পর্যায় অবচেতন মনের ক্রিয়ার অধীন।

এই মতবাদটির সবচেয়ে প্রবল প্রতিবাদী বেনিডেট্টো ক্রোচে। তিনি বলেন—'The intuitive or artistic genius, like every from of human activity, is always, conscious—otherwise it would be mechanism"। তাঁর ধারণা—যাঁরা শৈল্পিক প্রতিভাকে নির্জ্ঞান ব্যাপার বলে প্রচার করেন, তাঁরা শিল্পীকে মানবোত্তর মর্যাদার আসন থেকে নীচেয় নামিয়ে ফেলেন। শিল্প-সৃষ্টি ব্যাপারে নির্জ্ঞানের কোন কর্তৃত্ব নেই। ক্রোচের কথা এই অর্থে সত্য যে শিল্প-সৃষ্টি নিরুদ্দেশ কোন যাত্রা নয়—এলোমেলো খামখেয়ালি ব্যাপার নয়; শিল্প-সৃষ্টিকালে স্রষ্টা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং উপাদানাদি

সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন থাকেন। সত্যই তো এই সচেতনতাটুকু না থাকলে সৃষ্টি, পাগলের প্রলাপের মতো, অরাজক মানসিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। কিন্তু তাই বলে—ব্যাপারের সবটুকুই কি সংজ্ঞান মনের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়? ক্রোচের 'ইন্টুইশান'-ব্যাপারটির কথাই ধরা যাক। এর সম্পর্কে তিনি বলেছেন—We can not or not will our aesthetic vision অর্থাৎ শৈল্পিক প্রতিভানকে ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না অথবা ইচ্ছা দ্বারা প্রতিভানের গতিরোধও করা যায় না। একথাটির তাৎপর্য অনু-ধাবন করলে যা' পাওয়া যায় তা এই যে প্রতিভান প্রয়োগের ব্যাপারে সংজ্ঞান মনের যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকলেও প্রভিভানের সৃষ্টি-ব্যাপারে সংজ্ঞান মনের কোন হাত নেই। "Obscure region of the soul' অর্থাৎ আত্মার গহন প্রদেশ আছে "Impressions"; সেই impressions'—সমূহ কি প্রক্রিয়ায় একের সঙ্গে এক মিলেমিশে রূপ নিয়ে—আকার নিয়ে চেতনায় ভেসে উঠে তা' যখন আমাদের অজ্ঞাত, এবং তার ওপর যখন 'সংজ্ঞান-'আমি'র কোন কর্তৃত্ব নেই, তখন সেই ব্যাপারের ফল—ইন্টুইশান'কে সম্পূর্ণ সংজ্ঞান ক্রিয়ার ফল বলে মনে করা যায় না। সংজ্ঞান-মনের বাইরে সৃজনশীল কল্পনার কারখানা। সংজ্ঞান মন ইন্টুইশান সৃষ্টি করে না—প্রত্যক্ষ করে, অর্থাৎ সে, 'expression'-এর কর্তা নয়—externalization-এর কর্তা। ক্রোচের এই 'externalization'-ব্যাপারটি—'expression-কে বাইরে প্রকাশ করার ব্যাপারটি, সংজ্ঞান-মনের ক্রিয়া এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মতে শিল্প-সৃষ্টির যেটুকু আসল ব্যাপার সেই "expression" বা 'intuition'--সৃষ্টিতে সংজ্ঞান ইচ্ছার তেমন কর্তৃত্ব নেই। মনে হয়—স্রষ্টাকে সচেতন বলে বড় গলায় ঘোষণা করা সত্ত্বেও, সৃষ্ট-ব্যাপারকে তিনি সংজ্ঞান ক্রিয়া বলে প্রমাণ করতে পারেননি; বরং এই কথাই সত্য যে ক্রোচের হাতে স্রষ্টার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে—রহস্যময়ী সৃজনী কল্পনায় বা ভাবের স্বৈরাচারী আধিপত্য স্বীকৃত হয়েছে।

এ সৃষ্টিতে কর্তা অপ্রধান—'ভাব'ই প্রধান; কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হয় না, ভাবের ইচ্ছাকেই যেন কর্তা পূরণ ক'রে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-সৃষ্টি' প্রবন্ধ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে, এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ভালভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। (লক্ষ্য রাখতে হবে —ভাবুক অপেক্ষা ভাবের কর্তৃত্বই এক্ষেত্রে বেশী)—

"যেমন একটা সুতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলি দানা বাঁধিয়া উঠে তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোন-একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ভাব তাহার চারিদিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতি লাভের চেষ্টা করে। অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া আছে। এমন-কি স্বপ্নেও দেখিতে পাই, একটা কিছু সূচনা পাইবামাত্র অমনি তাহার চারিদিকে কতই ভাবনা দেখিতে দেখিতে আকার ধারণ করিতে থাকে। অব্যক্ত ভাবনাগুলা যেন মূর্তিলাভ করিবার সুযোগ অপেক্ষায় নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধ্যে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।.........অবসর সময়ে যখন চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি তখনো এই ব্যাপারটা চলিতেছে। হয়তো একটা ফুলের গন্ধের ছুতা পাইবামাত্র অমনি কতদিনের স্মৃতি তাহার চারিদিকে দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিতেছে। একটা কথা যেমনি গড়িয়া উঠে অমনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন-তেমন করিয়া কত-কী কথা যে পরে পরে আকার ধারণ করিয়া চলে তাহার আর ঠিকানা নাই। আর কিছু নয়, কেবল কোন রকম করিয়া কিছু একটা হইয়া উঠিবার চেষ্টা। ভাবনা রাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।" বলা বাহুল্য, উল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে যে-সব কথা বলা হয়েছে তাতে ভাবুকের স্থান গৌণ, এবং ভাবের নিজস্ব গতিবিধিই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বস্তুত, দেহের মধ্যে যেমন আছে voluntary ও Involuntary action-র অস্তিত্ব, তেমনি মনের মধ্যেও একটা আছে সংজ্ঞান বাসনার এলেকা, আর একটা আছে—অবচেতন বাসনার এলেকা। এই দুই এলেকা নিয়েই মনের বৃত্ত সম্পূর্ণ। ক্রোচের মতো অচেতন বিরোধী পর্যন্ত—'Obscure region of the soul' স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—বাধ্য হয়েছেন বলতে—"Even the representations that we have forgotten persist somehow

in our spirit"—এবং "other representations are also powerful elements in the present process of our spirit"। দেখা যাচ্ছে—বিস্মৃত রূপ-কল্পনা কোন—একভাবে আমাদের আত্মার মধ্যে অবস্থান করে এবং এই সব অতীত ও বিস্মৃত রূপ-প্রত্যয়গুলি বর্তমান মানসিক ক্রিয়াতেও বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মোট কথা, ক্রোচেও অচেতন ক্রিয়ার প্রভাব থেকে তাঁর 'ইণ্টুইশান'কে মুক্ত করতে পারেননি এবং পারেননি বলেই সৃষ্টি ব্যাপারকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞান মনের ইচ্ছাধীন প্রমাণ করতেও পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি, তা আগেই, তাঁর কবিতা থেকে দুই একটা অংশ উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে—কবির মধ্যে আর-এক কবি আছেন তিনিই আসলে স্রষ্টা, আগের কবি দ্রষ্টামাত্র—যেন ভিতরকার কবির কর্ম-সখা।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে কয়েকটি বিষয়ের ওপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম বিষয় এই যে—কাব্যের মধ্যে আমরা দুটো জাতি কল্পনা করতে পারি—সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ। সাবজেকটিভের—এক মেরুতে আছে—আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস বা গীতি-কাব্য ("একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ"—রবীন্দ্রনাথ), অন্য মেরুতে আছে—মনন-প্রধান "দীপ্তিকাব্য" (সুধীর দাশগুপ্ত)। অন্যদিকে অবজেকটিভের এক মেরুতে আছে গাথাকাব্য এবং অন্য মেরুতে আছে মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি কাহিনী-মূলক কাব্য।

গীতি-কবিতার উচ্ছ্বাসে সুরের তথা আবেগের প্রবাহই প্রধান এবং যেখানে যত আবেগ উচ্ছ্বসিত সেখানে তত ভাব-বিহ্বলতা—তত যেন 'participation Mystique'—"অহং"-এর ভাবতন্ময়তা। এক 'মেরু' থেকে সৃষ্টি যত অন্য মেরুর দিকে অগ্রসর হয় তত তার মধ্যে আবেগের ঐজাতীয় উচ্ছ্বাস হ্রাস পেতে থাকে। বলা যায়—আবেগোচ্ছ্বাস যেন পরিকল্পিত রূপকল্পনার খাতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে, গীতি-কবিতার উদ্দমতা হারাইয়া ফেলে। ভাবের সহিত ভাবনা মিশে অনুভবের সঙ্গে উপলব্ধির সংমিশ্রণে, ভাব ও ভাবনার এক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটে। এক মেরুতে 'অহং' আবেগাচ্ছন্ন বা আবেগ-চালিত, অন্য মেরুতে 'অহং' ভাব ও ভাবনার উপাদানকে (আবেগ-

কল্পনা-ভাবনাকে) নিজের বশে রেখে, আপন কর্তৃত্বে নূতন নূতন 'জীবন-বৃত্ত' তৈরী করে চলে। এই ক্ষেত্রেও তন্ময়ীভাব না আসে এমন নয়, কারণ চরিত্র সৃষ্টিতে তন্ময়ীভবন যোগ্যতা অবশ্যই চাই।

দ্বিতীয় বিষয় এই —অসংজ্ঞান মন যেমন সংজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে নিজের কাজ করিয়ে নিতে পারে, তেমনি সংজ্ঞান মনও অসংজ্ঞানকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারে। একক্ষেত্রে অহং আবেগের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে অন্যক্ষেত্রে অহং ইচ্ছামত আবেগের স্রোতকে কাজে লাগাতে পারে—খ্রীষ্টোফার কড্‌ওয়েলের ভাষায় বলা যাক—'directed feeling' সৃষ্টি করতে পারে। "This is what we do whenever we direct our feelings along lines intended to conform with what we think right with our true self. with the valid or the beautiful with what we feel is the better part of us with the ideal each has in his breast"—এই জাতীয় 'directed feeling' বা emotional 'consciousness'—অবোধপূর্ব্ব কোন ব্যাপার নয়।

সৃষ্টি ব্যাপারের সবটুকুই যেমন সংজ্ঞান মনের অধীন নয়, তেমন সবটুকুই নির্জ্ঞান ব্যাপারও নয়। এরিস্টটলের পরিভাষা প্রয়োগ করে বলা যাক্— সৃষ্টি ব্যাপারে যেমন কোন কোন স্থলে 'strain of madness' বা আত্মহারা ভাব-বিভোরতা থাকে, আবার কোন-কোন স্থলে থাকে—কল্পনা-পরিকল্পনা এবং তন্ময়ীভাব দুটোই। শিল্পসৃষ্টি আসলে 'aesthetico-logical'-ব্যাপার ভাব-ভাবনার অদ্ভুত সংশ্লেষণ। এরিস্টটলের পোয়েটিকসে, সৃষ্টি-ব্যাপার সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে এই সিদ্ধান্তই করা হয়েছে। সংজ্ঞান-আত্মসংজ্ঞান-নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নিয়ে, সৃজনশীল কল্পনা নিয়ে, পরবর্তীকালে যে সব তত্ত্বদর্শী আলোচনা হয়েছে তা অবশ্য পোয়েটিক্স-গ্রন্থে নেই, কিন্তু এ ধারণা এরিস্টটলের মনে কাজ করেছে যে কাব্যশিল্প-সৃষ্টি শুধু সংজ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয় না, সৃষ্টি ব্যাপারে সংজ্ঞান ইচ্ছার অতিরিক্ত—একটা শক্তি—অচেতন মনের ক্রিয়াও লক্ষিত হয়। তাই বলে কেউ যেন মনে না

করেন—এরিস্টটল চেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এখানকার বক্তব্য শুধু এই যে সাহিত্য-শিল্প-সৃষ্টি ব্যাপারটির সবটুকুই যে সংজ্ঞান এবং বিকল্পক ইচ্ছার অধীন নয়—নির্বিকল্পক অনুভবের ক্রিয়াও সেখানে আছে—এ কথাটা এরিস্টটল উপলব্ধি করেছিলেন।

সৃষ্টির প্রেরণা

সৃজন-ব্যাপার সম্বন্ধে যে সব জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগে তা'দের সম্পর্কে এরিস্টটল কি বলতে চেয়েছেন এবং পরবর্তী সমালোচকরাই বা কি আলোচনা করেছেন, আগের পরিচ্ছেদে পর্যালোচিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের বিশেষ উদ্দেশ্য—শিল্প-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করা। উদ্দেশ্য ও প্রেরণার মধ্যে তেমন কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভব না হলেও, সাধারণ আলোচনায় এই ভেদ স্বীকার হয় বলেই আমরা প্রেরণার আলোচনাকে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে স্থান দিচ্ছি এবং 'প্রেরণা' শব্দটিকে ইংরেজী 'impulse' কথাটার প্রতিশব্দ হিসাবে প্রয়োগ করছি। কী প্রেরণায় মানুষ শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করে—এই প্রশ্নই এখানে আলোচিত হচ্ছে।

শিল্প অনুকরণ—'মাইমেসিস'—এ ধারণা এরিস্টটলের আগেও গ্রীসে প্রচলিত ছিল, প্লেটোর রচনায়ও তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের উদ্ভব যে 'অনুকরণ-বৃত্তি' নামক একটা মানসিক বৃত্তি থেকে এ ধারণা স্পষ্ট করে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে—পোয়েটিক্‌সে। প্লেটো শিল্পকে "অনুকরণ" বল্লেও শিল্পের প্রেরণা খুঁজেছেন—দৈব ইচ্ছার বা কৃপার মধ্যে। চৌম্বক শক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে প্লেটো বলেছেন—চৌম্বক পাথর যেমন লোহার আংটিগুলিকে আকর্ষণ করে এবং তাদের মধ্যে একে অন্য আংটি আকর্ষণ করবার শক্তি সঞ্চার করে……তেমনি—the Muse. communicating through those whom she has first inspired, to all others capable of sharing in the inspiration, the influence of that first enthusiasm, creats a chain and a sucession ; for the authors of those great poems which we admire, do not attain to excellence through the rules of any art, but they utter their beautiful melodies of verse in a state of inspiration and as it were possessed by a spirit not their

own." প্লেটোর মতে কবিরা কাব্য রচনা করেন—"in a state of divine insanity"—দৈব উন্মাদনায়—দৈব প্রেরণায়। মূর্খ কবিরাও যে সুন্দর সুন্দর কাব্য সৃষ্টি করেন, তার কারণ—they do not compose according to any art which they have acquired, but from the impulse of the divinity within them ; মোট কথা প্লেটো শিল্পকে 'অনুকরণ' বলে সত্যের তিন ধাপ দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন বটে এবং যুক্তিহীন অন্ধ আবেগের ব্যাপার বলে—নৈতিক মর্যাদার দিক দিয়ে হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু শিল্পকে দৈব প্রেরণার ফল বলে, বোধহয় অজ্ঞাতসারেই মর্যাদা দিয়ে ফেলেছেন। "Muse"-এর প্রেরণায় যা' সৃষ্ট হয় 'Muse' অর্থাৎ দেবতা মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত তা' মিথ্যা হবে কি করে? যাই হোক, প্রেরণার আলোচনায় প্লেটো অলৌকিক প্রেরণাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। প্লেটোকে এই হিসাবে প্রথম "দৈব প্রেরণাবাদী'' বলা যেতে পারে।

এরিস্টটলই প্রথম, প্রেরণার আলোচনায়, অলৌকিকের বদলে লৌকিক কারণকে বড স্থান দিয়েছেন এবং প্রেরণা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনার অবতারণা করেছেন। এরিস্টটলের মতে কাব্যের উৎপত্তির মূলে সাধারণত দু'টো বৃত্তি আছে এবং দু'টোর প্রত্যেকটাই মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিহিত। প্রথম বৃত্তিটি—"instinct of imitation" দ্বিতীয়টি—'instinct for 'harmony' and rhythm"। এরিস্টটলের মতে—মানুষ "most imitative of living creatures" এবং তাঁর শৈশব শিক্ষার মূলেও আছে এই অনুকরণবৃত্তি। প্রথমেই 'instinct of imitation'-এর তাৎপর্য একটু ভালভাবে বুঝতে হবে। তাৎপর্য এই যে, মানুষ যা উপলব্ধি করে তাকেই সে পুনর্বার সৃষ্টি করতে চায় অর্থাৎ—জগতের এবং জীবনের রূপ ও রসকে মানুষ তার ''special aptitude"-দ্বারা প্রকাশ করতে চায়। "most imitative বলেই অর্থাৎ রূপ-রসের সংস্কারকে নিজের মধ্যে (স্নায়ুচক্রের মধ্যে) ধারণ করবার শক্তি এবং তাকে প্রকাশ করবার শক্তি মানুষের বেশী বলেই, মানুষ অনুকরণ-প্রবণ তথা প্রকাশ ব্যাকুল। কাব্য সৃষ্টির মূলে

আছে—মানুষের "প্রকাশ প্রবণতা"। এই কথাটা গোড়াতেই পরিষ্কার করে নিতে হবে—'imitation'-এর প্রাথমিক প্রকাশ যথাযথ 'প্রতিরূপ' কল্পনায় বটে, কিন্তু ব্যাপক বা বিশেষ অর্থে 'imitation'—প্রকাশের বা উপস্থাপনারই নামান্তর। অনুকরণবৃত্তি যখন বিশেষভাবে বিকশিত হয়—special aptitude-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন তার সঙ্গে প্রকাশ-বৃত্তির সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। মনে হয় এই অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই এরিস্টটল—অনুকরণ-বৃত্তিকে শিল্পসৃষ্টির প্রথম এবং প্রধান প্রেরণা বলে ঘোষণা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ—রূপ-সৃষ্টির সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে—'harmony and rhythm'-এর বাসনা।—অর্থাৎ রূপ হলেই চলবে না, রূপকে ছন্দোলয়ে, সামঞ্জস্যে সুন্দর হয়ে উঠতে হবে। যেখানেই 'form' সেখানেই 'harmony and rhythm'-এর প্রশ্ন আছে। আমাদের মনের স্বভাব এই যে ভাবাবেগকে সে ছন্দোলয়ে প্রকাশ করতে চায়, রূপের মধ্যে সে চায় ঐক্যের বা সঙ্গতির সুষমা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এখানে এই যে, এরিস্টটল শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে উল্লিখিত যে বৃত্তি দু'টি কল্পনা করেছেন, তাদের একটিকে ছেড়ে অন্যটি রাখলে, শিল্প-প্রেরণার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না।

শিল্পকে শুধু অনুকরণ-বৃত্তির কাজ হিসাবে দেখা চলে না এই কারণে যে অনুকৃত অর্থাৎ প্রকাশিত বস্তুমাত্রই শিল্প নয়। শিল্প সুন্দররূপে অনুকৃত বস্তু—অনুকৃত বস্তুই শিল্পিত বস্তু। এই অনুকরণ—চারু রূপ-কল্পনাসাপেক্ষ, আর 'harmony and rhythm'ই রূপের সম্পাদন করে। আসল কথা—সৃষ্টির প্রেরণায়, উপলব্ধ জগতের এবং জীবনের রূপকে প্রকাশ করবার বাসনাটি যেমন থাকে, তেমনি থাকে প্রকাশকে সুচারু করে তোলবার বাসনা। এই দুই বাসনা এক হলেই প্রকাশের প্রেরণাকে শৈল্পিক প্রেরণা বলা যেতে পারে। এইভাবে লেখা যেতে পারে—

শৈল্পিক প্রেরণা {
= শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা
= রচনা বা প্রকাশকে সুন্দর করবার প্রেরণা
= সুন্দর রূপ কল্পনার প্রেরণা

এখানেই পাওয়া যাচ্ছে—পরবর্তীকালের বহু-বিসংবাদিত প্রশ্নকে—শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী (aesthetic attitude) বাস্তব প্রয়োজন-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য-দিদৃক্ষা কি না সেই প্রশ্নটির বীজকে। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়—এখানে এরিস্টটল শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্যটির দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। রচনাকে শিল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সুরূপ হতে হবে—এ কথা বলতে চেয়ে এরিস্টটল একদিকে প্রভাবিত করেছেন—শিল্পের উদ্দেশ্য-বিচারকে, অন্যদিকে প্রভাবিত করেছেন তাঁদের যাঁরা বলতে চান—শিল্পে সাহিত্যে একমাত্র সত্য "form"—অর্থাৎ "expression." বলতে চান—'প্রকাশই কবিত্ব'। শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি যে মূলতঃ বিষয়কে সুন্দররূপে প্রকাশ করার প্রযত্ন, এ চিন্তা প্রথম ধরা পড়েছে—এরিস্টটলের মস্তিষ্কে। এই চিন্তাই পরে 'প্রয়োজন নিরপেক্ষ সৌন্দর্য সম্ভোগ' প্রভৃতি মতবাদে বিকশিত হয়েছে। ('সাহিত্যের উদ্দেশ্য'—পরিচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এরিস্টটলের অভিমতকে সিদ্ধান্তের আকারে দাঁড় করাতে গেলে বলতে হবে—এরিস্টটলের মতে শিল্পের প্রেরণা—(ক) অনুকরণের অর্থাৎ প্রকাশের তাগিদ। (খ) সুন্দর বা সুষমাময় রূপ সৃষ্টির ইচ্ছা। এই দু'য়ের কোন একটার ওপর ঝোঁক দিয়ে পরবর্তীকালে নানারকম মন্তব্য করা হয়েছে—কেউ প্রকাশের তাগিদকেই করেছেন আসল প্রেরণা, কেউ সৌন্দর্য সৃষ্টির ইচ্ছাকে করেছেন আসল প্রেরণা। অবশ্য "প্রেরণা"র আলোচনা শুধু ঐ দুটো ইচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। নানা মুনি নানা মত নিয়ে এই আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন এবং ক্ষেত্রটিকে কুরুক্ষেত্রেই পরিণত করেছেন। যথাস্থলে মতগুলো আমরা সাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করব। আপাততঃ—প্রকাশ-বাদ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নেওয়া যাক। সৃষ্টি যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ—এ অতি সাধারণ সত্য এবং সৃষ্টি ব্যাপারটি যে প্রধানতঃ প্রকাশের ব্যাপার, সে কথাটাও বলা চলে, সর্ব্ববাদিসম্মত। যাঁরা বলবেন—'এহ বাহ্য আগে কহ আর' প্রকাশের তাগিদের মূলেও অন্য তাগিদ আছে, তাঁদের কথা আপাততঃ স্থগিত রেখে প্রকাশবাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা কাণ্ট হেগেল ক্রোচে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মতো মনীষীদের দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। পূর্বেই আলোচনা করা

হয়েছে—"pure reason" এবং "practical reason"—'থেকে' শিল্পের ক্ষেত্রকে কান্ট পৃথক করেছেন তথা শিল্পকে অপ্রয়োজনের সৃষ্টি—বস্তুকে পরা-রূপ দেওয়ার প্রয়োজন—রূপে দেখতে চেয়েছেন। হেগেল বলেছেন শিল্পের উৎপত্তির মূলে আছে—"free rationality"। তা' আছে বলেই—মানুষ "reduplicates himself"। তাঁর সিদ্ধান্ত—"The universal and absolute want from which art on its side of essential form arises originates in the fact that man is a thinking consciousness, in other words that he renders explicit to himself and from his own substance what he is and all in fact that exists."—(41)

ক্রোচে এ সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্টভাবে কিছু না বল্লেও, সৃষ্টি যে আত্মিক ক্রিয়া—spiritual activity—আত্মার জ্ঞান-ক্রিয়া বিশেষ (knowledge through imagination) এবং প্রকাশ ক্রিয়া (expression & externalization)—আর সেই প্রকাশেই আত্মার আনন্দ—আত্মার মুক্তি, এ সব কথা বলেছেন অর্থাৎ এই কথাই বলেছেন যে প্রকাশের আবেগেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত ব্যক্ত করেছেন—"প্রকাশের যে একটা আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি, সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবল বেগে কাজ করিতেছে" (সাহিত্যসৃষ্টি) ; "হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ" (সাহিত্যের তাৎপর্য)।—আধ্যাত্মিক পটভূমিতে রেখে প্রকাশতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে কোলরিজ যেমন বলেছিলেন—"a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I. AM." তেমনি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"ভগবানের আনন্দ সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানব হৃদয়ে আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎ সৃষ্টির আনন্দ-গীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত

করিতেছে। সেই যে মানস-সংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ" (সাহিত্যের তাৎপর্য)। এখানে প্রকাশের আবেগের উৎস সন্ধানের চেষ্টা রয়েছে এবং উৎস নির্দেশ করা হয়েছে—"ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে···অন্তরের মধ্যে··· সৃষ্টির আবেগ"। এই কথাটাকেই আর একভাবে ঘুরিয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"উপনিষৎ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম্, জ্ঞানম্ এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় করে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে।·········'আমি আছি' এইটি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের অন্তর্গত, 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপের অন্তর্গত, 'আমি প্রকাশ করি' এটি ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের অন্তর্গত"।

হেগেল প্রমুখ অধ্যাত্মবাদী শিল্পদার্শনিকদের মতো রবীন্দ্রনাথ বলতে চান—প্রকাশের প্রেরণা থেকেই সৃষ্টি এবং প্রকাশের প্রেরণা আসছে ব্রহ্মের 'অনন্ত' স্বভাব থেকে।—প্রকাশের প্রবণতা মানুষের অন্যতম নিত্য স্বভাব। প্রকাশ উপলক্ষ্য নয়—লক্ষ্য। তবে এখানেই স্পষ্টভাষায় বলে রাখতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রকাশতত্ত্বেই থেমে থাকেননি; আরো আগে এগিয়ে 'প্রকাশে'র "কেন" পর্যন্ত পৌছতে চেষ্টা করেছেন। কিছু পরিচয় তার একটু আগেই পাওয়া গেছে, এগিয়ে গিয়ে আরো পাওয়া যাবে।

এবার 'প্রেরণা' সম্পর্কিত মতবাদগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে একত্র করা যাক:—

(ক) **দৈব-প্রেরণাবাদ**—(Theory of divine inspiration)

এই মতবাদ অনুসারে দৈব-প্রেরিত হয়েই শিল্পীরা সৃষ্টি করে থাকেন। দৈব-কৃপা যাঁর ওপর যত বেশী তিনি তত বড় শিল্পী। এই মতবাদটি খুবই প্রাচীন। প্লেটোর 'divine insanity'—থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের 'দৈববাণী' পর্যন্ত, এই সংস্কারের ধারা নানারূপে নেমে এসেছে। কবি-মানস ও কবি-প্রতিভাকে "বিধিদত্ত" বলায় মধ্যেও এই সংস্কারই সক্রিয়।

(২) **অনুকরণবাদ — প্রকাশবাদ** (Imitation — Expression)

'অনুকরণ শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে "অনুকরণ" ও "প্রকাশ" শব্দে পৃথক হ'লেও তাৎপর্যে এক। শুনলে মনে হয়, অনুকরণ কথাটার ভার-কেন্দ্র যেন বিষয়ী ও বিষয় দু'দিকেই ভর করে আছে, আর 'প্রকাশ' কথাটার ভারকেন্দ্র যেন আছে— 'বিষয়ীতে (subject)। অনুকরণ যেন বেশী পরিমাণে বিষয়জড়িত, প্রকাশ যেন একটু কম বিষয়নির্ভর—বেশী আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু অনুকরণ যেমন উপলব্ধির প্রকাশ, প্রকাশও তেমনি 'উপলব্ধির প্রকাশ' (expression of impressions)। সুতরাং দু'য়েরই উদ্দেশ্য এক এবং স্বরূপতঃ দু'টিই এক ব্যাপার। তবে "অনুকরণ" শব্দটার সঙ্গে এমন একটা ভাবানুসঙ্গ জড়িয়ে গেছে যে শব্দটা কানে এলেই মনে হয়—বাইরের কোন বিষয়ের যথাযথ প্রতিরূপ রচনার কথা বলা হচ্ছে। এই মতবাদের বক্তব্য আগেই বলা হয়েছে। এখানে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে অনুকরণবাদ বা প্রকাশবাদ, মানুষের-স্তরে-উন্নীত জীবের ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যের তথা অধিকতর প্রকাশ-সামর্থ্যের বৈশিষ্ট্যকে—ভিত্তি করেছে এবং দেখাতে চেয়েছে—নবলব্ধ প্রকাশ শক্তিকেই মানুষ নানারূপ প্রকাশের মাঝ দিয়ে পরীক্ষা করতে —উপলব্ধি করতে চায়। ঐ প্রকাশের শক্তিই প্রকাশের আবেগরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। আসল শৈল্পিক ব্যাপার—সুরূপে প্রকাশ এবং বিশুদ্ধ শৈল্পিক প্রেরণা তা'ই সুন্দররূপে প্রকাশের প্রেরণা। শিল্পীর আসল দায়িত্ব— সুপ্রকাশের দায়িত্ব। শৈল্পিক দৃষ্টি—বিষয়কে অন্য স্বার্থ ("interest"-কাণ্ট) থেকে পৃথক করে কেবলমাত্র প্রকাশের স্বার্থের কেন্দ্রে স্থাপনা করা এবং তাকে যথাসাধ্য রূপে-রসে সুন্দর করবার জন্য একান্তভাবে মনকে নিযুক্ত করা। প্রকাশ সুন্দর হয়ে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে ফুটবে "সৌন্দর্য"—সঙ্গে সঙ্গে জাগবে "আনন্দ"। ('উদ্দেশ্য' আলোচনা দ্রষ্টব্য)

(৩) **খেলাবাদ বা লীলাবাদ** (Play theory of art)

খেলাবাদকে প্রকাশবাদের একটা বিশেষ রূপ বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কল্পনা-ক্রিয়া (imagination) স্বতন্ত্র

বৃত্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কল্পনা ব্যাপারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে কল্পনা আত্মিক ক্রিয়া, রূপ-কল্পনার ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারটিকে—আসলে ঐন্দ্রিয় উপলব্ধির সংযোগে নানা রূপাদর্শ (form) সৃষ্টি করা। এই "রূপাদর্শ" সৃষ্টির মূলে, সুন্দর সুন্দর রূপ সৃষ্টির উদ্দশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য—বাস্তব-প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য—না থাকায়, সৃষ্টি-ব্যাপারটি প্রকাশ বৃত্তির নিরপেক্ষ অনুশীলন অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তিকে নানারূপে খেলানো—হয়ে দাঁড়ায়। কাণ্টের নিম্নলিখিত উক্তি লক্ষণীয় :—Cognitive faculties brought into play in the reflective judgment, and so far as they are in play, and hence merely a subjective formal finality of the object"—Introduction—Critique of judgment, Kant. কাণ্টের পরে কবি শিলার (Schiller 1759-1805) খেলাবাদকে তত্ত্বের আকারে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্য :—মানুষের আত্মার মধ্যে—দু'টো বৃত্তি কাজ করছে :—একটা বিষয়ের অভিমুখী (stofftrieb)—বস্তুধারণার ; অপরটি ভাবের বা রূপের অভিমুখী—(Formtrieb)—'ভাব'ধারণার। এই দুইয়ের মধ্যে—ঐক্যস্থাপনায় সৃষ্টি, এবং ঐ ঐক্যবিধায়িনী শক্তির নাম—'খেলাবৃত্তি' (Play impulse)। শিলারের পরে খেলাবাদের প্রবল সমর্থক হন—হার্বার্ট স্পেন্সার। তাঁর মতে—খেলা যেমন শরীরের বাড়তি শক্তির (surplus energy) প্রকাশ, তেমনি মানসিক শক্তির উদবৃত্ত অংশ থেকে শিল্পের জন্ম। উদবৃত্ত মানসিক শক্তিকে শিল্পী নানারূপের—কল্পনা-ভাবনার আকারে ব্যক্ত করতে বা খেলাতে চেষ্টা করেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, 'খেলা' কথাটার মধ্যে প্রয়োজন-সাধনের গন্ধ আছে বলে, কথাটাকে বর্জন করে "লীলা"—"অহেতুক লীলা" ব্যবহার করেছেন—এই যা' পার্থক্য। 'বীরবল'ও (প্রথম চৌধুরী মহাশয়) খেলাবাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এই মতবাদকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে—নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে—"অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করার যে চেষ্টা তাকে

খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ-সৃষ্টি করবার বৃত্তি, প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি নয়।"

(৪) **আত্মপ্রদর্শন-বাদ** (Theory of self-display—M. J. Baldwin—Social and Ethical Interpretations in mental Development—1897) জীব বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে নতুন নতুন মতবাদ দেখা দিতে থাকে। এই সব মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে এদের কাছে 'প্রকাশ' উপায় বিশেষ; কারণ মৌলিক কামনা-বাসনার উৎস থেকেই সৃষ্টির প্রেরণা জেগে থাকে এবং 'প্রকাশ' ঐরকম কোন মৌলিক প্রবৃত্তিরই অর্থাৎ জৈবিক প্রবৃত্তিরই আত্মপ্রকাশের উপায়। আত্মপ্রদর্শনবাদের বক্তব্য এই যে—জীবের অন্যতম মৌলিক বাসনা—আত্মপ্রদর্শনের বা প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা, শাদা বাংলা কথায়—সমাজের মধ্যে দশের একজন হয়ে—দশের দৃষ্টিতে ভেসে থাকা। শিল্পরচনার সাহায্যে শিল্পীরা আত্মপ্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং শিল্প-সৃষ্টি জৈবিক বাসনা কামনার সঙ্গেই যুক্ত। শিল্পরচনা ব্যক্তির আত্মপ্রদর্শনেরই উপায় বিশেষ। লক্ষ্য করবার বিষয় এখানে এই যে মানুষ প্রকাশ করে প্রকাশের আবেগেই—এ সিদ্ধান্ত এঁরা মানেন না। এঁরা বলতে চান—আচরণ—সে শারীরিক, মানসিক আধ্যাত্মিক যে রকমই হোক না কেন, মৌলিক বাসনা-কামনারই অভিব্যক্তির নানা উপায়।

(৫) এই জাতীয় জৈবিকবাসনা-ঘেঁষা আর একটি মতবাদ—আকর্ষণ-বাদ (ettraction Theory)। এর বক্তব্য :—মানুষ মানুষকে আকর্ষণ করতে চায়। অপরকে আনন্দ দিয়ে, তার মনোযোগ আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সাহিত্য-শিল্পের জন্ম। বলা বাহুল্য—এই মতবাদটি সহজেই 'এহ বাহ্য' ব'লে মনে হয়। 'কেন' আকর্ষণ করতে চায়—সেই 'কেন' টুকুর আকাঙ্ক্ষা এখানে থেকে যাচ্ছে; কারণ আকর্ষণ তো অন্য মৌলিক বাসনারই উপায় বিশেষ। এই মতবাদটির প্রবর্তক—এইচ. আর. মার্শাল [H R. Marshall—কৃত pain, pleasure and aesthetic 1894, —aesthetic principles—1895. দ্রষ্টব্য)

(৬) **'কামের রূপক প্রকাশ'-বাদ** (a sublimated outlet of frustrated sexuality)। এই মতবাদটির প্রচারক বিখ্যাতনামা মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড। এই মতবাদের আসল কথা এই যে—অবদমিত বাসনারাই কল্পমূর্তি পরিগ্রহ করে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। আমাদের কল্পনা-পরিকল্পনার মাঝে শেষ পর্যন্ত অবদমিত বাসনা-কামনাগুলিই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে শিল্পের সঙ্গে স্বপ্নের সাদৃশ্য আছে। শিল্পকে বলা যেতে পারে 'জাগ্রৎ'-স্বপ্ন'। স্বপ্ন যেমন পরোক্ষ বাসনা-পরিপূরণ, শিল্পও তেমনি পরোক্ষ বাসনাপূরণ। ফ্রয়েডকে কাম-কৈবল্যবাদী বলে অনেকেই নিন্দা করেছেন এবং এখনও করেন। তবে নিন্দাই করা হোক আর যাই করা হোক, 'কাম' কথাটি যেরকম ব্যাপক অর্থে ফ্রয়েড প্রয়োগ করেছেন সেইরূপ অর্থে ব্যবহার করলে দেখা যাবে ফ্রয়েড সত্য থেকে খুব দূরে সরে যাননি। ফ্রয়েডের মত যাই হো'ক,—ফ্রয়েডও শিল্পরচনাকে জৈবিক কামনারই বিশেষরীতিক প্রকাশ বলেছেন।

(৭) **সঞ্চারবাদ** (Theory of Communication)

মতবাদটি এক হিসাবে খুবই পুরাতন, কারণ শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মূলে যে সব প্রেরণা কাজ করে তাদের মধ্যে সামাজিকদের পরিতোষ বিধান করার ইচ্ছা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শিল্পী নিজে যে রূপ ও ভাব উপলব্ধি করেন তা' আর দশজনের কাছে ব্যক্ত করতে চান—প্রকাশবাদের মূল কথাই এই। সঞ্চারবাদ শুধু ব্যক্ত করার কথা বলেই সন্তুষ্ট নয়, সামাজিকদের মধ্যে অনুরূপ ভাব সঞ্চার করাই শিল্পীর কাজ এবং সেই প্রেরণা থেকেই শিল্পী শিল্প রচনা করতে যান—এই পর্যন্ত বলে তবে সন্তুষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোল্‌রিজ, শেলী, প্রভৃতি—তাঁদের আলোচনায় 'Communication-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কবি যে সামাজিক জীব, সমাজের আর দশজনের সঙ্গে মিলে মিশেই যে তার জীবনের সার্থকতা এবং তাঁর সমস্ত আচরণ যে জীবন-যাপন চেষ্টারই বিশেষ বিশেষ রূপ—এ চেতনা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যে খুব স্পষ্ট। কবি কে?—প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ব'লেছেন "He is a man speaking to

men ! a man it is true, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul…" সঞ্চারবাদকে মোটামুটি সকলেই—কেউ জ্ঞাতসারে, কেউ অজ্ঞাতসারে—মেনে নিয়েছেন। মনীষী টলস্টয় এই মতবাদটিকে বিশেষ জোর দিয়ে প্রচার করেছেন বলে সঞ্চারবাদের প্রবক্তা হিসাবে তাঁকে ধরা হয়। তাঁর মতে—'Art is Communication'—শিল্প সৃষ্টির মূলে আছে—সামাজিকদের মধ্যে উপলব্ধিকে সঞ্চার করার বাসনা—"naving for its purpose the transmission to others of the highest and best feelings". তাঁর মতে—"Art is one of the means of intercourse between man and man".

এই মতবাদে, সৃষ্টির "প্রেরণা"কে সামাজিক-বৃত্তি (Social instinct) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।—মানুষ মানুষের মধ্যে নিজের ভাব সঞ্চার করতে চায়—এই চাওয়া থেকেই শিল্পের জন্ম। রবীন্দ্রনাথেও এই মতবাদটির সমর্থক মন্তব্য পাওয়া যায়—"আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, যে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়"……… "মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা……… (সাহিত্যের সামগ্রী)

"হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যে কত ব্যাকুল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হৃদয়ের ধর্মই এই সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়"—(সৌন্দর্য ও সাহিত্য)

(৮) **খেলা ও আত্মপ্রদর্শনবাদ** (play & self display)

[Langfeld—The Aesthetic Attitude—1920]

ল্যাঙফেল্ড মহাশয়ের মতে খেলা ও আত্মপ্রদর্শন দু'টো বৃত্তির প্রেরণা থেকে সাহিত্য-শিল্পের উৎপত্তি। শিল্পী কল্পনা-শক্তির খেলা দেখিয়ে, আত্ম-প্রদর্শন করতে চান তথা সমাজিক ব্যক্তি হিসাবে জীবনের সার্থকতা প্রমাণ করতে চান।

(৯) **বাস্তবপ্রয়োজন-বাদ ?** (Hirn—Origins of Art 1900)

এই মতে, আদিম শিল্প অলঙ্করণের বা সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়নি, সৃষ্ট হয়েছে—প্রয়োজনের তাগিদেই, যেমন—(ক) জৈবিক আকর্ষণ (খ) শ্রমের সামবায়িক সংগঠন (গ) শত্রুশাতন বা শাসন (ঘ) যাদু-সঞ্চার ইত্যাদি। * তবে হার্ণ এ কথাও বলেছেন, উচ্চতর স্তরে কেবল আনন্দের বা সৌন্দর্যের জন্য শিল্প সৃষ্টি না হতে পারে এমন নয়।

(১০) **নির্মিতিবাদ** (Construction Theory)

এই মতের প্রবক্তা—স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার [Beauty and other forms of value (1933)] আলেকজাণ্ডারের মতে—মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে বাসা বা আশ্রয় নির্মাণের যে প্রবৃত্তি রয়েছে, মানুষের পর্যায়ে সেই প্রবৃত্তিরই উন্নততর বিকাশ ঘটেছে—শিল্পকলা সৃষ্টিতে। অভিযোজনের প্রয়োজন ছাড়াও অতিরিক্ত যা কিছু মানুষ সৃষ্টি করে—তা ঐ নির্মাণ-প্রবৃত্তিরই ক্রিয়া। নির্মাণ-বৃত্তি পরিবর্ধিত হয়েই কল্পনা-পরিকল্পনা শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

(১১) ফ্রয়েড যেমন কামের বিপরিণময়ন বা উর্ধ্বায়ন (sublimation) প্রয়াসের মধ্যে শিল্পে 'প্রেরণা' নির্দেশ করেছেন, তেমনি ম্যাক্‌ডুগাল্‌ড, লুণ্ডহোলম্‌ প্রভৃতি বলতে চেয়েছেন যে, যে কোন জৈবিক বাসনার (crude impulse) উর্ধ্বায়ন প্রচেষ্টা থেকে শিল্পের প্রেরণা জাগাতে পারে। [Lundholm—The Aesthetic Sentiment—1941] এ মতবাদটিকে এক কথায় আমরা 'বাসনার উর্ধ্বায়ন'-বাদ বলতে পারি।

উল্লিখিত একাদশের বাইরে কোন মতবাদ সম্ভব নয় বা নেই উল্লিখিত তালিকা দেখে এ কথা যেন আমাদের মনে স্থান না পায়। আমাদের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন দেখা যায় প্রকাশবাদকে—লীলাবাদকে দৈবপ্রেরণা-বাদকে, সঞ্চারবাদকে, তেমনি আবার পাওয়া যায় এমন একটি মতবাদকে যা জৈবিক কামনাকেই প্রকাশ প্রেরণার উৎসস্থল বলে মনে করেছে। প্রকাশ যে শুধু প্রকাশের প্রেরণারই ফল নয়, প্রকাশের পেছনে থাকে জীবের মৌলিক কামনারই কোন আবেগ—এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একেবারে উদাসীন

থাকতে পারেননি। বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সৃষ্টিকে খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারেননি। জীবন-অভিব্যক্তির, জীবন যাপনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শিল্পসৃষ্টির প্রেরণার উৎসকে সন্ধান করেছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনাকে প্রেরণা হিসাবে কেউ কেউ গণ্য করেছেন—আত্মপ্রদর্শনবাদের মধ্যে তার নিদর্শন পাওয়া গেছে; কিন্তু আত্মরক্ষা (self preservation) প্রবৃত্তিকে মূল প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করেছেন খুব কম লোকই। রবীন্দ্রনাথ দুই একস্থলে এমন সব কথা বলেছেন যাতে তাঁকে আমরা এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করতে পারি।

'সাহিত্যের সামগ্রী'-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বৈজ্ঞানিকের সংস্কার নিয়েই যেন, প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন— "প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে। মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রকমের একটা চেষ্টা আছে........মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা।

এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীনকাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই...... কী? না আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিবে।......সমস্তই যাইবে; কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝে বাঁচিয়া থাকিবে।"...... "আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি। দেশে বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের

মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।" এই উদ্ধৃতি সম্মুখে রাখলে এ কথা বলতেই হবে যে সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে বাহ্যত প্রকাশের প্রেরণা—ভাবসঞ্চারের প্রেরণা চোখে পড়ে বটে, কিন্তু অতি ভিতরে আছে "অহং"এর মূল কামনারই ক্রিয়া—আত্মরক্ষার কামনা।

প্রাণীর স্তরে আত্মরক্ষার কামনা = প্রাণকে রক্ষা করার কামনা + বংশ-বিস্তারের কামনা—এক কথায় প্রাণকে বাঁচানো। মনোজীবক মানুষের আত্মরক্ষা শুধু তো প্রাণকে বাঁচানো নয়, মনকেও বাঁচানো—নিজের চিন্তাকে বাঁচানো, নিজের ভাবকে বাঁচানো। শিল্পসৃষ্টি করে মানুষ তার হৃদয়ের অমরতার বাসনা পূর্ণ করে তথা নিজের আত্মরক্ষার কামনা চরিতার্থ করে। বাহুল্য হলেও এখানে বলে রাখা দরকার—এই সিদ্ধান্তের দিক থেকে দেখলে সৃষ্টি প্রয়োজন-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রকাশ ব্যাপার নয়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যাক—প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন :—এক —'বাহ্যিক', দুই 'আভ্যন্তরিক'। বাহ্য তাগিদ—বাইরের অর্থাৎ পরিবেশের চাহিদা বা ফরমাস; আভ্যন্তরিক তাগিদ—লেখার ভিতরকার তাগিদ—প্রকৃত শৈল্পিক প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা তুলে দেওয়া যাক্—"আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্ছে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখতে সুরু করেছিলাম, কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময়মর্তো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে⋯" (প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা পত্র—১৪ই বৈশাখ ১৩৩৩)। 'বাহ্য তাগিদ'কে শুধু বাইরের লোকের 'ফরমাস' বলে মনে করলে এবং আভ্যন্তরিক তাগিদকে বিশুদ্ধ শৈল্পিক অর্থাৎ সুন্দর রূপসৃষ্টির তাগিদ বলে ধরলে, বাহ্য ও আভ্যন্তরিকের মাঝে আর একটা তাগিদেরও অবকাশ আছে,—অবশ্য আপাত-দৃষ্টিতে তাগিদটিকে আভ্যন্তরিক বলেই মনে হয়ে থাকে। এই তাগিদটি 'বাইরের লোকের ফরমাস'—অর্থে বাহ্য নয়, আবার নিছক 'সুন্দর রূপসৃষ্টির তাগিদ' অর্থে আভ্যন্তরিক নয়। এর অবকাশ সেখানেই, যেখানে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিমানসের তাগিদেই, পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেন—তাঁর

অভীপ্সাকে শিল্প-রূপে অভিব্যক্ত করে থাকেন। প্রেরণা এই হিসাবে প্রায় ক্ষেত্রেই যৌগিক বা জটিল।

নানা মুনির নানা মতের আলোকে ধাঁধা লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তাই প্রশ্ন উঠবেই—তবে কি এরিস্টটল যা বলেছেন তা সত্যি নয়? প্রশ্নটির উত্তরে আমরা বলতে পারি—শিল্পী যখন শিল্পী হিসাবে স্বরূপে অবস্থান করেন তখন তাঁর চিত্ত প্রকাশের কৈবল্যভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ শিল্পীর সম্মুখে যে সমস্যা সে কেবল প্রকাশেরই সমস্যা—সুষ্ঠু প্রকাশের সমস্যা—সুন্দর প্রকাশের সমস্যা। সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে সাধারণভাবে শিল্পীর মনের গভীরে যে বাসনাই থাক, শিল্প রচনার উদ্দেশ্য যাই হোক শিল্পী পদবাচ্য হন তিনি তখনই যখন তাঁর মধ্যে প্রকাশের আবেগ জাগে—উপলব্ধিকে বাইরে প্রকাশ করবার ব্যাকুলতা জাগে—প্রকাশ্য বিষয়কে, পরম সুন্দর রূপ (final form) দেওয়ার চেষ্টা সার্থক হয়। এই হিসাবে শিল্পের প্রেরণা প্রধানতঃ প্রকাশেরই (mimesis) প্রেরণা—সুন্দর রূপ (perfect form) অর্থাৎ 'harmony and rhythm'—সৃষ্টিরই প্রেরণা। সুতরাং instinct of imitation এবং instinct for harmony and rhythm-কে শিল্পের প্রেরণা বলে—এরিস্টটল মিথ্যা শিক্ষা দেননি।

সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য

প্রেরণা এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা যে দুঃসাধ্য ব্যাপার এ কথা আগেই বলা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে—প্রেরণার আলোচনা এবং উদ্দেশ্যের আলোচনাকে যত পৃথক মনে হয় ওরা তত পৃথক নয়। সাধারণ আলাপ-আলোচনাতেও—শব্দ দুটোকে আমরা একই অর্থে প্রয়োগ করে থাকি। মানুষ কোন্ প্রেরণায় শিল্প সৃষ্টি করে? এবং মানুষ কোন উদ্দেশ্যে শিল্প সৃষ্টি করে?—এই দুটো প্রশ্নের তাৎপর্য আমাদের অনেকেরই কাছে এক। বাস্তবিক এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে "প্রেরণা" এবং "উদ্দেশ্য" এক কি পৃথক, পৃথক হলে কোন্ দিক দিয়ে পৃথক—এ আলোচনা সাহিত্য-তত্ত্বশাস্ত্রে সন্তোষজনকভাবে করা হয়নি। তবে সাহিত্য-তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ও মীমাংসার ক্ষেত্রে—শিল্পের প্রেরণা (art impulse) এবং শিল্পের উদ্দেশ্যকে (purpose) পৃথকভাবে আলোচনা করার রীতি আছে। আমিও সেই রীতি রক্ষা করে, দুই পরিচ্ছেদে আলোচনার আয়োজন করেছি।

প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধরণা এই যে—প্রেরণা হচ্ছে কার্য করবার জন্য কর্তার মধ্যে যে একটা চাপ আসে সেই চাপ-টুকু; এই চাপ যখন বাইরের ফরমাস রূপে আসে তখন তা'—'বাহ্য প্রেরণা'। চাপ যখন ভেতর থেকে জাগে, তখন সে আভ্যন্তরিক প্রেরণা। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে—কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যে ঈপ্সিততমকে লাভ করতে চান সেই ঈপ্সিত ফল বা লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যকে আমরা দুভাগে ভাগ করে দেখতে পারি—এক শৈল্পিক উদ্দেশ্য—বিষয়বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য, দুই—সামাজিক উদ্দেশ্য—সুন্দররূপ সৃষ্টি দ্বারা সামাজিকের হৃদয়ের-মনকে তৃপ্তি দেওয়ার ইচ্ছা। 'সাহিত্য শিল্পের উদ্দেশ্য' নিয়ে যত বাদবিসংবাদ দেখা দিয়েছে। উদ্দেশ্যের উক্ত দ্বৈতরূপ থেকেই তা দেখা দিয়েছে। একদল শিল্পকে বিশুদ্ধ শিল্পের এলেকায় গণ্ডী দিয়ে রেখে—'সুন্দর রূপ' বা সৌন্দর্য সৃষ্টিকেই শিল্পের

উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন, অনেকেই আবার শিল্পের সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে—শিল্পের উদ্দেশ্যের আসনে "আনন্দ"কে বসিয়েছেন এবং কেউ কেউ শিল্পের সৌন্দর্যজনকত্ব, আনন্দদায়কত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সত্য-সাধকত্বও এবং শিব-সাধকত্ব স্বীকার করেছেন। মোটামুটিভাবে বলা যায়, উদ্দেশ্যের আলোচনা উল্লিখিত তিন ধারায় অগ্রসর হয়েছে।

একটু আগে থেকেই প্রশ্নটির আলোচনা সুরু করা যাক্। প্রশ্নটির প্রথম এবং স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় এরিস্টফেনিসের 'দি ফ্রগ্‌স্' নামক নাটকে। কবির কাজ আনন্দ দেওয়া, এ কথা ধরে নিয়েই 'ঈস্কিলাস ইউরিপিডিসকে' জিজ্ঞাসা করেছেন—What are the principal merits entitling a poet to praise and renown ? ইউরিপিডিস উত্তর দিয়েছেন :—

"The improvement of morals, the progress of mind
When a poet, by skill and invention
Can render his audience virtuous and wise"

অর্থাৎ { the improvement of morals = শিব-সাধনা ; the progress of mind = সত্য-সাধনা } শিল্পের উদ্দেশ্য

এখানে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে—শিল্পীর উদ্দেশ্য শুধু সুন্দরের সাধনা নয়—শিবের ও সত্যের সাধনাও। দার্শনিক প্লেটো, সাহিত্য-শিল্পে সত্য শিবকে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই, সাহিত্য-শিল্পের প্রতিবাদে বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। দার্শনিক প্লেটো—যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী প্লেটো—নৈতিক সংস্কার বশেই সত্য-শিব-নিরপেক্ষ সুন্দরকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারেননি বলেই, তাঁর 'রিপাবলিকে' কবিকে স্থান দিতে চাননি। এখানে সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপকে তালিকাকার সামনে রাখতে পারলে বুঝার পক্ষে সুবিধে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটা তালিকা দেওয়া যাচ্ছে। বিষয়—বিশুদ্ধবুদ্ধি, নীতিবোধ এবং শিল্প-দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে—কি ভাবে সত্য-শিব-সুন্দর রূপে পরিণত হয়, নিম্নলিখিত তালিকায় সংকেতে বোঝানো হয়েছে।

বিষয়→	বৈজ্ঞানিক } বুদ্ধি → দার্শনিক }	সত্য-মিথ্যা তথা স্বরূপ জিজ্ঞাসা	→ সত্য
বিষয়—	নীতিবুদ্ধি →	ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ বিচার	→ শিব
বিষয়—	শৈল্পিক দৃষ্টি →	ঐকান্তিক প্রকাশ	→ সুন্দর

এবার এরিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' থেকে আমরা 'শিল্পের উদ্দেশ্য'-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। 'প্রেরণা' পরিচ্ছদে আমরা দেখেছি এরিস্টটল বলছেন—কাব্যসৃষ্টির মূলে দু'টো প্রেরণা কাজ করে :—একটি instinct of imitation অর্থাৎ প্রকাশের তাগিদ, অন্যটি—instinct for harmony and rhythm। ব্যাকরণের পরিভাষায় বল্লে এইভাবে কথাটা বলা যেতে পারে, কর্তা = শিল্পী, প্রকাশ = ক্রিয়া দ্বারা, তাঁর ঈপ্সিততম = কর্ম, অর্থাৎ সুন্দর রূপে বিষয়কে ব্যক্ত করিতে চান। বিশেষ-আকারে-ব্যক্ত 'সুন্দর রূপ'কে সামান্যভাবে—নৈর্ব্যক্তিক ভাবে—"সৌন্দর্য" বলা যায়। শৈল্পিক ক্রিয়ার আরম্ভ—প্রকাশের প্রেরণায়, শেষ—সুন্দর রূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রকাশে। বিশুদ্ধ শৈল্পিকের বৃত্তের মধ্যে—আছে শুধু প্রকাশ ব্যাপার—এবং সেই প্রকাশকে সুন্দরতম করবার চেষ্টা। এইভাবে একটা রেখা-চিত্র এঁকে কথাটাকে বোঝানো যেতে পারে।

বিষয়→ নির্ব্বাচন	শৈল্পিক দৃষ্টির সম্মুখে বিষয়	প্রকাশ ব্যাপার (imitation)	সুন্দররূপে প্রকাশ harmony & rhythm
↑ প্রেরণা	সূচনা	সৃষ্টিক্রিয়া	সৃষ্টির সমাপ্তি

এরিস্টটল এখানে, শৈল্পিক উদ্দেশ্যের বাইরে যে শিল্পের কোন উদ্দেশ্য আছে, সেকথা স্বীকার করছেন না। বিষয়কে রূপ দেওয়াই যে শিল্পীর মুখ্য কাজ—এই সিদ্ধান্তেই দাঁড়িয়ে আছেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার—সৌন্দর্য

এরিস্টটলের কাছে কোন নৈর্ব্যক্তিক বা অলৌকিক সত্তা নয়, সৌন্দর্য সুন্দর রূপের ধর্মমাত্র—প্রকাশিত রূপেরই "magnitude and order"—বিশেষ। প্রকাশ—রূপে-রসে প্রকাশ। সুতরাং সুন্দর প্রকাশ—সুন্দর রূপে—magnitude and order-এ, harmony and rhythm-এ প্রকাশ; সুন্দর রসে প্রকাশ—রসনিষ্পত্তিতে সার্থক। শৈল্পিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই রূপের এবং রসের উদ্দেশ্যই—শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য সব গৌণ।

কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য যেখানে অবিচ্ছেদ্য ভাবে অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্যের নাম করলে গৌণকেও গ্রহণ করা হয়। এরিস্টটল দেখিয়েছেন—যেখানেই অনুকরণ বা উপস্থাপনা, সেখানেই অবিনাভাবে 'আনন্দ' দেখা দিয়ে থাকে—"no less universal is the pleasure felt in things imitated. We have evidence in this in the facts of experience. Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate when reproduced with minute fidelity." (বুচার-কৃত অনুবাদ)। সুতরাং শিল্পের উদ্দেশ্য, এক হিসাবে যেমন প্রকাশকে সুন্দর করা; অন্যহিসাবে—সামাজিকদের মনে আনন্দদান করা। প্রথমটিকে বলা যাক—শিল্পের শৈল্পিক উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টিকে বলা যাক—সামাজিক উদ্দেশ্য। শিল্প-রচনা যেন দ্বিকর্মক ক্রিয়া :—এক ঈপ্সিত—সৌন্দর্য অন্য ঈপ্সিত—আনন্দ। এখন এই দু'য়ের মধ্যে কাকে এরিস্টটল মুখ্য মনে করেছেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে আমরা বলতে পারি—এ কথা সত্য, এরিস্টটলের মতে—বৃত্তরচনাই সর্বপ্রধান ব্যাপার (বৃত্তরচনা = ঘটনা বিন্যাস) এবং harmony or rhythm-এর প্রথমটি বৃত্তের সুগঠিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু তাই বলে এ কথা সত্য নয়—বৃত্তই সব; বরং এই কথাই মনে হয়—এরিস্টটল রূপ অপেক্ষা রসকেই বড় স্থান দিয়েছেন। সার্থক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—যা' 'most tragic in effect' (effect—লক্ষণীয়) সেইটাই সার্থক। ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—"faulty though he may be in the general management of his

subject, yet he is felt to be the most tragic of the poets". স্পষ্ট সিদ্ধান্ত—রসে যা বড়, সেই নাটকই সার্থক নাটক। প্রশ্ন হতে পারে—রসকে বড় স্থান দিলে—আনন্দকেই শেষ পর্যন্ত বড় করা হয় না কি? আমরা বলব—তাই হয় এবং হয়েছেও তাই। তবে এ কথা মনে করলেও ভুল হবে যে আনন্দ বলতে শুধু রসভাবস্বাদন মাত্রই বুঝায়; শৈল্পিক আনন্দ—(aesthetic pleasure) এরিস্টটলের কাছে রূপ-রসের অনুকরণজনিত বা উপস্থাপনাজনিত—এক কথায় সৃষ্টি-জনিত আনন্দ।

এখানেই আর একটা প্রশ্ন উঠবে—এরিস্টটলের পূর্বে গ্রীসদেশে এই বিষয়ে যে-সব ধারণা প্রচলিত ছিল—যেমন এরিস্টফেনিসের ধারণা, প্লেটোর ধারণা—সেই ধারণা সম্পর্কে—অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্যে মঙ্গলের স্থান—সত্যের স্থান সম্পর্কে, এরিস্টটল কি কোন কথাই বলেননি? আরো স্পষ্টাকারে প্রশ্নটিকে দাঁড় করানো যাক—"improvement of moral and progress of mind"—সাহিত্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে কিনা এবং এ সম্বন্ধে এরিস্টটল কিছু বলেছেন কি না?

এ কথা স্বীকার করতেই হবে, পোয়েটিকস্-গ্রন্থে এরিস্টটল প্রত্যক্ষভাবে এমন কিছু বলেননি যা'তে কাব্যের লোকশিক্ষার বা নীতিশিক্ষার দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কবির সার্থকতা রস সৃষ্টিতে, কাব্যের সার্থকতা রসোত্তীর্ণতায় —কাব্যের ফল আনন্দ, বিশেষ বিশেষ কাব্যের ফল—বিশেষ জাতীয় ঘটনার অনুকরণজনিত আনন্দ—এই পর্যন্ত এসেই যেন তার বক্তব্য থেমে গেছে। শিল্পরসিক শিল্পের প্রত্যক্ষ ফলের বহির্ভূত কোন ফল অন্বেষণ করেননি। আর শিল্পের দোষগুণ বিচার যা' করেছেন—রসনিষ্পত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই তা' করেছেন। নীতি যে পর্যন্ত রসের পরিপন্থী হয়ে না উঠছে সে পর্যন্ত নীতি-অনীতির প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে এরিস্টটল নারাজ।

তবে, সাহিত্য-শিল্পের সার্থকতা রসোত্তীর্ণতায় এবং আনন্দজনকতায়—এই ধরনের সিদ্ধান্তের ভূমিতে এরিস্টটল দাঁড়িয়ে থাকলেও, এরিস্টটলের আলোচনায়—পরোক্ষভাবে improvement of morals and progress of mind-এর সমস্যাটি স্থান পেয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে—অনুকরণ

মাত্রই আনন্দ দিয়ে থাকে। কেন অনুকৃত বস্তু দেখলে আনন্দ পাওয়া যায়—সে 'কেন' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এরিস্টটল বলেছেন—"The cause of this again is, that to learn gives the liveliest pleasure, not only to philosophers but to men in general......Thus the reason why men enjoy seeing a likeness is, that in contemplating it they find themselves learning or inferring"—এখানে এরিস্টটলের বক্তব্য কি তা' আমরা অনুমান করে নিতে পারি। তিনি বলতে চান—অনুকৃত রূপ অর্থাৎ জীবনের রূপ দেখবে অথচ কোন শিক্ষা হবে না, তা' তো হতে পারে না ;—সব দেখাশোনার প্রত্যক্ষ ফল যাই হো'ক, ফলশ্রুতি—শিক্ষা, সে সুশিক্ষাই হো'ক আর কুশিক্ষাই হো'ক। Contemplating, learning or inferring—এই উক্তির তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি না করলে এরিস্টটলের প্রতি অন্যায়ই করা হবে। রস তো শুধু খানিকটা আবেগ নয়। আমাদের রস শাস্ত্রে রসনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে যেমন বলা হয়েছে—'রসনা চ বোধরূপা' তেমনি এরিস্টটলের কাছেও aesthetic pleasure—"rational enjoyment"—সংবিদানন্দ। রসনা যেখানে বোধরূপা (rational) সেখানে রচনা সৌন্দর্য বা আনন্দ যাই সৃষ্টি করুক, সঙ্গে সঙ্গে বোধকেও জাগ্রত করে। বোধকে জাগ্রত করে আর শিক্ষা দেয়—একই কথাকে দুইভাবে বলা।

অন্য দিক থেকেও বিষয়টিকে আমরা বিচার করে দেখতে পারি।—কাহিনী-কাব্যের (নাটক-মহাকাব্যাদি) উপাদান নির্ধারণ করতে গিয়ে এরিস্টটল—"thought" কে অন্যতম উপাদান বলে [উপাদান—(১) Plot (action) (২) Character (৩) Diction (৪) Thought (৫) Spectacle (৬) Song—মহাকাব্যে—শেষের দু'টি নেই] স্বীকার করেছেন এবং "Thought" ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"Faculty of saying what is possible and pertinent in given circumstances'......"Thought ...is found where something is proved to be or not to be, or a general maxim is enunciated"। কাব্যে সমগ্রভাবে জীবনের যে রূপ তথা সমালোচনা প্রকাশ পায়, তা'তে জীবন-সম্বন্ধীয় বোধ যেমন বেড়ে

যায়, তেমনি কাব্যের অন্তর্গত "thought"—উপাদান প্রত্যক্ষভাবেই আমাদের চিন্তাশক্তি এবং জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অসমীচীন হবে না—কবিরা জীবনের রূপ-রস প্রকাশ করতে গিয়ে যখনই 'সৌন্দর্য' এবং আনন্দ সৃষ্টি করেন, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষও সাধন করেন। তারপর এ কথাও বলে রাখা যেতে পারে যে মানসিক উৎকর্ষ যা' সাধন করে তা' কোন না-কোন ভাবে নৈতিক উৎকর্ষসাধনের ব্যাপারেও অংশগ্রহণ করে।

এইবার আলোচনা করা যাক—"improvement of moral"-এর প্রশ্নটি। এই প্রশ্নের আলোচনা করতে সকলেই 'ক্যাথারসিস (Katharsis) কথাটাকে আঁকড়ে ধরেছেন এবং নৈতিক শিক্ষার কথাও যে এরিস্টটল তুলেছেন তা শব্দটির তাৎপর্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে—এখানেও একবার স্মরণ করতে দেওয়া হচ্ছে—এরিস্টটল পোয়েটিক্স-গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠাতেই এমন কথা লেখেন নি যে শিল্পের উদ্দেশ্য, চিত্তোৎকর্ষ বিধান করা এবং নীতি শিক্ষা দেওয়া। এমন কি যেখানে 'ক্যাথারসিস্' কথাটি প্রয়োগ করেছেন সেখানেও বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগের মোক্ষণের কথাই বলেছেন; কিন্তু ভাবাবেগের মোক্ষণ হলে কী হবে সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি। দেখা যাক—সেখানে কি আছে। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"Tragedy, then is an imitation...... through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions (২৩পৃ.) (বুচার)। বাইওয়াটার মহাশয়ের অনুবাদে আছে—"A tragedy then······with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its Catharsis of such emotions" (৩৫ পৃষ্ঠা)। ক্যাথারসিস্ শব্দটির তাৎপর্য কী এই প্রশ্নের উত্তরে রীতিমত একটা কথার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। (মোটামুটিভাবে—শব্দটিকে তিন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে—(১) চিকিৎসাবিধি-গত (medical) (২) ধর্মানুষ্ঠান-গত (religious or liturgical) (৩) নীতি-গত (moral, 'purificatio')) এরিস্টটল ঠিক কোন্ অর্থে কথাটা প্রয়োগ করেছেন সেই অর্থটি ঠিক করা নিয়েই যত বিসংবাদ। ষোড়শ শতাব্দীতে মিণ্টুর্নো নামক জনৈক সমালোচক

(লা আর্টে পোয়েটিকা—ভেনিস ১৫৬৪) শব্দটির ভাষ্য করতে গিয়ে লিখেছেন—"As a physician eradicates by means of poisonous medicine, the perfevid poison of disease which affects the body, so tragedy purges the mind of its impetuous perturbations by the force of these emotions beautifully expressed in verse." প্লেটোর মধ্যেও এই অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত এবং এরিস্টটলও যে শব্দটাকে অনুরূপ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে—'পলিটিক্স'-গ্রন্থে,—যেমন "These who are liable to pity and fear, and in general persons of emotional temparament pass through a like experience ;......they all undergo a Katharsis of some kind and feel a pleasurable relief। 'ক্যাথারসিস্' ভাষ্যের ইতিহাসে প্রবেশ করবার প্রয়োজন আমাদের নেই। ভাষ্য পেলেই আমাদের কাজ চলে যাবে। রেনাসা থেকে আরম্ভ করে বিংশশতাব্দী পর্যন্ত 'ক্যাথারসিস্' শব্দটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'মোক্ষণ' অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়েছে এবং বড় বড় শিল্পী-সমালোচক শিল্পের নৈতিক উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য স্বীকার করে এসেছেন। সমালোচক বুচার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করে নিয়েও নতুন একটা অর্থ বের করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন—"It expresses not only a fact of psychology or of pathology, but a principle of art." অর্থাৎ ক্যাথারসিস শেষ পর্যন্ত একটা শৈল্পিক প্রক্রিয়া—"fear and pity"কে শিল্পের মাধ্যমে শোধন করবার প্রক্রিয়া—যাতে "The painful element in the pity and fear of reality is purged away, the emotions themselves are purged. The Curative and tranquillising influence that tragedy exercises follows as an immediate accompaniment of the transformation of feeling. এরিস্টটল এই অর্থেই যে শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন এ কথা জোর করে বলা চলে না; তবে এটুকু স্পষ্ট যে ভাষ্যকার ট্র্যাজেডির 'curative and tranquilling influence' স্বীকার করেছেন তথা এ

কথাও স্বীকার করেছেন—"improvement of morals"—সম্বন্ধে সাহিত্য উদাসীন নয়।

সাহিত্য-শিল্প মানুষের নৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে—মানুষকে সু-কু, সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে—পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত করে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করে —প্রবৃত্তিকে দমন এবং নিবৃত্তিকে পোষণ করতে শিক্ষা দেয়,—এইরূপ কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এরিস্টটল করেননি বটে, কিন্তু এরিস্টটলের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, সৌন্দর্য, আনন্দ, চিত্তোৎকর্ষ ও নৈতিক শিক্ষার পারস্পরিক নিগূঢ় সম্পর্ক ধরা না পড়ে যায়নি।

জীবনের রূপ-কল্পনাকে সার্থক করতে হলে সুন্দর করতে হবে, সুন্দর করতে পারলে লোক আনন্দিত চিত্তে তা' গ্রহণ করবে, আনন্দে গ্রহণ করতে করতে অজ্ঞাতসারেই লোকে অনেক কিছু জেনে যাবে—শিখে নেবে এবং তা'দিয়ে নিজের আচরণকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবে—এই সম্পূর্ণ বৃত্তটির উপর এরিস্টটলের দৃষ্টি ছিল বলে তিনি এক থেকে অন্যকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। আরও একটা কথা। এরিস্টটলের কাছে, সাহিত্য-শিল্প জীবনের অনুকরণ। তার একদিকে আছে জীবনের তীব্র দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভের রূপ —ট্র্যাজেডির রূপ, অন্যদিকে আছে—জীবনের লঘু 'স্খলন-পতন ত্রুটি'র রূপ—কমেডির রূপ। নীতিকে বাদ দিয়ে আর যাই হোক জীবনের রূপ কল্পনা করা সম্ভব নয়—বিশেষতঃ ট্র্যাজেডিতো নয়ই। যে এরিস্টটলের সামনে ঈস্কিলাস-সফোক্লিস-ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডিগুলি ছিল, তাঁর পক্ষে নীতির প্রশ্ন বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সেখানেই তাঁর বাহাদুরি যেখানে তিনি মুখ্য থেকে গৌণকে পৃথক করেছেন এবং শিল্পের আসল বৃত্তটিতে, প্রকাশ —সুন্দর প্রকাশ—আনন্দজনক প্রকাশ—ছাড়া আর কোন-কিছুকেই স্থান দেননি। এরিস্টটলের কাছে সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য—জীবনকে সুন্দর তথা আনন্দদায়ক রূপে প্রকাশ করা। এ ছাড়া আর সবই গৌণ। তবে তারা এত অবশ্যম্ভাবী আনুসঙ্গিক যে, তাদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

এরিস্টটলের পরে—সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন।—এমন কি দুই দুটো নামডাকের মতবাদও (Art for art's

sake + Art with a purpose) এ নিয়ে গড়ে উঠেছে। আগে যথাসম্ভব সংক্ষেপে নানা মুনির মত সংগ্রহ করে দেখা যাক—কে কি বলেছেন ; পরে বিচার করে দেখা যাবে—এরিস্টটল যা' বলেছেন তা' থেকে কেউ নতুন কোন কথা বলেছেন কিনা।

হোরেস—'আর্স পোয়েটিকা'তে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'Poets aim either to benefit or to delight or to unite what will give pleasure with what is serviceable for life······ ; that poet gets every vote who unites information with pleasure, delighting at once and instructing the reader" (Works of Horace —214) অর্থাৎ কবিদের উদ্দেশ্য—কোনস্থলে প্রয়োজন সিদ্ধ করা। কোনস্থলে নিছক আনন্দ দেওয়া এবং কোনস্থলে একই সঙ্গে প্রয়োজন সিদ্ধ করা এবং আনন্দদান করা। যে কবি আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও দিতে পারেন তাকেই সকলে পছন্দ করে। স্ট্রাবো (Circa 24 B. C). এ সম্বন্ধে দু'টো মতের উল্লেখ করেছেন—তিনি বলেছেন—এরাটোস্থিনিসের মতে—"the aim of the poet always is to charm the mind, not to instruct" এবং তাঁর নিজের মতে poetry is a kind of elementary philosophy which introduces us early to life and gives us pleasurable instructions in reference to character, emotion, action" দেখা যাচ্ছে —কেউ কেউ আনন্দকৈবল্যবাদী পক্ষ সমর্থন করেছেন ; কেউ কেউ সামাজিক উপযোগিতার দিকেই বেশী ঝোঁক দিচ্ছেন।

মধ্যযুগে মোটামুটিভাবে "pleasurable instruction" মতবাদটিই প্রচলিত। সমাজের উপকারে যা' না আসবে, সামাজিক মানুষ তাকে গ্রহণ করবে কেন ?—এই মনোভাবই এযুগে প্রবল। মহাকবি দান্তে, 'Can Grande Scalle'-এর কাছে লেখা একখানা চিঠিতে জানিয়েছেন যে তাঁর কাব্যকে যে জাতীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তাকে বলা যায়— 'moral activity or ethics' এই কাব্যের উদ্দেশ্য—তাঁর মতে—"to-

remove those living in this life from a state of misery and to lead them to a state of happiness—দান্তের এই উক্তি—আনন্দ-কৈবল্যবাদকে সমর্থন করে না। সার্থক শিল্প সমাজের উপকার করবে—এই ঘোষণাই এখানে সুস্পষ্ট।

ষোড়শ শতাব্দীতে—"delightful teaching"—উত্তরটি প্রায় সকলেরই মুখে পাওয়া যায়। হোরেসের মন্তব্য বিশ্লেষণ করে ট্যাসো সিদ্ধান্ত করেছেন—heroic poem has its end to profit by delighting···But to profit through delight is perhaps the end of all poetry—(Discourse on the Heroic poem—Bk. 1) এই যুগে বেসুরো সুর শোনা যায় কস্টেলভেত্রোর কণ্ঠে—কাব্যের উদ্দেশ্য—'solely to delight and recreate, I say to delight and recreate the minds of the crude multitude and of the common people.

সপ্তদশ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি কর্ণেই আনন্দকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন বটে কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করেননি। 'dramatic poetry aims only to please the spectators'—নিশ্চয়ই আনন্দ-কৈবল্যবাদের পক্ষের কথা; কিন্তু এটাই তার একমাত্র এবং শেষ কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন—উক্ত মন্তব্যটি—"does not contradict those that think to ennoble art by giving it the aim of profiting as well as pleasing"। তাঁর মতে—সাহিত্য শুধু আনন্দদানই করবে, না সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মেটাবে—এ বিসংবাদ নিরর্থক; কারণ প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে বড় আনন্দ সৃষ্টি করা যায় না—"it is impossible to please according to rules, without including much that is useful······Though the useful enters only under the form of the delightful, it does not cease to be necessary"। কর্ণেই একটি স্মরণীয় সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দুঃখের বিষয়—আনন্দ ও প্রয়োজনকে যাঁরা দুই কোটিতে পৃথক করে রেখে দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা কর্ণেই-এর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। ড্রাইডেন—

তার 'Essay of Dramatic poetry-তে কলাকৈবল্যবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের দ্বন্দ্বটিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন ; বক্তা ইউজেনিয়াসের রুচি কলাকৈবল্য-বাদীর রুচির মতোই। Crites যখন বল্লেন—"ill poets should be as well silenced as seditious preachers"—Eugenius উত্তর দিলেন—"In my opinion you pursue your point too far. I am so great a lover of poetry that I could wish them all rewarded who attempt but to do well." কলাকৈবল্যবাদের মূল সংস্কার থেকেই কথাটি বেরিয়েছে—"to do well" অর্থাৎ 'কলা হি কেবলম্' আসল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে ড্রাইডেনকে কলাকৈবল্যবাদী বলা চলে না এই কারণে যে অন্য একজন বক্তা (Lisideius) নাটকের লক্ষণ নির্ধারণ করতে বলেছেন—"A just and lively image of human nature, representing its passions and humours and the changes of fortune to which it is subject for the delight and instruction of mankind ; ড্রাইডেনের সিদ্ধান্ত—"To instruct delightfully is the general end of all poetry."

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পদর্শনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন দেখা দেয়। নতুন করে কল্পনার তত্ত্ব ও সৌন্দর্যের তত্ত্ব ও মহিমা প্রচার করা হতে থাকে এবং শিল্পকে প্রয়োজন-নিরপেক্ষ কল্পনাবিলাস বা সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ বলে ঘোষণা করা হয়। এই যুগের চিন্তা এডিসন [on the imagination (1711-12], * জি বুমগার্টেন—[Aesthetica (1750)], এডমাণ্ড বার্ক [A philosophical enquiry into the origin of our Ideas of the sublime and beautiful (1756)], হোগার্থ—[Analysis of Beauty (1753), লেসিঙ্—[Laocoon—1766] * কাণ্ট [critique of judgment—1790], এবং শিলার [Letter upon the Aesthetical Education of man—1795] প্রমুখ চিন্তানায়কদের দ্বারা প্রভাবিত। (অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-দার্শনিকদের তালিকা দ্রষ্টব্য)। কল্পনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে

এবং শিল্পকে কল্পনা-শক্তির লীলা প্রমাণ করতে এরা বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন।

এঁদের মধ্যে দার্শনিক কান্টের Critique of judgment-এর প্রভাব খুবই সুদূরপ্রসারী! বুমগার্টেন "এস্থেটিক" শব্দটিকে প্রথম প্রয়োগ করে ঐতিহাসিক গুরুত্বলাভ করলেও, দার্শনিক কান্টই শিল্পতত্ত্বকে দার্শনিক আলাচনার স্তরে উন্নীত করে দেন। তাঁর মতে—শৈল্পিক মনোভঙ্গী (aesthetic attitude)—প্রয়োজন (interest)-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যদিদৃক্ষা—বীক্ষাপরায়ণ মানসিক অবস্থা বিশেষ—ফলে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের "সত্য"-সন্ধানীমনোভাব থেকে এবং কর্মযোগীর নৈতিক মনোভঙ্গী থেকে পৃথক ধরনের এক দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের কথায় স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক —"Now where the question is whether something is beautiful, we do not want to know, whether we, or any one else, are, or even could be, concerned in the real existence of the thing, but rather what estimate we form of it on mere contemplation. (Intuition or reflection.")। সৌন্দর্য-বিচারে প্রয়োজনের হিসাব আসতেই পারে না। যেখানে তা আসে সেখানে বিচার—সম্পূর্ণ নয়, খণ্ডিত। রসাস্বাদনের আনন্দ—"the pure disinterested delight." কান্টের সতর্কবাণী—But the further point that the delight arising from aesthetic ideas must not be made dependent upon the successful attainment of determinate ends……is brought home to us by the fact that fine art as such must not be regarded as a product of understanding and science, but of genius, and must, therefore, derive its rule from aesthetic ideas which are essentially different from rational ideas of determinate ends". (a esthetic idea = representation of the imagination which induces much thought yet without the possibility of any definite thought

whatever (175—Crit of judgment)। কাণ্ট বলেছেন—"For fine art must be free art in a double sense : i.e., not alone in a sense opposed to contract work, as not being a work the magnitude of which may be estimated, exacted or paid for according to a definite standard, but free also in the sense that, while the mind, no doubt, occupies itself still it does so without ulterior regard to any other end and yet with a feeling of satisfaction and stimulation (independent of reward) শেষটুকু লক্ষণীয়। সৃষ্টিকালে মন বিশেষভাবে প্রবণায়িত, কিন্তু সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনে মন নিযুক্ত নয়। প্রবণতা আছে বটে কিন্তু কর্মই এখানে কর্মের লক্ষ্য। এ যেন—"purposiveness without purpose"—উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য। 'এস্থেটিক এ্যাটিচিউড' বলতে—এই বিশেষ ধরনের মনোভাবকেই বুঝায়।

তবে এরিস্টটলের মতো কাণ্টও স্বীকার করেছেন—কবির কাজ—"mere play with ideas" হলেও, কবি—'accomplishes something worthy of being made a serious business, namely the using of play to provide food for the understanding and the giving of life to its concepts by means of the imagination". অর্থাৎ কবির মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই হোক আর আনন্দ সৃষ্টি করাই হোক—চিত্তোৎকর্ষের দায়িত্ব কবির পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। তেমনি সম্ভব নয়—শৈল্পিক দৃষ্টিকে নৈতিক বোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা; কারণ—"For only when sensibility is brought into harmony with moral feeling can genuine taste assume a definite unchangeable form (227).

—কাণ্ট শিল্পকে তথা কাব্যকেও উদ্দেশ্যহীন মুক্ত কল্পনা বল্লেও, কাব্যের ফলশ্রুতির—সামাজিক উপযোগিতার—কথা বিস্মৃত হননি। স্বীকার করেছেন—(১৯১ পৃষ্ঠায়) কাব্য—"expands the mind by giving freedom to the imagination and by offering······a wealth

of thought to which no verbal expression is completely adeqate and by thus rising aesthetically to ideas"—এবং কাব্য—invigorates the mind by letting it feel its faculty—free, spontaneous……তবে এ কথাও বলা দরকার—কাণ্টের সিদ্ধান্তে, শিলারের খেলাবাদে (play theory of Art)—যাতে কাণ্টের চিন্তাই নতুন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে কলাকৈবল্যবাদের ভিত্তিই পাকাপোক্ত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী প্রভৃতি কবি-সমালোচকদের দ্বারা কাব্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই উদ্দেশ্যই আলোচিত হয়েছে। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেন—যদিও "The poet writes under one restriction only, namely, the necessity of giving immediate pleasure to a human Being……" তবুও কাব্যে 'worthy purpose' আবশ্যক; অন্তত তাঁর কাব্যে তা' আছে—কারণ "poetry is the breath and finer spirit of all knowledge"…… "poetry is the first and last of all knowledge" তারপর, কবি শেলীর কাছে নীতিমূলক কবিতা ঘৃণার বস্তু—(Didactic poetry is my abhorrence) এবং যে অনুপাতে কাব্যে কবির নৈতিক উদ্দেশ্য মেশে সেই অনুপাতে কাব্যত্বের হানি ঘটে—বটে, কিন্তু শেলীর "A Defence of poetry" নিবন্ধের নানাস্থলে এমন সব উক্তি ছড়ানো আছে, যাদের সাক্ষ্যে অনায়াসেই এ কথা প্রমাণ করা যায় যে শেলী কলাকৈবল্যবাদী বলতে যা' বুঝায় তা' ন'ন। কাব্যের প্রশস্তি করতে গিয়ে শেলী কাব্যকে 'কি-নয়'তে পরিণত করেছেন। কাব্য আনন্দে আনন্দ, জ্ঞানে জ্ঞান, নীতিতে নীতি, প্রীতিতে প্রীতি—একাধারে সত্য-শিব-সুন্দর।

কবি শুধু 'নাইটিঙ্গেল' ন'ন, কবিরা হচ্ছেন—"institutors of laws and founders of society, the inventors of the arts of life—এক কথায়—" unacknowledged legislators of the world." কবি শেলী মনে করেন, 'আনন্দ' ও 'প্রয়োজন' একে অন্যের বিসংবাদী নয়। প্রয়োজনকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে—এক, স্থূল প্রয়োজন—জৈবিক

(animal nature) প্রকৃতির চাহিদা যা মেটায়; দুই, সূক্ষ্ম প্রয়োজন—"Whatever strengthens and purifies the affections, enlarges the imagination and adds spirit to sense (is useful)" গভীর আনন্দ বড প্রয়োজনই মেটায়। আর এক দিক থেকেও শেলী সাহিত্যের উপযোগিতার কথাটা আলোচনা করেছেন। নৈয়ায়িক বাক্যবিন্যাস করলে এইভাবে বলা যায়—'morality'র 'basis' হচ্ছে 'imagination'; কাব্য 'imagination'-কে পরিপোষণ করে; অতএব কাব্য 'morality'কেই পুষ্ট করে। কাব্য যখন strengthens and purifies the affections, তখন নৈতিক জীবনকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। তাঁর কাছে—The great instrument of moral good is the imagination and poetry administers to the effect by acting upon the cause. সুতরাং কবি শেলীকে কলাকৈবল্যবাদীর পংক্তিতে স্থান দেওয়া চলে না।

আমরা দেখেছি—এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স গ্রন্থেই কলাকৈবল্যবাদের মূল কথাটি প্রথম বলা হয়েছে—শিল্পের সার্থকতা বড় শিল্প হয়ে উঠায় অর্থাৎ সৌন্দর্য ও আনন্দ মূল্যই যে আসল শৈল্পিক মূল্য—এ সংস্কারের সূচনা এরিস্টটলেই। তবে এরিস্টটল সৌন্দর্যকে যেমন অলৌকিক বস্তু করে তোলেননি, আনন্দকে তেমনি জীবন-নিরপেক্ষ ভাবমাত্রে পর্যবসিত করেননি। আর তা' করেননি বলেই—কাব্যের ফলশ্রুতি থেকে 'চিত্তোৎকর্ষ' বা চিত্ত-শুদ্ধিকে বাদ দেওয়ার জন্য কোন কথা বলেননি। পরবর্তীকালে—আজ পর্যন্তও বলা যায়—কাব্যের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচুর মতভেদ ঘটেছে এবং ঘটেছে তা' মুখ্য উদ্দেশ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যর দু'য়ের একটার ওপর বেশী ঝোঁক দেওয়ার ফলে। উনবিংশ শতাব্দীতে, একদল, কাব্যের সার্থকতা খুঁজতে কবিত্বের বাইরে যেতে চাননি, বলতে চেয়েছেন—কাব্য-সৃষ্টির আদিতে—প্রকাশের ব্যাকুলতা, মধ্যে—প্রকাশ, অন্তে—সুন্দর প্রকাশ। কাব্যের উদ্দেশ্য—সুন্দর অর্থাৎ কলাকৌশলময় প্রকাশ। এ প্রকাশে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়, শ্লীল-অশ্লীলের হিসাব বড় কথা নয়—বড় কথা কেন কোন কথাই নয়—একমাত্র কথা—সৌষ্ঠবের হিসাব—সৌন্দর্যের হিসাব। এই দলকে বলা

হয়েছে কলাকৈবল্যবাদী অর্থাৎ এরা বলতে চান—Art for Arts sake 'কলা হি কেবলম্'। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার, যাঁরা কলাকৈবল্যবাদী বলে খ্যাত তাঁরা গোড়াতেই 'কলা হি কেবলম্' বলে যত গোড়ামিই দেখান, শেষ পর্যন্ত ফলাকাঙ্ক্ষা না করে পারেন নি—শিল্পের সামাজিক উপযোগিতা স্বীকার না করে পারেননি—প্রত্যক্ষভাবে না করলেও পরোক্ষভাবে করেছেন।

ভিকটর হিউগো শতাব্দীর গোড়াতে (১৮১৯) আলোচনার মাঝ দিয়ে কলাকৈবল্যবাদটিকে সামান্যভাবে প্রচার করবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই (১৮৬৪) বিরুদ্ধপক্ষে যোগদান করেন—কাব্যের উপযোগিতার প্রশ্ন উপেক্ষা করতে পারেন না। কলাকৈবল্যবাদের ইতিহাস আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ হয়—১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। **ভিকটর কুঁজা** (Victor cousin 1792—1867)—১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে (Revue des Deux Mondes 1845)—এ, "লা' আর্ট পিওর লা' আর্ট" '(I'art pour I'art) বচনটি প্রয়োগ করেন। এই বচনটির আক্ষরিক অনুবাদ দাঁড়ায়—'শিল্পতো বিশুদ্ধ শিল্প'। [ইংরাজীতে এর রূপ দাঁড়িয়েছে "Art for Art's sake"—তা' থেকে এসেছে আমাদের বাংলা তর্জ্জমা—'শিল্পের জন্য শিল্প',—কলাকৈবল্য' প্রভৃতি। (কলাকৈবল্যই বেশী চালু)]

ফরাসীদেশের—গোতিয়ে, ফ্লবার্ট, বোদলেয়া, ভার্লেন প্রভৃতি, ইংল্যাণ্ডের ওয়ালটার পেটার, ওসকার ওয়াইলড্, ব্র্যাডলে, হুইসলার প্রভৃতি, ইতালীর বেনিডেট্টো ক্রোচে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বীরবল প্রভৃতিকে এই মতবাদটির সমর্থ পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

এই মতটির প্রথম ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন—শিল্পী থিওফিল গোতিয়ে (Theophile Gautier) "Mademoiselle de Muupin" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় (১৮৪৫) তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে—Art is a moral অর্থাৎ শিল্পী নীতির ধার ধারেন না। গোতিয়ের পরে নাম করা যায়, নামকরা সাহিত্যিক ফ্লবার্টের (১৮২১—৮০) ফ্লবার্ট বলেন—"No great poet has ever drawn conclusion··········paint, paint

without theories" তবে মুখের ঘোষণার সঙ্গে কার্যের যোগ রাখতে পারেননি। 'মাদাম বোভারি' তার দৃষ্টান্ত। নভেল সাহিত্যকে কি তিনি —L'Education Sentimentale' আখ্যা দেননি ? বড় প্রমাণ রয়েছে তাঁর একখানা চিঠি—মৃত্যুর এক বৎসর আগে ১৮৭৯ খ্রী:—লেখা। এই চিঠিতে লিখেছেন—কলাকৈবল্যবাদ অসম্পূর্ণ—আসলে চাই—"An aesthetico-moral Theory—the heart is inseparable from the intelligence, Those who have drawn a line between the two possessed neither." মন্তব্যটি স্মরণীয়। হৃদয় এবং বুদ্ধিকে যাঁরা বিচ্ছিন্ন করে দেখেন তাঁদের হৃদয় ও বুদ্ধির কোনটাই নেই।

Baudelaire (বোদলেয়া ১৮২১-৬৭) এই মতবাদের উগ্র সমর্থক। তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন—"poetry has no end beyond itself ...If a poet has followed a moral end, he has diminished his poetic force and the result is most likely to be bad." তবে, নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে গেলে শিল্প নষ্ট হয়ে যায়—এ কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও, বোদলেয়া—তাঁর 'Les fleurs du Mal'—সম্বন্ধে একখানা পত্রে লিখেছেন—(Ancelle-এর কাছে লেখা)—"In that appalling book I put my whole heart all my most tender feelings all my religion (in a disguised from) and all my hatred. Even were I to write to the contrrary and swear by all the gods that it was only a composition of pure art, of artistic jugglery with words ...I should only be lying like a trooper." এ বই শিল্পের জন্যই শিল্প রচনা' নয় এবং তা' বল্লে মিথ্যা কথাই বলা হবে—এই যদি তাঁর মত হয়, তবে বলতে হবে—কলাকৈবল্যবাদের শিবির থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। তারপর কবি ভার্লেন এ সম্পর্কে যা বলেছেন তাকে ব্যাজস্তুতি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তিনি চিরকাল শিশু হয়ে থেকে আবোল তাবোল বকতে চেয়েছেন—সাবালক হওয়ার দায়িত্ব তাঁর কাছে অসহ্য। তিনি বলেছেন—'I wish art to be irresponsible in order that I

may indulge without reproach my sadism my masochism and my anti-parental Neurosis. For like all neurotics I find adult responsibility too harassing and prefer a second childhood." এ সমর্থন না খণ্ডন বুঝা কঠিন। তবে এইটুকু বোঝা যায় কবিদের 'নিউরোটিকস' অথবা দায়িত্বশীল দুটোর একটা হতে বলার মধ্যে—খণ্ডনের সুরটিই প্রধান।

ইংলণ্ডে এই মতবাদটির প্রধান প্রচারক—লুকাসের ভাষায়—'the major prophet of English Aestheticism." ওয়ালটার পেটার (১৮৩৪—৯৪)। তাঁর মতে—[Studies in the History of the Ranaissance—1873]—"Not the fruit of experience but the experience itself is the end—" কাব্যের উদ্দেশ্য—"not to teach lessons or enforce rules or even to stimulate us to noble ends, but to withdraw the thoughts for a little while from the mere machinery of life, to fix them, with appropriate emotions, on the spectacle of those great facts in man's existence which no machinery affects.

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এহেন কলাকৈবল্যবাদীও কাব্যের ফলশ্রুতি আলোচনা করেছেন; রচনা শক্তির প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন—(Essay on style—1888)—রচনার দ্বারা—"increase of sympathy, amelioration of suffering, service of humanity"—সম্ভব। এ তো প্রায় শেলীরই উক্তি। যা সহানুভূতির শক্তি বাড়িয়ে দেয়, দুঃখ-দুর্ভোগ দূর করে, মনুষ্যসমাজকে সেবা করে—তার সামাজিক উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য। কলাকৈবল্যবাদীর তালিকায়, ওসকার ওয়াইলডের (১৮৫৬-১৯০০) স্থানও নগণ্য নয়। ওয়াইলড যেন বেশ একটু উগ্র—"There is no such thing as a moral or immoral book. Books are well written or badly written that is all······স্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেন—"No artist has ethical sympathies. An ethical

sympathy in an artist is an unpardonable mannerism"—আরো স্পষ্ট কথা—"All art is quite useless." কিন্তু ওয়াইলড মহাশয়ও শেষ পর্যন্ত কাব্যে—বিষ-অমৃতের সন্ধান করেছেন Huysman-এর 'A Rebour' —সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"It was a poisonous book." কোন বইকে বিষাক্ত বলে বর্জন করা নিশ্চয়ই নিছক শৈল্পিক বিচার নয়।

এই পর্যন্ত যে পরিচয় পাওয়া গেল তা'তে—দেখা গেল—কলাকৈবল্য-বাদীরা—শিল্পের শৈল্পিক মূল্যকেই একমাত্র মূল্য বলে ঘোষণা করলেও কার্যতঃ কেউই শিল্পের ঔপযোগিক মূল্য বাদ দিতে পারেন নি। টি. এস. এলিয়টের ভাষায় বলা যেতে পারে—মতবাদটি—"more advertised than practised." তবে এ কথা কিন্তু মনে করবার কারণ নেই—কলাকৈবল্য-বাদই এ যুগের একমাত্র মতবাদ।

একদিকে যেমন কাব্যকে দেশকাল নিরপেক্ষ নিছক আনন্দের সামগ্রী বলে প্রচার করবার প্রবণতা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে কাব্যকে দেশকালপাত্রসাপেক্ষ সৃষ্টি হিসাবে দেখার প্রবণতা—সামাজিক মনের অভিব্যক্তি—সামাজিক উৎপাদন—হিসাবে দেখাব প্রবণতা। বহু মনীষী, কবির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি?—এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং শিল্পের সামাজিক উপযোগিতার প্রশ্নটি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

*সুবিখ্যাত কোম্‌তে (১৭৮৯-১৮৫৭) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—শিল্পের উদ্দেশ্য, উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাহায্য করা। (শিল্পও এক হাতিয়ার)।

* মনীষী রাসকিনের (১৮১৯-১৯০০) মতে—সমস্ত ললিত-কলাকে "didactic to the people and that as their chief end" (Aratra pantelici Lecture IV) হতে হবে। তিনি মনে করেন—Art properly so called is no recreation......" এবং "And chiefly the great representative and imaginative arts—teach what is noble in past history and lovely in existing human and organic life."

* উলিয়াম মরিস (১৮৩৪-৯৬), যদিও প্রথম জীবনে—"The idle singer of an empty day"—হতে চেয়েছেন, এবং যদিও দেশের দশের মঙ্গল করার ইচ্ছা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন এই বলে "Why should I strive to set the crooked straight?—শেষ পর্যন্ত সেই বাঁকাদের সোজা করবার জন্যই সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেছেন। তাঁর কাছে শিল্প—"man's expression of his joy in labour."

এন. জি. চেরনিশেভ্স্কি—"Aesthetict Relation of Art to Reality" —নিবন্ধে (১৮৮৮) এ সম্পর্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথা লিখেছেন— "Content worthy of the attention of thinking individual is alone to shield art from the reproach that it is merely as pastime which it very often is, Artistic form does not save a work of art from contempt or a pitiful smile if the importance of its idea can not answer the question :—Was it worth the trouble to make? A useless thing has no right to respect. "Man is an aim in himself but the aim of the things man makes must be to satisfy man's needs and must not be an aim in itself" (Selected Philosophical Essays—367) * আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন—"আমোদ ভিন্ন অন্যলাভ যে কাব্যে নাই সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।" তাই বলে বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেননি। স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন "সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য'; অবশ্য—"সৌন্দর্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিতে হইবেক।" বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না, কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি

কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।" বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তে সত্য-শিব-সুন্দরের সমন্বয় করার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা দেখা যায়।

মনীষী টলস্টয়ের মন্তব্যেও—সামাজিক উপযোগিতার কথা স্বীকার করা হয়েছে—তিনি বলেন—Art is not, as the Metaphysicians say the manifestation of some mysterious idea of beauty or God; it is not as the aesthetical psychologists say, a game in which man lets off his excess of stored-up energy, it is not the production of pleasing objects; and above all it is not pleasure; but it is a means of union among men, joining them together in the same feeling and indispensible for the life and progress towards wellbeing of individuals and humanity."

আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রশ্নটির সুন্দর একটি ছোট উত্তর দিয়েছেন —"সৃষ্টির ন্যায়, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য"। তবে সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকতে পারেননি—লিখেছেন—"সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ে জীবন ও স্বাস্থ্য সঞ্চার হয়।……উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়। (সাহিত্যের উদ্দেশ্য)। তবে রবীন্দ্রনাথ এখানেই থামেন নি; আরো একটু এগিয়ে গেছেন। 'মানবপ্রকাশ' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—"আমি তো বলি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে গঠিত করে তোলা…(১২৯৯)। 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধে নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন—প্রকাশটাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম সত্য কিন্তু এটেই কি শেষ সত্য? উত্তর দিয়েছেন— "সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ"। তবে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ আনন্দবাদী এবং কলাকৈবল্যবাদী বলে তান-বিস্তারের পরেই সমে ফিরে

এসেছেন—"সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা" (সাহিত্যের পথে)। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশের বৃত্তিকে প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছেন বলেই সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন—"সেই সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে —তা' অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত।" (সৃষ্টি—সাহিত্যের পথে)।

বেনিডেট্টো ক্রোচে'র দৃষ্টিতে Art is expression। সুতরাং সেখানে নীতি অনীতির কোন প্রশ্ন নেই, সত্য-মিথ্যারও কোন প্রশ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন—আনন্দই তাহার আদি, মধ্য, অন্ত—আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য, ক্রোচের মতেও—রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে বলা যাক্—expression-ই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত। আসলে এই expressionism কলা-কৈবল্যবাদেরই একটা বড সমর্থক।

কলা-কৈবল্যবাদীর অভাব কোনযুগেই হয়নি—বিংশ শতাব্দীতেও হয়নি কিন্তু প্রত্যেক যুগের মতো এযুগেও প্রতিবাদীর সংখ্যা বেশী ছাড়া কম নয়। এইচ. জি. ওয়েলস্ মহাশয় বলেছেন—লেখকেরা নিজেদের সমশ্রেণীভুক্ত মনে করবেন—শিল্পীদের সঙ্গে নয় শিক্ষক-পুরোহিত-অবতারদের সঙ্গে (not with the artists, but with the teachers, the priests and the prophets". নাট্যকার বার্নাডশ মহাশয় তো পুরোদস্তুর উদ্দেশ্যবাদী। তাঁর মতে— Art for Árt's sake means merely 'success for money's sake.' মনে হতে পারে এ রসিকতা। কিন্তু গম্ভীর হয়েও তিনি একই কথা বলেছেন—"Good art is never produced for its own sake. It is too difficult to be worth the effort."

সোমারসেট মম বলেছেন—"Little as I like the deduction. I can not but accept it, and this is that the work of art must be judged by its fruits and if these are not good, it is valueless" "ফল" দিয়েই যখন বিচার, তখন কবির উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই 'সুফল'

ফলানো। এবার টি-এস এলিয়ট মহাশয়ের মন্তব্য দিয়ে আমরা এই ইতিহাসের উপসংহার করছি। "The use of poetry and the use of criticism-গ্রন্থে কলা-কৈবল্যবাদ সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন মতবাদটি—"a mistaken one and more advertised" অর্থাৎ মতবাদটিতে সত্য নেই এবং যত বড় গলা করে মতবাদটিকে প্রচার করা হয়, তত নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যতঃ মানা হয় না।

এরিস্টটল থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি কিন্তু দূরত্ব যতটা কালের দূরত্ব ততটা সত্যের নয়। নানা মুনির নানা মতের ইতিহাস অনেক জায়গা জুড়েছে, সত্য, কিন্তু প্রশ্নের দার্শনিক মীমাংসার চেষ্টা যা' হয়েছে তা জড়ো করলে খুব অল্প জায়গাই জুড়বে। (প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যাপার এই রকম নয় কি?) দেখা গেছে—যারা 'শৈল্পিক দৃষ্টির' (aesthetic attitude) প্রকৃতি বলতে অলৌকিক বা নৈর্বক্তিক সৌন্দর্যের ধ্যানধারণা বুঝেছেন বা অহেতুক আনন্দ সৃষ্টি বুঝেছেন তাঁরাই কলা-কৈবল্যবাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন, আর যাঁরা শৈল্পিক দৃষ্টিকে জীবনের রূপ সৃষ্টির চেষ্টারূপে দেখেছেন —নিরালম্ব প্রকাশ, নির্বিষয় প্রকাশকে যাঁরা অসম্ভব বলে মনে করেছেন এবং বিষয়কে সমাজেরই বিষয় ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারেননি, তাঁরাই শিল্পের সামাজিক উপযোগিতার কথা ভুলতে পারেননি। এঁরা দেখেছেন —সাহিত্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানব-জীবন এবং জীবনের লঘু রূপ বা গুরু রূপ যে রূপই প্রকাশ করবার চেষ্টা করা যাক, জীবনের রূপে নীতির স্পর্শ না থেকে পারে না, আর জীবনের বিচিত্র রূপ যেখানে অভিব্যক্ত সেখানে পরোক্ষতঃ জীবন-তত্ত্বের শিক্ষাও পরিবেশিত। এই দেখার সঙ্গে এরিস্টটলের দেখার কোন পার্থক্য নেই।

আমাদের দেশে অনেকটা মুক্ত মন নিয়েই—প্রেরণা ও উদ্দেশ্য আলোচনা করা হয়েছে। নানা উদ্দেশ্যে লোক কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারে—এ সত্যটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে যায়নি। যশ, অর্থলাভ, অমঙ্গলের প্রতিবিধান, লোকশিক্ষা প্রভৃতি এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে লোক কাব্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হতে পারে। অকামের কোন ক্রিয়া নেই;

সুতরাং যেখানেই ক্রিয়া বর্তমান, সেখানেই কামনাও বর্তমান। তবে কাব্য রচনার মূলে যে নিগূঢ় লৌকিক উদ্দেশ্যই থাক, কাব্য-রচনায়-প্রবৃত্ত কবির সম্মুখে উদ্দেশ্য একটিমাত্র—সে উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। * [রসবাদ ছাড়াও অন্যান্য মতবাদ আছে, তা থাকা সত্ত্বেও 'রস' কথাটি প্রয়োগ করছি এই কারণে যে রসবাদই প্রধান মতবাদ, বহু প্রচলিত এবং বহুজন প্রশংসিত মতবাদ। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এই সংজ্ঞা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—বস্তুতঃ কাব্যের সংজ্ঞা আর কিছুই হইতে পারে না।"] একেই বলা যায় "শৈল্পিক উদ্দেশ্য" (aesthetic purpose)। রস-সৃষ্টির বাইরে শিল্পীর কোন উদ্দেশ্য নেই—এ কথাটা শুনে আমাদের দেশের অনেক সমালোচক নাসিকাটাকে একটু কুঞ্চিত করেছেন; কারণ তাঁদের ধারণা হয়েছে রস সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের অর্থাৎ জীবন-সমালোচনার (criticism of life) কোন সম্পর্ক নেই —রসের মধ্যে রূপের অর্থাৎ কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে এমন সব কথা উঠেছে—'কবি কাব্যসৃষ্টিই করেন, রসসৃষ্টি কাব্যের মুখ্য প্রয়োজন নয়"…… ……"রস একটি নির্বিশেষ পদার্থ, কিন্তু কাব্য প্রেরণা এতই বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট যে, তাহা প্রত্যেক কাব্যে একটি নিজস্ব ও বিলক্ষণ রূপ লইয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে" (সাহিত্য-বিচার)। রসবাদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি যিনি করেছেন তিনি বুঝতে পেরেছেন জীবনকে বাদ দিয়ে রসনিষ্পত্তি সম্ভব নয় এবং রস বলতে সাধারণভাবে 'aesthetic pleasure' বুঝায়। যে পর্যন্ত কাব্যের উদ্দেশ্যের ঘরে—'শৈল্পিক আনন্দ' বিরাজ করবে সে পর্যন্ত রসবাদের মার নেই। রস তো নিরালম্ব কোন ব্যাপার নয়! 'বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিযোগাৎ রসনিষ্পত্তি' এই সূত্রটি চোখের উপরে থাকতে কেন যে রসের জীবন-নিরপেক্ষতার অভিযোগ উঠে বুঝতে পারা যায় না। সাহিত্য জীবন-সমালোচনা—এ কথার অর্থ নিশ্চয় এ নয় যে সাহিত্য জীবন-সমালোচনার প্রবন্ধ; সাহিত্য এই অর্থেই জীবন সমালোচনা যে সাহিত্যে জীবনের রূপের মাঝ দিয়েই জীবনসত্যকে ব্যক্ত করা হয়। জীবনের রূপই বড় কথা। তবে জীবনের এলোমেলো রূপ নয়—রসকেন্দ্রে-গ্রথিত জীবনের রূপই সবচেয়ে বড় কথা। রসবাদ এর কম বা এর বেশী

কিছু বলেনি। জীবনকে 'রূপ' দিতে গেলে, দেশকাল-অবস্থায়—অবস্থিত ব্যক্তি-জীবনের, দেহ-মন-আত্মার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাঝ দিয়ে যে রূপ ব্যক্ত হয়, সেই রূপকেই প্রকাশ করতে হবে। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি সংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ—সূত্রে এই কথাই সূত্রাকারে বলা হয়েছে। বড় রকমের জীবনের রূপ সৃষ্টি না করতে পারলে বড় রসও যে সৃষ্টি করা যায় না—এ কথাটা তলিয়ে দেখতে হবে। সুতরাং সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি—'aesthetic pleasure' সৃষ্টি, এ কথা বল্লে—সাহিত্যের জীবন-সমালোচকের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয় না, বা 'রূপ-কল্পনা'-রূপ দেহটিকেও অস্বীকার করা হয় না। কারণ দেহ ছাড়া দেহীর প্রকাশ সম্ভব নয়।

উপসংহারে এ কথা আমরা বলতে পারি—সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এত যে বাদবিসংবাদ ঘটেছে তার কারণ—প্রথমতঃ মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যের ভেদ বুঝতে না পারা ; দ্বিতীয়তঃ মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন একটিকে 'একমাত্র' করে তোলা, তৃতীয়তঃ আনন্দকে প্রয়োজন-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব হিসাবে দেখা, চতুর্থতঃ 'জীবনের রূপ' বলতে কি বুঝায় তা' ভাল করে না বুঝতে পারা—জীবনের রূপ যে জীবন-তত্ত্বেরই রূপাশ্রয়ী প্রকাশ—নীতি-নিয়ন্ত্রিত রূপ—এই সত্যটা উপলব্ধি না করা। পঞ্চমতঃ—শিল্পের রূপ (form) ও বিষয় (content) সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা। ষষ্ঠতঃ—শিল্পকে সামাজিক ব্যক্তি মানসের সৃষ্টি—গোটা জীবনযাপনেরই অন্যতম অংশ হিসাবে না দেখা।

সমস্যাটি আসলে, 'form' এবং 'Content'-এর পারস্পরিক সম্পর্কের অস্পষ্ট ধারণা থেকেই দেখা দিয়েছে। একদলের ভুল এই যে, তাঁরা মনে করেন বিষয় (Content) না হলেও চলে অর্থাৎ প্রকাশটাই বড় কথা—প্রকাশই কবিত্ব। এরা ভুলে যান যে, প্রকাশ বিষয়েরই প্রকাশ এবং প্রকাশের সার্থকতা ততটুকুই যতটুকু সে বিষয়কে প্রকাশ করেছে। এদের কাছে প্রকাশ বিষয়নিরপেক্ষ একটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদলের ভুল এই যে তাঁরা মনে করেন—প্রকাশ না হলেও চলে—আসল এবং বড় কথা—প্রকাশের

বিষয়বস্তু। যত বস্তুর গুরুত্ব তত রচনার মূল্য। এরা ভুলে যান—সাহিত্য তত্ত্ব-সংগ্রহ বা তত্ত্বমীমাংসা নয়, সাহিত্য সত্যের তত্ত্বরূপ নয়—সাহিত্য সত্যের রসরূপ।

আর একটা কথা এবং মনে করি মনে করে রাখার মতই কথা—সাহিত্য-শিল্পে "বিষয়বস্তু" (Content) কোন সিদ্ধ বস্তু নয়, এ 'বিষয়বস্তু, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠে। এই হিসাবে বিষয়বস্তুকে অরূপ বলা যেতে পারে। শিল্পে কোন 'বিষয়' নেই আছে শুধু 'রূপ'—ক্রোচের কথাটা এই হিসাবে সত্য। কবি-কল্পিত কাহিনী কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। যেখানে পুরাণ বা ইতিহাস বা কিংবদন্তী কাহিনী সরবরাহ করে, সেখানেও কাহিনীর কাঠামো আপাততঃ এক বটে, কিন্তু তাই বলে "বিষয়বস্তু"—এক নয়। কারণ শিল্পীর আত্মসংস্কৃতির সঙ্গে মিশে কাহিনী যে 'বিশেষ রূপ' পায়—পরিস্থিতি-কল্পনায় চরিত্র-কল্পনায়, ভাবাভিব্যক্তিতে—ভাবনার ঐশ্বর্যে, প্রকাশ যে বিশিষ্টতা লাভ করে, সেই বিশেষ রূপটি, সেই বিশিষ্টতা "বিষয়বস্তুর" আসল স্বরূপ। কবি যে পরিমাণে বিষয়কে বিশিষ্ট রূপ দেন সেই পরিমাণেই বিষয় ব্যক্ত হয়—এই হিসাবে প্রকাশ—বিষয়ের অভিব্যক্তি। যত বেশী প্রকাশ তত বিষয়ের অভিব্যক্তি। মোট কথা একদৃষ্টিতে যা' প্রকাশ অন্য দৃষ্টিতে তা'ই বিষয়ের অভিব্যক্তি—'Conquest of matter by form' বিশ্বের উপর যে কবির 'হৃদয়ের অধিকার' যত গভীর সেই কবির কাব্য তত গভীর—বিষয়বস্তু তত বড। এই দিক থেকে দেখলে দেখা যায়—যাকে বলা যায় বড 'form', বড আনন্দ, তাকেই বলা যায়—বড বিষয়, আর বড বিষয় অর্থ—জীবনের গভীর রূপ—যে রূপে জীবন, তার বৈষয়িক—নৈতিক-আধ্যাত্মিক-বাসনাময় সত্তার সমগ্রতা নিয়ে ফুটে উঠে—'প্রেয় ও শ্রেয়' কামনার তীব্র দ্বন্দ্বের মাঝ দিয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রেয়োবোধ—সত্য-শিব বোধেরই নামান্তর। সুতরাং এ কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে—'সত্য-শিব' চেতনাতেই যখন শ্রেয়োবোধ প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রেয়োবোধ-নিরপেক্ষভাবে জীবনের গভীর রূপ সৃষ্টি যখন সম্ভব নয়—তখন সত্য ও শিবকে উপেক্ষা করে জীবনের গভীর রূপ—

"great art" বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অতএব সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা—

এ কথা বল্লে—সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও পরোক্ষভাবে বলা হয়—সাহিত্য জীবন সমালোচনা করবে—জীবন সত্যকে প্রকাশ করবে। এরিস্টটল এ সত্যটিকে ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন বলেই লিখতে পেরেছেন—"in contemplating it they find themselves learning and inferring" রসস্বাদন করার মাঝ দিয়েই যে শিক্ষা হয়—এই মূল কথাটা ভুলে থাকার জন্যই এত কথা কাটাকাটি হয়েছে।

শৈল্পিক সৌন্দর্য ও আনন্দ

(ক) শৈল্পিক সৌন্দর্য (Aesthetic Beauty)

শিল্পের উদ্দেশ্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করা নয়—অর্থাৎ লোকশিক্ষা দেওয়া নয়—নীতিশিক্ষা দেওয়া নয়—সমাজকে এগিয়ে নেবার বা পিছিয়ে দেবার হাতিয়ার নয়—এ কথা যাঁরা স্বীকার করেছেন তাঁরা 'প্রয়োজনবাদে'র (purpose) শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু সকলেই এক শিবিরে মিলিত হতে পারেননি। সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্যে অগ্রাধিকার কাকে দেওয়া হবে এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ উদ্দেশ্যের আসনে বসিয়েছেন—"সৌন্দর্য"কে, কেউ কেউ বসিয়েছেন আনন্দকে।

আমরা দেখেছি এবং বিসংবাদিত হলেও একথা সত্য—এরিস্টটল খুব ঘটা করে সৌন্দর্য বা আনন্দ কোনটিকেই উদ্দেশ্যের আসনে বসাতে চেষ্টা করেননি। সৌন্দর্য ও আনন্দ তাঁর কাছে,—শিল্পের বা প্রকাশের আনুসঙ্গিক তবে অব্যভিচারী ফল। সৌন্দর্য রূপের পারিপাট্য আর আনন্দ রূপের-রস—এক কথায় সমগ্র সৃষ্টির সম্ভোগ থেকে উপজাত সামাজিক চিত্তের আহ্লাদ। শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি না আনন্দ-সৃষ্টি—এভাবে কেউ এরিস্টটলের কাছে প্রশ্ন করলে এরিস্টটল নিশ্চয়ই বলতেন—শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য 'perfect form' এ পৌছানো ; 'from' যতই perfect হয় ততই তা'তে সৌন্দর্য ফুটে উঠে আর তা' 'Contemplate' করে সামাজিকদের চিত্তে তত আনন্দ জন্মে। প্রকাশসৌন্দর্য এবং আনন্দ পরস্পরনিরপেক্ষ বিষয় নয়। সৌন্দর্য ও আনন্দ প্রকাশেরই মূল্য। সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বুচার মহাশয় এ কথায় সায় দিতে পারেননি ; তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন (The end of fine Art-অধ্যায়) যে এরিস্টটলের মতে, শিল্পের উদ্দেশ্য—আনন্দ দেওয়া এবং এই মত তাঁর শিল্পদর্শনের সূত্রের সঙ্গে খাপ খায় না ; কারণ—দর্শনানুসারে কোন বস্তুর

উদ্দেশ্য বস্তুর নিজের মধ্যেই নিহিত থাকবে (The end of an object is inherent in that object) এবং তদনুসারে শিল্পের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সম্পূর্ণ বা সুন্দর রূপ (form)। তাই বুচার লিখেছেন—'According to his general theory of aesthetic as a branch of Art its end aught to be the purely objective end of realising the 'eidos' in concrete form. But in dealing with particular arts, such as poetry and music, he assumes a subjective end consisting in a certain pleasurable emotion. There is here a formal contradiction from which there appears to be no escape." (২০৯ পৃষ্ঠা)। আমার মনে হয়—এরিস্টটলের মধ্যে এমন কোন স্বতোবিরোধ নেই। অন্ততঃ 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের কোন উক্তি দিয়ে তা' প্রমাণ করা চলে না। বরং উল্‌টোটাই প্রমাণ করা যায়। প্রথমতঃ দেখা যায়—এরিস্টটল সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে যে দুটো বৃত্তিকে (instinct of imitation + instinct for harmony and rhythm) নির্দেশ করেছেন, তা'তে দেখা যায়—প্রকাশের প্রবৃত্তি এবং সেই প্রকাশকে সুন্দর করবার প্রবৃত্তি দু'য়ে মিলে শিল্পের সৃষ্টি। এখানে আনন্দ দেওয়ার কোন কথাই তিনি তোলেননি।

তারপর, প্রকাশ প্রবণতা এবং প্রকাশকে সুচারু করবার প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি, আর সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হলে শিল্পী আনন্দলাভ করে থাকেন। সুতরাং আমাদের সতর্ক করতে বুচার যে লিখেছেন—"we must be careful here not to import the later idea that the artist works merely for his own enjoyment, that the inward satisfaction which the creative act affords is for him the end of his art"—এই উক্তি সম্পর্কেও সতর্ক করবার কিছু আছে। কোনো সৃষ্টিই সর্বাংশে ব্যক্তির বা সর্বাংশে সমাজের নয়—এ কথাটা যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনি এ কথাটাও ভুলে গেলে চলবে না—এরিস্টটল সৃষ্টির প্রেরণা আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পীর নিজের প্রকাশ প্রবৃত্তির উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন, দর্শের

আনন্দ বিধান করার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তির কোন উল্লেখ করেননি। কবি এজন্য কবি ন'ন যে তিনি দশের মনে আনন্দ দেন—কবি কবি, যেহেতু তিনি প্রকাশ করেন "he is a poet because he imitates and what he imitates are actions"—সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টিরই আনুসঙ্গিক ফল। সৌন্দর্য বা আনন্দ শিল্পের উদ্দেশ্য এমন কথা পোয়েটিক্‌স গ্রন্থে কোন স্থলেই খুব সুস্পষ্টাকারে বলা হয়নি। বরং এই কথাই বলা হয়েছে—যে কবির আসল কাজ তাঁর কাব্যকে সুন্দররূপে প্রকাশ করা—রূপে সুন্দর এবং রসে প্রাণবান করে তোলা। যেমন, ট্র্যাজেডির গঠন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"incidents and plot are the end of a tragedy and the end is the chief thing of all—কবির মুখ্য কর্ম—নির্মিতি—আদর্শ বৃত্ত গঠন। এই বৃত্ত-গঠন প্রসঙ্গেই সৌন্দর্যের কথা এসেছে। এরিস্টটল দেখাতে চেয়েছেন—সজীব দেহের সৌন্দর্যই হোক বা যে কোন অংশ সংযোগে-গঠিত অংশীর সৌন্দর্যই হোক—অঙ্গ-বিন্যাসের সুষমা (an orderly arrangement of parts)—ছাড়াও একটা আয়তনও (magnitude) চাই। কারণ—"beauty depends on magnitude and order." অতিসূক্ষ্মের বা অতি বৃহতের আর যাই থাক সৌন্দর্য নেই। বৃত্তের সৌন্দর্য সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। বৃত্তে ঘটনার সু-বিন্যাস তো থাকবেই—সঙ্গে সঙ্গে থাকবে বিস্তার—যা' স্মৃতি অনায়াসেই ধারণ করতে পারবে। তারপর ভাব ও রসের বিষয়েও এরিস্টটল—রূপের সম্পূর্ণতার—"effectকে heightened" করবার কথাই বার বার বলেছেন। কি করলে রস জমবে—রস নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটবে না—সেই সব দিকেই শিল্পীকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বলেছেন। ট্র্যাজেডি যখন 'most tragic of effect' হয়, তখনই তার সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠতা। এই 'effect' সৃষ্টি করাই কবির আসল কাজ। যে রসের রচনা, ঘটনাকে সেই রসে রসান্বিত করে তুলতে হবে। কারণ রসান্বিত না হলে আনন্দ দেবে কি করে? প্রত্যেক সৃষ্টিরই বিশেষ বিশেষ রস। যেমন, ট্র্যাজেডির বিশেষ রস—"pity and fear"—ভাব থেকে জন্মে। সুতরাং ট্র্যাজেডির ঘটনায়—"this quality must be impressed."

এই effect-এর প্রসঙ্গেই এসেছে—'pleasure'-এর কথা। শিল্প সৃষ্টি যখন সামাজিক ব্যক্তির সৃষ্টি তখন সামাজিকের কাছে তার আবেদন—আদর-অনাদর অবশ্যম্ভাবী। শিল্পী অনুকরণ করেন, অনুকৃত বা শিল্পিত বস্তু দেখে সামাজিকরা আনন্দলাভ করেন। এই হিসাবে শিল্পীর সৃষ্টি আনন্দ দান করে। এই আনন্দদান 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্ত্য' ব্যাপার। যা' হোক কবিরা আনন্দ দেবেন—এইরূপ বিধিবাক্য পোয়েটিক্‌সে খুব সামান্যই আছে। 'pleasure'-কথাটার উল্লেখ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যাচ্ছে এইভাবে "The pleasure, however, thence, derived is not the true tragic pleasure" ; চতুর্দশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যাচ্ছে এইভাবে—we must not demand of Tragedy any and every kind of pleasure, but only that which is proper to it. And since the pleasure which the poet should afford is that which comes from pity and fear through imitation, it is evident that this quality must be impressed upon the incidents" এবং ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে নাটক ও মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—নাটকে মহাকাব্যের উপাদান ছাড়াও গীত ও দৃশ্য দুটো উপাদান বেশী আছে—"and these produce the most vivid of pleasures" ; নাটকের অল্পপরিসরে—vividness of impressionও বেশী এবং "Moreover the art attain its end within narrow limits : for the concentrated effect is more pleasurable than one which is spread over a long time and so diluted" প্রথমটির তাৎপর্য এই যে শিল্প থেকে আনন্দ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি থেকে—কবি আনন্দ দিয়ে থাকেন—এমন কথা পাওয়া যায়। শেষোক্তটিতে সংকীর্ণ পরিসরে উদ্দেশ্যলাভের (end) কথা আছে এবং সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে সংহত সংবেদনা জনিত আনন্দ। 'আনন্দদান করা যে শিল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য এ কথা অস্বীকার করার কোন হেতু নাই, কিন্তু এ আনন্দ-দানকেই শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে প্রচার করলে এবং ললিতকলার উদ্দেশ্য

আনন্দদান—এই সিদ্ধান্তকে এরিস্টটলের প্রধান বা একমাত্র মত হিসাবে ঘোষণা করলে—সত্যের অপলাপ করা হয়। 'পোয়েটিক্‌স' পাঠ করতে করতে এই কথাই বারবার এবং বেশী করে মনে হয় যে—এরিস্টটল রূপ ও রস সৃষ্টির "effect"-এর গণ্ডীর মধ্যেই শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্যকে বেঁধে দিয়েছেন এবং তার মতে—রূপকে নিখুঁত বা সুন্দর এবং রসকে সুনিষ্পন্ন করতে পারলেই শিল্পীর দায়িত্ব শেষ। তবে, সামাজিকের সৌন্দর্যবোধের নিকষ পাষাণে রূপের মূল্য পরীক্ষা হয় এবং আনন্দ-বোধের দ্বারা রসের মূল্য পরীক্ষা হয়, তাই সৌন্দর্য এবং আনন্দকে গৌণ উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। এরিস্টটলের কাছে সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য—সুন্দর সৃষ্টি—সৌন্দর্য-আনন্দ সৃষ্টির আবেদন-মূল্য।

যা'হোক, এ বিষয়ে, আমরা এরিস্টটলকে নির্দিষ্ট কোন শিবিরে একান্ত-ভাবে আবদ্ধ করতে পারিনে। তবে এ কথা জোর করেই বলা যেতে পারে যে এরিস্টটলের আলোচনায় শিল্পরসিকের দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্যলাভ করেছে। এরিস্টটলের দৃষ্টি প্রকৃতিস্থের দৃষ্টি।

শিল্পীর উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি না আনন্দসৃষ্টি এ প্রশ্ন অনেকবার এবং অনেকের মনেই জেগেছে। মুনিরা তাঁদের মতও জানিয়েছেন। তবে ফল —মন্তব্যের পর মন্তব্য আর মীমাংসা—অস্থির দিগন্ত রেখা। বলা বাহুল্য, কেহ বলেন—"সৌন্দর্য", কেহ বলেন "আনন্দ"। কিন্তু বলার পরেই আবার উপস্থিত—নতুন সমস্যা—সৌন্দর্য ও আনন্দের স্বরূপ নিয়ে বাদ-বিসংবাদ। 'পাত্রাধার তৈল না, তৈলাধার পাত্রের মত এখানেও এমন কথা উঠেছে— সৌন্দর্য উপলব্ধি করার ফলেই লোক আনন্দ লাভ করে, না যা আনন্দ দেয় তাকেই লোকে সুন্দর বলে থাকে। একের মতে—সৌন্দর্যবোধ মৌলিক —আনন্দের পূর্বভাবী। অন্যের মতে—আনন্দবোধ মৌলিক—সৌন্দর্যবোধ পরভাবী। এ তর্কের মীমাংসা আজও হয়নি। সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্যের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বা ধারণায় আজও পৌছানো সম্ভব হয়নি। সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তাদের মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—(১) সৌন্দর্য=essence (২)

সৌন্দর্য = সৌষম্য (relation) (৩) সৌন্দর্য = কারণ (cause) (৪) সৌন্দর্য = ফল (effect)। প্রথম মতে—যাতে সৌন্দর্য থাকে তাই সুন্দর—(প্লেটোর উক্তি—If anything is beautiful it is beautiful for no other reason than that it partakes of absolute beauty—(ফেইডো); দ্বিতীয় মতে—সৌন্দর্য হচ্ছে রূপ-সুষমা ("Significant form" ক্লাইভ বেল—"আর্ট" ১৯১৩)—বিশেষ ধরনের রম্যরূপ—কল্পনা; তৃতীয় মতে—সৌন্দর্য হচ্ছে রসাস্বাদনের কারণ (beauty is that which rouses "the aesthetic emotion") চতুর্থ মতে—সৌন্দর্য হচ্ছে—প্রতিভার সৃষ্টি। সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ঠিক না থাকায় অর্থাৎ গোড়ায় গলদ থাকায়—'সৌন্দর্য সৃষ্টি করা কবির উদ্দেশ্য এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য নিজেই গণ্ডগোল বেধেছে। কবি যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তার স্বরূপ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দুই দলের কাছ থেকে দুভাবে পাওয়া যায়। একদলকে বলা যায়—প্লেটো-অনুবর্তী অন্যদলকে—এরিস্টটল-অনুবর্তী। প্লেটো অনুবর্তীরা 'সৌন্দর্য'কে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক সত্তা (absolute) রূপে গণ্য করেন। নব্য-প্লেটোবাদী প্লটিনাসের মতো কেউ কেউ এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে ভগবানের ঐশ্বর্যের সঙ্গে এক করে দেখেছেন—সৌন্দর্য এদের কাছে—"the ineffable one shining dimly through appearence here and luring the troubled human soul over yonder"—'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্। যাতে যে পরিমাণ পরম সুন্দরের অনুভা ব্যক্ত সেই পরিমাণেই সেই বস্তু সুন্দর। যোগীরা যে সত্য-শিব-সুন্দরকে ধ্যানে জানেন কবিরাই তাঁকে 'নেশার নয়নে' দেখে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে—কবিরা পরম সুন্দরের দূত, সুন্দরের সেবক ও প্রচারক। যাঁরা এতখানি অদ্বৈত পর্যায়ে পৌছতে অনিচ্ছুক—সৌন্দর্য-সত্তা ও ভগবৎ সত্তা এক করে দেখতে চাননি, তাঁরা সৌন্দর্যকে 'idea of absolute beauty'—বলে মনে করেন। এদের কাছে যে রূপ-কল্পনায় ঐ পরা সৌন্দর্যের আদর্শ বেশী মাত্রায় অভিব্যক্ত তা বেশী সুন্দর। সৌন্দর্যের উপলব্ধি নির্ভর করে intuition-এর উপর। বেনিডেটো ক্রোচে এই মতের প্রধান পাণ্ডা। তাঁর কাছে শিল্পের উদ্দেশ্য—

expression। আর expression মানেই "beauty"। যে অনুপাতে রূপায়ণ সেই অনুপাতে সৌন্দর্য। সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে—'intuitive absoluteness of imagination'-এর উপর। সৌন্দর্যের পরা-আদর্শের মর্ম দৃষ্টি দিয়েই সৌন্দর্য বিচার করতে হবে। অন্য পথ নেই। এরিস্টটলের মতে—সৌন্দর্যের আদর্শের কোন সুন্দরবস্তু-নিরপেক্ষ 'absolute form' নেই। সৌন্দর্য মানেই সুন্দর রূপের ধর্ম এবং সেই ধর্ম:—harmony বা order symmetry definiteness (Metaphysics)। ক্রোচের "সৌন্দর্য" সম্পূর্ণ মর্মগ্রাহ্য; এরিস্টটলের 'সৌন্দর্য' অনেকটা "ধর্ম"-গ্রাহ্য।

মূল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক—শিল্পে সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্ন। লৌকিক দৃষ্টির সুন্দর-অসুন্দর এবং শৈল্পিক দৃষ্টির সুন্দর-অসুন্দর এক নয় অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টির এবং শৈল্পিক দৃষ্টিতে সুন্দর-অসুন্দর নির্ধারণের মান এক নয়—এ ধারণাটি অস্ফুটাকারে এরিস্টটলের পোয়েটিকসে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। শৈল্পিক দৃষ্টিতে সুন্দর-অসুন্দর নির্ধারণের একমাত্র মান—"প্রকাশ" (expression) লৌকিক দৃষ্টিতে যা কুৎসিত, শিল্পে সুপ্রকাশিত করতে পারলে তাই সুন্দর হয়ে উঠে—এ কথা এরিস্টটল জানতেন। তিনি লিখেছেন—"We have evidence of this in the facts of experience. Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate when produced with minute fidelity: such as the form of the most ignoble animals and dead bodies" (৪র্থ—১৫ পৃঃ) অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে যেসব বস্তু দেখে আমাদের মধ্যে জুগুপ্সা জাগে, শিল্পে সেই সব বস্তুকে—(অতি কদাকার প্রাণী—মৃতদেহ···) অতি যথাযথরূপে প্রকাশিত দেখে আমরা আনন্দিত হই।

লৌকিকে যা ঘৃণ্য, শিল্পে তাই রম্য হয়ে উঠেছে একটি মাত্র গুণে অর্থাৎ প্রকাশের গুণে—অতি যথাযথরূপে উপস্থিত হওয়ার গুণে। এরিস্টটল যেন বলতে চান—অতি যথাযথ উপস্থাপনায় অর্থাৎ প্রকাশের মধ্যেই শিল্পের

রম্যত্ব নিহিত—যত প্রকাশ তত রম্যতা। লৌকিকে কুৎসিত যত কুৎসিত হয় তত সে আমাদের ঘৃণার বস্তু হয়ে উঠে আর শিল্পে কুৎসিত যত যথাযথ কুৎসিত হয় ততই সে সুন্দর বলে সমাদৃত হয়। শিল্পে শয়তান যখন শয়তান না হয়ে ভগবান হয়ে দাঁড়ায় তখনই সে কুৎসিত হয় আর যত সে শয়তান হয়ে উঠে—শয়তানিতে সিদ্ধপুরুষ হয়, ততই সে সুন্দর শয়তান হয়। লৌকিক জগতে শয়তানের সঙ্গে আমরা যখন আচরণ করি তখন ন্যায়-অন্যায় বোধই আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, আর শিল্পের জগতে —সাধু-শয়তানের এক মাপকাঠি—কতখানি সে চরিত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে সেইটেই একমাত্র বিচার্য। শিল্পে রামও সুন্দর রাবণও সুন্দর—রাম রাম হিসাবে সুন্দর, রাবণ রাবণ হিসাবে সুন্দর।

এখানেই জটিল একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে—কলাকৈবল্যবাদীরা এগিয়ে এসে বলেন—শিল্পে প্রকাশই একমাত্র কথা, যা' প্রকাশিত তা'ই সুন্দর। সত্যের বা শিবের সঙ্গে সুন্দরের কোন বাধ্যবাধকতা বা মুখাপেক্ষিতা নেই। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, শ্লীল-অশ্লীল—শৈল্পিক সৌন্দর্য-বিচারে অনাবশ্যক। কবির সৃষ্টি সমাজের যত অমঙ্গলই করুক, আর যত মিথ্যার ভিত্তির উপর তা' গড়ে উঠুক, প্রকাশ হিসাবে তা' যদি সুন্দর হয় তা'হলেই তা' সার্থক। মোটকথা প্রকাশই কবিত্ব এবং প্রকাশেই সৌন্দর্য। এই যুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করলে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে শিল্পের সৌন্দর্যে সত্য-শিবের কোন অংশ নেই—'সৌন্দর্য' সত্য-শিব-নিরপেক্ষ প্রকাশ-মহিমা—প্রকাশেই শিল্পের চরম সার্থকতা। সাহিত্যে যে সমস্ত চিত্তাকর্ষক শয়তান-চরিত্র রয়েছে তারা লৌকিক হিসাবে অসুন্দর হলেও শৈল্পিক দৃষ্টিতে অবশ্যই সুন্দর। সুন্দর সাধু-চরিত্র সৃষ্টিতে কবির যত কবিখ্যাতি, সুন্দর শয়তান-চরিত্র সৃষ্টিতেও কবির তত কবিত্বশক্তি। মোটকথা, কাব্যের মহত্ত্ব তার মহৎ বিষয়সাপেক্ষ নয়—মহৎ উদ্দেশ্য সাপেক্ষ নয়। কাব্যের মহত্ত্ব—প্রকাশ মহিমায়।

কলাকৈবল্যবাদীর উক্ত যুক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই খাঁটি বলে মনে হয়। —মনে হয়, সত্যই ত' ; যখন 'প্রকাশই কবিত্ব' তখন কবিত্বের ছোটত্ব বড়ত্ব

যাচাই করতে 'প্রকাশের পরিস্ফুটতা' ছাড়া আর কিছুই হিসাব করবার প্রয়োজন নেই। শিল্পী ছোট বা বড়—এ বিচারে ব্যক্ত বিষয়ের গভীরতা ও গাম্ভীর্যের প্রশ্ন টেনে আনা অবাস্তব; যা 'good art' তা'ই "great art"। শিল্পে good এবং great-এর অর্থে কোন পার্থক্য নেই। 'রামায়ণে'র মত 'রাবণায়ণ'ও সার্থক মহাকাব্য হতে পারে। ধর্মের ক্ষয় অধর্মের জয় সুন্দর রূপে প্রকাশ করতে পারলে সার্থক সৃষ্টি হওয়ার কোন বাধা নেই। মূর্তিমান শয়তানকে নায়ক করেও—সমস্ত মানব-মহিমাকে খর্ব করেও সুন্দর কাব্য রচনা করা যেতে পারে। কারণ প্রকাশই কবিত্ব এবং প্রকাশই সৌন্দর্য। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাক—কবির কাজ প্রকাশ করা কবি সু-কু উভয়কেই প্রকাশ করতে পারেন। পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা সব কিছুই কবির প্রকাশ-প্রতিভার স্পর্শে সুন্দর মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারে। কোন কবি যদি তাঁর কাব্যে মানুষের বীভৎস রূপ নিখুঁতভাবে আঁকেন—মানব সভ্যতার মহামূল্য নীতিকে হেয় বা উপেক্ষা করে, পাপকে তার সমস্ত কদর্যতা দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন—তা হ'লেও সেই কবিকে আমরা বড় কবি বলতে—সুন্দরের স্রষ্টা বলতে বাধ্য।

উল্লিখিত যুক্তি-পরম্পরা আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য বলেই মনে হয় ঘটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে—ভিতরে গলদ আছে। যা' হেতু বলে মনে হয় তা' হেত্বাভাস মাত্র। প্রথম গলদ এই যে প্রকাশ্য ও প্রকাশকে এরা দুটো স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব বা বিষয় বলে মনে করেন। মনে করেন প্রকাশ যেন বিষয়-নিরপেক্ষ একটা ব্যাপার—প্রকাশ যেন বিষয়ের প্রকাশ নয় প্রকাশের মহিমা যেন বিষয়কে অধিক পরিমাণে রূপ-রসে ব্যক্ত করার কৃতিত্ব নয়—বিষয় মহৎ না হলেও যেন মহৎ প্রকাশ সম্ভব।

প্রকাশের মহিমা যে বিষয়বস্তুকে অধিক পরিমাণে ব্যক্ত করারই মহিমা এ কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে যে আজ পর্যন্ত মহৎ প্রকাশ বলে যে সমস্ত রচনা স্বীকৃত হয়েছে তা'তে বিষয়ের মহত্ত্বকে প্রকাশ করেই প্রকাশ আপন মহিমা লাভ করেছে। লঘু বিষয় নিয়ে কমেডি সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু ট্র্যাজেডি সৃষ্টির

জন্য 'serious action' আবশ্যক হয়েছে। কমেডি তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—perfect form-এ পৌঁছতে পারে—সুন্দর হতে পারে। কিন্তু কমেডি কমেডি, ট্র্যাজেডি ট্র্যাজেডি এবং তা' হয় এই কারণেই যে একের উপস্থাপ্য জীবনের লঘু রূপ—অন্যের উপস্থাপ্য জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন জীবনের ব্যর্থ ও শোচনীয় সংগ্রামের রূপ। প্রথমটির সঙ্গে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নেই বটে কিন্তু দ্বিতীয়টির সঙ্গে নীতিবোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বিষয়বস্তু এবং তদনুগত রসই যে কমেডি-ট্র্যাজেডি ভেদের নিয়ামক—এ কথা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। বিষয় এবং বিষয়ানুকূল রস—এই দুইটির অভিব্যক্তিতেই প্রকাশের বা রূপের সার্থকতা। এ ছাড়া প্রকাশের স্বতন্ত্র কোন 'স্বমহিমা' নেই। কমেডিকে যিনি 'perfect form'-এ পরিণত করেন তিনি সুন্দর কমেডি-লেখক বটে—good artist নিঃসন্দেহ, কিন্তু যিনি ট্র্যাজেডিকে 'perfect form'-এ পরিণত করেন—মানব জীবনের গভীর রহস্য আকুতিকে—প্রকাশ করেন—তীব্রতম দ্বন্দ্বের সম্মুখে জীবনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার দেহ-মন আত্মার সমস্ত প্রতিক্রিয়া রূপ দেন—তিনি একাধারে good and great artist। দু'জনেরই সৃষ্টি সুন্দর সুতরাং দু'জনেই শিল্পী হিসাবে সমান এ কথা বলা যায় না—অন্তত' এ কথা বলা হয় না। কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম পাণ্ডা ওয়াল্টার পেটার পর্যন্ত স্বীকার করেছেন—the distinction between great art and good art depends immediately, as regards literature at all events, not on its form, but on the matter'—"Appreciations with an essay on style"—1889.

কলাকৈবল্যবাদী-পক্ষ থেকে এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে—বেশ ত'; ধরে নেওয়া গেল—প্রকাশ বিষয়েরই প্রকাশ; বিষয়ের গুরুত্বে প্রকাশ গুরুত্বলাভ করে, লঘুত্বে লঘুতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্যের খণ্ডন হল কোথায়? প্রকাশেই সৌন্দর্য—এ কথা সত্য হলে সুপ্রকাশমাত্রই সুন্দর হবে—তা'তে 'সু'ই প্রকাশিত হোক বা 'কু'ই প্রকাশিত হো'ক। রামকে নায়ক না করেও রাবণকে নায়ক করে 'সুন্দর কাব্য' সৃষ্টি

করা যেতে পারে—মোট কথা কাব্যের সৌন্দর্য কোন নীতি-মহত্ত্বের অপেক্ষা করে না—নৈতিক মূল্য—মানসিক মূল্য প্রভৃতি উপযোগিক মূল্য বাদ দিয়েও কাব্য সুন্দর হতে পারে। সুতরাং 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' একথা ঠিক নয়। সৃষ্টিকে 'সিরিয়াস' হতে হলেই তাকে নৈতিক সমস্যা—আধ্যাত্মিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এমন কি কথা? সিদ্ধ শয়তানকে নায়ক করে, তার শয়তানির পর শয়তানির দক্ষতা দেখিয়ে সুখকর পরিণতি ঘটালে কেন সুন্দর ও বড়ো সৃষ্টি হবে না?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হলে প্রথমেই 'সৌন্দর্য' (Clive Bell-এর ভাষায় "Significant form") কথাটার তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিতে হবে। 'সুন্দর' কথাটির প্রথম প্রয়োগস্থল চাক্ষুস প্রত্যয় বা রূপের ক্ষেত্রে বটে, কিন্তু ক্রমে অর্থব্যাপ্তির ফলে (প্রত্যক্ষ শব্দটির মত) অন্যান্য প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ব্যাপ্ত হয়েছে—শুধু রূপ-প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি যেমন :—সুন্দর ছবি, সুন্দর গান, সুন্দর ব্যক্তিত্ব, সুন্দর চরিত্র, সুন্দর ভাব, সুন্দর গঠন, সুন্দর রসসৃষ্টি; প্রত্যেক স্থলেই বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। সুন্দর গোলাপ বলতে যে সৌন্দর্যবোধ আর সুন্দর ব্যক্তিত্ব বা সুন্দর ভাব বলতে যে সৌন্দর্যবোধ—এই দুই বোধ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে—প্রথম সৌন্দর্য-বোধ যে পরিমাণ নির্বিকল্পক, দ্বিতীয় সৌন্দর্যবোধ সেই পরিমাণে নির্বি-কল্পক নয়—সবিকল্পক। প্রথমটির সঙ্গে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নেই বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সঙ্গে নীতিবোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সুন্দর ব্যক্তিত্বের 'ধারণা'র (Idea) মধ্যে 'দৈহিক-মানসিক-নৈতিক' গুণের ধারণা সমষ্টিগতভাবে নিহিত আছে। আসল কথা 'সুন্দর' কথাটা যে পর্যন্ত 'রূপ' সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় সে পর্যন্ত অঙ্গবিন্যাসাদির দৈহিক সুষমা ও চিত্তাকর্ষকতা বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যেখানে অরূপ ভাব বা যৌগিক জীবনবৃত্তরূপ কোন পদার্থ সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়, সেখানে মানসিক—বিশেষতঃ নৈতিক—সুষমা বোঝাতেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

কোন সৃষ্টির সৌন্দর্যকে মোটামুটিভাবে আমরা তিনভাগে ভাগ করে দেখতে পারি—(১) রূপের সৌন্দর্য অর্থাৎ গঠন পরিপাট্য (২) রসের সৌন্দর্য (৩) যে ভাবকে বা জীবন-সত্যকে প্রকাশ করা হয় সেই ভাবের বা জীবন সত্যের সৌন্দর্য। প্রকাশেই সৌন্দর্য—এই মূল সূত্রকে সামনে রেখেই বলা যাক্—রূপের সৌন্দর্য—সুগঠিত বৃত্তের গঠন-সুষমাজনিত চমৎকারিত্ব; রসের সৌন্দর্য—খুব ব্যাপক অর্থে সবকিছুরই সৌন্দর্য, তবে সংকীর্ণ অর্থে—অনুভাবাদির অভিব্যক্তি জনিত সৌন্দর্য। আর ভাবের বা জীবন-সত্যের সৌন্দর্য—প্রকাশিত জীবনের তথা জীবন-সমালোচনার দ্বারা মানুষের জীবন-বোধে অধিক মাত্রায় সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা দান করা। এই জীবন-বোধ যেখানে যত খণ্ডিত সেখানে রসনিষ্পত্তিও তত ব্যাহত। সুতরাং জীবনকে যা তা ভাবে রূপ দিলে গঠন-পারিপাট্যের কোন হানি না হতে পারে, খণ্ড রসও হয়ত নিষ্পন্ন হতে পারে, কিন্তু জীবন-বোধের প্রতিবাদের ফলে রসের সাবলীল গতি অবশ্যই ব্যাহত হবে। দৃষ্টান্তে ফিরে যাওয়া যাক—রামায়ণে রাবণ পরিস্ফুট চরিত্র হিসাবে, প্রতিনায়ক হিসাবে, সুন্দর—এ বিষয়ে কোন্ সন্দেহ নেই, কিন্তু রামায়ণে রাবণকে জয়ী করলে রামায়ণ সুন্দর কাব্য হতে পারতো না এই কারণে যে মানুষের অন্তরতম নৈতিক বোধ—জীবনবোধের সঙ্গে যা' ওতপ্রোতভাবে জড়িত—সেই বোধ—আহত হতো তথা রসচর্বণাও ব্যাহত হতো—অর্থাৎ রামায়ণ প্রকাশের দিক দিয়েই সুন্দর হতে পারতো না। প্রকাশকে সুন্দর হতে হলে অবশ্যই আনন্দদায়কও হতে হবে। কারণ—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাক—'যা' আনন্দ দেয় তাই সুন্দর'। যেহেতু আনন্দের সঙ্গে বাসনা-কামনার নিবিড় যোগ সেইহেতু কোন গভীর বাসনাকে ব্যাহত করে আনন্দ সৃষ্টির চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। আনন্দ যেখানে ব্যাহত, রসনিষ্পত্তি বা সৌন্দর্য সেখানে ক্ষুণ্ণ হ'বেই হবে।

এই কারণেই—ট্র্যাজেডিতে আজও পর্যন্ত অতিদর্পী বা অতিচারী ব্যক্তির শোচনীয় পরিণাম দেখানো হয়ে থাকে এবং যে জাতীয় ট্র্যাজেডিই হোক—(doing something terrible বা suffering something terrible) নৈতিক জগতের তথা মানবিকতার প্রতিষ্ঠাই সকলের কাম্য। ম্যাকবেথ

নৈতিক জগতকে আঘাত করে শোচনীয়ভাবে আহত হয়—প্রথমে মরমে মরে, শেষে প্রাণে মরে—তথা নৈতিক জগতকেই প্রতিষ্ঠিত করে যায়। হ্যামলেট নৈতিক জগতকে বাঁচাতে গিয়ে—পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, অকালে ঝরে যায়—মরার ভেতর দিয়ে নৈতিক জগতকেই বাঁচিয়ে যায়। ম্যাকবেথ সুন্দর প্রকাশ হয়েছে এই কারণেই যে ম্যাকবেথের মধ্যে গভীর জীবন-সত্যকে ব্যক্ত করা হয়েছে। ম্যাকবেথের প্রকাশ বলতে শুধু তার শৌর্য বীর্যের প্রকাশ নয়, শুধু তার উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রকাশ নয়—ম্যাকবেথের প্রকাশ তখনই সুন্দর হয়েছে যখন দেহ-মন-আত্মার অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা নিয়ে, মানবিক মাহাত্ম্য নিয়ে ম্যাকবেথ প্রকাশিত হয়েছে। আসল কথা, প্রকাশ যত গভীর সত্যবোধ বা নীতিবোধকে তৃপ্ত করে ততই প্রকাশ সুন্দর হয়। কান্টের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে "For only when sensibility is brought into harmony with moral feeling can genuine taste assume a definite unchangeable form." রবীন্দ্রনাথও 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে সমর্থক একটি মন্তব্য করেছেন :—"সৌন্দর্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে একদিকে সুন্দর ও আর এক দিকে অসুন্দর এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দিষ্ট। তারপরে বুদ্ধি যখন সৌন্দর্যবোধের সহায় হয় তখন সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে···তখন যে জিনিস আমাদের মনকে টানে সেটা হয়তো চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য দেখিয়া যেখানে আমরা আনন্দ পাই সেখানে আমরা চোখ-ভুলানো সৌন্দর্যের দাসখত তেমন করিয়া আর মানিনা। তারপর কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরো বাড়িয়া যায়···"। আসল কথা এই যে সত্যবোধ বা নীতিবোধ সৌন্দর্যবোধের অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকে বলেই নীতিবোধকে আঘাত দিয়ে (সংকীর্ণ বা প্রাদেশিক নীতিবোধ নয়) বড়

সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না। এই কারণেই, মানবজীবনের বাস্তব রূপকে উপাদান করে যাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা কখনো নীতিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বরং নীতির পায়েই মাথা নত করেছেন। দুর্নীতিকে শিল্পীরা সুন্দররূপে প্রকাশ করেন,—শুধু সুনীতির প্রতিষ্ঠাকে উজ্জ্বলতর করার জন্যই। ভাড়ুদত্ত, ইয়াগো, রাবণ খণ্ডরূপ হিসাবে সুন্দর, কিন্তু কাব্যের অখণ্ড রূপের সৌন্দর্য যেখানে বিচার্য, যেখানে জীবন-সত্যের পূর্ণ বৃত্তটির সৌন্দর্য বিচার্য, সেখানে 'সুন্দর জীবন'-বোধ সৌন্দর্য-বিচারে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করে। তাই প্রত্যেক যুগেই এই মহাসূত্র সত্য থাকবে—রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন রাবণাদিবৎ।

শৈল্পিক আনন্দ = (aesthetic pleasure)

শিল্পে সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করা—এই সিদ্ধান্তকেই যেন আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু 'সৌন্দর্য' কথাটা যে কত গোলমেলে কথা আগেই একটু আলোচনা করে তা দেখানো হয়েছে। দেখা যায় যাঁরাই সৌন্দর্যের তাৎপর্য ধরবার জন্য একাগ্র হয়েছেন, তাঁরাই আলেয়ার পিছনে ছুটে হয়রান হয়ে পড়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যের অনেক ভক্ত ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন :—মানে সৌন্দর্যকে স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে রাজি হননি। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এমনি একজন ধর্মান্তরিত ভক্ত। "সাহিত্যের পথে"-র ভূমিকায় যা লিখেছেন তাতেই স্পষ্টভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত ধরা পড়েছে—লিখেছেন :—"এতদিন নিশ্চিন্ত স্থির করে রেখেছিলাম সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না। তখন মনে এল এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই

সোজা করে বলা দরকার। বললুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুতঃ বলা চাই যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে·· ”। “সাহিত্যের স্বরূপ”—গ্রন্থেও লিখেছেন—“গোড়াতেই গোলমাল ঠেকায় সুন্দর কথাটা নিয়ে। সুন্দরের বোধকেই বোধগম্য করা কাব্যের উদ্দেশ্য একথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয় তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোঁকা লাগায়, ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে।” এখানে অবশ্য ভেবে স্থির করেছেন—সত্যই সৌন্দর্য। যা হোক আনন্দই সৌন্দর্য হোক, আর সত্যই সৌন্দর্য হোক—কথাটা দাঁড়াচ্ছে, এই যে সৌন্দর্যের স্বতন্ত্র মহিমা থাকছে না; সৌন্দর্যবোধ সত্য ও আনন্দ-বোধেরই সহভাবী একটা উপবোধে পরিণত হচ্ছে। সাহিত্যে সত্য-শিব-সুন্দর সকলেরই সদ্গতি—রসে বা আনন্দে। সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য, এই দিক থেকে বলা চলে—আনন্দ-সৃষ্টি। এই আনন্দের নামই রস বা শৈল্পিক আনন্দ (aesthetic pleasure)।

এই আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্য করতে গিয়ে অনেক জল ঘোলা করা হয়েছে। উদ্দেশ্যের ঘরে আনন্দ শব্দটাকে বসাতে অনেকেই—বিশেষতঃ প্রকাশবাদীরা (expressionist) রাজি হননি। ‘hedonism’—আখ্যা দিয়ে মতবাদটিকে এঁরা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু যত চেষ্টাই করুন—সৌন্দর্যকে “successful expression” বলুন আর যাই বলুন, আনন্দ-মূল্য থেকে কোন সৌন্দর্যকেই মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। “Aesthetic pleasure” —স্বীকার করতে হয়েছে—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে “Aesthetic pleasure is sometimes reinforced or rather complicated by pleasures arising from extraneous facts···(Theory of Aesthetic)—Croce.

যা' হোক সাহিত্য-শিল্প আস্বাদন করে আনন্দ হয়, এ কথা সকলেরই জানা, কিন্তু কেন আনন্দ হয়?—এই প্রশ্নের মীমাংসা খুব সহজ নয়। সাধারণ লোক আনন্দকে আনন্দ বলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু পণ্ডিতরা ‘কি-কেন-কি-ভাবে’ না জেনে তৃপ্ত হতে পারেন না। কেঁচো খুড়তে অনেক সময়েই তাঁরা সাপ বের করে

ছাড়েন। হাসি-কান্নার মত এত সহজ ব্যাপার নিয়েও পণ্ডিতরা যখন গ্রন্থের পর গ্রন্থ লেখেন তখন অপণ্ডিতরা হেসেই মরে। তবে আসলে মরে না এই কারণেই যে ঐ সব গ্রন্থের সাথে মরা-বাঁচার কোন কার্যকারণ যোগ নেই। প্রহসন দেখতে দেখতে অতিবড় স্থূলবুদ্ধিও হেসে লুটোপুটি খায়, কিন্তু কেউ যদি তাকে তখনই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করে—এবং হাসির কারণ ব্যাখ্যা করতে বলে—সে তখন বোধ হয় ঐ জিজ্ঞাসা শুনেই হাসতে হাসতে আবার লুটোপুটি খায়। আমোদে হাসবে না—এমন বোকা যে সে নয়, বারবার হেসেই সে কথা সে প্রমাণ করে। এখানেই প্রশ্ন তোলা যাক—লোকটা প্রহসন দেখে যে আনন্দলাভ করেছে, সে কি ঐ আমোদজনক আনন্দদায়ক ঘটনা দেখার আনন্দ না অন্য কিছু? যদি বলা যায় হ্যাঁ, আনন্দদায়ক ঘটনা আনন্দের সৃষ্টি করেছে—তাই আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে—কমেডিতে না-হয় আনন্দদায়ক ঘটনার উপস্থাপনা হয় বলে আনন্দের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে তো দুঃখজনক ঘটনার উপস্থাপনা হয় এবং তা' দেখে দুঃখও জাগে কিন্তু তাই বলে ট্র্যাজেডি দেখে দুঃখের সৃষ্টি হয় তা বলা যায় না। কমেডি এবং ট্র্যাজেডি উভয়েই আনন্দ দান করে থাকে। .পরিণতি সুখাবহই হোক আর দুঃখাবহই হোক—উভয়েরই পরম সার্থকতা আনন্দদানে। তাহলে এ সিদ্ধান্তে পৌছতে হচ্ছে যে—'শৈল্পিক আনন্দ' ঘটনার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত নয় (ঘটনা হাসির বা কান্নার যাই হোক না কেন) আনন্দের কারণ রয়েছে অন্যত্র। কোথায় সেইটিই আলোচ্য। কমেডি আনন্দ দেয়—এ নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন জাগেনি—জাগেনি এই কারণেই যে কারণ অর্থাৎ ঘটনা এবং কার্য অর্থাৎ আনন্দ—এই দুয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কমেডির ঘটনাগুলি আনন্দদায়ক ঘটনা বলে—শৈল্পিক আনন্দকে আনন্দদায়ক ঘটনাজনিত বলেই মনে হয়। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে কারণ ও কার্যের বৈপরীত্য অতি সুস্পষ্ট। দুঃখদায়ক ঘটনা-রূপ কারণ থেকে আনন্দ-রূপ কার্য সংঘটিত হয়। সুতরাং ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় কেন বা কিভাবে, এ প্রশ্ন না উঠে পারেনি। কেন যে মানুষ কাঁদতে চায়, কেঁদে আনন্দ পায়—এমন কি কাঁদার জন্য পয়সা খরচ করে টিকিট কেনে এবং কাঁদতে পেরে খুসী হয়—অনেকের কাছেই এ এক সমস্যা

হয়ে রয়েছে। অবশ্য সমস্যা মানেই সমাধানরাশি—যত মুনি তত মত। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মুনিদের মত উদ্ধার করবার আগে মনীষী এরিস্টটল এ সম্বন্ধে কি বলতে চেয়েছেন ভাল করে আলোচনা করা যাক্।

এরিস্টটলের মতে—কাব্যের অন্যতম প্রেরণা—অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং কাব্য যে আনন্দ সৃষ্টি করে তার কারণ—প্রধান কারণ—"no less universal is the pleasure felt in things imitated"। তবে আনন্দের কারণ শুধু এই একটিই নয়। এরিস্টটল তিনটি কারণের কথা বলেছেন। এক—অনুকৃত বস্তু দেখার আনন্দ (২) জ্ঞানের আনন্দ (to learn gives the loveliest pleasure) (৩) যেখানে জ্ঞাত বিষয়ের অনুকরণ থেকে আনন্দ না হয় সেখানে—"The pleasure will be due not to the imitation as such but to the execution, the colouring or some such other cause" অর্থাৎ আনন্দ জন্মে গঠননৈপুণ্য, বর্ণযোজনা অথবা অনুরূপ অন্য কোন কারণের ফলে। [এরই নাম বিশুদ্ধ শৈল্পিক আনন্দ]

উল্লিখিত তিনটি উক্তির মধ্যে, এরিস্টটলের শৈল্পিক আনন্দের সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে এবং সে ধারণা এই যে, যেহেতু শিল্প-অনুকরণ, শৈল্পিক আনন্দ সাধারণতঃ অনুকরণ নৈপুণ্যের অর্থাৎ সৃষ্টি-চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করার আনন্দ। তবে এই আনন্দ সরল আনন্দ নয়—যৌগিক। এর সঙ্গে জ্ঞানের আনন্দ—জীবন অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ জনিত আনন্দও মিশে থাকে। শৈল্পিক আনন্দ সামান্যতঃ অনুকরণজনিত আনন্দ বটে, কিন্তু অনুকরণের বিষয় ভেদে আনন্দের প্রকৃতিতে পার্থক্য জন্মে। কমেডির আনন্দ এবং ট্র্যাজেডির আনন্দ সামান্য ধর্মে এক—অর্থাৎ অনুকরণ বা সৃষ্টি নৈপুণ্য-জনিত আনন্দ ; যত রূপ-রসের সার্থক অনুকরণ তত আনন্দ। কিন্তু কমেডির অনুকরণীয় বিষয়—হাস্যোদ্দীপক ঘটনা, আর ট্র্যাজেডির বিষয়—"incidents arousing pity and fear"। সুতরাং কমেডির আনন্দের প্রকৃতি, হাস্যকর (ludicrous) বিষয় দ্বারা এবং ট্র্যাজেডির আনন্দের প্রকতি, ভয়ানক ও করুণ বিষয় দ্বারা

নিরূপিত হয়। হাস্যকর বিষয়ের—'জীবনের উপরিতলের ফেণপুঞ্জের' গুরুত্ব এবং ভয়ানককরুণ বিষয়ের—জীবনের গভীর ও তীব্র আলোড়নের গুরুত্ব এক নয় এবং এক নয় বলেই কমেডির গুরুত্ব এবং ট্র্যাজেডির গুরুত্বও এক নয়। এরিস্টটলই বোধহয় এই বিষয়ে, প্রথম এবং বিশেষভাবে সচেতন হন। বিষয় এবং রস আনন্দের প্রকৃতি গঠনে অংশ গ্রহণ করে, এ কথা এরিস্টটলেরই ধারণায় প্রথম স্থান পেয়েছে। ট্র্যাজেডির আনন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন —"We must not demand of Tragedy any and every kind of pleasure, but only that which is proper to it. And since the pleasure which the poet should afford is that which comes from pity and fear through imitation, it is evident, that this quality must be impressed upon the incidents" এখানকার আসল কথাটা রয়েছে—the pleasure····· which comes from pity and fear through imitation···"র মধ্যে এবং সে কথাটা এই যে ট্র্যাজেডির আনন্দ মুখ্যতঃ—করুণ এবং ভয়ানক ঘটনার অনুকরণ দেখার আনন্দ। এ আনন্দ করুণকে ও ভয়ানককে অনুকরণ-মাধ্যমে উপলব্ধি করার আনন্দ—আমাদের সংস্কৃত রসশাস্ত্রের পরিভাষায় বললে—ভয়ানক রস ও করুণ রস 'আস্বাদন' করার আনন্দ। সৃষ্টি হিসাবে—প্রকাশ হিসাবে খুব বড় শিল্প বা প্রকাশ হয়েছে—এই বোধ থেকে—শুধু এই বোধ থেকেই যে আনন্দ জন্মে সেই আনন্দকেই বলা চলে শৈল্পিক আনন্দ। মনে রাখা দরকার—এরিস্টটল উল্লিখিত মন্তব্যের বাইরে একটি কথাও বলেননি এবং শৈল্পিক আনন্দ সম্বন্ধে ধারনা খুব—পরিচ্ছন্ন থাকায়, ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় কেন—এ প্রশ্ন তাঁর কাছে কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি।

আমাদের রসবাদীদের কাছেও 'করুণ কেন আনন্দ দেয়'—এ প্রশ্ন কোন সমস্যা হয়ে উঠেনি। কারণ বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী সংযোগে রসনিষ্পত্তি —এ লক্ষণ সব রসের পক্ষেই প্রযোজ্য। খুব সহজভাবে বললে এইভাবে বলা যেতে পারে কবির কাজ বিভাবাদির সংযোগ সৃষ্টি করা—যার নাম কাব্যরচনা করা। সামাজিকরা সেই সংযোগ উপলব্ধি করেন—কাব্য সম্ভোগ

করেন—সৃষ্টির চমৎকারিত্ব অর্থাৎ রস আস্বাদন করেন। কাব্য অলৌকিক সৃষ্টি। এই সৃষ্টি সম্ভোগের জন্যই প্রবণান্বিত। যে অনুপাতে সৃষ্টি সফল হয় সেই অনুপাতে সাফল্য-বোধ তথা আনন্দ উদ্রিক্ত হয়। বিশ্বনাথ, কবিরাজ এ সম্পর্কে প্রশংসনীয় আলোচনা করেছেন, লিখেছেন—

অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ।

অলৌকিকত্বের মধ্যেই—ব্যাখ্যার চাবিকাঠি রয়েছে। লৌকিক ঘটনা কাব্যে যখন রূপায়িত হয় তখন "অলৌকিক" শিল্পমূর্তি পরিগ্রহ করে—অর্থাৎ কবি-কৃতি রূপে উপস্থিত হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে—ঘটনা লৌকিক দৃষ্টির এলেকা থেকে মুক্ত হয়ে শৈল্পিক দৃষ্টির এলাকায় প্রবেশ করে। ফলে লৌকিক দৃষ্টির সঙ্গে যে সব বাসনা-কামনা জড়িয়ে থাকে সে সব বাসনা আর কাজ করতে পারে না, শৈল্পিক দৃষ্টির মাঝ দিয়ে যে বাসনা প্রকাশ পায়, সেই রূপ-রস সম্ভোগের বাসনাটুকুই মাত্র কাজ করে এবং সেই বাসনা চরিতার্থ করে ঘটনাটি (অলৌকিক) আমাদের কাছে আনন্দদায়ক হয়। বিশ্বনাথের কাছেও—শৈল্পিক আনন্দ—সৃষ্টি-চমৎকারিত্বের উপলব্ধি জনিত আনন্দ।

কিন্তু পণ্ডিতেরা তো এত সহজে ছাড়বার পাত্র ন'ন। আপাত দেখেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। অনুকৃত বস্তু দেখে আনন্দ হয় এরিস্টটল মতে, এ সার্বজনীন সত্য। কিন্তু ঐটুকু বলেই এরিস্টটল সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আনন্দের উৎস সন্ধানে এগিয়ে গিয়ে আত্মার মৌলিক কোন বৃত্তিকে খুঁজে বের করেছেন—দেখিয়েছেন—জানার আনন্দও পণ্ডিত মূর্খে সমান। শিল্পের আনন্দ বাহ্যতঃ শিল্প-সুন্দর প্রকাশের আনন্দ বটে কিন্তু—জ্ঞানের আনন্দও তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে। এরিস্টটলের পরে শৈল্পিক আনন্দের উৎস সন্ধানে যাঁরা বেরিয়েছেন তাঁরা শিল্প-সম্ভোগের বাসনা-লোক ছাড়িয়ে আত্মার আরো নিগূঢ় বাসনালোকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন এবং সহজ মীমাংসা-ক্ষেত্রকে দার্শনিক কচকচির কুরুক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। প্রতিনিধি

স্থানীয় কয়েকজনের মতবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করলেই দেখা যাবে—ট্র্যাজেডি কেন আনন্দ দেয়—এই প্রশ্নটির উত্তর কত ভাবে কে দিয়েছেন।

আরম্ভ করা যাক একটা অদ্ভুত মতবাদ দিয়ে। মতবাদটিকে ইংরাজীতে বলা হয়েছে—'Malevolence Theory,'—বাংলায় আমরা বলতে পারি জিঘাংসাবাদ। এই মতবাদে মানুষকে মূলতঃ হিংস্র জীব হিসাবেই দেখা হয়েছে। বলা হ'য়েছে :—মানুষের রক্তে হিংসার জীবাণু কিলবিল করছে; ফলে, কেবল শত্রুর দুর্গতি দেখেই যে মানুষ আনন্দ পায় তা নয়; যে লোক কোনদিন কোনো ক্ষতি করেনি এমন লোকের দুর্গতি দেখেও মানুষ আনন্দিত হয়। Emile Faguet—এই মতের বড় একজন পাণ্ডা। ইনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন—প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে একটা আদিম বর্বর বাস করছে। হিংসা এর সহজ ধর্ম। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হিংসার অধীন মানুষ হবেই। ট্র্যাজেডি এই গোপন জিঘাংসা-বাসনাকে তৃপ্ত করে তথা আনন্দ দেয়।

(খ) এই মতেরই সগোত্র—'প্রতিশোধ'বাদ। এই মতের বক্তব্য এই যে মানুষের মনের অবচেতন স্তরে অপ্রশমিত ক্ষতি-বোধ জমা আছে (subconscious sense of unredressed injury)। এই ক্ষতিবোধ থেকে প্রতিশোধ—স্পৃহা জাগে। ট্র্যাজেডিতে মানুষের শোচনীয় পরিণতি রূপ পায়। বলীর বল, দর্পীর দর্প, জ্ঞানীর জ্ঞান, মানীর মান সব কিছু চূর্ণ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য উপস্থাপিত হয়। তা দেখে প্রতিশোধ-স্পৃহা চারিতার্থ হয়। ট্র্যাজেডির আনন্দ প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দ। কোথায় শৈল্পিক আনন্দ আর কোথায় জিঘাংসা! মনস্তত্ত্ববিদ্ হয়ত বলবেন—'হয় হয় জান্‌তি পার না।'

(গ) মনস্তত্ত্বের এই ধরনের গবেষণার সঙ্গে অনেকেই মত মেলাতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে মনস্তাত্ত্বিক সমাধানের চেষ্টা বন্ধ হয়ে গেছে তা' নয়। একদল বলতে চেয়েছেন—(Abbe Dubois প্রমুখ)—"any spectacle however painful and disagreeable, is better than insipidity of langour, any cure for our listlessnes a

boon" (Dixon—Hume on Tragedy পরিচ্ছেদ)। এঁদের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে সুন্দর ভাষা পেয়েছে। তিনি লিখেছেন—"এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্বেলিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয়—মনে উত্তর এল, চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড়া থাকে না, তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি এইটে খুব করে যাতে উপলব্ধি করায় তা'তেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারিদিকে এমন-কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্বোধিত করে রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ। দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপ্‌সা হতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্‌। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল ও বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি!" ('সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা) রবীন্দ্রনাথের মতে ট্র্যাজেডির আনন্দ—আশঙ্কা-মুক্ত ভয় দুঃখ-বিপদের অভিঘাত জনিত তীব্র উত্তেজনার তথা আত্মোপলব্ধির আনন্দ। 'শৈল্পিক আনন্দ' থেকে রবীন্দ্রনাথও দূরে সরে গেছেন। 'প্রকাশই কবিত্ব'—এই চেতনা যেন এখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। ট্র্যাজেডির আনন্দের কারণ খুঁজতে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশতত্ত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। উত্তেজনা ও আত্মোপলব্ধির তত্ত্ব মিশিয়ে নতুন এক তত্ত্বভূমিতে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন।

কবি শেলী রবীন্দ্রনাথের মতো উত্তেজনা-তত্ত্ব বা আত্মোপলব্ধি-তত্ত্বের দিক দিয়ে আনন্দের হেতু খুঁজতে যাননি বটে, কিন্তু আত্মার অনির্বচনীয়

রহস্যময় স্বভাবের মধ্যেই হেতু নির্দেশ করে আত্মোপলব্ধি-তত্ত্বের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি লিখেছেন—"It is difficult to define pleasure in its highest sense; the definition involving a number of apparent paradoxes, For, from an inexplicable defect of harmony in the constitution of human nature, the pain of the inferior is frequently connected with the pleasures of the superior portions of our being. Sorrow, terror, anguish despair itself, are often the chosen expressions of an-approximation to the highest good. Our sympathy in tragic fiction depends on this principle; * * tragedy delights by affording a shadow of the pleasure which exists in pain. (A Defence of poetry.) শেলী আত্মার মধ্যে দুটো অংশ কল্পনা করেছেন —একটা অন্তরতর সত্তা—আত্মার নিগূঢ় বাসনা কামনার বৃত্তটি, আর একটা বাহ্য সত্তা—জৈবিক সত্তা—জৈবিক বাসনা-কামনার বৃত্তটি। এই দুই সত্তার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। ফলে একের যাতে দুঃখ, অন্যের তাতেই আনন্দ। দুঃখ-ভয়-অন্তর্দাহ নির্বেদ প্রভৃতিতে বাহ্য সত্তা যতই উদ্বেজিত হয় আন্তর সত্তা তত আনন্দিত হয়। ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় এই কারণেই যে বেদনার মধ্যে মহা আনন্দ বর্তমান—ট্র্যাজেডিতে সেই আনন্দ আভাসিত। রহস্যময় ব্যাখ্যা বটে!

শেলী দার্শনিক না হলেও দর্শনের তুরীয় লোকে পৌঁছে গেছেন। আত্মার সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য তত্ত্বের অবতারণা করে খানিকটা হেগেলীয় চিন্তার ধারা আমদানী করেছেন। তাই বলে হেগেলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত মিশিয়ে দিয়েছেন তা' নয়। ট্র্যাজেডি-সম্পর্কে হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) আলোচনা প্রসিদ্ধ। হেগেল নিজ দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকেই ট্র্যাজেডিতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন—"সব ক্ষতি তুচ্ছ করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে", হেগেলের মতেও—চৈতন্যস্বরূপ The great Absolute'ই সত্য—সব দ্বন্দ্বের উপরে অনন্তের চৈতন্য ও

মহাসাম্য (harmony) বিরাজ করছে। মহাসাম্যেই মহাশান্তি—অপার আনন্দ। জগতে ও জীবনে দ্বন্দ্ব আছে সত্য, কিন্তু আসল সত্য রয়েছে দ্বন্দ্বের সমাধানে। ট্র্যাজেডি শিল্পে এই দ্বন্দ্ব ও সমাধানের দৃশ্যই দেখতে পাই। দ্বন্দ্বে আমরা দুঃখ পাই বটে কিন্তু সমাধানে চৈতন্য আবার আপন সাম্য ফিরে পায় বলে, আনন্দ লাভ করি। ট্র্যাজেডির আনন্দ, হেগেলের মতে,—সমাধান-বোধ ("feeling of riconciliation")—সনাতন ন্যায় বোধ (sense of Eternal justice) থেকে জন্মে। মানুষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বাসনা-কামনার উপরে আছে—সনাতন ন্যায়বোধ। সমাধান এই ন্যায়বোধেই পরিপ্লুত তথা আনন্দজনক হয়। বলা বহুল্য হেগেল ট্র্যাজেডির আনন্দকে আত্মার নৈতিক বোধের পরিপূরণ-জনিত আনন্দে পর্যবসিত করে ফেলেছেন। আত্মার সাম্য-বোধ ও নৈতিক-বোধ চরিতার্থ করে বলেই ট্র্যাজেডি আনন্দ দান করে—এটাই শাদা কথায় হেগেলের মত।

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) আত্মার অন্য একটি বৃত্তিকে আনন্দের হেতু রূপে নির্দেশ করেছেন। হেগেল হেতু করেছেন—(ক) সামঞ্জস্য-বোধ ও (খ) ন্যায়বোধ ; শোপেনহাওয়ার হেতু করেছেন—বৈরাগ্য বা আত্ম-সমর্পণ প্রবৃত্তিকে (spirit of resignation)। তিনি বলেন—ট্র্যাজেডিতে—"We are brought face to face with great suffering and the storm and stress of existence ; and the outcome of it is to show the vanity of all human effort. Deeply moved, we are either directly prompted to disengage our will from the struggle of life. or else a chord is struck in us which echoes a similar feeling—(on some form of Literature 57. Complete Essays of Schopenhour) যেমন দর্শন তেমনি মতবাদ। যাঁর কাছে সংসার অসার, মৃত্যু অনিবার্য, জীবন একটা মস্ত ভুল—বাসনা ত্যাগ না করলে—বাঁচার ইচ্ছা (will to live) ত্যাগ না করলে, জন্ম-জরা-মৃত্যু শোক-তাপ ভোগ করতেই হবে. বাসনা ত্যাগেই

আনন্দ, তাঁর কাছে ট্র্যাজেডির আনন্দ এভাবে ব্যাখ্যাত হবে এই তো স্বাভাবিক। ট্র্যাজেডি—leads to resignation' এবং তা'তেই তার সার্থকতা আর সেই "resignation"-এর মধ্যেই ট্র্যাজেডির আনন্দ নিহিত। বলা বাহুল্য, শোপেনহাওয়ারের মতবাদটিতে, হেগেলের মতোই আত্মার নিগূঢ় একটি কামনাকে ভিত্তি করা হয়েছে।

শোপেনহাওয়ারের আত্ম-সমর্পণ-বাদের পাশেই আর এক দার্শনিকের মতকে স্থান করে দেওয়া যাক্। এই দার্শনিক সুবিখ্যাত নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০)। এর 'Birth of Tragedy' গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীৎসে বলেন ট্র্যাজেডির মধ্যে ডাওনেসীয় এবং এপোলীয় এই দুই শিল্পধারা মিলিত হয়েছে। ডাওনিসাসকে কেন্দ্র করে করুণ গীতি উৎসারিত আর এপোলোকে কেন্দ্র করে দুঃখজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী আশা-আকাঙ্ক্ষা—অক্ষয় সৌন্দর্যের তৃষ্ণা স্ফুরিত হয়েছে। ট্র্যাজেডি তাই একাধারে দুঃখের এবং দুঃখজয়ের কথা। নীৎসের মধ্যে—Tragedy is the art of metaphysical comfort a metaphysical supplement to the reality of nature—তবে কি নীৎসে বলতে চান—ট্র্যাজেডির আনন্দ দুঃখজয়ের আনন্দ? 'হ্যাঁ' বলার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বলে স্বস্তি কোথায়? নীৎসে অস্থির। নোতুন কথা বলতে শুরু করেন—আমাদের মধ্যে একটা 'secret instinct for annihilation' গোপন আত্ম-বিনাশন-প্রবৃত্তি আছে। এই বিনাশন আমাদের ব্যক্তি-সত্তাকে অখিল-সত্তার মধ্যে বিলীন করে দেয় বলে ব্যক্তি-বিনাশ দেখে আমরা আনন্দিত হই। ট্র্যাজেডিতে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-সত্তাকে অস্বীকার করা হয়—বিনাশ করা হয় তথা অখণ্ড ভূমার আকৃতিকেই ব্যক্ত করা হয়। ব্যক্তিতেই বেদনা অব্যক্তে অপার আনন্দ। ট্র্যাজেডি অব্যক্তের মধ্যে ব্যক্তির বিলয় প্রদর্শন করে তথা মানবের পরা আকৃতি প্রকাশ করে—মানুষের অন্তরতম কামনাকে চরিতার্থ করে আনন্দদান করে। (কেঁচো খুড়তে সাপ! যে সে সাপ নয় একেবারে কেউটে সাপ!) নীৎসের নিজের কথা তুলে দিলে, তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝা যেতে পারে:—ট্র্যাজেডি বুঝিয়ে দেয়—"how all that

comes into being must be ready for a sorrowful end; we are compelled to look into the terrors of individual existence—yet we are not to become torpid: a metaphysical comfort tears us momentarily from the bustle of the transforming figures. We are really for brief moments primordial Being itself, and feel its indomitable desire for being and joy in existence; the struggle, the pain, the destruction of phenomena, now appear to us as something necessary, considering the surplus of innumerable forms of existence which throng and push one another into life, considering the exuberant fertility of the universal will. We are pierced by the maddenning sting of these pains at the very moment when we have become, as it were, one with the immeasurable primordial joy in existence, and when we anticipate, in Dionysian ecstasy, the indestructibility and eternity of this joy. In spite of fear and pity we are the happy living beings, not as individuals, but as the one living being, with whose procreative joy we are blended." (১২৮-২৯)। নীৎসে আনন্দের শৈল্পিকপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে একেবারে অচেতন —এ কথা বলা যায় না বটে। কিন্তু খাঁটি শৈল্পিক (aesthetic) বলতে যা বুঝায় তা' নীৎসের ধারণায় স্থান পায়নি। একথা বলতেই হবে।

দার্শনিকদের এই উচ্চ বায়ুমণ্ডল থেকে নেমে এসে আমরা ডেভিড হিউমের আলোচনার মধ্যে একটু আরামে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি। হিউম তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাজেডি-বিষয়ক প্রবন্ধে (লা-'আবে-ডুবো'র 'উত্তেজনা' বাদ এবং ফন্তেনেলের—'কাল্পনিক' 'fiction'-বাদ সমালোচনা করে) সিদ্ধান্ত করেছেন ট্র্যাজেডির আনন্দ নিহিত থাকে—'eloquence'-এর মধ্যে। মানসিক অবসাদ ঘুচিয়ে ট্র্যাজেডি চেতনাকে উত্তেজিত করে তথা আনন্দ দেয়—

ডুবোর এই সিদ্ধান্ত তিনি মানতে পারেননি, তেমনি মানতে পারেন নি ফন্তেনেলের মতটি—"we weep for the misfortune of a hero to whome we are attached. In the same moment we comfort ourselves by reflecting that it is nothing but fiction"—উপস্থিত ঘটনারাজি সত্য নয়—কাল্পনিক এই কথা মনে করেই আনন্ত হয়। হিউম 'eloquence' বলতে যদি 'প্রকাশ' (expression) অর্থাৎ শিল্পকর্ম বুঝে থাকেন সত্যের কাছাকাছি গেছেন বলতে হবে। কাছাকাছি বলছি এই কারণে যে 'eloquence' বলতে হিউম 'ভাষা-প্রয়োগের নৈপুণ্যকেই ধরেছেন—সমগ্র প্রকাশ—রূপ-রসের সমগ্র প্রকাশকে ধরেননি। নিম্নলিখিত উক্তিটি—হিউমের মতটিকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করবে—ট্র্যাজেডির রস আস্বাদনের সময়—"The soul, being at the same time, roused by passion and charmed by eloquence feels on the whole a strong movement which is altogether delightful ট্র্যাজেডির আনন্দে eloquence'-এর দান অবশ্যই আছে, কিন্তু eloquenceই একমাত্র কারণ নয়। রূপ-রসের সমবায়ে সম্পূর্ণ জীবনের প্রকাশ (expression) উপলব্ধি করার ফলেই শৈল্পিক আনন্দ জন্মলাভ করে।

এরিস্টটলের মত আলোচনাকালে আমরা দেখেছি—এরিস্টটল আনন্দের যৌগিক প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি যেমন আনন্দের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি এক বৃত্তির সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ-ভাবে অন্যবৃত্তির সম্ভোগও সম্ভব। ট্র্যাজেডির আনন্দ—মূলতঃ "অনুকরণ" মহিমাজনিত আনন্দ। কিন্তু ভয়ানক করুণ ঘটনার অনুকরণ বলে—কমেডির লঘু অনুকরণের আনন্দ থেকে এ আনন্দ পৃথক। তারপর—শিল্প মুখ্যতঃ প্রকাশবৃত্তির সামগ্রী হলেও, আত্মার অন্যান্য বৃত্তিকেও চরিতার্থ করে থাকে, যেমন অনুকরণ আমাদের জ্ঞানবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। ফলে অনুকরণের—অর্থাৎ শিল্পের আনন্দের মধ্যে যেমন 'প্রকাশের আনন্দ' থাকে তেমনি 'জ্ঞানের আনন্দ'—(অন্যান্য আনন্দও) মিশে থাকে। ট্র্যাজেডির আনন্দকে 'শৈল্পিক' মনে না করে, একদল আত্মার নিগূঢ় বৃত্তির (জিঘাংসা, আত্ম-বিনাশন,

প্রতিশোধ স্পৃহা, আত্মসমর্পণ, সনাতন ন্যায়বোধ, আত্মোপলব্ধি প্রভৃতি) পরিপূরণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা বাহুল্য এরা মূলেই ভুল করেছেন। আর একদল এর শৈল্পিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও—নিছক শৈল্পিক বলে মনে করেন না। আনন্দের যৌগিক প্রকৃতির উপর বেশী জোর দিয়েছেন। এই দলে আমরা ডিকসন, থর্নডাইক, গিলবার্ট মারে প্রমুখ সমালোচকদের অনেককেই পাই।

W. M. Dixon লিখেছেন—'It may very well be that beyond its broad and common ways, in the gloomier defiles of life, amid the grief-worn faces and under the clouded skies of tragedy we may seek knowledge, wisdom, an enlargement of the spirit, the meaning of things or some other ends.'

A. H. Thorndike—আনন্দকে বিশ্লেষণ করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে আনন্দের মধ্যে—থাকে (ক) ভাবমোক্ষণ (catharsis) (খ) সহানুভূতি প্রদর্শন-জনিত আত্মগরিমা (egoistical satisfaction i.e., self-congratulation that comes with the exercise of sympathy) (গ) রসাস্বাদন (aesthetic delight) (ঘ) অনন্তের রূপ দর্শনের বিস্মিত উল্লাস (exaltation due to vision of the eternal)।

গিলবার্ট মারে মহাশয়—The classical Tradition in poetry-গ্রন্থের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আনন্দের একাধিক কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁহার মতে—আনন্দের মূলে থাকে (ক) সনাতন ন্যায়বোধ (profounder scheme of values) (খ) মৃত্যুকে জয় করবার উল্লাস (It must show beauty out-shining horror, it must show human character somehow triumphing over death and it can create and maintain that illusion only by high and continuous and severe beauty of form) (গ) প্রকাশ সৌন্দর্য (severe beauty of form).

কেউ-কেউ 'fear'-এর 'transformation বা katharsis'-এর মধ্যে

আনন্দের কারণটিকে খুঁজে পেয়েছেন। সমালোচক বুচার মহাশয়কে আমরা এই দলের একজন বলে মনে করতে পারি। ডুবোয়, ফণ্টেনিল, জনসন প্রভৃতি অনেকের মত একসঙ্গে পাকিয়ে এই মত তৈরী করা হয়েছে। এতে শৈল্পিক দৃষ্টির আভাস আছে, স্পষ্ট শৈল্পিক দৃষ্টি নেই। ফলে আলোক অপেক্ষা অস্পষ্ট চিন্তার কুহেলিকাই সৃষ্টি হয়েছে বেশী।

বিশুদ্ধ শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রশ্নটির আলোচনা—খুব কমই হয়েছে। আমরা দেখেছি ভারতীয় রসশাস্ত্রের সমাধান বিশুদ্ধ শৈল্পিক। ফলে, ভয়ানক বা করুণের রূপান্তর কল্পনা করতে হয়নি অথবা আত্মার নিগূঢ় কোন বৃত্তির মধ্যে আনন্দের কারণ খুঁজতে হয়নি। শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত শান্ত—সব রসের নিষ্পত্তিতে একই প্রক্রিয়া—বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ। তাই বলে, সব রসের আস্বাদ এক নয়। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের পার্থক্যের ফলে রসে রসে প্রকৃতির পার্থক্য বর্তমান। তবে সর্বত্রই—'রসে সার চমৎকারঃ'—বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী-কল্পনার অর্থাৎ শিল্পকর্মের চমৎকারিত্বের আনন্দ। যত চমৎকারিত্ববোধ তত আনন্দ। শিল্পের আনন্দ এই চমৎকারিত্ববোধেরই আনন্দ—আসল কথা এই শিল্প-সম্ভোগের কালে রসিক চিত্ত—শিল্পকর্মের নৈপুণ্য—প্রকাশদক্ষতা উপলব্ধি করার জন্যই ঐকান্তিক—ইংরাজীতে বললে বলা যায় aesthetic attitude নিয়ে থাকেন। প্রকাশ্য বস্তু যাই হোক—রূপ ও রস সুষ্ঠুমাত্রায় ব্যক্ত হচ্ছে কিনা এটাই তখন তাঁর মুখ্য বিচার্য। হৃদয়-বুদ্ধি-কল্পনা সকলেই এই বিচারে অংশ গ্রহণ করে। হৃদয় অনুভব দ্বারা রসমাত্রা উপলব্ধি করে—হাসি কান্না ভয় প্রভৃতি ভাব রসনিষ্পত্তির মাত্রাই নিরূপণ করে—কল্পনা কল্পনা-শক্তির মহিমা বিচার করে এবং বুদ্ধি বিচার করে ভাবনা-ঐশ্বর্যকে। এই কারণেই ট্র্যাজেডি রসাস্বাদনের সময় চোখে জল মুখে হাসি সম্ভব হয়—করুণ যত করুণ ভাব জাগায় তত আনন্দের কারণ হয়। করুণ করুণ না হলে ব্যর্থ সৃষ্টি। করুণ যত করুণ হয় তত সার্থক সৃষ্টি হয়। আমরা সাধারণীকৃতির বশে যত সমবেদনায় ব্যথিত হই তত আমাদের চিত্তে শোচনার আবেগ চঞ্চল হয়ে উঠে—তত আমাদের চোখে জল আসে।

কিন্তু এই সাধারণীকৃতির ঊর্ধ্বে, অন্তর্যামীর মত, থাকেন রসিক-অহং সাধারণীকৃতি যার রস গ্রহণের উপায় বিশেষ—যিনি উপস্থাপিত ব্যাপারকে সম্পূর্ণ নিজের বা সম্পূর্ণ পরের বলে মনে করেন না—লৌকিক—অলৌকিকের চেতনা যার মধ্যে মুছে যায় না—অলৌকিকের প্রতি লৌকিক প্রতিক্রিয়া দেখান না বা নিছক অলৌকিক বলে হৃদয় ক্রিয়া বন্ধ করে বসে থাকেন না। এই "রসিক-অহং"ই শিল্পকর্মকে হৃদয়-বুদ্ধি-কল্পনায় ধারণ করেন এবং তার সৌন্দর্য বা চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করে আনন্দিত হন। হাসি বা কান্না রসের উপাদান হিসাবেই এই রসিকের কাছে আস্বাদিত হয়। সুতরাং যে কারণে কমেডি আনন্দ দেয় সেই একই কারণে ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয়—কমেডির আনন্দ শৈল্পিক আনন্দ—ট্র্যাজেডির আনন্দও শৈল্পিক আনন্দ (aesthetic pleasure)। কমেডির আনন্দ যেমন হাসির আনন্দ নয়, ট্র্যাজেডির আনন্দও তেমনি কান্নার আনন্দ নয় বা ভয়ের রূপান্তর-জনিত আনন্দ নয়।

এই দৃষ্টি বিশুদ্ধ শৈল্পিক দৃষ্টি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ মহাশয় —অনেকটা এই দৃষ্টি থেকেই ট্র্যাজেডির আনন্দকে বিচার করতে চেষ্টা করেছেন। "Tragic Relief"—গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সঙ্কল্প করেছেন—"It will be our purpose in this study to investigate this problem of tragic pleasure and to approach it purely from a literary point of view."

অধ্যাপক গুহের মতে—ট্র্যাজেডির আনন্দের দুটো রূপ আছে। একটা সদাত্মক (affirmative), অন্যটা—নঙাত্মক (negative)। সদাত্মক রূপ পাওয়া যায়—"in the exaltation tragedy brings to the mind of the audience by its artistic representation, in different plays, of different phases of the tragedy of life." আর নঙাত্মকরূপ পাওয়া যায়—"in the palliation which we meet with in all tragic drama, of the inherent painfulness of its theme, by the employment of various devices of art।" সদাত্মক আনন্দের প্রকৃতি অধিক পরিমাণে ট্র্যাজেডির মানবিক আবেদনের মাত্রার উপর নির্ভর করে থাকে;

'কিং লীয়ারে'র আনন্দ আর "দি যু অফ মাল্টা"র আবেদনে তথা আনন্দে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অধ্যাপক গুহ বলেন—Every great tragedy is as it were, a play within a play………The impression made by the outer events of the play and that produced by the unseen world within art set in a sort of conflict with each other, so that the depressing effect of the former is mitigated by the exalting influence of the later." খাঁটি শৈল্পিক দৃষ্টিতে দেখলে, শেষের মন্তব্যটুকুতে আপত্তি করবার কথা এই যে ঘটনা ও রসের মধ্যে বিরোধের সম্পর্ক কল্পনা করা ঠিক নয়, ঘটনা যত শোচনীয় হয় ততই করুণ রস নিষ্পন্ন হয়। দৃশ্যজগৎ (ঘটনা) এবং অদৃশ্য জগৎ ("poetic world") উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই, দৃশ্য অদৃশ্যের পরিপোষক।

আর মত কুড়িয়ে লাভ নেই। ছোট একটি প্রশ্ন—'ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় কেন?' এরিস্টটল থেকে আজ পর্যন্ত, ঐ ছোট্ট একটা প্রশ্নের কত বড় বড় উত্তরই না দেওয়া হয়েছে। আর তা' দিয়েছেন কত বড় বড় সব মহারথীরা। আশ্চর্যের কথা—এরিস্টটল যে উত্তরটি দিয়েছেন তার তাৎপর্য দার্শনিকরা তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেননি বলে, বহু ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করলেও, তাঁরা সত্যে পৌঁছতে পারেন নি, বিশুদ্ধ শৈল্পিক আনন্দের স্বরূপ বুঝতে পারেননি। মানুষের মধ্যে, ঊর্ধ্বতন মস্তিষ্কের বিস্তার ও জটিলতার ফলে, ভাব প্রকাশের নতুন শক্তি স্ফুরিত হয়েছে; তাতে মানুষের "অহং" নতুন এক প্রবৃত্তিতে শাখায়িত—নতুন বাসনার খাতে প্রবাহিত—হয়েছে। এই বাসনার বা বৃত্তির অভিপ্রৈতি—'প্রকাশ'। সুষ্ঠু প্রকাশে এই বাসনার পরিপূর্তি এবং তাতেই আনন্দ। শিল্পসৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রধানতঃ এই বাসনাই। শিল্পিত বস্তু দেখে যে আনন্দ হয় তা মানুষের এই বিশেষ বাসনারই পরিপূরণজনিত আনন্দ এবং ততক্ষণই সেই আনন্দ বিশুদ্ধ শৈল্পিক, যতক্ষণ তা' এই বাসনা-চক্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এই বাসনার সঙ্গে যে পরিমাণে অন্যান্য 'বাসনা' এসে মেশে (মিশে যায়ই) সেই পরিমাণে 'তা' বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলে, তত আনন্দ যৌগিক হ'য়ে উঠে। শিল্পের আনন্দ যে যৌগিক অর্থাৎ

নিছক শৈল্পিক হয় না, এরিস্টটল তা' বুঝেছিলেন এবং বুঝেছিলেন বলেই বলেছিলেন—প্রকাশবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানবৃত্তিও চরিতার্থ হয়। আমরা যা দেখি তা' জানি এবং দেখে ও জেনে আনন্দিত হই। এই আনন্দে দেখার এবং জানার—দুয়েরই আনন্দ মিশে থাকে। এরিস্টটলের সিদ্ধান্তকে একটু বাড়িয়ে বলা যেতে পারে—জ্ঞানবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৃত্তিও চরিতার্থ হতে পারে তথা আনন্দের যৌগিকত্ব বাড়তে পারে।

শিল্পে ও সাহিত্য-শিল্পে শ্রেণী-বিভাগ

পোয়েটিক্‌সের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এরিস্টটল লিখেছেন—'But of this enough has been said in our published treatises—অর্থাৎ আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থরাজিতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। দুঃখের বিষয় —যে সব প্রকাশিত গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে তারা হারিয়ে গেছে। আর তাদের স্থান অধিকার করে আছে আমাদের পোয়েটিক্‌স—ভাষ্যকল্প একখানি পুস্তিকা। অনেক কিছুই এখানে সূত্রাকারে বলা হয়েছে—উল্লেখ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—বলা বাহুল্য মনে করে বলা হয়নি। পোয়েটিক্‌সের আলোচনা অনেকক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ মনে হয়ে থাকে। তবে যাঁরা সংকেতগ্রাহী তাঁরা যে অল্প থেকেই অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন—এ ব্যবস্থা এরিস্টটল করেছেন।

এ কথা সত্য যে এরিস্টটল, এই গ্রন্থে, শ্রেণী-বিভাগের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেননি, কিন্তু তাই বলে এ কথা সত্য নয় যে পোয়েটিক্‌সে শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে তিনি কোনো কথাই বলেননি। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি শিল্পের জাতি ও প্রজাতি সম্বন্ধে আলোচনা তুলেছেন এবং জাতি-ভেদের কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। এরিস্টটলের মতে—(প্লেটোর মতেও বটে)—শিল্পের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে—"মাইমেসিস্"। সব শিল্পই—'are all in their general conception modes of imitation'।

নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্র, সাহিত্য সমস্ত শিল্প সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য হয়—তিন কারণে—"the medium,' the objects, the manner or mode of imitation."

শিল্পগুলির সাধারণ পরিচয় :—

(ক) নৃত্যও অনুকরণ। নৃত্য দৈহিক ছন্দে চরিত্র ভাবাবেগ এবং ঘটনাকে অনুকরণ করে থাকে। ছন্দই (rhythm) হচ্ছে এর বিশেষ উপায় (dancing imitates character emotion and action by rhythmical movement)। আসল কথা নৃত্য জীবনেরই অনুকরণ—তবে এই অনুকরণের মাধ্যম হচ্ছে—দেহের গতি-ভঙ্গিমা।

(খ) গীতও সামান্য লক্ষণে—অনুকরণবিশেষ। কিন্তু এই অনুকরণের মাধ্যম বা উপায়—'voice বা স্বর (by the voice)। গীতে 'লয়' (harmony) অন্যতম উপায়।

(গ) বাদ্যে—বাঁশী বা বীণার বাদ্যে এবং অন্যান্য বাদ্যে ছন্দ ও লয় (rhythm and harmony) উভয়ই আবশ্যক।

(ঘ) চিত্র—বর্ণ ও রেখার সাহায্যে বিবিধ বস্তু এবং মানুষের রূপ অনুকরণ করে—(imitate and represent various objects through the medium of colour and form.)

(ঙ) সাহিত্য-শিল্পও জীবনের অনুকরণ করে—এর অনুকরণের উপায় হচ্ছে—ভাষা (by means of languages alone)।

সংক্ষেপে বলা যায়—সাহিত্য হচ্ছে ভাষা-শিল্প—ভাষার মাধ্যমে জীবনের রূপ-কল্পনা। 'ডিথিরাম্বিক', নোমিক, ট্র্যাজেডি, কমেডি, এপিক সমস্ত প্রজাতিরই সামান্য লক্ষণ—ভাষাময়ত্ব।

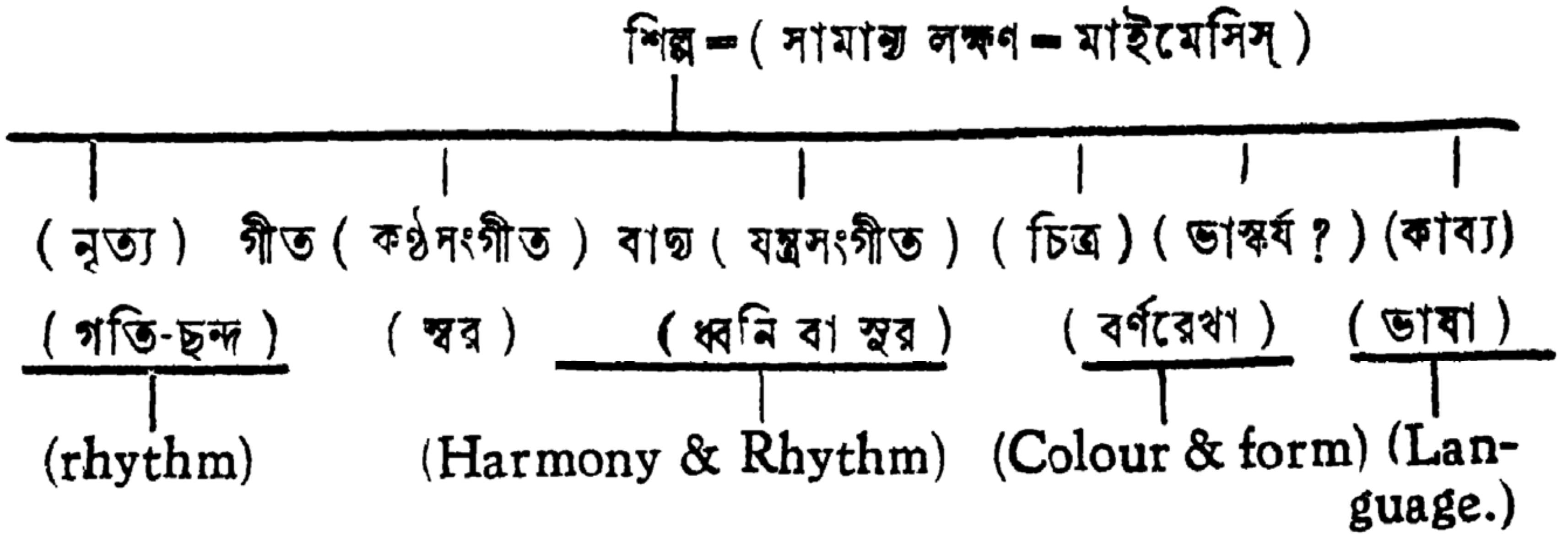
এরিস্টটল উল্লিখিত শিল্পগুলির বিশেষ ভেদ-লক্ষণটি নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু যাকে আমরা তুলনামূলক আলোচনা বলে থাকি তেমন কোন আলোচনা করেননি।

অনুকরণের 'মাধ্যম'-'বস্তু' এবং 'রীতি—ভেদে শিল্পগুলির মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে—এই সাধারণ সূত্রটি নির্দেশ করে যদিও তিনি অনেকখানিই বলে

দিয়েছেন, তবু বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করে তিনি আমাদের আশা অপূর্ণই রেখেছেন। অনুকরণ সকলেরই উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও, 'মাধ্যমে'র সামর্থ্য,—কিভাবে বিশেষ বিশেষ শিল্পের চারদিকে সীমা এঁকে দিয়েছে—কোন্ শিল্প কতখানি জীবনের রূপ যথাযথভাবে অনুকরণ করতে পারে এবং কেন পারে—এ নিয়ে এরিস্টটল বিশেষ আলোচনা করেননি। তারপর স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যও এরিস্টটলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। স্থাপত্য সম্বন্ধে—বিশেষতঃ ভাস্কর্য সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেননি, এ খুবই আশ্চর্যেরই কথা। কারণ ভাস্কর্যও তো জীবনকে অনুকরণ করে এবং অন্যতম চারু শিল্প।

অবশ্য কেউ এরিস্টটলের পক্ষ অবলম্বন করে বলতে পারেন—গ্রন্থখানি কাব্য-বিষয়ক ; সুতরাং কাব্যকে অন্যান্য শিল্প থেকে পৃথক করতে যেটুকু বলা দরকার এরিস্টটল ততটুকুই বলেছেন—বিশেষ তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেননি। কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করবার মতো না হলেও সম্পূর্ণ গ্রাহ্য বলা যায় না। এরিস্টটল ইচ্ছা করলেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে পারতেন। অবশ্য লেসিঙ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Laocoon"-এ যেভাবে চিত্র, ভাস্কর্য এবং সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তেমন আলোচনা এরিস্টটলের কাছে প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। তবে চিত্রে বা ভাস্কর্যে জীবনের বিশেষ মুহূর্তের স্থিতিশীল রূপটি ব্যক্ত করা যায়, আর সাহিত্যে জীবনের গতিশীল রূপ প্রকাশ করা যায়—এ ভেদটুকু আবিষ্কার করা এরিস্টটলের পক্ষে খুব অসম্ভব কাজ ছিল বলে মনে হয় না।

যা' হোক আমরা এখানে শিল্প-বিভাগের একটা ছক এইভাবে করতে পারি।—



এবার দেখা যাক্—কাব্যের শ্রেণী-বিভাগ এরিস্টটলের হাতে কি রূপ নিয়েছে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার—এক্ষেত্রেও এরিস্টটল সন্তোষজনক অর্থাৎ পরিপাটি কোন তালিকা প্রস্তুত করেননি এবং প্রত্যেকটি প্রজাতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেননি। যেমন বলা যেতে পারে, তিনি 'ডিথিরাম্বিক' 'নোমিক' এলিজিয়াক, প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে বর্ণনামূলক কাব্যের বা নাট্য-কাব্যের পার্থক্য কোথায় তা' নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা করেননি। আভাসে-ইঙ্গিতে যেটুকু বলেছেন তা' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় নেই।

যেমন 'ডিথিরাম্বিক' নোমিক কাব্য, কমেডি ও ট্র্যাজেডি সম্পর্কে একস্থলে লিখেছেন—এরা সকলেই rhythm, tune and metre প্রয়োগ করে থাকে, তবে পার্থক্য এই—ডিথিরাম্বিক এবং নোমিক কাব্য—ঐ তিনটি উপায়ই এক সঙ্গে প্রযুক্ত আর কমেডি-ট্র্যাজেডিতে, এক সময়ে একটিমাত্র প্রযুক্ত হয়। এই উক্তি থেকে বুঝা যায় যে ডিথিরাম্বিক এবং নোমিক গীতি-মূলক (lyrical) কাব্য। রীতির দিক দিয়ে কাব্যকে শ্রেণী-বিভক্ত করতে তিনি যে চেষ্টা করেছেন তাতে মনে হয়— তাঁর দৃষ্টি রয়েছে প্রধানতঃ কাহিনী কাব্যের দিকে। কাব্যকে সেখানে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে (ক) এক শ্রেণীতে রয়েছে—বর্ণনাত্মক কাব্য (narrative

poetry) (খ) অন্য শ্রেণীতে রয়েছে—দৃশ্য কাব্য (dramatic)। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'For the medium being the same, and the object the same, the poet may imitate by narration—in which case he can either take another personality as Homer does, or speak in his own person unchanged or he may present all his characters as living and moving before us. অবশ্য 'narration' কথাটার তাৎপর্য যদি হয় 'শ্রব্যত্ব' তা'হলে—গীতি-মূলক এবং বর্ণনা-মূলক, দুটোই—'narrative' শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যতদূর মনে হয় এরিস্টটল 'narration' কথাটি ব্যাপক অর্থেই প্রয়োগ করেছেন।

তা' হলে এইভাবে একটা তালিকার ছক এঁকে নেওয়া যেতে পারে—

কাব্য

শ্রব্য (গীতিমূলক + বর্ণনাত্মক   দৃশ্য

ডিথিরাম্বিক   নোমিক   এলিজিক   স্যাটায়ার ও প্যারোডি   এপিক

কমেডি   ট্র্যাজেডি

*কবির মনোভঙ্গী অনুসারে তালিকা করতে গেলে—তালিকা দাঁড়াবে এইরূপ—

*	১	২	৩
Character of writers	Lyrical—পর্যায়ে	Narrative—পর্যায়ে	Dramatic পর্যায়ে—
graver spirits (গুরুচিত্ত)	hymns to the gods (দেবস্তোত্র) praises of famous men (নর-প্রশস্তি) Dithyrambic+ Noimic etc.	Epic (মহাকাব্য	Tragedy (ট্র্যাজেডি)
trivial sort (লঘুচিত্ত)	satires (ব্যঙ্গ কবিতা) and parodies	Satires (ব্যঙ্গ-কাব্য)	Comedy (কমেডি)

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে এরিস্টটল অনেকটা বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনা করেছেন। 'গুরুচিত্ত' কবিরা প্রথম পর্যায়ে দেবস্তুতি, নরপ্রশস্তি এবং 'লঘুচিত্তরা' ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে—কাহিনী কাব্যের উৎপত্তি, এই পর্যায়ে গুরুচিত্তরা সৃষ্টি করেছেন—মহাকাব্য লঘুচিত্তরা ব্যঙ্গ-কাব্য। তৃতীয় পর্যায়ে—নাট্য-কাব্যের উৎপত্তি; এই পর্যায়ে গুরুচিত্ত সৃষ্টি করেছেন—ট্র্যাজেডি, লঘুচিত্ত সৃষ্টি করেছেন কমেডি। এরিস্টটলের ধারণা=যে শিল্প যত জটিল, উৎপত্তি তার তত পরবর্তী। শ্রব্যকাহিনী-কাব্য থেকে দৃশ্য কাব্য জটিলতর সৃষ্টি। তাই মহাকাব্যের পরবর্তী পর্যায়ে নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। তারপর, বিশেষ প্রশংসার কথাটা এই যে এরিস্টটল স্পষ্টভাবেই বলেছেন—কোন প্রজাতিই সম্পূর্ণ আকার নিয়ে জন্মায়নি; স্থূল আরম্ভ থেকে ক্রমবিবর্তনের মাঝ দিয়ে সম্ভাব্য আকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। বৈজ্ঞানিক এরিস্টটলের চোখের সামনে জৈবিক বিবর্তনের সত্য, বিশেষ

করে 'এণ্টেলেকি' তত্ত্ব দাঁড়িয়ে ছিল বলেই বিবর্তনের সংস্কার তাঁর চিন্তায় সহজেই মিশে গেছে। বিশেষ প্রশংসার কথা বলছি এই কারণে যে অতীতে যে চিন্তাটা এত সহজে ধারণায় স্থান পেয়েছে, পরবর্তীকালে সেই চিন্তাকেই স্থান করে নিতে প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজো এমন লোক আছেন যিনি কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করতে চান না—কাব্যকে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ একটা অলৌকিক বস্তু বলে স্বীকার করেন। এরিস্টটল দেখিয়েছেন—বস্তুকে ক্রমবিবর্তনের ধারা থেকে পৃথক করে দেখা সত্যের অপলাপ করা। জৈবজগতে প্রাণী যেমন ছোট আরম্ভ থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণ পরিণতির স্তরে উপস্থিত হয়, শিল্পজগতেও, শিল্প তেমনি ছোট এবং স্থূল আরম্ভ থেকে ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হয় এবং আদর্শ রূপের দিকে এগিয়ে যায়; এই ক্রমবিকাশ দেশকালপাত্রসাপেক্ষ ব্যাপার। ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত ধরা যাক। ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—Tragedy—as also comedy, was at first mere improvisation. The one originated with the authors of the Dithyramb, the other with those of the phallic songs······Tragedy advanced by slow degrees; each new element that showed itself was in turn developed. Having passed through many changes it found its natural form, and there it stopped. কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলে রেখেছেন—whether Tragedy has yet perfected its proper types or not······আলোচ্য বিষয়।

আর একটা কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার; সে কথাটি এই যে এরিস্টটলই প্রথম লক্ষ্য করেছেন—উপস্থাপনার প্রকৃতি রীতিভেদে মোটামুটি তিন রকমের হতে পারে। (ক) কোন উপস্থাপনায় জীবনকে সাধারণ এবং বাস্তব জীবন থেকে বড়ো করে—মহিমান্বিত রূপে দেখানো হয় (খ) কোন উপস্থাপনায় বাস্তব জীবন থেকে ছোট করে বা হেয় করে দেখানো হয় (গ) কোন উপস্থাপনায় জীবনকে যথাযথভাবে অর্থাৎ ইচ্ছা করে বড়ো

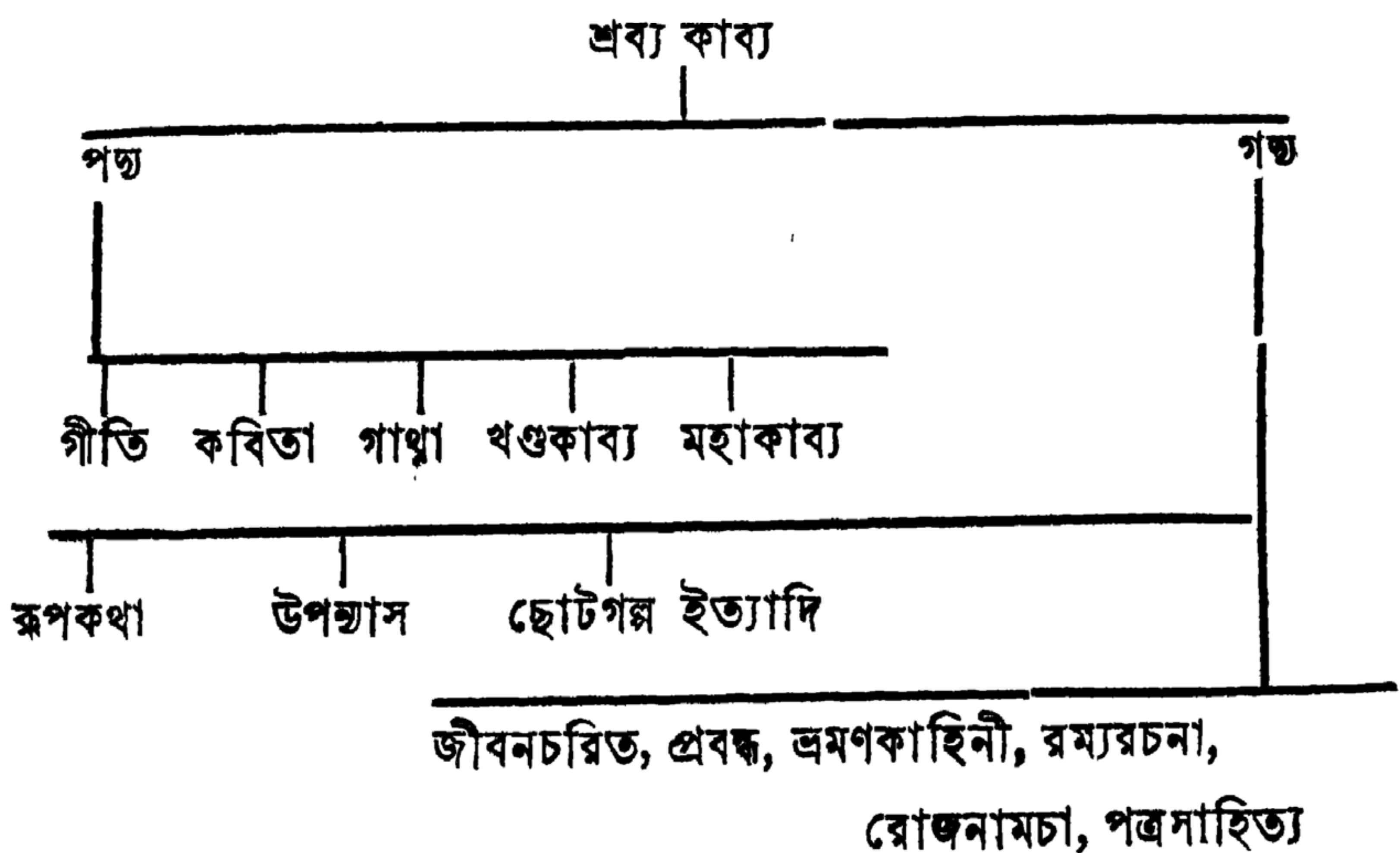
যা ছোট না করে জীবনের বাস্তব রূপকে দেখানো হয়। বলা বাহুল্য হলেও, স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো—সাহিত্যে আদর্শবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদের (Realism) দ্বন্দ্ব খুবই প্রাচীন এবং এরিস্টটলের পোয়েটিক্স্-গ্রন্থে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের প্রথম আভাস এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এরিস্টটল দেখিয়েছেন—এই তিনটি প্রবৃত্তি—'মহৎ রূপ', 'হেয় রূপ' এবং 'যথাযথ রূপ' দেওয়ার প্রবৃত্তি—সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই রয়েছে। চিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—পোলিগনোটাস মানুষের মহত্তর রূপ এঁকেছেন, পোসন এঁকেছেন ইতর রূপ এবং ডাওনিসিয়াস এঁকেছেন যথাযথ রূপ (true to life)। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির মধ্যে আদর্শায়নের প্রবৃত্তি—মানুষের মহত্তর রূপ ব্যক্ত করবার চেষ্টা রয়েছে এবং কমেডিতে মানুষের হেয় রূপ ব্যক্ত করার চেষ্টা আছে (representing men as worse)। যদিও এক্ষেত্রে, বিষয় বস্তুর প্রকৃতি কিভাবে রচনার প্রকৃতিকে নির্ধারিত করে সেই আলোচনা প্রসঙ্গেই কথাটা উঠেছে, তবু রীতির কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে। গঠন-আলোচনাপ্রসঙ্গে এই আদর্শবাদ এবং বাস্তববাদের ধারণা আরো স্ফুট আকার ধারণ করেছে। পরে (সাহিত্যে মতবাদ অধ্যায়ে) এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

যদিও এই অধ্যায়ের আলোচ্য—সাহিত্য শিল্পে শ্রেণী-বিভাগ, তবু আমি শ্রব্যকাব্যের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে, এই অধ্যায় শেষ করছি। কারণ কমেডি, ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য সম্বন্ধে পৃথক তিনটি অধ্যায়ে আলোচনা হবে এবং সেখানেই ওদের শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে যা' বলবার আছে তা' বলা হবে। এখানে শুধু শ্রব্যকাব্যের "প্রজাতি" সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করছি।

এরিস্টটল যে কয়প্রকার সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন তা' আগেই, তালিকা তৈরী করে দেখানো হয়েছে। সেখানে আমরা পেয়েছি—লিরিক, এপিক, ড্রামাটিক, এলিজিয়াক—মোটামুটি এই চার প্রকার রচনা। (স্যাটায়ারিক, ডিথিরাম্বিক, নোমিক প্রভৃতি মোটামুটি লিরিকের অন্তর্ভুক্ত—এ হিসাবে) হোরেস এই চার প্রকার কাব্যের কথাই বলেছেন। তবে—

"সক্রেটিসের ডায়লোগ"কে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে—এ নিয়ে এরিস্টটলের মনে প্রশ্ন না জেগে পারেনি। প্রশ্নের উত্তর না দিলেও—বলা যেতে পারে, প্রশ্নটা নিজেই উত্তরের ইঙ্গিত বহন করছে।

এরিস্টটল যে সব শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন, বলা বাহুল্য তাতে শ্রব্য কাব্যের সমস্ত 'প্রজাতি' অন্তর্ভুক্ত হয়নি—এরিস্টটলের সময়ে তাদের অস্তিত্ব ছিল না বলেই হয়নি। যেমন ওভিদের "Epistle" বা পত্র-সাহিত্য বা মধ্যযুগের "রোমাঞ্চ-সাহিত্য" (Gesta Romanorum & Decameron) গল্প-সাহিত্য, পরবর্তীকালের ছোটগল্প ও উপন্যাস সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্য, এরিস্টটলের শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে স্থান পায়নি, কারণ এজাতীয় সাহিত্য তখন রচিতই হয়নি। এরিস্টটলের তালিকাকে সম্পূর্ণ করতে, এখানে শ্রব্যকাব্যের একটি ছক দিয়ে শ্রেণীবিভাগের আধুনিক রূপটিকে প্রকাশ করা যাক্।



কমেডি

সাহিত্য-শিল্প জীবনের ভাষাময় অনুকরণ বা উপস্থাপনা। তাই জীবনে যত রূপবৈচিত্র্য, চরিত্রবৈচিত্র্য সাহিত্যেও তত রূপ-রসের বিভিন্নতা। জীবনের একদিকে রয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের ব্যর্থ সংগ্রামের শোচনীয় রূপ—কোথাও জীবন সম্ভোগের তীব্র কামনার প্রেরণায় উদ্‌ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী আচরণ—মোহের আবর্তে জীবনের অকাল বিনাশ, কোথাও সমাজ-সংস্কারের অপরিচ্ছেদ্য নাগ-পাশ বন্ধনে আবদ্ধ ও জর্জরিত মানবাত্মার সুদুঃসহ দুঃখভোগ, আকুল আর্তনাদ—আত্মরক্ষার নিস্ফল তথা করুণ সংগ্রাম —এক কথায় জীবনের দ্বন্দ্ব-মথিত বেদনা-বিক্ষুব্ধ রূপটি—painful sensations-এর বৃত্তটি। এই বেদনা বৃত্তের অন্যদিকে আছে—জীবনের দ্বন্দ্ব-মুক্ত চরিতার্থ-বাসনা আনন্দোজ্জ্বল রূপটি—ছোটখাটো বাধা বিপত্তির কালোমেঘ ও ধূলিঝঞ্ঝার পরে মেঘমুক্ত নির্মল আলোকের উচ্ছ্বাস। এখানে নেই মৃত্যুর কালোছায়ার স্পর্শে জীবনের বিষাদ-কালো রূপের ঘনস্তব্ধ নিথরতা, নেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন-সংগ্রামের তীব্র আলোড়ন—সমস্ত সত্তাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ-করে-দেওয়া বেদনা-কম্পন। এখানে শেষ পর্যন্ত—প্রাপ্তিযোগ। না পাওয়ার বেদনার রাত্রি এখানে দীর্ঘ নয়। দেখতে না দেখতে প্রভাত আসে এখানে প্রচুর আনন্দের আলোক ছড়িয়ে। এখানে জীবন—জীবনের আনন্দে বিভোর—জীবন জীবনমুখী—জীবনের সাথে জীবন যোগ করে—কাম্যকে কামনা করে, প্রাপ্যকে পেয়ে মহাসুখী। এ জীবনের pleasurable sensations-এর বৃত্ত—আনন্দের বৃত্ত।

এই বৃত্তেরই একটু এদিকে রয়েছে—জীবনের আরও একটি বৃত্ত—জীবনের অতি লঘু রূপের—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাক্—"জীবনের উপরিতলের ফেণপুঞ্জ"-এর—'Comic aspect of life'-এর বৃত্তটি। এখানে জীবন ও জীবনের সমস্যা সবই লঘু; জীবনের জন্য জীবনের সমবেদনা নেই, আর থাকলেও জীবনকে নিয়ে রসিকতা করতে জীবনের বাধে না। এখানে জীবনের বিকৃতি বা অসঙ্গতি দেখে—সে বিকৃতি বা অসঙ্গতি আকার-বাক্-চেষ্টা যাতেই প্রকাশ পাক না—জীবন আমোদ অনুভব করে—

হাসির আবেগে ইচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। জীবনের অসঙ্গতি নিয়ে জীবনের এ. এক রসিকতার বাতিক—শুধু পরের নয়, নিজের বিকৃতি নিয়েও, রসিকতা করবার অদ্ভুত এক নির্লিপ্ত মনোভঙ্গী।

জীবনের রূপকে মোটামুটিভাবে এই তিনটি বৃত্তের দ্বারা সীমায়িত করে দেখা যেতে পারে। প্রথম বৃত্তে—জীবনের ট্র্যাজেডির রূপ, দ্বিতীয় বৃত্তে জীবনের ট্র্যাজি-কমেডি এবং সিরিয়াস কমেডির রূপ; তৃতীয় বৃত্তে—জীবনের কমিক বা হাস্যোদ্দীপক রূপ। প্রথম বৃত্তের জীবনের রূপ দেখে মানুষ বেদনা-বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। মানুষের হৃদয়-মন তীব্র ভাব ও ভাবনার ঐকান্তিক স্পন্দনে পরিস্পন্দিত হয়, মন জীবন বোধের রহস্যে আত্মহারা হয়ে যায়। অহং এখানে ঐকান্তিকভাবে একাগ্র। দ্বিতীয় বৃত্তের জীবনের রূপে, জীবনের ও জীবনের সমস্যার গুরুত্ব আছে বটে কিন্তু সত্তাকে তা, আগের মত আলোড়িত করে না। 'অহং' এখানে (ট্র্যাজেডিতে যেমন) তীব্র স্পন্দনে স্পন্দিত হয় না—তত ঐকান্তিকভাবে একাগ্র থাকে না (tension এখানে অপেক্ষাকৃত কম) আর সমস্যা যা' দেখা দেয় তার সমাধান ঘটে আনন্দদায়ক পরিণামের মধ্যে।

তৃতীয় বৃত্তের জীবনের রূপকে দেখার সময়, "অহং"-এর সমস্যাবোধ শূন্য অঙ্কে নেমে যায়। ফলে অনুভূতির তীব্রতা—ইংরাজীতে যাকে বলা হয় tension—মনোযোগের একাগ্রতা, না-থাকার মতোই থাকে। সমস্যামুক্ত শিথিল চিত্তে জীবনের অসঙ্গতি ও বিকৃতি হাসি ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়াই জাগায় না। সমস্যা-পীড়িত গুরুগম্ভীর জীবনের রূপ বাদ গেলে—বাকী থাকে তো জীবনের সেই সব লঘু রূপগুলিই যা' হাস্য রস ছাড়া আর কোন রসই জাগাতে সক্ষম নয়। সুতরাং চিত্ত এখানে হাস্যরসিক মাত্র।

রস হাস্যই হোক আর করুণই হোক—ন ভাবহীনোঽস্তি রসঃ। মানুষের মধ্যে যদি হাসির স্থায়ীভাব (psycho-physical disposition) না থাকতো মানুষ হাসতে পারতো না—হাস্যরসও হতো না। মানুষের মধ্যে এই ভাবটি অন্যতম বিলক্ষণ স্থায়িভাব। কেউ কেউ তাই রসিকতা করতে মানুষের সংজ্ঞা তৈরী করেছেন—"laughing animal"। হাসির স্থায়িভাব নিয়ে জন্মেছে বলে,

মানুষ অতি আদিম কালেই হাসতে শুরু করেছে এবং তখন থেকেই উপযুক্ত অবস্থা এলেই সে হেসে ফেলছে। হাসছ কেন ?—জিজ্ঞাসা করলে হয়ত আরো হাসতে আরম্ভ করেছে এবং আজো তার ব্যতিক্রম নেই। বাস্তবিক সাধারণ লোক যখন প্রহসন দেখে প্রাণ খোলা হাসি হাসতে থাকে, তখন যদি কেউ তাদের কাছে গিয়ে হাসির Psychological, Social and Biological Theories গুলি ব্যাখ্যা করতে থাকেন এবং বলেন "হাসির কারণ" ব্যাখ্যা করতে মহাভারতের মত সব বই লেখা হয়েছে, তা' হলে নিশ্চয়ই তারা আর একবার প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠবে।

(ক) মানুষের অসঙ্গতি বা বিকৃতি দেখে, সাময়িক ভাবে মানুষের মধ্যে সহসা "শ্রেষ্ঠম্মন্য"-ভাব জাগে বলে মানুষ হাসে (হব্‌স) বা (খ) মানুষ মানুষের ছোটখাটো অসঙ্গতি বা বিকৃতিকে হাসি দ্বারা সংশোধন করতে চায় বলে হাসে (বের্গস্‌) অথবা (গ) অতি স্পর্শকাতর চিত্ত মানুষ, জীবনের ছোটখাটো অসঙ্গতি ও বিকৃতির বেদনা তরঙ্গ থেকে সমবেদনা-প্রবণ চিত্তকে মুক্ত রাখার জন্য তথা জীবনকে বিষাদ-রোগ থেকে মুক্ত রেখে মনুষ্য প্রজাতির সুষ্ঠু অভিযোজন সুরক্ষিত করবার জন্যই, হাসি দ্বারা বেদনার তরঙ্গকে লঘু ও অপসারিত করবার জন্য হাসে (ম্যাকডুগাল) অথবা (ঘ) উদগ্র প্রত্যাশা হঠাৎ, 'কিছুনা'তে পরিণত হওয়ার জন্য হাসে (কাণ্ট)—বড় একটা কিছু আশা করে তার জায়গায় নগণ্য একটা কিছুকে পাওয়ার জন্য হাসে (স্পেন্‌সার)—যে কারণেই মানুয়ের 'হাস' স্থায়িভাব দেখা দিক—মানুষের কান্নার মত হাসিও অতি পুরাতন ব্যাপার। জীবন হাসি-কান্নার দোলায় গোড়া থেকেই দুলে আসছে।

এরিস্টটল লক্ষ্য করেছেন—মানুষের মধ্যে—শিল্পীর মধ্যেও বটে—দুই রকম প্রকৃতির লোক আছে; একের প্রকৃতি গুরুগম্ভীর (graver spirit), অন্যের প্রকৃতি লঘু (trivial sort)। অবশ্য অনেক সময় একই শিল্পীর মধ্যে ঐ দুই প্রকৃতি সহ-অবস্থান করতে না পারে এমন নয়। যা' হোক শিল্পীর মধ্যে মোটামুটি দুটো মনোভঙ্গী (attitude) পাওয়া যায়। গুরুগম্ভীর-প্রকৃতি জীবনের প্রথম দুই বৃত্তের রূপ অর্থাৎ জীবনের গুরুগম্ভীর (serious) রূপ ব্যক্ত

করতে চায়; আর লঘু-প্রকৃতি জীবন নিয়ে ব্যঙ্গ করতে চায়—জীবনের হাস্যোদ্দীপক বিকৃতি-অসঙ্গতিকে রূপ দিতে চায়। এরিস্টটল আরো লক্ষ্য করেছেন—কমেডি প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ দিয়েই জীবন সুরু করেছে এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের (personal satire) পর্যায় অতিক্রম করে—বিশুদ্ধ অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক হাস্যোদ্দীপকের উপস্থাপনায় পরিণত হয়েছে।

যে মহাকবি তোমার গুরুগম্ভীর প্রকৃতি নিয়ে ইলিয়াড অডিসির মত মহাকাব্য রচনা করেছেন, সেই তোমারই আবার লঘুচিত্তে 'মারগাইটিস' সৃষ্টি করে হাস্যরসকে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের স্তর থেকে হাস্যোদ্দীপকের (ludicrous) স্তরে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এরিস্টটল লিখেছেন—"As in the serious style Homer is pre-eminent among poets, so he alone combined dramatic form with excellence of imitation, so he too first laid down the main lines of comedy by dramatising the ludicrous instead of writing personal satire." যা হোক এই বর্ণনাত্মক কাব্যের পর্যায়ের পরে—অর্থাৎ নাট্যের পর্যায়ে লঘুপ্রকৃতি "lampooners became writers of comedy and epic poets were succeeded by Tragedians……"। কমেডির উৎপত্তি সম্পর্কে এইটিই এরিস্টটলের প্রথম কথা এবং সাধারণ কথা। তবে সব কথা নয়। গ্রীক কমেডির উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কথা এই—যে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হয় ডিথিরাম্ব রচয়িতাদের হাতে আর কমেডি রচনা করেন তাঁরাই যাঁরা 'phallic songs'—রচনা করেন। * (The one originated with the authors of the dithyramb, the other with those of the 'phallic songs' which are still in use in many of our cities. IV.—19.) ট্র্যাজেডির ধারাবাহিক ইতিহাস যেমন পাওয়া যায়, কমেডির তেমন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারণ কমেডির কবিকে সামাজিক উৎসবে তেমন মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সুতরাং 'phallic songs' থেকে, একের পর এক অঙ্গ যুক্ত হয়ে হয়ে কিভাবে 'কমেডি' গড়ে উঠেছে তা' জানা যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে কমেডির কাহিনী আমদানী হয়েছিল সিসিলি থেকে এবং এথেন্সবাসীদের মধ্যে ক্রেটিস্‌ই

প্রথম আয়াম্বিক বা ব্যঙ্গ-ছন্দ বাদ দিয়ে কমেডিকে বিষয় এবং বৃত্তের দিক দিয়ে পুরোদস্তুর নাটকের মর্যাদা দান করেন। গ্রীক কমেডির ইতিহাস নিয়ে বেশী সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমাদের আসল কাজ—কমেডির স্বরূপ বা লক্ষণটি জেনে নেওয়া।

কমেডি—এরিস্টটলের মতে—'an imitation of characters of a lower type—not however in the full sense of the word bad. 'lower type' কথাটার তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য। এখানে lower type বলতে নিম্নশ্রেণীর লোক বা মন্দ চরিত্রের লোক বুঝাচ্ছে না ; অর্থাৎ আভিজাত্য বা নৈতিক মানের সঙ্গে 'lower'-কথাটার যোগ নেই। অবশ্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় higher type এবং 'lower type' বিভাগে 'moral character'কেই ভিত্তি করা হয়েছে এবং সেখানে লেখা আছে—comedy aims at representing men as worse। এখানে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে 'worse' —বলতে মন্দ চরিত্রের লোকই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ কথাও ভেবে দেখতে হবে, এরিস্টটল উপস্থাপ্য মানুষকে (man in action) তিন ভাগে ভাগ করেছেন (১) better than in real life. (২) worse. (৩) as they are এই বিভাগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে 'worse' কথাটার মানে দাঁড়ায় স্বাভাবিক বা সাধারণ থেকে এক ধাপ নীচের লোক অর্থাৎ "বিকৃতি"। তবে মনে হয়—মন্দচরিত্রের মধ্যে বিকৃতির মাত্রা বেশী এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিকৃতের সংখ্যা অধিক বলে—"lower type" কথাটা এরিস্টটল কখনো 'মন্দচরিত্র' অর্থে কখনো 'নিম্নশ্রেণীর লোক' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যা'হোক—lower type বলতে আসলে বুঝায় "ludicrous"। এরিস্টফেনিসের কমেডিতেই দেখা যায়—উচ্চশ্রেণীর লোকের পক্ষেও 'ludicrous' হওয়ার বাধা নেই। Ludicrous কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরিস্টটল লিখেছেন—"It consists in some defect or ugliness which is not painful or destructive"—অর্থাৎ হাস্যোদ্দীপকতা নিহিত থাকে সেইজাতীয় বিকৃতি বা কুৎসিত আকারের মধ্যে যা'তে আমাদের মধ্যে কোন বেদনা বা ভয় সঞ্চার হয় না। এখানে এরিস্টটল বিশুদ্ধ হাস্যরসের মূলে প্রবেশ করেছেন। বিকৃতি

দেখে আমাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক তা হচ্ছে—বেদনা এবং কদাকার কোন কিছু দেখার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে—প্রাণনাশের আশঙ্কা অর্থাৎ ভয় ; অথচ সেই বিকৃতি দেখে বা কুৎসিত আকার দেখে মানুষের হাসি আসে এই কারণেই যে মানুষ সমবেদনা বা ভয়ের ভাব নিয়ে ঐ বিকৃতি বা আকারকে দেখে না। সমবেদনা বা ভয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে, বিকৃতি বা কদাকার, হাসির বদলে অবশ্যই বেদনা এবং ভয় জাগাবে। এরিস্টটলই প্রথম সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন—অবশ্য প্লেটোর 'ফিলেবাস'-ডায়ালোগে এই উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায়—যে বিকৃতি অসঙ্গতি বা কুৎসিত আকার প্রভৃতি হাস্যের উদ্দীপক বটে কিন্তু হাসির জন্য যে বিশেষ মানসিক অবস্থা চাই তাতে সমবেদনা বা ভয়ের ভাবের অভাব অবশ্যই আবশ্যক। ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের ক্ষেত্রেও —যেখানে অপরের অপদস্থ অবস্থা বা দুর্দশা দেখে আমোদ হয় সেখানেও সূত্রটি খাটে। ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের মধ্যে অমর্ষের (malice) মাত্রা কিছুটা থাকে এবং তারই মধ্যে ব্যঙ্গের আমোদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিহিত। অমর্ষের ভাব মানেই সমবেদনার অভাব। ব্যক্তির বিকৃতি (আকার-বাক্‌-চেষ্টার বিকৃতি দেখে সমবেদনা বোধ করলে চিত্ত থেকে অমর্ষ-বোধ তিরোহিত হতে বাধ্য। তারপর হব্‌সের বিখ্যাত মন্তব্যটি—"The passion of laughter is nothing else but a sudden glory, arising from a sudden conception of some eminency in ourselves, by comparison of the infirmity of others or with our own formerly."—বিশ্লেষণ করেও দেখা যায়—অপরের বিকৃতি দেখে নিজের মধ্যে হঠাৎ গরিমা-বোধ উপস্থিত হতে পারে একটিমাত্র কারণেই এবং সে কারণটি এই যে বিকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যে সমবেদনাবোধ তা' সাময়িক ভাবে স্থগিত হয়ে যায়। অমর্ষ-বোধ যেমন সমবেদনার অভাবেই সম্ভব, হঠাৎ গরিমা-বোধও সমবেদনার অভাব না ঘটলে সম্ভব হয় না। সমবেদনার অভাব মানে কিন্তু ঘৃণা বা ক্রোধ নয়। সমবেদনার সদ্ভাব ঘটলে চিত্ত বেদনা অনুভব করতে থাকে আর সমবেদনার অভাব বিশেষ মাত্রা অতিক্রম করলেই চিত্ত ঘৃণা বা ক্রোধের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ভল্‌টেয়ার যে বলে রেখেছেন—"Laughter always arises from a gaiety of dis-

position absolutely incompatible with contempt and indignation"—খুবই সত্য কথা। হাসির প্রথম সর্ত—এই "gaiety of disposition"—জীবনের সমস্ত রকমের ছোটখাটো বিকৃতি বা অসঙ্গতিকে হালকাভাবে দেখার মনোভাব। এই মনোভাব (attitude) না থাকলে sudden transformation of a strained expectation into nothing—(কাণ্ট) —হাসির বদলে হতাশ ভাবই সৃষ্টি করবে। হেগেলের—"Inseparable from the comic is an infinite geniality and confidence, capable of rising superior to its own contradiction"—প্রায় একই জাতের কথা এবং আগের মন্তব্যকেই সমর্থন জানায়। তবে ভলটেয়ারের মত মানলে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাসিকে খাঁটি হাসি বলা চলে না। যে হাসি অমর্যমূলক, contempt মেশানো, তাকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দের অভিব্যক্তি বলাই উচিত। রতি, ক্রোধ, বীর, বীভৎস প্রভৃতি রসের সঞ্চারিভাব হিসাবে পাত্রপাত্রীর মধ্যে যে হাসি কল্পিত হয়, তাদের সঙ্গে হাস্যরসের হাসির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, এ কথাটা মনে রাখা দরকার। হাস্যরসের স্থায়িভাব যে 'হাস' (instinct of laughter), তা, 'হাস্যোদ্দীপক' বিভাব-অনুভাব -ব্যভিচারিসংযোগেই—রসতা প্রাপ্ত হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাসি বা অন্যান্য রসের সঞ্চারী হাসির সঙ্গে এর বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও, প্রকৃতিতে এ হাসি পৃথক। এ হাসি লঘু মনে universal ludicrous কে দেখার হাসি। যত রকমের হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতি—আকার-বাক-চেষ্টার (অর্থাৎ দৈহিক -মানসিক উদ্দীপনা) সম্ভব সমস্ত রকম হাস্যোদ্দীপকের নৈর্ব্যক্তিক রূপ দেখার হাসি। এরিস্টটলের মতে—আসল কমেডি—"dramatising the ludicrous"। personal satire" কমেডির বিকৃত রূপ—প্রকৃত রূপ নয়। তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে হাস্যোদ্দীপক উপাদান অর্থাৎ অসঙ্গতি বা বিকৃতি থাকে এবং যে পরিমাণে থাকে সেই পরিমাণেই তারা হাস্যরসের বিভাবাদিতে পরিণত হয়। এই কারণেই ব্যঙ্গ (satire) খাঁটি কমেডি-জাতীয় রচনা হিসাবেই গণ্য হয়ে আসছে।

ব্যঙ্গের সঙ্গে যেখানে সম্প্রদায়ের বা সমাজের বাসনা যুক্ত থাকে—ব্যঙ্গ

যেখানে সম্প্রদায়কে বা সমগ্র সমাজকে আমোদ দেয়, সেখানে সেই সম্প্রদায় বা সমাজের কাছে রচনাটি হাস্যোদ্দীপক বলে তথা "কমেডি" বলেই আদৃত হয়ে থাকে। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার—সার্বজনীন আবেদন তার থাকে না। বিশুদ্ধ হাস্যোদ্দীপককে যে পরিমাণে যিনি রূপ দেন, সেই পরিমাণেই তাঁর রচনার আবেদন সার্বজনীন হয়।

এরিস্টটলের "ludicrous"-এর লক্ষণ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি—সমবেদনার ভাব বা অভাব বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে হাসি সম্ভব নয়। defect 'painful' হয়ে উঠলে বা ugliness "destructive" হয়ে দাঁড়ালে—আর হাস্যোদ্দীপকের গণ্ডীর মধ্যে থাকে না—প্রথমটি করুণ রসের অন্যটি ভয়ানক রসের উদ্দীপক হয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি—সমবেদনার অভাবেই "defect" painful হতে পারে না, এবং সমবেদনার অভাব মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে—ক্রোধ বা ঘৃণার উদ্রেক ঘটারই সম্ভাবনা। তাহলে দেখা যাচ্ছে সমবেদনা ভাবের দিকে এগিয়ে গেলে শোচনায় পরিণত হয় আর অভাবের দিকে সরে গেলে—বিরাগ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। সুতরাং হাসির এলেকায়, সমবেদনা, ভাবাভাববর্জিত এক উদাসীন অবস্থায় বর্তমান এবং তখন চিত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয় আমোদপ্রবণতা। কিন্তু ব্যতিক্রম স্থল নেই কি? ব্যতিক্রম স্থল—দুটি; একটি ব্যঙ্গ-হাসি, অন্যটি "হিউমার।"

ব্যঙ্গ-হাসির ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমবেদনা অভাবের দিকে সরতে সরতে অমর্ষের (malice) কক্ষে উপস্থিত। সুতরাং অমর্ষ থাকা সত্ত্বেও হাসি সম্ভব—এই কথা মানতে হচ্ছে। ঐ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে—সামর্ষ হাসি বিশুদ্ধ হাসি নয়। আবার সমালোচকরা দেখেছেন—সমবেদনার সদ্ভাব সত্ত্বেও একপ্রকার হাসি সম্ভব। এই হাসিকে বলা হয়েছে—"হিউমার"জন্য হাসি। এ সম্পর্কে সমালোচক বুচার যা লিখেছেন উদ্ধৃত করা যাক্—Humour, enriched by sympathy, directs its observation to the more serious realities of life. It looks below the surface, it rediscovers the hidden incongruities and deeper discords to which use and wont have

deadened our perception. It finds everywhere the material both for laughter and tears ; and pathos henceforth becomes the companion of humour. ... ...Humour is the meeting-point of tragedy and comedy.

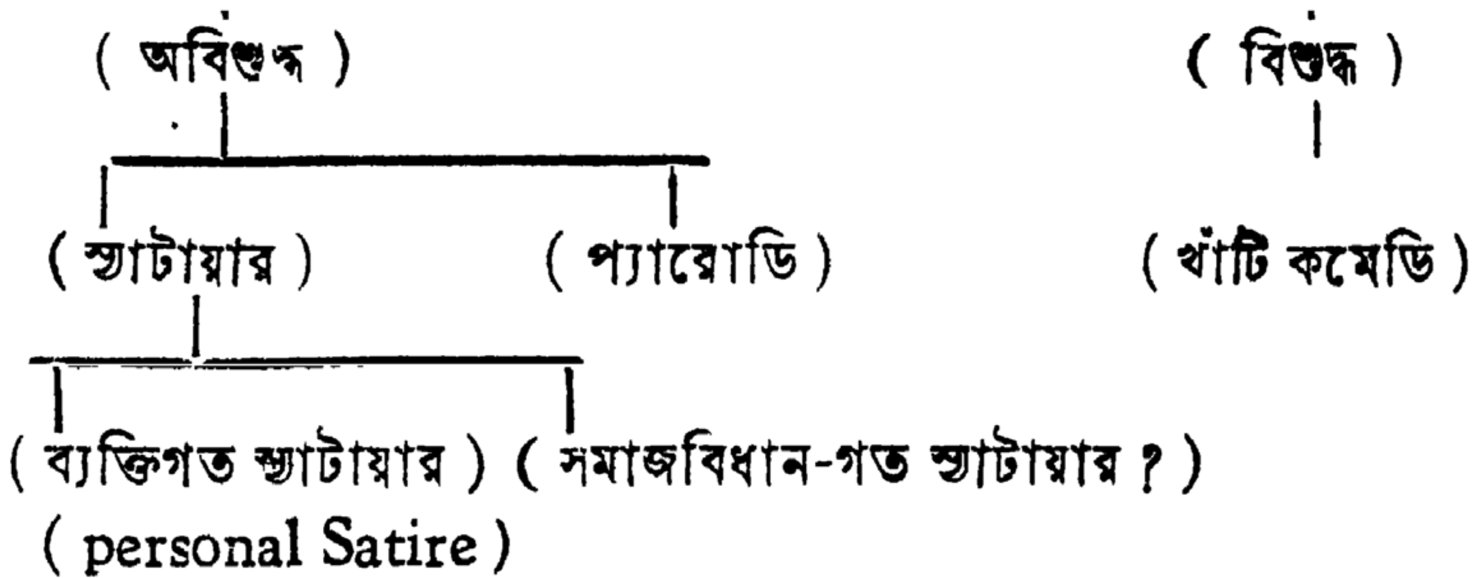
সার সংগ্রহ করে বলা যাক—(ক) হিউমার সমবেদনামূলক রসিকতা—গুরুতর জীবনসত্যকে রসিকের দৃষ্টিতে দেখা (খ) অভ্যাসবশে যে সমস্ত গভীর অসঙ্গতি ও বিকৃতি সাধারণের চোখে পড়ে না, হিউমার-রসিক সেই সব অব্যক্ত বিকৃতি ও অসঙ্গতিকে তলিয়ে দেখেন এবং হাসেন (গ) সর্বত্রই তার চোখে হাসি-কান্নার কারণ ছড়ানো (ঘ) হিউমার ট্র্যাজেডি কমেডির সঙ্গমস্থল—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "মুখের হাসি চোখের জল মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি।"

এখন, এরিস্টটলের সূত্রানুসারে—defect যেখানে pain সৃষ্টি করে অর্থাৎ অপরের বিকৃতি দেখে মানুষ বেদনা বোধ করে, সেখানে হাসি সম্ভব নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে সমবেদনা এবং করুণা জাগা সত্ত্বেও হাসি যে সম্ভব "হিউমার"ই তার নিদর্শন। তবে কি এরিস্টটলের কথা সত্য নয়? প্রশ্নটি অবশ্যই বিশেষ আলোচনা দাবী করতে পারে। প্রথমেই "হিউমার"-এর প্রকৃতি সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা যাক। হিউমার ও স্যাটায়ারের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—"স্যাটায়ারিস্ট" মানব সমাজের একজন হয়েও নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন; আর "হিউমারিস্ট"—নিজেকে দশের একজন বলেই মনে করেন, স্যাটায়ারিস্ট ব্যক্তির বিকৃতি অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেন—ব্যক্তিকে হেয় করবার জন্য, আর "হিউমারিস্ট"—"sees around him shattered ideals, he observes the irony of destiny ; he is aware of discords and imperfections, but accepts them with playful acquiscence and is saddened and amused in turn." লক্ষ্য করবার বিষয়—হিউমারিস্ট "is saddened and amused in turn।" জগতের অসঙ্গতি ও বিকৃতি দেখে, জীবনে আদর্শের অপমৃত্যু, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস প্রভৃতি দেখে শুনে, হিউমারিস্টের চোখে সুখ-দুঃখ যেন রসিকতা বলেই মনে

হয়। তাই তো দুঃখের মধ্যেও সে রসিকতার উপাদান খুঁজে পায় এবং পেয়ে হেসে উঠে—যেন তার "চোখের জল ফেলতে হাসি পায়"। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে যখনই জীবনের জন্য সমবেদনা আসে সে "saddened"—দুঃখিত না হয়ে পারে না, কিন্তু দুঃখ আসতে না-আসতে—অর্থাৎ সমবেদনা জাগতে না জাগতে, রসিক-সত্তা এত প্রধান হয়ে পড়ে যে সমবেদনা তিরোহিত না হলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়—সে "amused" হয়। রসিকের প্রাধান্য না ঘটলে নিশ্চয়ই "amused" হওয়া অসম্ভব নয়। একটা কথা সর্বদাই মনে রাখা দরকার—হিউমারিস্ট রসিক লোক—হাস্যরসিক লোক বলেই পরিচিত এবং হিউমার হাস্যরস সৃষ্টিরই অন্যতম উপাদান। সুতরাং দুঃখের হাসি এবং হিউমারের মধ্যে পার্থক্য আছে। হাসি যেখানে করুণরসেরই সঞ্চারী হিসাবে দেখা দেয় তা' শোচনাকেই পরিপোষণ করে। হাস্যরসের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। 'করুণ হাসি' করুণকেই প্রকাশ করবার উপায় বিশেষ। করুণরসেই সে হাসির পরিণতি। কিন্তু হিউমারের পরিণতি প্রধানতঃ হাস্যরসে। যেখানে সমবেদনা ঐকান্তিক বা স্থায়ী সেখানে বেদনাই থাকতে পারে, 'হিউমার' থাকতে পারে না। কারণ সমবেদনা যথার্থ রূপে এবং যথেষ্টমাত্রায় উদ্রিক্ত বা ব্যক্ত হলে 'আমোদ' বা রসিকতা তিরোহিত হতে বাধ্য। আমোদ ও রসিকতা যে পরিমাণে তিরোহিত হয় সেই পরিমাণে হিউমারও উবে যায়। সুতরাং সমবেদনাকে এমন মাত্রায় আবদ্ধ থাকতে হবে যাতে রসিকতার প্রবৃত্তি নষ্ট না হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে স্যাটায়ারে হাসির পাত্র হাস্যরসিকের সমবেদনা থেকে বিযুক্ত এবং হিউমারে সমবেদনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ঐ যোগ ঐকান্তিক নয়। হিউমারে সমবেদনা সম্পর্কে চিত্তের অনেকটা যেন 'না-গ্রহণ না-বর্জন' নীতি। সমবেদনার প্রবণতা থাকে কিন্তু যথার্থ সমবেদনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া থাকে না। স্যাটায়ারে সমবেদনা সহজেই প্রত্যাহৃত আর হিউমারে সমবেদনা যেন অবদমিত (repressed)—রসিকতার স্রোতের তলে আচ্ছন্ন—থেকেও যেন নেই। তাই তো 'defect' সমবেদনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া—pain সৃষ্টি করে না—হাসির সৃষ্টি করে। তবে অবদমিত সমবেদনার আর্দ্রতা এই

হাসির সঙ্গে মিশে থাকে বলে—ব্যঙ্গ হাসির এবং বিশুদ্ধ হাসির প্রকৃতি থেকে এর প্রকৃতি পৃথক হয়।

অতএব বলা যেতে পারে এরিস্টটল হাস্যোদ্দীপকের (ludicrous) সংজ্ঞা দিতে যা' বলেছেন তা' মিথ্যা নয়। হাসি স্যাটায়ার-জনিত, বিশুদ্ধ বা হিউমার-জনিত যে জাতেরই হো'ক না কেন…"হাস" স্থায়িভাবকে রসতা দান করাই বড় কথা অর্থাৎ চরিত্র স্যাটায়ার-প্রধান হোক বা বিশুদ্ধ হাস্যোদ্দীপক হোক অথবা হিউমার-প্রধান হো'ক—হাস্যজনক বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাব সৃষ্টিই "কমেডি"-কারের আসল উদ্দেশ্য। কমেডি-সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণাকে ছক করে প্রকাশ করতে গেলে এমনি একটা ছক করা যায় :—



এই তালিকার মধ্যে যে কয়টি নাম দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র "সমাজবিধান-গত স্যাটায়ার" পোয়েটিক্‌স-এ উল্লিখিত হয়নি। এরিস্টফেনিসের স্যাটায়ার প্রধান কমেডিতে যেমন ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ আছে, তেমনি সমাজ-বিধান (যুদ্ধ ইত্যাদি) নিয়েও ব্যঙ্গবিদ্রূপ রয়েছে, সুতরাং—personal satire-এর বিপরীত কোটিতে social satire—কল্পনা করা যেতে পারে। এরিস্টটল স্পষ্ট উল্লেখ না করলেও—তার অভিপ্রায় অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা যাক—এরিস্টফেনিসের কমেডিগুলিকে

বলা হয় "old comedy"; এই কমেডিগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এই সব নাটকে পাত্র-পাত্রীর কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা যেমন আছে, তেমনি আছে—বিতর্ক-নাটকের (discussion drama) প্রধান লক্ষণটি—কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিচার বিতর্ক। এরিস্টফেনিস এ বিষয়ে অগ্রদূত। "Middle comedy" বা "New comedy"—রূপে-রসে যত পরিপাটিই হো'ক না কেন—বিচার-বিতর্কের দিক দিয়ে অর্থাৎ মনন-মহিমার দিক দিয়ে দীন হয়ে গেছে।

আর একটা কথা—এখানে উত্থাপন করতে চাই। আজও পর্যন্ত এ কথা কেউ উত্থাপন করেননি। প্রশ্নাকারে বল্লে এই ভাবে বলা যায়—কমেডি বলতে এরিস্টটল কি শুধু হাস্যরসাত্মক নাটকই বুঝেছেন? পরবর্তীকালে সিরিয়াস কমেডি বলতে যে ধরনের নাটক ধরা হয়েছে—তার ধারণা কি এরিস্টটলের ছিল?

কমেডি শুধু হাস্যরসাত্মক নাটক—এই ধারণার পক্ষে যুক্তি :—

(ক) Lampooners became writer of comedy.

(খ) The one originated with the authors of the Dithyramb, the other with those of the phallic songs……

(গ) Comedy is...on imitation of characters of a lower type……Ludicrous being merely a subdivision of the ugly.

কিন্তু ট্র্যাজেডির উপযুক্ত পরিণাম আলোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল এমন একটি মন্তব্য করেছেন যা'তে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে আনন্দপরিণাম মিলনান্ত নাটক, "সিরিয়াস" হলেও অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে ট্র্যাজেডি বলে পরিচিত হলেও,—আসলে কমেডি। তিনি লিখেছেন—"In the second rank comes the kind of tragedy which some place first. Like the odyssey it has a double thread of plot and also an opposite catastrophe for the good and bad……………… The pleasure, however, thence derived is not the true tragic pleasure. *It is proper rather to comedy where those who,

in the piece, are the deadliest enemies—like Orestes and Aegisthus—quit the stage as friends at the close and no one slays or is slain." কমেডিতেও যে দ্বন্দ্ব থাকে—এবং শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বের আনন্দ-পরিণাম সমাধান ঘটে—এ ধারণা এরিস্টটলের মধ্যে রয়েছে। catastrophe অর্থাৎ পরিণামের প্রকৃতির মধ্যেই ট্র্যাজেডি-রসের বা কমেডি-রসের শেষ নিষ্পত্তি অনেকটা নির্ভর করে—এ সম্বন্ধেও এরিস্টটল সচেতন। তা'হলে দেখা যাচ্ছে—সিরিয়াস কমেডির ধারণা এরিস্টটলের চেতনায় প্রথম ধরা পড়েছে। তিনি যেন বলতে চান—ট্র্যাজেডির মত "সিরিয়াস" ঘটনা নিয়ে লেখা হলেও যেখানে পরিণাম আনন্দময় বা মিলনান্ত, সেখানে নাটককে ট্র্যাজেডি রসাত্মক না বলে কমেডি-রসাত্মক বলাই যুক্তিযুক্ত।—কমেডির এই উন্নততর রূপকে পরবর্তীকালে ট্র্যাজি-কমেডি, সিরিয়াস কমেডি প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছে। এদের রস-পরিণতি হাসিতে নয়—আনন্দ অনুভূতিতে—কোথাও বা মিশ্র অনুভূতিতে।

প্রাক্-রেনাসাঁ ও রেনাসাঁ-যুগে কমেডি-লক্ষণ

কমেডির ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে—নিছক "হাস্যোদ্দীপকের অনুকরণ" থেকে কমেডি প্রথমে হাস্য-মিশ্র আনন্দদায়কের ঘটনার অনুকরণ—এবং পরে "হাস্য"-বেদনা-আনন্দ মিশ্র ঘটনার অনুকরণ-এ পরিণত হয়েছে। প্রাক্ রেণাসাঁ-যুগের কমেডি-লক্ষণ নিম্নলিখিত মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায় :—

(ক) থিওক্রেসটাসের মতে—ডাওমিডিস বলেন—কমেডিতে "private and civil fortunes" রূপ দেওয়া হয়।

(খ) Euanthius Donatus-এর গ্রন্থে পাওয়া যায়—

(১) কমেডির উপস্থাপ্য বিষয়—সাধারণ লোকের জীবন

(২) কমেডির আরম্ভ হয়—দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভ দিয়ে, শেষ হয় শান্ত ও আনন্দজনক পরিণতিতে

(গ) Diomedes-এর 'Ars grammatica'-র তৃতীয় অধ্যায়ে ট্র্যাজেডি-কমেডির পার্থক্য নির্দেশ করবার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

(১) ট্র্যাজেডির চরিত্র = বীর, বড় বড় নায়ক, রাজারাজড়া
কমেডির „ = ছোট ও সাধারণ লোক

(২) ট্র্যাজেডিতে প্রধানতঃ থাকে = বিলাপ, নির্বাসন, রক্তপাত
কমেডিতে „ „ = প্রেমের ব্যাপার প্রভৃতি

(ঘ) Isidore of seville, (7th cent)

(১) কমেডির উপস্থাপ্য—"acts of private men"
ট্র্যাজেডির " —public matters & histories of king
কমেডির বিষয়বস্তু—আনন্দদায়ক ব্যাপার
ট্র্যাজেডির „ —বেদনাদায়ক „

*স্পিনগার্ণ মহোদয় মধ্যযুগের ধারণাকে তালিকাবদ্ধ করেছেন এই ভাবে :

(ক) ট্র্যাজেডির চরিত্র = রাজা, রাজকুমার, বিখ্যাত নায়ক
কমেডির „ = নীচুশ্রেণীর লোক ও সাধারণ নাগরিক

(খ) ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য ঘটনা = মহান ও ভয়ঙ্কর
কমেডির „ „ = অতিপরিচিত ও পারিবারিক ঘটনা

(গ) ট্র্যাজেডি আরম্ভে আনন্দদায়ক, পরিণামে ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক
কমেডি „ দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ „ আনন্দদায়ক

(ঘ) ট্র্যাজেডির প্রকাশরীতি = গাঢ়বন্ধ, গাম্ভীর্যপূর্ণ
কমেডির „ = হালকা ও কথ্য

(ঙ) ট্র্যাজেডির বিষয় = সাধারণতঃ ঐতিহাসিক
কমেডির „ = সর্বদাই কবিকল্পিত

(চ) কমেডিতে থাকে = প্রেমের ব্যাপার, ঠকানোর ব্যাপার
ট্র্যাজেডিতে „ = নির্বাসন, রক্তপাত প্রভৃতি ব্যাপার

উল্লিখিত লক্ষণরাজির পটভূমি হিসাবে প্লটাস ও টেরেন্স-লিখিত রোমান কমেডিগুলি দাঁড়িয়ে আছে। রোমান কমেডির স্তরেই দেখা যায়—কমেডি নিছক হাস্যোদ্দীপকের উপস্থাপন মাত্র নয়। কমেডির মধ্যে দুটো বৃত্ত—

একটি প্রধান বৃত্ত, অন্যটি উপবৃত্ত। প্রধান বৃত্তে—প্রেমের কাহিনী, ষড়যন্ত্রের কাহিনী বর্ণিত, উপবৃত্তে—হাস্যোদ্দীপক চরিত্র ও ঘটনা উপস্থাপিত। মধ্যযুগে "কমেডি" শব্দটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তার বড় প্রমাণ রয়েছে দান্তের "ডিভাইন কমেডি" নামকণের মধ্যে। দান্তের মতে—যে কাব্য গম্ভীর রীতিতে লিখিত—যার আরম্ভ সুখকর—শেষ দুঃখকর ও ভয়ঙ্কর সেই কাব্য ট্র্যাজেডি। সুতরাং তাঁর কাব্য—যার আরম্ভে নরক এবং শেষে স্বর্গ —কমেডি। বলা বাহুল্য—'ডিভাইন কমেডিকে' আমরা সিরিয়াস (ট্র্যাজি-কমেডির নমুনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

রেনাসাঁ-যুগে অনেকেই এরিস্টটলের—"ludicrous"—শব্দটির উপর ভাষ্য রচনা করেছেন। ত্রিসিন্নো (১৫৬৩) বলেছেন—সেই সব ছোটখাটো বিকৃতি যা করুণ বা ভয়ানক নয় এবং যা আমাদের মধ্যে নেই বলেই আমাদের আনন্দ —হাসি সৃষ্টি করে থাকে। লক্ষ্য করবার বিষয়—হাস্যের—হাস্য তত্ত্বের বীজ রয়েছে ত্রিসিন্নোর—সিদ্ধান্তের শেষাংশে—"which we perceive in others but do not believe to be in ourselves (স্পিনগার্ণ)। এরিস্টটলের পরে নতুন কথা এইটুকু। মগ্‌গি (Maggi) আর একটু নতুন যোজনা করেছেন—idea of suddenness or novelty'-র সর্ত যোগ করে। 'Uglinless' 'painless' হলেই হাসি সৃষ্টি করে না। বহু প্রচলিত বা পরিচিত 'painless ugliness' হাসির সৃষ্টি করে না। স্ক্যালিগের (১৫৬১) —কমেডিকে ষড়যন্ত্র (negotiosum)-পূর্ণ, প্রচলিত রীতিতে-লেখা আনন্দ-পরিণাম নাটক বলেছেন। কমেডির চরিত্র—প্রধাণতঃ অভিজাত বা গ্রাম্য বৃদ্ধ ভৃত্য, সভাসদ্। কমেডিতে ঘটনার আরম্ভ হয় তীব্র সংঘাত নিয়ে,—শেষ হয় মিলনের আনন্দে এবং কমেডির রচনারীতি—না-লঘু ও না-গুরু। কমেডির বিষয়বস্তু সাধারণতঃ—ক্রীড়া, ভোজনোৎসব, বিবাহ, মাতলামি প্রভৃতি। রেনাসাঁতে কমেডির রূপ ও রস সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে—তার পরিচয় এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কমেডির স্বরূপ ও শ্রেণী-বিভাগ নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে। এই শতাব্দীতেই ট্র্যাজি-কমেডি এবং সিরিয়াস কমেডি

শ্রেণীর নাটক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফরাসী সমালোচক ওগিয়েরু (১৬২৮) দেখাতে চেষ্টা করেছেন—'ট্র্যাজি-কমেডি' নামে নতুন জাতি হিসাবে পুরাতন। ইউরিপিডিসের "সাইক্লোপ্‌স" তাঁর মতে—ট্র্যাজি-কমেডি শ্রেণীর প্রথম নাটক। নাট্যকার-সমালোচক পিয়েরি কর্ণেই—কমেডির শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে লিখেছেন—যে নাটকের ঘটনাগুরুত্বপূর্ণ অথচ পরিণামে নায়ক—'does not meet the risk of death, loss of states or banishments' সে নাটকের "right to a higher name than Comedy"—স্বীকার করা যায় না। এই জাতীয় নাটককে তিনি "হিরোয়িক কমেডি" বলেছেন। পরবর্তীকালে এই নাটকই 'সিরিয়াস কমেডি' নাম পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিদেরো (১৭৫৮) কমেডিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—এক—"গে কমেডি"; দুই—"সিরিয়াস কমেডি"। বুমারকেই (১৭৬০) প্রভৃতিও হাস্যোদ্দীপক ও হিরোয়িক ট্র্যাজেডির মাঝে এক শ্রেণীর নাটকের অস্তিত্ব সম্ভব বলে মনে করেছেন—দেখিয়েছেন তার মধ্যে ট্র্যাজেডির অশ্রু এবং কমেডির আনন্দ ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। "টিয়ারফুল কমেডি" নাম দেওয়া যায় কিনা এ প্রশ্নও তাঁর মনে জেগেছে।

অধ্যাপক নিকল, কমেডির মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী কল্পনা করেছেন :—

(ক) যে কমেডিতে বিষয়বস্তু ও সংলাপ হাস্যোদ্দীপক—পরিণতি—আনন্দজনক।

(খ) ব্যঙ্গ-প্রধান কমেডি

(গ) ড্রেম-কমেডি—গুরু-গম্ভীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে হাস্যোদ্দীপক উপাদানের সংমিশ্রণে ঘটে।

(ঘ) ট্র্যাজি-কমেডি—যেখানে—Comic is the main theme and the tragic forms an under-plot

*["ড্রেম"—নাটক কমেডির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।]

অন্য ভিত্তিতে কমিক রচনাকে তিনি পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন :—

(ক) প্রহসন (ফার্স)

(খ) কমেডি অফ হিউমারস (কমেডি অফ স্যাটায়ার)

(গ) কমেডি অফ রোমান্স+(ট্র্যাজি-কমেডি)

(ঘ) ,, ,, ইনট্রিগ

(ঙ) ,, ,, ম্যানারস+(জেণ্টিল কমেডি; কমেডি অফ উইট)

অধ্যাপক নিকলের এই শ্রেণী-বিভাগ উপাদানের প্রাধান্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং খুব যে পরিপাটি বিভাগ তা' বলা যায় না। নিকলও তা বলেননি। যা'হোক উপসংহারে শুধু আগের একটা কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাচ্ছে—"কমেডির ক্রমবিকাশে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়—প্রথম পর্যায়ে কমেডি হাস্যোদ্দীপক রচনা, দ্বিতীয় পর্যায়ে—হাস্যরস মিশ্র আনন্দ-পরিণাম রচনা, তৃতীয় পর্যায়ে—কমেডি সিরিয়াস মিলনান্ত নাটক—ট্র্যাজি-কমেডি ও সমস্যামূলক নাটক। এরিস্টটল পোয়েটিক্‌স-গ্রন্থে প্রথম পর্যায়ের "কমেডি" লক্ষণ নিরূপণ করেছেন, তবে দ্বিতীয়-তৃতীয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আভাস দিয়েছেন মাত্র।

ট্র্যাজেডি

ট্র্যাজেডির আলোচনা পোয়েটিক্‌স-গ্রন্থের প্রায় বার আনা স্থান অধিকার করে আছে। এই হিসাবে, পোয়েটিক্‌সকে ট্র্যাজেডির আলোচনা বল্‌লে খুব বেশী অতিশয়োক্তি করা হয় না। যা'হোক, এরিস্টটলের ট্র্যাজেডি—আলোচনাকে আমি নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদে ভাগ করে উপস্থাপিত করতে চাই:—

(১) গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

(২) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা

(৩) ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু

(৪) ,, নায়ক

(৫) ,, রস

(৬) ,, পরিণতি

(৭) ট্র্যাজেডির উপাদান ও গঠন
(৮) „ শ্রেণী-বিভাগ
(৯) ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামা

(১)

গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পূর্বেই এ কথা বলা হয়েছে যে এরিস্টটল বৈজ্ঞানিক সংস্কার বশেই বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব কিছুর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে চেষ্টা করেছেন। কথাটির বড় সমর্থন পাওয়া যায়—ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনার মধ্যে। এরিস্টটল এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছেন—কি করে "ডিথিরাম্ব"—গীতি থেকে ধীরে ধীরে একটির পর একটি পাত্র যোজনার ফলে, ট্র্যাজেডি নাটকের বর্তমান রূপের উদ্ভব ঘটেছে। তাঁর সিদ্ধান্ত—ট্র্যাজেডি "Originated with the authors of the Dithyramb এবং "Tragedy advanced by slow degrees each new element that showed itself was in turn developed. Having passed through many changes, it found its natural form and there it stopped". বিবর্তনবাদী 'stop'-এর কথা বলেছেন বটে, কিন্তু এ কথাও বলে রেখেছেন,—"Whether Tragedy has as yet perfected its proper types or not···বিচার্য বিষয়।

গ্রীক ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—এইস্কিলাস প্রথম দ্বিতীয় পাত্র প্রবেশ করান এবং কোরাসের প্রাধান্য কমিয়ে সংলাপের প্রাধান্য বৃদ্ধি করেন। সফোক্লিস্ পাত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে তিন করেন এবং চিত্রিত দৃশ্য যোজনা করেন। এইভাবে ক্রমে ছোট বৃত্তের স্থলে বড় বৃত্ত প্রচলিত হয় এবং লঘু 'Satiric form' এর স্থলে ট্র্যাজেডির গুরু-গম্ভীর রীতি দেখা দেয়।

গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে পরে অনেকেই অনেক

কথা বলেছেন। সকলেই এ কথা স্বীকার করেছেন—'ডাওনিসাস' উপাসনাকে কেন্দ্র করেই ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ঘটেছে। কেউ কেউ আরো পিছিয়ে গিয়ে আদিম—দীক্ষা-বিধির (initiation) মধ্যে ট্র্যাজেডির উৎস আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন (টমসনের Aeschylus and Athens গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। যে যাই করুন, এ বিষয়ে এরিস্টটল যা' বলেছেন তা এখনও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়নি। এ আলোচনা এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা

ট্র্যাজেডির 'formal definition' দিয়ে এরিস্টটল ট্র্যাজেডির আলোচনা আরম্ভ করেছেন। এই সংজ্ঞাটিই ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা হিসাবে চলে আসছে। সংজ্ঞাটি এই—"Tragedy then is an imitation of an action that is serious, Complete and of certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament the several kinds being found in separate parts of the play ; in the form of action not of narrative, through pity and fear effecting proper purgation of these emotions." এই সংজ্ঞার মধ্যে মোট চারটি উপলক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে।

(১) imitation of an action that is serious······

(২) in language embellished with each kind of artistic ornament.

(৩) in the form of action, not of narrative.

(৪) through pity and fear········

এই চার উপলক্ষণের মধ্যে—প্রথমটিতে ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে—ট্র্যাজেডিকে কমেডি থেকে পৃথক করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি—অনুকরণ মাধ্যম সম্পর্কিত; তৃতীয়টি—দৃশ্যকাব্যের সাধারণ লক্ষণ—শ্রব্য

কাব্য থেকে নাটককে পৃথক করেছে এবং চতুর্থটি—ট্র্যাজেডির রস-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। সিরিয়াস কথাটার তাৎপর্যের মধ্যেই—লক্ষণটি নিহিত আছে।

সংজ্ঞাটিকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে :—

(ক) ট্র্যাজেডি দৃশ্য কাব্য—শ্রব্য কাব্য নয় (এপিক থেকে এই কারণে পৃথক)।

(খ) ট্র্যাজেডিতে "সিরিয়াস" বিষয়বস্তু উপস্থাপিত—(কমেডির সাথে এইখানে তার পার্থক্য)।

(গ) ট্র্যাজেডিতে "incidents arousing pity and fear—উপস্থাপিত বলে—ট্র্যাজেডি ভয়ানকমিশ্র করুণরসের নাটক।

(ঘ) গীত ও ছন্দোবদ্ধ সংলাপের সাহায্যে ট্র্যাজেডিতে অনুকরণ সম্পন্ন হয়।

এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়—ট্র্যাজেডি জীবনের ভয়ানক ও করুণ ঘটনা অবলম্বনে রচিত, ভয়ানক-মিশ্র করুণ রসাত্মক দৃশ্য কাব্য। ট্র্যাজেডি তাঁদেরই কাহিনী—"those who have done or suffered something terrible".

বিষয়বস্তু

ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য বিষয়—সংক্ষেপে বললে—'actions which excite pity and fear"—আরো সংক্ষেপে—'action that is serious' অর্থাৎ মানুষের জীবনের সেই সমস্ত ঘটনা যা' মানুষের মনে ভয় ও করুণা উদ্রিক্ত করতে সক্ষম। এরিস্টটল—নিজেই "the circumstances which strike us as terrible or pityful"—নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—পরস্পর দুই শত্রুর মধ্যে যখন একে অন্যকে হত্যা করে, তখন হত্যা ব্যাপারে এবং হত্যার উদ্দেশ্যে শোচনীয় বলে কিছু থাকে না—শুধু যন্ত্রণা যতটুকু শোচনীয় হয়, ততটুকুই তাতে শোচনীয়ত্ব।

পরস্পর উদাসীন ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা। কিন্তু যেখানে ঘটনা ঘটে প্রিয়জনের মধ্যে—আত্মীয় স্বজনের মধ্যে—যেমন ভাই যখন ভাইকে হত্যা করে বা করতে উদ্যত হয়, পুত্র পিতাকে, মাতা পুত্রকে, পুত্র মাতাকে, হত্যা করে বা করতে উদ্যত হয় অথবা এই ধরনের সাংঘাতিক কোন কাজ করে বসে—তখনই ঘটনা আসলে তীব্রভাবে শোচনীয় হয়ে উঠে) এবং "these are the situations to be looked for by the poet". তবে এই সব হচ্ছে আদর্শ পরিস্থিতি এবং বোধ হয় এই কারণেই আদর্শ যে এই সব ঘটনায় মানুষের মনুষ্যত্বের মহিমা-বোধ, নীতিবোধ—শ্রেয়োবোধ তীব্রভাবে আলোড়িত হয়—হৃদয় তীব্রতম অনুভূতিতে পরিস্পন্দিত হয়।) আবেগ ও আকর্ষণের গতি-বেগ যেখানে বেশী, সেখানে আহত আবেগের ও বিকর্ষণের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতাও বেশী। এই কারণেই তীব্র আবেগের পরিমণ্ডলেই আদর্শ ট্র্যাজেডি-পরিস্থিতি সম্ভব। গভীর ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব তো সেখানেই যেখানে দ্বন্দ্বের দুই পক্ষেই সমান শক্তি। তীব্রতম অন্তর্দাহ আসে তখনই যখন মানুষ প্রবৃত্তির বশে বা পরিবেশের চাপে তার হৃদয়ের প্রেয়তমকে, তার আত্মার শ্রেয়তমকে, পরিহার করে, বিনাশ করে বসে। যা' জীবনে প্রেয়তম-শ্রেয়তম, তাকে হারানোর বেদনাই জীবনের তীব্রতম বেদনা।) সেখানেই জীবনের মহতী বিনষ্টি। বড় ট্র্যাজেডি সেখানেই যেখানে মানুষ প্রবৃত্তির প্রেরণায় প্রেয়কে লাভ করতে গিয়ে, শ্রেয় হারিয়ে বসে ; এবং প্রেয়-শ্রেয় দু'ই হারিয়ে, মহাশূন্যতার হাহাকারে, অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে শোচনীয়ভাবে জীবন শেষ করে ; অথবা মানুষ নিয়তির ষড়যন্ত্র, বাহ্যিক পরিবেশের চাপে নিরুপায়ভাবে প্রেয়কে ও শ্রেয়কে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং দৈহিক-মানসিক ও আত্মিক দুঃখ-দুর্দশায় শোচনীয়ভাবে জীবন শেষ করে। এই সব জীবনের রূপই—অর্থাৎ তাদেরই কাহিনী যারা 'have done or suffered something terrible'—ট্র্যাজেডির আসল উপস্থাপ্য বিষয়। জীবন যেখানে জীবনের উদ্দাম কামনাবশে, হঠাৎ উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে জীবনের মহৎ সম্ভাবনাকে অকালে বিনাশ করে—জীবনের কক্ষ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অপরকে আঘাত করে, নিজেকে আহত করে করে শেষ

পর্যন্ত শোচনীয় রিক্ততায় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়, সেখানে জীবন 'does something terrible'; আর জীবন যেখানে জীবনের মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, প্রবলতর পরিবেশের সম্মুখীন হয় এবং সেই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিষ্ফল সংগ্রাম করে বার বার পরাজিত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে—চারদিক-থেকে-ঘিরে-ধরা আঘাত-উৎপীড়ন-লাঞ্ছনায়, দুঃখ-দুর্দশায় জর্জ্জরিত হতে হতে জীবনের তাপ হারিয়ে ফেলতে থাকে—শেষ পর্যন্ত প্রাণ ত্যাগ করেই প্রাণের মর্যাদা রাখার শেষ চেষ্টা করে, সেখানে suffers something terrible। 'doing something terrible এবং suffering something terrible'—উভয় ক্ষেত্রেই জীবনের অভিযোজন প্রচেষ্টা ব্যর্থ।—উভয় ক্ষেত্রেই জীবনের অপচয়—মহাবিডম্বনা—শোচনীয় পরিণাম। প্রথম ক্ষেত্রে জীবন জীবনের কক্ষ থেকে উৎক্রান্ত—উদ্‌ভ্রান্ত, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে জীবন কক্ষের মধ্যেই অবস্থিত, কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় আক্রান্ত পরাজিত ও লাঞ্ছিত। এই সব "সিরিয়াস এ্যাকশন"—ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য বিষয়।

ট্র্যাজেডির নায়ক

'ট্র্যাজেডির নায়ক' বিষয়ক আলোচনার সূচনায়—(মুখবন্ধ হিসাবে) এরিস্টটল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—ট্র্যাজেডি "imitations which excite pity and fear, this being the distinctive mark of tragic imitation"—অর্থাৎ ট্র্যাজেডির বৃত্ত—নায়কের ভাগ্য-বিপর্যয়াদি—এমন ধরনের হওয়া চাই যাতে করুণা ও ভয় জাগ্রত হয়। কারণ ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে করুণ ও ভয়ানক ঘটনার উপস্থাপনা। এই প্রথম স্বতঃসিদ্ধ থেকে তিনি অনুসিদ্ধান্ত টেনে দেখিয়েছেন যে—(ক) কোন ধার্মিক লোকের (virtuous man) ঐশ্বর্য থেকে দারিদ্র্যের মধ্যে পতন দেখানো চলবে না। কারণ এই পতনের দৃশ্য আমাদের মধ্যে করুণা বা ভয় কোন ভাবই জাগায় না, এই ধরনের দৃশ্য দেখে

আমরা শুধু আঘাতই পেয়ে থাকি (it merely shocks us) (খ) অসৎলোকের—দুরবস্থা থেকে সু-অবস্থায় উন্নতি দেখানো চলবে না; কারণ এ দৃশ্য ট্র্যাজেডি-রসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাতে না তৃপ্ত হয় নৈতিক চাহিদা, না জাগায় করুণা বা ভয়। (গ) অতি দুর্বৃত্তের পতনের দৃশ্যও অচল। এতে নৈতিক চাহিদা মেটে বটে, কিন্তু করুণা বা ভয় কোনটিই জাগে না। কারণ —করুণা জাগে—'unmerited misfortune'—অনুচিত বা অপ্রাপ্য ভাগ্যবিপর্যয় দেখে, আর ভয় জাগে—'misfortune of a man like ourselves'—দেখে। সুতরাং বাকী থাকে এই দুই অতিমাত্রার মাঝখানকার চরিত্র অর্থাৎ সেই চরিত্র যে "eminently good and just—নয়, আর যার পতন কোন "vice or depravity"-র ফলে ঘটে না; ঘটে "by some error or frailty."

ট্র্যাজেডি-নায়ক সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্য ছাড়া এরিস্টটল আরো কয়েকটি মন্তব্য করেছেন—যেমন :—

(ক) Comedy aims at representing men as worse Tragedy as better than in real life অর্থাৎ "higher type"—(কমেডিতে—"lower type".)

(খ) He must be one who is highly renowned and prosperous—a personage like Oedipus, Thyestes or other illustrious men of such families."

(গ) Tragedy is an imitation of persons who are adove the common level.

এইবার এরিস্টটলের বক্তব্যকে সুনির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করা যাক। ট্র্যাজেডি জীবনের "সিরিয়াস" অর্থাৎ গভীর ভাবাবেগ-সংপৃক্ত রূপের অনুরূপায়ণ। সুতরাং ট্র্যাজেডির নায়ককে—(তথা ঘটনাকেও) অবশ্যই "সিরিয়াস"—মহিমাসম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ ট্র্যাজেডি-নায়কের গৌরব থাকা চাই—গুরুত্ব থাকা চাই, চিত্তাকর্ষকত্ব থাকা চাই। বলা বাহুল্য এই গৌরবের মধ্যেই নায়কের অসাধারণত্ব নিহিত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এই গৌরব কি শুধু খ্যাতি

গৌরবে বা ঐশ্বর্য-গৌরবেই সীমাবদ্ধ? ট্র্যাজেডি নায়ককে কি অবশ্যই সুবিখ্যাত কোন ঐতিহাসিক অর্থাৎ সর্বজনপরিচিত এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি হতে হবে?

একথা স্বীকার্য যে জাতির কাছে যাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁকে জাতি অনেকটা হর্তা কর্তা-বিধাতা বলে মনে করে—যাঁর শক্তি-সম্পদ-গুণ-গৌরবের প্রতি জনসাধারণের নির্বিচার সম্ভ্রমবোধ রয়েছে—তাঁর ভাগ্য-বিপর্যয় ও শোচনীয় দুঃখদুর্ভোগ ও বিপত্তি অধিকতর সহজেই আমাদের মনকে আলোড়িত করে থাকে। 'যস্মিন্ জীবতি বহবো জীবন্তি' এইজাতীয় বহুখ্যাত (highly renowned and prosperous) গৌরবশালী ব্যক্তির নায়ক-যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এরূপ 'অতি-বিখ্যাত' না হলে কি "higher type" বা "above the common level" এর পর্যায়ে উঠা সম্ভব নয়? 'higher type' হতে গেলেই কি 'highly renowned and prosperous' হতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার "higher type" বলতে এরিস্টটল কি বুঝেছেন বা বুঝাতে চেয়েছেন। মানুষকে মোটামুটি দুই পর্যায়ে ('higher or lower type') ভাগ করে বন্ধনীর মাঝে লিখেছেন—"for moral character mainly answears to these divisions, goodness and badness being the distinguishing marks of moral difference" অর্থাৎ higher type—সেই যাঁর 'goodness' অর্থাৎ moral purpose আছে। অতএব এ কথা বলা যেতে পারে "higher type" এবং "highly renowned and prosperous সমার্থক নয়—যদিও অতি বিখ্যাত এবং ঐশ্বর্যশালী হলে—সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়ার কোন বাধা নেই। অতি বিখ্যাত না হয়েও ব্যক্তি "higher type" হতে পারে।

তারপর—ট্র্যাজেডির নায়ককে যে অবশ্যই 'highly renowned' হতে হবে—বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। 'highly renowned' নয় অর্থাৎ যাঁর নাম কোন ইতিহাসে নেই—জনসাধারণের কাছেও পরিচিত নয়—সেই সব 'কাল্পনিক চরিত্র'কে নায়ক

করেও ট্র্যাজেডি লেখা হয়েছে। নবম পরিচ্ছেদে এরিস্টটল লিখেছেন—"Still there are even some tragedies in which there are only one or two well known names, the rest being fictitious. In others; none are well known as in Agathon's Antheus where incidents and names alike are fictitious...". সুতরাং দেখা যাচ্ছে ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে প্রখ্যাতি অত্যাবশ্যক নয়, যেটি অত্যাবশ্যক সে হচ্ছে—চরিত্র গৌরব বা গুণগৌরব—এক কথায় মহিমা-সম্পদ। অতএব এরিস্টটলের "highly renowned and prosperous"—সূত্রটি যে বিশেষ সূত্র দ্বারা বাধিত হয়েছে এ কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে এরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি-নায়কের চরিত্রে উপযুক্ত গৌরব অবশ্যই চাই—তবে সে গৌরব শুধু বংশের বা ধনেরই নয়, সে গৌরব সদগুণেরও গৌরব। ভাগ্যবিপর্যয় (misfortune) ও শোচনীয় পরিণতি দেখানো যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে 'সৌভাগ্য' (fortune) অবশ্যই অপেক্ষিত, সুতরাং নায়কের মহত্ত্ব (ধনে + মানে + গুণে, যত প্রকারে মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায় ততই ভাল) অবশ্যই চাই। তবে এরিস্টটলের কাছে নায়কের এই মহত্ত্ব, নিছক নৈতিক গুণের মহিমা নয়, এর সঙ্গে বংশাভিজাত্যের ও ধনাভিজাত্যের মহিমাও মিশে আছে। কারণ রস-নিষ্পত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই এরিস্টটল সূত্র রচনা করেছেন। তখনকার সামাজিক-চিত্তের রুচি-প্রবৃত্তির কাছে "সিরিয়াস" বলে যা স্বীকৃত ছিল, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি নায়কের মর্যাদা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। নায়ক প্রখ্যাতবংশ হোক না হোক, তাঁকে সদ্বংশ ও ধীরোদাত্ত হতে হবে—এটাই তাঁর অভিমত।

নায়কের বংশমর্যাদা কি হবে না হবে এ নিয়ে পরে জটিল কোন সমস্যা দেখা দেয়নি বটে, কিন্তু নায়কের নৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এরিস্টটল যে সূত্র করেছেন—তা নিয়ে পরে অনেক কথাকথান্তর হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন উঠেছে—অতিধর্মনিষ্ঠ লোকের (virtuous)—অতি ভালো লোকের (eminently good and just) ভাগ্যবিপর্যয় ও শোচনীয় দুঃখদুর্দশা ভোগ ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টি করবে না কেন? প্রশ্নটির আলোচনায় প্রবেশ করার আগে এরিস্টটলের

বক্তব্য সঠিকভাবে জেনে নেওয়া যাক। এরিস্টটল এই জাতীয় নায়ককে অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন এই কারণে যে—অতি ধার্মিক ও দোষলেশহীন ব্যক্তির পতন আমাদের মধ্যে করুণা জাগায় না—আমাদের ধর্মবোধকে অহেতুকভাবে আঘাত দেয় মাত্র। ফলে, ট্র্যাজেডির উপযুক্ত রস (ভয় ও করুণা) জাগ্রত হয় না। ভয় ও করুণা সম্পর্কে মূলসূত্র করা হয়েছে (ক) করুণা জাগে—"unmiritted misfortune" দেখে আর (খ) ভয় জাগে—"misfortune of a man like ourselves" দেখে। এই সূত্র অনুসারেই "eminently good and just"—man like ourselves" নয়। অর্থাৎ দোষেগুণে মেশানো লোক নয়। (অতি মন্দ লোকও এই কারণে বাদ পড়ে) আর এক দিক থেকেও এই জাতীয় দোষলেশহীন ব্যক্তির নায়কত্বে বাধা আসে। ট্র্যাজেডির সূত্র আছে—ট্র্যাজেডি নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে—নায়কের বিচার বিভ্রমের অথবা অন্তর্নিহিত কোন প্রসক্তির বা দুর্বলতার ফলে। যে ব্যক্তির বিচার-বিভ্রম সম্ভব বা যাঁর মধ্যে প্রসক্তি বা দুর্বলতা সম্ভব তাঁকে ঠিক 'eminently-good and just'—বলতে এরিস্টটল বোধ হয় রাজি ন'ন। তাই সর্বদোষলেশহীন ব্যক্তি—যিনি বুদ্ধিবিচারের দিক দিয়ে কোন ভ্রম করেন না, যিনি-প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণায় কোন গর্হিত কর্ম করেন না—যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ, ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না। এরিস্টটলের এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যের মাত্রা বেশী নেই তা নয়। 'Virtuous' বলতে যদি আমরা সাধুসন্ত বা সাধক শ্রেণীর লোক ধরি তা' হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—ট্র্যাজেডি-রসের আলম্বন বিভাব হিসাবে এই শ্রেণীর শান্ত নিরীহ দ্বন্দ্বাতীত মুনিপ্রকৃতির লোক উপযুক্ত নয়। দুঃখকে যারা দুঃখ বলেই মনে করেন না—দৈবের কৃপা বলে বুক পেতে দুঃখের আঘাত সহ্য করেন, তাদের নিয়ে শান্ত রসই জমে, ট্র্যাজেডি-রস ঠিক জমে না। তবু এ প্রশ্ন থেকেই যায়—এই জাতীয় শান্ত ও নিরীহ লোকের দুঃখ-দুর্ভোগ করুণা জাগাবে না কেন? এরিস্টটলের উত্তর আমরা আগেই পেয়েছি। নিরপরাধ মানুষকে অকারণে বিড়ম্বনা ভোগ করতে দেখে আমরা আঘাত

পাই—শোচনা প্রবলতর একটি ভাবের অর্থাৎ নীতিচেতনা দ্বারা তিরোহিত হয়ে যায়। শোচনা তিরোহিত হলে অবশ্যই "শকিঙ"-এর প্রাধান্য হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরপরাধ ব্যক্তিকে পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থায় নিরুপায়ভাবে পতিত ও অবস্থাচক্রে নিষ্পেষিত হ'তে দেখে, মানুষের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে, সমবেদনাও জাগতে পারে। যেখানে 'সমবেদনা' থাকে—শোচনা স্তম্ভিত হয়ে নীতিবোধের পীড়া প্রাধান্য লাভ করে না, সেখানে অবশ্যই ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম নির্দোষ নায়কের পক্ষে ওকালতি আরম্ভ হয়। কস্টেলভেত্রো এবং রোস্‌সি (Rossi) বলেন—নির্দোষ ব্যক্তিও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে, সাধু-সন্তকে নায়ক করেও ট্র্যাজেডি লেখা সম্ভব।

পরে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সমালোচক বুচার প্রশ্নটি তুলেছেন এবং আলোচনার চেষ্টা করেছেন।

"Perfectly blameless hero"—কে নায়কের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ায় বুচার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং গ্রীক নাটকেই যে নির্দোষ নায়ক আছে—এন্টিগোনের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা' প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'এন্টিগোন' —মহৎ কর্তব্য করতে গিয়ে দুঃখ দুর্ভোগ ভোগ করেছে—অকালে শোচনীয় ভাবে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। তাঁর চরিত্রে নীচতা নেই, কোন নৈতিক হীনতা নেই এ সবই সত্য। কিন্তু এরিস্টটলের পক্ষ থেকে বলবার কথা এই যে এরিস্টটল এন্টিগোনকে good বল্লেও 'perfectly blameless বলবেন না; কারণ, এন্টিগোন চরিত্রে পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই—frailty রয়েছে—অতিরিক্ত ভ্রাতৃপ্রীতি। 'selfwilled passion'—এর জন্যই তার জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটেছে। এন্টিগোন আর যাই হো'ক, নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে নয়—একেবারে 'innocent hero' নয়। তাঁর 'will' যেমন ঐকান্তিক তেমনি আপসহীন। সর্বমত্যন্তগর্হিতম্—সূত্রটি সামনে রেখে তবে 'blameless'—বিচার করতে হবে। সব 'অতি'র মধ্যেই শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনা নিহিত। অতি দর্পে, অতি মানে অতি দানে—সব অতিশয়েই এক পরিণতি। এই কারণে 'eminently good and just'—এর জীবনেও ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে—

দোষের জন্য নয় তার গুণাতিশয্যের জন্যই—অতিগুণের ফলে। তবে 'eminently good and just'—বলতে যদি অহংশূণ্য ও দ্বন্দ্বাতীত সাধুসন্ত বুঝায়—তা' হলে অবশ্য অন্য কথা।

বুচার মহাশয় প্রশ্ন তুলেছেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরিস্টটলকেই সমর্থন জানিয়েছেন এবং বলেছেন—নিরীহ (innocent) লোকের ট্র্যাজেডি হতে পারে না ; কারণ ট্র্যাজেডির নায়ক হতে গেলে নিষ্ক্রিয় ও নিরীহ হলে চলবে না—'self-assertive energy', থাকা চাই—যেহেতু ট্র্যাজেডি শেষ পর্যন্ত—'shows us a mortal will engaged in an unequal struggle with destiny whether that destiny be represented by the forces within or without the mind'. (311) এই প্রশ্নটি পরেও উঠেছে। ১৯২২ খ্রীঃ জন্ এস স্মার্ট মহাশয় প্রশ্নটি তুলেছেন এবং আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন—"সম্পূর্ণ নির্দোষ" চরিত্র ও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে। তিনি প্রশ্ন করেছেন—'Is it possible for a wholly innocent person to be the hero of a tragedy ? Or is it necessary that some form of guilt should be assigned to the sufferer, or at least some weakness or defect of character to which the cause of his suffering can be traced ? তাঁর সিদ্ধান্ত—সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তিও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে। যেখানে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি দশচক্রে পড়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন—'শোচনীয় ভাবে জীবন শেষ করেন সেখানেও ট্র্যাজেডি হয়। 'It is a legitimate one ; and we can only refuse to call it tragic by putting some refined or esoteric significance.'

স্মার্টের সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে—'error of judgment or frailty' না থাকলেও নায়কের ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন—"ট্রোজান উইমেন"।

অধ্যাপক নিকল নির্দোষ নায়কের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করতে পারেননি বটে (শেক্‌সপীয়ারের রোমিওকে তিনি নিদর্শন হিসাবে গণ্য করেছেন) কিন্তু

লিখেছেন—'of tragic dramas in which the hero is utterly flawless there are but few examples and such as exist seem to show that Aristotle was right in recognizing this character as unsuitable for tragedy.' অধ্যাপক নিকল নির্দোষ ও নিরীহ নায়কের পক্ষপাতী ন'ন।

এবার 'অতি মন্দ' চরিত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এরিস্টটল 'অতি মন্দ'কে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ অতি মন্দের পতনে বা দুঃখ-দুর্দশায় আমাদের সমবেদনা জাগে না। মন্দের প্রতি বিরাগ স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রেও 'অতিভাল'র ক্ষেত্রের মত মাত্রা বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। কত মন্দ হলে এবং কিভাবে মন্দ হলে নায়ক হওয়া যাবে না তা' নির্দিষ্ট করে বলা চলে না। বুচার মহাশয় মোটামুটিভাবে এরিস্টটলের সূত্রকেই সমর্থন করেছেন বটে, তবে একটি 'কিন্তু' তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন —সূত্রটি একটু অব্যাপ্ত। অতি দুর্বৃত্ত চরিত্রও বিশেষ অবস্থায় ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগাতে পারে—'Wickedness on a grand scale resolute and intellectual, may raise the criminal above the common-place and invest him with a sort of dignity. There is something terrible and sublime in mere will-power working its evil way dominating its surroundings with a superhuman energy. The wreck of such power excites in us a certain tragic sympathy not indeed genuine pity which is inspired by unmeritted suffering but a sense of loss and regret over the waste or misuse of gifts so splendid." (314) Richard III দৃষ্টান্ত। লক্ষ্য করবার বিষয়—দুর্বৃত্তের মধ্যে এমন কোন কোন গুণ দেখানো চাই যা'তে সে আমাদের সম্ভ্রম দাবী করতে পারে—সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে।

বুচার অতি মন্দের গুণপণার এক দিকটাই দেখেছেন—তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও কর্মশক্তির দিকটাই দেখেছেন। অন্য দিকেও অতি মন্দের 'ভালো' দেখানো

সম্ভব। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে অতি মন্দ হওয়া সত্ত্বেও, কোন মহৎ প্রবৃত্তির ঐকান্তিক আবেগে চরিত্র মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে—আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করতে পারে। আর্থার উলিয়াম পিনেরো'র "সেকেণ্ড মিসেস ট্র্যাজেরি" নাটকের নায়িকা এমনি একটি চরিত্র। পার লাগার্কভিস্ট—এর 'ডোয়ার্ফ' উপন্যাসের রাণীও এমনি একটি চরিত্র।

তা' হলে দেখা যাচ্ছে ট্র্যাজেডি-নায়ক সম্পর্কে এরিস্টটল যে কয়টি সূত্র করেছেন তাদের বিষয়ে নিম্নলিখিত সংশোধন প্রস্তাবিত হয়েছে।

(ক) অতি ভালো লোকও নায়ক হতে পারে। কারণ অতি নির্দোষ ব্যক্তির নিরুপায় দুঃখদুর্দশাভোগ শোচনা জাগ্রত করে থাকে।

(খ) অতি মন্দ লোকও বিশেষ কারণে ট্র্যাজেডি-নায়কের মর্যাদা লাভ করতে পারে। বিশেষ কারণ—নায়কের বুদ্ধির বা হৃদয়ের চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তি—ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তি।

তবে এই সংশোধনী প্রস্তাব স্বীকার করলেও এরিস্টটলের মূল বক্তব্য থেকে দূরে সরে আসা হয় না। এরিস্টটল যেমন অতি ভালো-অতি মন্দের সংজ্ঞা বেঁধে দেননি তেমনি একটি মানদণ্ড দিয়েই তিনি ট্র্যাজেডিত্ব পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। এই মানদণ্ড হচ্ছে—শোচনা (pity)। 'অতি-ভালো' সেই—যার ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের মধ্যে শোচনা জাগায় না বরং আমাদের নৈতিক বোধকে আঘাত দিয়ে বিহ্বল করে তোলে। আর অতি মন্দ হচ্ছে সেই—যার মন্দ আচরণ আমাদের এত বিরূপ করে দেয়—যে তার দুঃখদুর্দশা দেখে আমাদের মধ্যে শোচনাই জাগে না। এই হিসাবে—এরিস্টটলের সূত্র এখনও সত্য। অতি ভালোর বা অতি মন্দের যে সব বিশেষ ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির অবকাশ আছে বলে মনে করা হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রেও শোচনাকেই (pity) নিয়ামক কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে। আসলে—শোচনা জাগ্রত করতে পারাই বড়ো কথা। দোষগুণের সমাবেশ যে মাত্রাতেই করা হোক—অনুপাতটি এমন হওয়া চাই যাতে দোষ সত্ত্বেও গুণের মহিমা অবিস্মরণীয় ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বিরাজ করে। তবেই সমবেদনা তথা শোচনা তথা ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগার সম্ভাবনা।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে পূর্বে ট্র্যাজেডি-নায়কের 'মহত্ত্বের' মধ্যে বংশমর্যাদার ও ঐশ্বর্য-মর্যাদার উপাদান দুইটির যে গুরুত্ব ছিল, পারিবারিক বা সামাজিক ট্র্যাজেডির আবির্ভাবের পর থেকে সে গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। মহত্ত্ব এখনও চাই; তবে সে মহত্ত্ব চরিত্রের মহত্ত্ব—ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব। গণতন্ত্র এবং মনস্তত্ত্বের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বাইরে ও ভিতরে যে গুরুত্ব লাভ করেছে, তাতে শূদ্রের ক্ষুদ্রত্ব অনেক পরিমাণে ক্ষয় পেয়ে গেছে। ক্রমে আরো যাচ্ছে। গণতন্ত্রের ফলে, ব্যক্তি বাইরে পেয়েছে—সমান অধিকার; অন্যদিকে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান আলোকপাত করেছে—তার মনের অপার রহস্যের উপরে—সংজ্ঞান-অসংজ্ঞান-নির্জ্ঞান মনের অবিরাম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার উপরে। মনস্তত্ত্ব দেখিয়ে দিয়েছে কোন মনেরই গুরুত্ব কম নয়। মনের রহস্যের দিক দিয়ে বড়লোক ছোটলোকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। (ফলে ট্র্যাজেডির নায়ক করবার জন্য আজ আর ইতিহাসের দুয়ারে ধর্ণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বড়লোক খোঁজবারও প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট খড়ের ঘরের ছোট ছোট বুকের মধ্যেও ট্র্যাজেডির কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে। তবে সব সময়েই একটা কথা সত্য—রসসৃষ্টিই বড়ো কথা। উপাদান সংমিশ্রণের নিয়ম বেঁধে দেওয়া শুধু যায় সাধারণভাবেই। বিশেষ সর্বদাই স্বতন্ত্র। উপাদানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করেই বিশেষ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। সব ক্ষেত্রেই—"যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে"—কবির এই বাণী সত্য।)

(দ্বিতীয়তঃ নায়কের দোষগুণের মাত্রাও বেঁধে দেওয়া যায় না। দোষগুণ মেশাবার ক্ষমতা শিল্পীতে শিল্পীতে পৃথক।) বেশী দোষের সঙ্গে অল্পগুণ মিশিয়ে ট্র্যাজেডি সে সৃষ্টি করতে পারে। বেশীগুণে অল্প দোষ মিশিয়ে রসসৃষ্টি করতে পারা সহজ এবং তা সকলেই পারে, কিন্তু বেশী দোষে অল্পগুণ মিশিয়ে ট্র্যাজেডিরস সৃষ্টি করতে পারা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং তা পারেন বড় বড় শিল্পীরাই। তাই সাধারণের পক্ষে এরিস্টটলের—অতি ভালো নয় অতি মন্দও নয়—এই মধ্য পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। মনে হয়, অতি ভালোকে বা অতি মন্দকে নায়ক করে রস আদায় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলেই এরিস্টটল ওদের বাদ দিয়ে রেখেছেন। যা'হোক, অতি ভালো বা অতি মন্দের সীমা

যে দাগ দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় এই কথাটাই মনে রাখা দরকার। অতি-ভালোকে নায়ক করে রসসৃষ্টি করা যেমন অসাধ্য কোন ব্যাপার নয়, তেমনি অতি মন্দের (সাধারণ অর্থে, নৈতিক অপকর্ষের অর্থে) মাঝেও এমন কিছু গুণ মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব যাতে সমস্ত কলঙ্ক সত্ত্বেও চরিত্রটি আমাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় না। নায়কের বংশমর্যাদা বা নৈতিক মর্যাদা উপাদান মাত্র—উপাদেয় হচ্ছে রস। রস নিষ্পন্ন হলে উপাদান নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করে লাভ নেই।

তৃতীয়তঃ—নায়কের উদ্যম বা ক্রিয়াশীলতার প্রশ্ন। এ অনুমান করা যেতে পারে যে এরিস্টটল ট্র্যাজেডি-নায়ককে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছেন :—এক শ্রেণীর নায়ক—does something terrible, অন্যশ্রেণীর নায়ক—suffers something terrible (এই অনুমানের হেতু "Now the best tragedies are founded on the story of a few houses—on the fortunes of Alemaeon, Aedipus, Orestes, Meleager Thystes, Telephus and those others who have done or suffered something terrible XIII 47). প্রথম শ্রেণী—প্রবৃত্তির তাড়নায় সাংঘাতিক কিছু করে বসে এবং শোচনীয় পরিণতি লাভ করে; দ্বিতীয় শ্রেণী—অবস্থাচক্রে দুঃসহদুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, পরিস্থিতিয় বিরুদ্ধে নিরুপায় ও নিষ্ফল সংগ্রাম করে তথা শোচনীয়ভাবে জীবন শেষ করে। বলা বাহুল্য, প্রথম শ্রেণী—দেহে-মনে উদ্যমশীল। এদের ইচ্ছাশক্তি বা বাসনা প্রবল। বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সর্বতোভাবে এরা সচেষ্ট—এক কথায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী (self-assertive)। এই শ্রেণী, পরিবেশক জোর করে নিজের বশে আনতে চেষ্টা করে—বাধাবিপত্তিকে দেহ-মনের শক্তি দিয়ে অপসারিত করতে চায়—অর্থাৎ আক্রমণ-প্রবণ। মোটকথা দৈহিক উদ্যমের প্রাধান্য (physical activity) এদের মধ্যে বেশী। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বা হৃদয়ের ক্রিয়ার মাত্রা বেশী। দৈহিক উদ্যমের অবকাশ এদের অবস্থায় কম মেলে, ফলে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তীব্র প্রকাশের মধ্যেই এদের ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায়। এদের ক্রিয়াশীলতার

বৈশিষ্ট্য—দৈহিক আচরণের মধ্যে নয়, মানসিক বা আত্মিক ক্রিয়ার (mental or spiritual activity) মধ্যে। প্রথম শ্রেণীর দ্বন্দ্বে আক্রমণাত্মক (offensive) সংগ্রামের লক্ষণ বেশী প্রকাশ পায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর সংগ্রামে আত্মরক্ষাত্মক (defensive) সংগ্রামের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, উভয়ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব বর্তমান—একক্ষেত্রে নায়ক পক্ষ উদ্যত ; অন্যক্ষেত্রে পরিবেশ-পক্ষ উদ্যত। নায়ক যেখানে উদ্যমশীল সেখানেই ইংরেজীর 'active' কথাটা সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয়, যেখানে নায়ক উদ্যমহীন অর্থাৎ দৈহিক চেষ্টা দ্বারা পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোন উদ্যোগ করে না পরিস্থিতির আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়—অথচ নিষ্ফল মানসিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়াই দেখাতে পারে না, সেখানে নায়কের বিশেষণ দেওয়া হয় passive অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। এই দুইটি বিশেষণ অনেক সময়েই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে। তাই সাধারণ বুদ্ধির লোকে 'action' বলতে স্থূল শারীরিক ক্রিয়াই বুঝে থাকেন। মানসিক বা আত্মিক ক্রিয়াও যে ক্রিয়া এবং উন্নত স্তরের ক্রিয়া তা' ধরতে পারেন না। শারীরিক ক্রিয়ার অতি প্রাধান্য ঘটলে নাটকাদি মেলোড্রামার স্তরে নেমে যায়—এ কথাটাই পর্যন্ত তাঁরা ভুলে যান। 'কায়েন মনসা বাচা'—আত্মা আপনার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। ক্রিয়াকেও মোটামুটি—কায়িক—মানসিক ও বাচিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই তিন ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারাই বড় কথা। একঘেয়েমির অবসাদ থেকে রচনাকে মুক্ত রাখতে হলে ক্রিয়া-বৈচিত্র্য অবশ্যই চাই। যিনি শুধু দেহ বা শুধু মন প্রয়োগ করেন তাঁর প্রয়োগ ব্যর্থ হতে বাধ্য। যা'হোক, ক্রিয়াশীল কথাটাকে সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করলে ভুল হবে। ব্যাপক অর্থে ক্রিয়া বলতে—দৈহিক এবং মানসিক উভয় ক্রিয়াই বুঝায়।

ট্র্যাজেডির রস

ট্র্যাজেডির অঙ্গীরস এক কি একাধিক এবং এক হলে সেটা কি আর একাধিক হলেও বা কি কি—এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই জাগে আর অনেককাল আগে থেকেই জেগে আছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত প্রশ্নটির সুস্পষ্ট মীমাংসা হয়নি। চমকপ্রদ বলে মনে হলেও মন্তব্যটি সত্য। আমরা দেখতে পাবো—ট্র্যাজেডি-রসকে (Tragic impression) মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা খুব কমই হয়েছে—হয়নি বললেও মিথ্যা বলা হবে না। ট্র্যাজেডির মুখ্য রস কি সে সম্বন্ধে মতভেদও দেখা দিয়েছে যথেষ্ট। একদিকে আছে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত—'pity and fear' অন্যদিকে আছে অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয়ের সিদ্ধান্ত—"feeling of awe allied to lofty grandeur" (122)। আমাদের পরিভাষায় বলতে গেলে—এরিস্টটলের মতে যেখানে অঙ্গীরস ভয়ানক সমন্বিত করুণ রস, অধ্যাপক নিকলের মতে সেখানে ট্র্যাজেডির অঙ্গীরস—(বিস্ময় স্থায়িভাবমূলক) অদ্ভুত। সুতরাং রস সম্বন্ধে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত যে নেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মীমাংসা করার চেষ্টা করবার আগে প্রথম এরিস্টটলের সিদ্ধান্তটিকে সুষ্ঠুভাবে ধারণা করা আবশ্যক। কারণ এরিস্টটলের সিদ্ধান্তকে সাধারণতঃ আমরা যত স্পষ্ট মনে করি তত স্পষ্ট যে নয়। কেন নয়—একটু এগিয়েই দেখা যাবে। এখন এরিস্টটলে প্রবেশ করা যাক এবং রস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কোথায় কি বলেছেন তা সংগ্রহ করে সামনে এনে রাখা যাক।

(ক) প্রথম এবং প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়—ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রসঙ্গে—'through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions' [এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে—কথাটি "pity and fear" 'শোচনা এবং ভয়' অর্থাৎ এই দুই ভাবকে উদ্রেক করাই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য]।

(খ) তারপর—(৩৯ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন—Tragedy is an imitation

not only of a complete action, but of events inspiring fear or pity" *[এখানে ঘটনার প্রকৃতি নির্দেশ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—fear or pity—ভয়ঙ্কর অথবা শোচনাজনক ঘটনার উপস্থাপনা। এ থেকে মনে হতে পারে, ট্র্যাজেডি ভয়জনক ঘটনার অথবা শোচনাজনক ঘটনার উপস্থাপনা অর্থাৎ ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসের অথবা করুণ রসের নাটক]।

(গ) পরিস্থিতি-বিপর্যাস ও অভিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'This recognition combined with Reversal, will produce either pity or fear; and actions producing these effects are those which by our definition tragedy represents —(৪১ পৃঃ) [এখানে "pity or fear" কথাটি আছে। তবে মনে রাখা দরকার—এখানকার "or" (অথবা) শোচনা বা ভয়ের এককত্ব স্থাপনা করছে না, এইটুকুই ব্যক্ত করছে যে কোনস্থানে শোচনা, কোনস্থানে ভয় উদ্রিক্ত করে। ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে—'actions producing these effects' অর্থাৎ ভয় ও শোচনা উদ্রিক্ত করা]

(ঘ) খাঁটি ট্র্যাজেডির (পারফেক্ট ট্র্যাজেডি) গঠন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন—৪৫ পৃঃ) It should, moreover, imitate actions which excite pity and fear, this being the distinctive mark of tragic imitation". [এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে—"pity and fear"—শোচনা ও ভয় এই দুই ভাবোদ্দীপক ঘটনাই ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য বিষয়]

(ঙ) এই পৃষ্ঠাতেই 'নায়ক'-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে—তিন প্রকার অনুচিত নায়কের ক্ষেত্রেই, তিনি—"neither pity nor fear" লিখেছেন—উপসংহারে লিখেছেন—"such an event····· will be neither pitiful nor terrible". [এখানে neither pitiful nor terrible কথাটির তাৎপর্য থেকে এমন অর্থ করা যেতে পারে যে "pity" অথবা "fear" দু'টির যে-কোন একটিকেই উদ্রিক্ত করলে ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টি হয়]

(চ) তারপর আদর্শ কয়েকজন নায়কের—(ইডিপাস, অরিস্টিস্, মিলিগের

থিয়েস্টিস, টেলিফাস্ প্রভৃতির) বৈশিষ্ট্য নির্দেশ প্রসঙ্গে লিখেছেন...... "those others who have done or suffered something terrible" (৪৭ পৃঃ) [এখানে দুই শ্রেণীর নায়কের কথা দেখা যায়—এক শ্রেণী—ভয়ানক কোন আচরণ করে—(ভয়ানক-রসাত্মক ট্র্যাজেডির-নায়ক?) অন্যশ্রেণী দুঃসহ দুর্দশা ভোগ করে—করুণরসাত্মক ট্র্যাজেডির নায়ক। মোট কথা এখানেও "fear or pity"র দিকে ঝোঁক পড়েছে।]

(ছ) বৃত্ত গঠন প্রসঙ্গে লিখেছেন—(৪৯ পৃঃ) এমনভাবে কাহিনী গঠন করতে হবে যে চোখে না দেখেও, শুধু শুনেই, শ্রোতা "will thrill with horror and melt to pity at what takes place". [এখানে একাধারেই ভয় ও শোচনা উদ্রেকের কথা বলা হয়েছে এবং ট্র্যাজেডি যে ভয়ানক-মিশ্র করুণ রস এই সিদ্ধান্তই যেন করা হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয় এই—'melt to pity' কথাটি। করুণায় বিগলিত করা ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য নয়—এ যাঁরা বলেন তাঁরা এরিস্টটলকে লঙ্ঘন করেন।]

(জ) এই পৃষ্ঠাতেই, ট্র্যাজেডির আনন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করার প্রসঙ্গে লিখেছেন, ট্র্যাজেডির আনন্দ—'comes from pity and fear through imitation' [এখানেও pity and fear]।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—কোন স্থলে 'pity and fear' বলা হয়েছে এবং কোন কোন স্থলে pity or fear বলা হ'য়েছে। ফলে এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক-ভাবেই উঠতে পারে (ক) ট্র্যাজেডি কি ভয়ানক-মিশ্র করুণ রসের নাটক? বা (খ) ট্র্যাজেডির মুখ্য বা অঙ্গীরস ভয়ানক বা করুণ দু'টোর যে-কোন একটা হতে পারে?

এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত স্থির করবার আগে—কয়েকটি বিষয় ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার। তাদের মধ্যে প্রথমটি—'fear' শব্দটির অর্থ। এরিস্টটলের মতে, ট্র্যাজেডিতে যে ভয়ের ভাব জাগে, তা' জাগে আমাদের মত কোন মানুষের দুর্বিপাক দেখে (fear by the misfortune of a man like ourselves)। এ ভয় যেন অনেকটা শোচনারই আনুষঙ্গিক। এ ভয় যে অনেকটা মানসিক আতঙ্ক বা উৎকণ্ঠা—এরূপ অনুমান করার হেতু

আছে। দৃশ্য দ্বারা ভয় উদ্রেক করা যে হেয় উপায়—এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে এরিস্টটল লিখেছেন—'those who employ spectacular means to create a sense not of the terrible, but only of the monstrous are strangers to the purpose of tragedy' (XIV 49,) এখানে 'terrible' এবং 'monstrous' এই দুটো শব্দের অর্থ পৃথক করতে চেষ্টা করেছেন। "terrible"—যে ভয় জাগ্রত করে, তা' ধারণাসাপেক্ষ অর্থাৎ মানসিক (নৈতিক+আত্মিক), monstrous যে ভয় জাগায় তা' দৃশ্য-সাপেক্ষ অর্থাৎ দৈহিক। ভয়ঙ্কর দৃশ্য (spectacle) দ্বারা যাঁরা ভয়ানক রস সৃষ্টি করেন তাঁরা ট্র্যাজেডি রসের কিছুই বোঝেন না—এ কথাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য।

তবে 'fear' বলতে শুধু যে ভাগ্য-বিড়ম্বনা-দর্শন জনিত আতঙ্কই বুঝায় —এ কথা বলা চলে না। কারণ ট্র্যাজেডি-নায়ক যেখানে 'does something terrible, সেখানে ভয়ানক আচরণ দেখার ফলেই ভয় জাগ্রত হয়। অবশ্য 'terrible doing'কে নায়কের misfortune-এরই অঙ্গ বলে ধরলে—এ ভয়েও ভাগ্য-বিড়ম্বনাজনিত আতঙ্কের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়তঃ দেখা দরকার—শুধু ভয়ানক রসের ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে কিনা এবং ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগে এরিস্টটল তেমন কোন ট্র্যাজেডির উল্লেখ করেছেন কিনা। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি (যে ২১ খানি পাওয়া যায়) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতেই শেষ পর্যন্ত 'pity' জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে নায়ক সাংঘাতিক কিছু করেছে, সেখানেও শেষ দিকে তার দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়ে করুণা জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে। জন স্মার্টের ভাষায় বলা যেতে পারে—"what is common to all is the element of calamity and suffering." তাই যদি হয়, তবে করুণ রসই শেষ পর্যন্ত অঙ্গী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ "suffering" অবশ্যই শোচনা জাগ্রত করার জন্যই যোজিত হয়।

এরিস্টটলও বলেছেন—ট্র্যাজেডিতে—suffering দেখাতেই হবে। গ্রীক ট্র্যাজেডি সামনে রেখেই এরিস্টটল সূত্র রচনা করেছেন। ট্র্যাজেডির

গঠন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—ট্র্যাজেডিতে তিনটি পর্ব থাকে—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যথাক্রমে (ক) পরিস্থিতি-বিপর্যাস ও (খ) অভিজ্ঞান (এ দুটি ব্যাপারই বিস্ময়জনক) তৃতীয়টি—"The scene of suffering"—অর্থাৎ "destructive or painful action, such as death on the stage, bodily agony, wounds and the like". মোট কথা, এরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির শেষ পর্বে—'disaster' বা suffering দেখাতেই হবে। তা' দেখানোর অর্থ যে শেষ পর্যন্ত "pity" জাগ্রত করা তা বলাই বাহুল্য। এর সমর্থনে এরিস্টটলের নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—'for the plot ought to be so constructed that, even without the aid of the eye, he who hears the tale told will thrill with horror and melt to pity'! ভয়ে শিউরে উঠবে এবং করুণায় গলে যাবে—এ কথায় করুণ রসকেই অঙ্গীরসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

তবে ট্র্যাজেডিতে pity অপরিহার্য উপাদান হলেও--ভাবের মাত্রা—তারতম্যে ট্র্যাজেডি-রসের প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য সম্ভব এবং সে সম্পর্কে এরিস্টটল সচেতন। ট্র্যাজেডির মোট ভাব তিনটি—(১) ভয় (২) শোচনা (৩) বিস্ময় (The element of the wonderful is required in Tragedy (XXIV—95). এই তিনটি ভাবের সমবায়ে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হয়। এই তিনটির মাত্রা-তারতম্যে, রসের প্রকৃতিতে বা স্বাদে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এই তিন ভাব যত অনুপাতে মিশতে পারে, তত এই বৈচিত্র্য। মোটামুটিভাবে আমরা দেখতে পারি, কোনটি বিস্ময়-প্রধান, কোনটি ভয়-প্রধান, কোনটি শোচনা-প্রধান, কোনটি বা মিশ্র বা সমমাত্রিক হতে পারে। এরিস্টটল ট্র্যাজেডির যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন তাতে—চারটি শ্রেণী কল্পিত হয়েছে।—(১) পারফেক্ট ট্র্যাজেডি—(বিস্ময় প্রধান) (২) প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি (শোচনা প্রধান) (৩) এথিকাল ট্র্যাজেডি (নীতি-ভাব প্রধান) (৪) সিম্‌পিল্—(এপিসোডিক গঠনের নাটক)। এই শ্রেণীবিভাগে ভয়-প্রধান ট্র্যাজেডির কোন উল্লেখ নেই। পারফেক্ট

ট্র্যাজেডিতে বিস্ময়ের মাত্রা বেশী থাকে এবং প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিতে শোচনা উদ্রেকের চেষ্টা বেশী—তা' স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। তবে অন্য দুইক্ষেত্রে বোধ হয়—কোন ভাবের বিলক্ষণ আধিক্য থাকে না বলে ভয়, বিস্ময় এবং শোচনায় সামঞ্জস্য বিরাজ করে বলে—এরিস্টটল বিশেষভাবে কিছু বলেননি। বিস্ময়ের আধিক্য বা ভয়ের আধিক্য যাই থাক, শোচনা থেকে বিযুক্ত হয়ে গেলে—বিস্ময়ের ও ভয়ের ট্র্যাজেডিজনক গুণ নষ্ট হয়ে যায়—এ কথাও মনে রাখা দরকার। শোচনাকে এই হিসাবে বিলক্ষণ ধর্ম বলে মনে করা যায়। প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিতে শোচনার একক প্রাধান্য বর্তমান। অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময় তেমন না থাকলেও ট্র্যাজেডি সম্ভব। কিন্তু শোচনা না থাকলে হাজার বিস্ময় বা ভয় নিষ্ফল—ট্র্যাজেডি-সৃষ্টির ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং বিস্ময় বা ভয় ট্র্যাজেডিতে নিরন্তর থাকলেও, শোচনাই (শোক) ট্র্যাজেডির মূল স্থায়িভাব। শোচনা বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডি হয় না—কোনদিন হয়ওনি। কারণ ট্র্যাজেডি আসলে ভাগ্যবিপর্যয়েরও শোচনীয় পরিণতিরই রূপ। ভাগ্যবিপর্যয়ের দৃশ্য যেখানে শোচনা সৃষ্টি না করে সেখানে আর যাই হোক ট্র্যাজেডি হয় না। এই কারণেই তো, কে নায়ক হতে পারবে না—এই নিয়ে এত বাদবিচার।

রস-সম্পর্কে এ যাবত কেউ কোন তেমন জোরালো প্রশ্ন করেননি। ভয়ানক রসের আধিক্য ও করুণ রসের আধিক্য—এই দুই আধিক্যের মেরুর মাঝে ট্র্যাজেডির রস নানা বৈচিত্র্য নিয়ে বিরাজ করছে। ভয়ের আধিক্য (হরর ট্র্যাজেডিতে) এবং করুণের আধিক্য (প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিতে) নিয়ে রসিকরা খুঁৎ খুঁৎ না করেছেন এমন নয়, কিন্তু কেউ এ কথা বলতে সাহস করেননি—ভয় এবং শোচনা বাদ দিয়েই ট্র্যাজেডির রস সৃষ্টি সম্ভব। এই সাহস দেখিয়েছেন অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি থিওরি অফ ড্রামা'র "দি স্পিরিট অফ ট্র্যাজেডি" পরিচ্ছেদে তিনি ট্র্যাজেডির প্রচলিত মতকে প্রায় উল্‌টে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডিতে শোচনার স্থান আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর উক্তি—"Terror, assuredly, is frequently called forth by a

great drama, although terror is not the chief emotion in an audience ; but as regards pity, we may truly feel doubtful whether in a high tragedy it may to any great extent enter in. Tragedy, after all is not a thing of tears" অর্থাৎ বড বড় ট্র্যাজেডিতে মাঝে মাঝে ভয়ানক রস সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায় বটে, তবে ভয়ানক মুখ্য রস কখনও হয় না। কিন্তু করুণা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, বড় বড় ট্র্যাজেডিতে করুণার তেমন কোন স্থান নেই ; কারণ ট্র্যাজেডি চোখের জলের ব্যাপার নয়। (এরিস্টটলের "melt to tears"-এর উল্‌টো কথা)। কোন বড় নাট্যকার 'pity'-জাগ্রত-করাকেই "main tragic motif"—করেন না (গ্রীক নাট্যকারগণ এই মন্তব্যের বড়ো প্রতিবাদ নয় কি ?)

ট্র্যাজেডির আসল উদ্দেশ্য শোচনা বা করুণ রস সৃষ্টি করা (arousing of pity) নয়—আসল উদ্দেশ্য 'feeling of awe allied to lofty grandeur'—অধ্যাপক নিকলের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার প্রথম ব্যক্তব্য এই যে "pity" কথাটিকে তিনি প্রচলিত 'pity করা' অর্থে ব্যবহার করেছেন —এবং এরিস্টটলের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিতে pity জাগ্রত করার উদ্দেশ্য স্পষ্টাকারেই ব্যক্ত হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। ঈডিপাস, এন্টিগোন প্রভৃতি নাটকে pity সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়নি, এ কথা তিনি বলতে পারেন কি ? তৃতীয়তঃ 'pity' জাগা মানেই 'চোখের জল' ফেলা নয়। ঈডিপাস নাটকে বিস্ময় ও ভয় যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত হয়েছে অথচ "pity"ও উপেক্ষিত হয়নি। চতুর্থতঃ, pity-র যোগ হারালে "awe and grandeur"— "tragic impression" জাগাতে পারে না। এমন কোন ট্র্যাজেডি নেই যার নায়ক দর্শক-পাঠকের সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে হারিয়েও ট্র্যাজিক-নায়কত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। পঞ্চমতঃ উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডিতেও "pity" যথেষ্ট মাত্রায় ব্যক্ত হতে পারে—'awe and grandeur'-এর স্বার্থেই pity নির্বিরোধে থাকতে পারে (কীং লীয়র দৃষ্টান্ত)।

উপসংহারে বক্তব্য এই—'pity' এবং 'pathos' এই দুটো শব্দ সম্বন্ধে

সমালোচকদের মধ্যে খানিকটা অবজ্ঞার ভাব—বলা যেতে পারে complex, গড়ে উঠেছে। শব্দ দুটি শুনলেই এঁরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন এবং রচনার গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এই Complex বর্জন করা দরকার। এই কথাটি উপলব্ধি করা দরকার—নায়কের প্রতি pity না জাগলে, নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় এবং শোচনীয় পরিণতি দেখে ট্র্যাজেডি-সংবিদও জাগে না। ট্র্যাজেডি-সংবিদের জন্য সমবেদনা—বেশী বা কম—অপরিহার্য। সমবেদনার সহযোগেই বিস্ময় ও ভয় ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে সার্থকতা লাভ করে। শুধু বিস্ময়কর ঘটনা বা শুধু ভয়ানক ঘটনা ট্র্যাজিক নয়; মানুষের ভাগ্য বিপর্যয়ের বা শোচনীয় পরিণতির কারণ হিসাবেই যখন তারা প্রকাশ পায় তখনই তারা 'ট্র্যাজিক'-গুণান্বিত হয়। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার—প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি এবং পারফেক্ট ট্র্যাজেডি—এই দুই মেরুর মধ্যে বিচিত্র আস্বাদের ট্র্যাজেডি-রস সম্ভব। এরিস্টটল সব শ্রেণীর উল্লেখ না করলেও—শ্রেণী বিভাগের মধ্যে সামান্য ইঙ্গিত রেখে গেছেন।

বড় কথা ট্র্যাজেডি-সংবিদ (Tragic impression)। এই 'সংবিদ' জাগলেই রচনাকে ট্র্যাজেডির তালিকায় স্থান দেওয়া যেতে পারে। ট্র্যাজেডি সংবিদের বিশ্লেষণ করলে, মোটামুটিভাবে আমরা পাই :—

বোধ পর্যায়ে—(ক) দুঃখ দুর্ভোগের অনৌচিত্য (sense of unmeritted suffering)
(Cognitive aspect)

(খ) নিরুপায় এবং নিষ্ফল সংগ্রামের ব্যর্থতা

(গ) শক্তির অপচয় এবং অসাময়িক মৃত্যুর ক্ষোভ

(ঘ) মানব নিয়তির রহস্য

অনুভব পর্যায়ে—(ক) সমবেদনা
(Emotive aspect)

(খ) শোচনা

(গ) ভয়

(ঘ) বিস্ময়

ট্র্যাজেডি-সংবিদ-সৃষ্টিতে 'বোধ' এবং অনুভব ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বোধ এবং অনুভূতি—মিলে মিশে ট্র্যাজেডি-সংবিদে পর্যবসিত হয়। কোন্ কোন্‌টি মিশছে এবং কোথায় কোনটি প্রাধান্য লাভ করছে, বিশ্লেষণ করে দেখা ছাড়া উপায় নেই।

ট্র্যাজেডির পরিণাম (Ending)

ট্র্যাজেডির পরিণাম সম্পর্কে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্ট। পরবর্তীকালে তাঁর সিদ্ধান্তই সর্ববাদিসম্মত ভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও ট্র্যাজেডি বলতে আমরা সাধারণতঃ বিয়োগান্ত নাটকই বুঝে থাকি। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে—জীবনের দ্বন্দ্ব-করুণ দুর্ভোগ-করুণ ও মৃত্যু-করুণ রূপ উপস্থাপিত হয়েছে বটে কিন্তু নাটকের পরিণামে অনেক ক্ষেত্রেই সেই সব দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয়েছে—অনেকটা happy ending ঘটেছে। এইরূপ গঠনের মূলে যে সংস্কার কাজ করেছে তা' এই :—ট্র্যাজেডি "সিরিয়াস ইমিটেশন্"। সেই 'সিরিয়াস ইমিটেশন্' হওয়ার পরে—নায়কের ভাগ্যে চরম দুঃখদুর্ভোগ, শোচনীয় পরিণতি ঘটে যাওয়ার পরে—নায়কের দুঃখের চাপ কমিয়ে দিলে—'ইমিটেশনের সিরিয়াসনেস্' অক্ষুন্নই থাকে। এই ধারণাই তখন ছিল। কিন্তু ইউরিপিডিস করুণ রস সৃষ্টি করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন—বিয়োগান্ত নাটকের দ্বারাই রস বেশী আদায় করা যায়। তাঁর বিয়োগান্ত নাটককে সমালোচকরা প্রশংসা করেন নি বটে কিন্তু এরিস্টটল স্পষ্ট ভাষায় ইউরিপিডিসকে সমর্থন করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন—"It is as we have said, the right ending'. এরিস্টটলের মতে 'unhappy ending'—ই = right ending। এখন unhappy ending-কে বিয়োগান্ত বলা ঠিক হবে কিনা, বিচার্য বিষয়। বিয়োগান্ত না হয়েও অর্থাৎ আপাত মিলনান্ত হওয়া সত্ত্বেও, পরিণতি 'unhappy' হতে পারে। যোগের মধ্যেও যে অযোগের প্রকাণ্ড ব্যবধান থাকতে পারে—রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' তারাশঙ্করের 'রাইকমল' তার সুন্দর দৃষ্টান্ত। যোগ-বিয়োগের বাইরের রূপটাই বড় বিচার্য নয়, বড় বিচার্য

হয়ে ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়,) বীজের সম্ভাবনাই যেমন বৃক্ষের আকার ধারণ করে, অথবা "জীব-বীজ" যেমন ভাবে ক্রমবিকশিত হয়ে জীবের আকার প্রাপ্ত হয়—নানা অঙ্গের সমবায়ে এক অঙ্গী জীবে পরিণত হয়, তেমনি "আদি" ঘটনার সম্ভাবনাই ক্রমবিকশিত হয়ে, "মধ্যে"-র মাঝ দিয়ে "অন্তে"-র পরিণাম প্রাপ্ত হবে। ঘটনা-বিন্যাসে এরূপ কার্যকারণ নিয়তি প্রকটিত যেখানে হয়, সেখানেই সম্পূর্ণতার এক আদর্শ রূপ ব্যক্ত হয়। যে অনুপাতে ঘটনা-বিন্যাসে "probable or necessary sequence" থাকে' সেই অনুপাতে সম্পূর্ণতা আদর্শের দিকে এগিয়ে যায়। আর যে অনুপাতে 'probable or necessary sequence'-এর অভাব ঘটে, সেই অনুপাতেই বৃত্ত "এপিসোডিক" —গঠনের দিকে এগিয়ে যায়। এরিস্টটলের মতে "এপিসোডিক" অতিনিকৃষ্ট বৃত্ত এবং এপিসোডিক হচ্ছে সেই ধরনের বৃত্ত—in which the episodes or acts succeed one another without probable or necessary sequence" এপিসোডিক বৃত্তে ঘটনার পরম্পরা থাকে কিন্তু একের সঙ্গে অপরের অনিবার্য বা সম্ভাব্য যোগ থাকে না।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এরিস্টটল বৃত্ত-গঠনের উত্তম এবং অধম দুই রূপকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একদিকে এপিসোডিক অর্থাৎ অতি শিথিলবন্ধ রূপ; অন্যদিকে আদর্শ রূপ, যার—structural union of the parts being such that if any one of them is displaced or removed the whole will be disjointed and disturbed। কারণ জৈবিক অঙ্গ (organic part) তাকেই বলা হয়—যার অভাবে অঙ্গীর আঙ্গিক ত্রুটি লক্ষিত হয় আর যাঁর সদ্ভাবে অঙ্গী নিখুঁত রূপে অবস্থান করে। বাস্তবিক আদর্শ গঠনের ধারণা করতে গেলে, এই আদর্শ রূপের ধারণাতেই পৌঁছতে হয় এবং ঘটনা-বিন্যাস রীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—এরিস্টটল-কথিত রীতির বাইরে বিন্যাস অসম্ভব। এক রীতি—ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে একটা নিগূঢ় কার্যকারণ যোগ স্থাপনা করা—পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত পরবর্তী ঘটনার অনিবার্য যোগ—probable or necessary sequence রক্ষা করা—সমগ্র রচনাকে একটি ঘটনার বা ভাবের সম্ভাব্য বা অনিবার্য বিকাশে পরিণত করা;

অন্য রীতিতে—ঘটনার পরে ঘটনা সাজিয়ে এমন কি অবান্তর ঘটনা মিশিয়েও, কোন রকমে একটা কাহিনী দাঁড় করানো। এখানে ঘটনার সঙ্গে ঘটনা কোন সম্ভাব্য বা অনিবার্য যোগে যুক্ত থাকে না—অসংলগ্ন ও বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার মাঝ দিয়ে একটা জোড়াতালি-দেওয়া গোছের ঐক্য তৈরী করা হয়। প্রথম বৃত্তে পাওয়া যায়—সংহতির সৌন্দর্য এবং রসের তীব্র আবেদন, দ্বিতীয় বৃত্তে পাওয়া যায়—বাহুল্যের বিস্তার এবং রসের বৈচিত্র্য।

উল্লিখিত আদর্শ বৃত্ত গঠন করতে হলে—বলা-বাহুল্য বিচিত্র বা জটিল ঘটনার উপস্থাপনা করা চলে না, কারণ বহু ঘটনাময় জটিল ঘটনাকে রূপ দিতে গেলে ঘটনা-বিন্যাসে তেমন পরিপাটি probable or necessary sequence—রক্ষা করা সম্ভব হয় না। পরবর্তী আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে। একথাও উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক গঠন এবং ক্লাসিকাল-গঠন নিয়ে পরে যে আলোচনা হয়েছে এরিস্টটলের আলোচনাই তার ভিত্তি।

ঐক্য—(বিষয়-ঐক্য)

বৃত্তের গঠন যাতে 'আদর্শে'র অনুরূপ হতে পারে—এরিস্টটল একক ঘটনাকেই উপস্থাপ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন—'so the plot being an imitation of an action, must imitate one action and that a whole……" যে বৃত্তে একক একটি ঘটনা উপস্থাপিত এবং আদর্শ গঠনের রীতিতে উপস্থাপিত—সেই বৃত্তেই ঐক্য (unity of plot) বিরাজ করে। এখানেই তিনি একটি প্রচলিত ভুল ধারণার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন—'ঘটনা-ঐক্য' মানে 'নায়ক-ঐক্য' নয়। "unity of plot does not, as some persons think consist in the unity of the hero. তাঁর যুক্তি এই যে, একজন ব্যক্তির জীবনে বিচিত্র বিচিত্র ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে, এবং এমন হতে পারে যে এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার হয়ত কোন যোগই নেই; ফলে সেইসব বিচ্ছিন্ন

বিচ্ছিন্ন ঘটনাদের মিলিয়ে কোন ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না—"there are many actions of one man out of which we can not make one action." তিনি বলেন—যে সমস্ত কবি হিরাক্লিসের জীবনের সমস্ত ঘটনাকে রূপ দিয়ে "হিরাক্লেইদ" বা "থেসেইড" রচনা করেছেন, তাঁদের "ঐক্য" সম্পর্কে ধারণা নেই বলেই—তাঁরা ভুল করেছেন। কারণ যে সমস্ত ঘটনার মধ্যে—ঘনিষ্ঠ যোগ নেই, সম্ভাব্য বা অনিবার্য সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়, তাদের দ্বারা 'বৃত্ত-ঐক্য' গঠন করা যায় না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে 'একক ঘটনা' বলতে কিন্তু এরিস্টটল একটিমাত্র ঘটনার কথাই বলছেন না—একক ঘটনা একাধিক ঘটনা নিয়েও সম্ভব—যদি সেই সব ঘটনার মধ্যে সম্ভাব্য বা অনিবার্য সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। সুতরাং ঘটনা একক হলেই যে বৈচিত্র্যহীন হবে এমন আশঙ্কা করার কারণ নেই।

যা'হোক—বৃত্ত গঠন সম্পর্কে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত—'A well constructed plot should therefore be single in its issue, rather than double as some maintain." (XIII—47). তবে এই মতটি কিন্তু গ্রীসের সকল সমালোচকের মত নয়। এই মত এরিস্টটলের—বিশেষভাবে এরিস্টটলেরই। ভিন্নমতাবলম্বী লোকও যে ছিল—তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। প্রথম প্রমাণ—উল্লিখিত উদ্ধৃতির শেষাংশ—"rather than double as some maintain." অর্থাৎ বিষয় (issue) একক না হলেও চলতে পারে এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। দ্বিতীয় প্রমাণ—এরিস্টটল—যেখানে "double thread of plot"-এর মিলনান্ত ট্র্যাজেডিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্র্যাজেডি বলে উপেক্ষা করেছেন, সেখানে তাকেই—'some place first'. দর্শকদের দুর্বলতাকে দোষারোপ করলেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, দর্শকরা উপ-কাহিনী-যুক্ত বৃত্ত এবং বিয়োগান্ত পরিণতি অপেক্ষা মিলনান্ত পরিণতিরই অধিক পক্ষপাতী ছিল।

এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে—ঘটনা-ঐক্য বলতে এরিস্টটল যা বুঝেছেন, তা গ্রীসের সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত নয়। সুতরাং ক্লাসিকাল-গঠন বলতে, আমরা সাধারণতঃ যে গ্রীসের প্রাচীনযুগের রচনায়

গঠন-বৈশিষ্ট্য বুঝে থাকি তা' সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ গ্রীসের সব রচনাতেই ঘটনা-ঐক্য রক্ষিত হয়নি। ক্লাসিকাল-গঠন বলতে বিশেষতঃ এরিস্টটল-কথিত ঐক্য-যুক্ত সংহত কাহিনীই বুঝায়। 'double issue—বা double thread of plot'—এর মতো ঐক্য-বিহীন বা জটিল-ঐক্য যুক্ত রচনাকে নিশ্চয়ই ক্লাসিকাল গঠনের নিদর্শন বলা চলে না। তা' চলে না বলেই, বলা বাহুল্য, ক্লাসিকাল-গঠন বলতে গ্রীসের সর্বপ্রকার রচনা-রীতি বুঝায় না।

(খ) দ্বিতীয় ঐক্য-বিধি—"সময়"-বিষয়ক অর্থাৎ "সময়-ঐক্য" (unity of time). সময় ঐক্য সম্পর্কে পোয়েটিক্সে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা' করা হয়েছে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির দৈর্ঘ্য-গত পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে। মহাকাব্যে বহুদিবসব্যাপী ঘটনাকে উপস্থাপিত করা যায় বলে—ঘটনার কাল-ব্যাপ্তি সীমাহীন। কিন্তু নাটক তো দৃশ্য কাব্য—সেখানে "অনেকদিন নিবর্ত্য-কথা" সম্প্রযোজনা করা অসুবিধাজনক বলেই বর্জনীয়। এরিস্টটল লিখেছেন—"Tragedy endeavours, as far as possible, to confine itself to a single revolution of the sun or but slightly to exceed this limit ;············though at first the same freedom was admitted in Tragedy as in Epic poetry." এই মন্তব্যের ভিত্তির উপরেই "কাল-ঐক্য" সূত্র গড়ে উঠেছে। সুতরাং মন্তব্যটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এ সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই যে—(ক) কাল-মাত্রা সম্পর্কে আগে কোন বিধিনিষেধ ছিল না—মহাকাব্যের মত ট্র্যাজেডিরও এ বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল—অর্থাৎ বহুদিবসব্যাপী ঘটনাকেও ট্র্যাজেডি রূপ দিতে পারতো। (খ) দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে—নাটকের ঘটনার কালব্যাপ্তি —যথাসম্ভব 'single revolution of the sun' অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা বা ততোধিক কিছু বেশী সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সূর্যের এক আবর্তন ১২ ঘণ্টা কি ২৪ ঘণ্টা এ নিয়ে গোঁড়া ভাষ্যকারগণ হাস্যকর গবেষণা করেছেন এবং এরিস্টটলের—'as far as possible' এবং "slightly to exceed this limit"—কথাটির তাৎপর্যটুকু পর্যন্ত উপেক্ষা করেছেন। অবশ্য যথাসম্ভব

চব্বিশ বা চব্বিশের কিছু বেশী—বললে খুব যে ইতর বিশেষ হয় তা' নয়। তবে সত্য রক্ষা হয় এই যা সান্ত্বনা।

(গ) তৃতীয়—'ঐক্য'='স্থান ঐক্য' (unity of place). এ সম্পর্কে এরিস্টটল কোন কথাই বলেননি। তাই বোধ হয় ভক্তরা অনেক কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। এই ঐক্য-বিধিটি বোধ হয়—'কাল-ঐক্য' থেকে অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বের করা হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ঘটনা শেষ হবে তাকে নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার সময় তো দেওয়াই চলে না। তারপর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে গেলেও তো অনেক সময় চলে যায়। সুতরাং ঘটনাকে যথাসম্ভব এক স্থানেই ঘটাতে হবে। এই যুক্তি থেকেই স্থান-ঐক্যের চাহিদা ও বিধি দেখা দিয়েছে। কস্টেলভেত্রোর (১৫৭০) ভাষ্যের মধ্যে প্রথম এই "স্থান ঐক্য"কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং ফরাসী ক্লাসিকাল-প্রিয় সমালোচক ও লেখকদের মধ্যে 'ঐক্য-ত্রয়' রীতিমত গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছিল।

ঐক্য-ত্রয়ের—(ঘটনা-ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং স্থান-ঐক্য) মর্যাদা বহুকাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে—এরিস্টটল 'ঐক্য' বলতে যা' বুঝেছিলেন অনেক গ্রীক নাটকেই তা ছিল না। কাল-ঐক্য এবং স্থান-ঐক্যও যে অক্ষরে অক্ষরে সব ট্র্যাজেডিতে রক্ষিত হয়েছে সেকথা জোর করে বলা যায় না। কমেডি নাটকে তো ঐক্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা গোড়া থেকেই তেমন অনুভূত হয়নি। আজ "ঘটনা-ঐক্যের" বিশুদ্ধ রূপ খুব কমই দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই—গঠন 'জৈবিক' (organic) না হয়ে এপিসোডিক হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে—ঐতিহাসিক ও চরিত-নাটকের ক্ষেত্রে—ঘটনা-ঐক্য অপেক্ষা "নায়ক-ঐক্য"ই বেশী প্রকটিত হয়। কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তার বহুকালব্যাপী জীবনের ঘটনাকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে—এমন নাটক আজ দুর্লভ নয়। তারপর রোমান্সকাহিনীর মত বহুঘটনাময়—বহুদেশে-কালে—ব্যাপ্ত কাহিনীকেও নাটকাকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ কথা

সত্য "ঐক্য" নিয়ে আজ আর তেমন গোঁড়ামি কেউ করে না—কাল-ঐক্য এবং স্থান-ঐক্য তো আজ অতীত সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

তবে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে—ঐক্য নিয়ে গোঁড়ামি নষ্ট হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু তাই বলে এরিস্টটল-কথিত বিষয়-ঐক্য এবং কাল-ঐক্যের বিধি নিছক খেয়ালের বশে উদ্ভাবিত হয়নি। বিষয়-ঐক্য সম্পর্কে এরিস্টটল যা' বলেছেন তার তাৎপর্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মূল বক্তব্য আজও সত্য। অবান্তর ঘটনা-মুক্ত, সংহত এবং বিকাশধর্মী কাহিনী রচনা করতে হলে বিষয়ের ঐক্য অবশ্যই চাই। যেখানে একাধিক কাহিনী থাকে, সেখানে ঘটনা-বিন্যাসে পূর্ববর্তীর সহিত পরবর্তীর কার্যকারণ সম্পর্কের শক্ত বাঁধুনি থাকে না—এ কথা স্বীকার করতেই হবে। বৃত্তে একাধিক 'ফোকাস' বা লক্ষ্য ব্যক্ত হলে দর্শক-পাঠকের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং রস-সংবেদনার তীব্রতাও কমে যায়। সুতরাং অঙ্গ-যোজনা সর্বদাই এমন হওয়া চাই যে অঙ্গীর প্রাধান্য এবং এককত্ব কিছুতেই যেন আচ্ছন্ন না হয়। অঙ্গীর প্রাধান্য রক্ষা করতে হলে "বিষয়-ঐক্য" অবশ্যই চাই। যে রচনায় কোন মনীষীর জীবনকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়—সেই জাতীয় 'নায়ক-ঐক্য' বিশিষ্ট নাটক ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে কোন একটি বিশেষ ভাব বা ঘটনাকে রূপ দেওয়া হয়, বিষয়-ঐক্য (ব্যাপক অর্থে) অবশ্যই আবশ্যক। "কাল-ঐক্য সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই যে—অনেকদিনব্যাপী ঘটনা যে নাটকের পক্ষে সুপ্রযোজ্য নয়—এ ধারণাটি প্রাচ্য-প্রতীচ্য সব দেশেই প্রচলিত। আমাদের দেশেও বলা হয়েছে—"নানেকদিননির্বর্ত্যকথয়া সম্প্রযোজিতঃ"। "single revolution of the sun" অপেক্ষা "নানেকদিন"—কালমাত্রা হিসাবে ব্যাপক বটে কিন্তু উভয়েই এই সাধারণ সত্যকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছে যে নাটকে বহুকালব্যাপী ঘটনাকে উপস্থাপিত করা সুবিধাজনক নয়। এই ধারণার মূলে যুক্তি কতটুকু আছে, দেখা যাক। নাটক দৃশ্য কাব্য অর্থাৎ নাটকে জীবনকে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ করা হয়। এই দৃশ্যত্ব বা প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা-ধর্মই নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য এবং এই ধর্ম থেকেই নাটক-সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের উৎপত্তি হয়েছে। বাস্তবিকতার মায়া এবং দর্শকের কৌতূহল ও উদ্দীপনা বজায় রাখার দায়িত্ব রক্ষা

করতে গিয়েই নাটককে এমন সব বিধি-নিষেধ মানতে হয়েছে যা' বর্ণনাত্মক কাব্যকে—খণ্ডকাব্যকে মানতে বা মহাকাব্যকে হয়নি। বাস্তবিকতা বজায় রেখে যে সব ঘটনাকে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়, সেগুলিকে বাদ দিতে বলা হয়েছে! ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা কৌতূহল উদ্দীপিত রাখার প্রয়োজনের উপর, লক্ষ্য-পরায়ণ কাহিনীর অগ্রগতির উপর মোট কথা "action"-এর প্রয়োজনের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। 'action'কে নাটকের প্রাণ-শক্তি বলা হয়েছে বলেই, যে সব ব্যাপার এই "action"কে স্তিমিত করে দেয় তা'কে দোষ বলা হয়েছে এবং বহুদিনব্যাপী ঘটনাকে উপস্থাপিত করা অসুবিধাজনক বলে—অল্পদিনের ব্যাপ্তির মধ্যে দৃশ্য ঘটনাটুকু সীমাবদ্ধ করতে বলা হয়েছে। বহুদিনব্যাপী ঘটনাকে রূপ দেওয়ার প্রথম অসুবিধা—পাত্র-পাত্রীর বয়ক্রম ঠিক রাখা। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক অবস্থার জন্য এক একজন সদৃশ নায়ক আবশ্যক হয়। শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ—একাধারে এই কয়টি রূপ দেখানো সম্ভব নয়। রূপসজ্জা দ্বারা প্রৌঢ়কে বৃদ্ধ করা যেতে পারে বটে, কিন্তু রূপসজ্জারও ক্ষমতা অসীম নয়। শিশুকে যুবা বা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ করার সাধ্য তার নেই। এ অসুবিধা যে উপেক্ষণীয় নয়, সাম্প্রতিককালের অভিনয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো যেতে পারে। কিশোরের পক্ষে বৃদ্ধ সাজা যেমন অসম্ভব, বৃদ্ধের পক্ষে কিশোর সাজাও অসম্ভব। দ্বিতীয় অসুবিধা—কাল-প্রবাহের ক্রম প্রদর্শন করা। পাত্র-পাত্রীর রূপসজ্জার পরিবর্তন দেখিয়ে অথবা পাত্র-পাত্রীর মুখে—কথা বসিয়ে অথবা অন্য কোন সংকেত দ্বারা কালের গতি দেখানো হয় বটে কিন্তু বহুকালে ছড়িয়ে থাকা ঘটনা দ্বারা জমাট রস সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য হয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই কারণেই নাটকের উপস্থাপ্য ঘটনার কালব্যাপ্তি অল্প হওয়া দরকার। অবশ্য কত অল্প হওয়া দরকার তা' সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা চলে না। যে কয় ঘণ্টার অভিনয় সেই কয় ঘণ্টার ঘটনা হওয়া চাই—এ যেমন অতিশয়কোটিক একটি মত, তেমনি কাল-ব্যাপ্তি অসীম হলেও চলে—এ মতও অতিশয়-কোটিক। ঘটনার কালমাত্রা এমন হওয়া চাই যাতে ঘটনাটিকে সম্যকভাবে দৃশ্য করে তোলার পথে কোন অসুবিধা না দেখা দেয়।

এরিস্টটল এই দৃশ্যত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই—"কাল-ঐক্য" রক্ষার কথা বলেছেন। কথাটির মূলে যুক্তি আছে। এলিয়টের একটি মন্তব্য দিয়ে উপসংহার করা যাক—'The unities have for me at least a perpetual fascination. I believe they will be found highly desirable for the drama of the future. For one thing we want more concentration'. (A Dialogue on Dramatic poetry).

ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগ

ট্র্যাজেডি নাটকের স্রষ্টা ইস্কিলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস বটে কিন্তু ট্র্যাজেডিতত্ত্বের প্রথম সূত্রকার ও বৃত্তিকার—মনীষী এরিস্টটল। প্রথম সূত্রকারের—শ্রেণী-বিভাগ হিসাবে, পোয়েটিক্‌স গ্রন্থে ট্র্যাজেডির যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে।

এরিস্টটল মতে ট্র্যাজেডি চার প্রকার—(১) কম্‌প্লেকস—(২) প্যাথেটিক (৩) এথিকাল (৪) সিম্‌প্‌ল্‌। ('স্পেক্‌টাকুলার'-উপাদান-প্রধান গণনার অনুপযুক্ত বলে তালিকায় স্থান দেননি।)

(ক) প্রথম শ্রেণীর—('কমপ্লেক্‌স-ট্র্যাজেডির) বৈশিষ্ট্য এই যে, এই জাতীয় নাটকের গঠনে পরিস্থিতি-বিপর্যাস (Reversal of situation) এবং প্রত্য-ভিজ্ঞান (Recognition) প্রভৃতি বিস্ময়জনক ঘটনার সমাবেশ বেশী থাকে। যেহেতু 'Reversal of situation and Recognition turn upon surprises' ৪৩ পৃঃ) এই লক্ষণের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে এই জাতীয় নাটকে ট্র্যাজেডির মূল রস—ভয়ানক ও করুণ তো থাকেই—অধিকন্তু থাকে অদ্ভুত রস। অর্থাৎ এই সব নাটকে বিস্ময়-ভয়-শোচনা এই তিন ভাবের সংমিশ্রণ ঘটে এবং বিস্ময়ের মাত্রা বেশী থাকায়—চিত্তে শোচনার উদ্রেক হওয়া সত্ত্বেও চিত্ত 'দ্রবীভূত' হয় না। বলা বাহুল্য—এই জাতীয় নাটকে "awe and grandeur" এর মাত্রা বেশী থাকে এবং এই শ্রেণীর নাটককে এরিস্টটল উত্তম জাতি—"perfect" বলে ঘোষণা করেছেন।

অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয় উত্তম ট্র্যাজেডির রস সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা' আপাতদৃষ্টিতে খুব নতুন বলে মনে হলেও, আসলে নতুন নয়—এরিস্টটলের—'পারফেক্ট ট্র্যাজেডির' লক্ষণের মধ্যেই উক্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডিতে বিস্ময়-ভাবের একটা বড স্থান রয়েছে—এবং প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতেই কম বেশী "element of wonderful" থাকা আবশ্যক, এ কথা এরিস্টটল স্পষ্ট করেই বলেছেন। তবে অধ্যাপক নিকলের সাথে এরিস্টটলের পার্থক্য এই যে অধ্যাপক নিকল pity বা 'প্যাথোস'কে যে ভাবে অপাংক্তেয় করেছেন এরিস্টটল তা' করেননি—করতে পারেন নি বলেই করেননি। "ঈডিপাস দি রেক্স" নাটকখনি এরিস্টটলের মতে পারফেক্ট ট্র্যাজেডি (হেগেলের মতে = এন্টিগোন)। তা'তে—বিস্ময়-ভয় ও শোচনা নির্বিরোধে ব্যক্ত হয়েছে। শোচনা, বিস্ময়বোধ বা ভয় পরস্পর স্বতোবিরুদ্ধ নয় বলেই সামবায়িক সমাবেশ সম্ভব হয়েছে। এন্টিগোনেও শোচনা জাগানোর চেষ্টা কম নেই। সুতরাং ট্র্যাজেডি যত "হাই" হো'ক—"প্যাথোস-মুক্ত হলেও 'পিটি'-মুক্ত হ'তে পারে না।

দ্বিতীয় শ্রেণী = প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি। বন্ধনীর মধ্যে এই জাতির বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করতঃ বলা হয়েছে—where the motive is passion এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—Ajax and Ixion, দু'খানি নাটকের। 'mad-brained error'—এর ফলে "আয়াস"—অকীর্তি ও অখ্যাতি লাভ করেন এবং তা' তাঁর পক্ষে মরণের চেয়েও বেদনাদায়ক হয়। এই বেদনাই এই নাটকে মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয়। আয়াসের বিক্ষোভ ও বিলাপ প্রকাশ করা তথা করুণ রস সৃষ্টি, এখানে মুখ্য লক্ষ্য হয়েছে।

বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এখানে এই, যে—প্রলাপ-বিলাপও ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টির অন্যতম উপায় হতে পারে। সুতরাং "প্যাথেটিক" ও "ট্র্যাজিক"—একে অন্যের প্রতিশব্দ নয়। "ট্র্যাজিক" কথাটা এমন একটি ব্যাপক তাৎপর্য-যুক্ত শব্দ যার মধ্যে—'wonderful,'—'terrible' এবং "pathetic" নির্বিরোধে অবস্থান করতে পারে। আসল কথা, ঘটনার বা পরিস্থিতির

বৈশিষ্ট্য, পাঠক দর্শক চিত্তে ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগাতে যেখানে সক্ষম, সেখানে—নায়কের প্রলাপ-বিলাপ ট্র্যাজেডি-রসের সঞ্চারিভাব হিসাবে অবশ্যই স্থান পেতে পারে, অর্থাৎ প্রলাপ-বিলাপ ট্র্যাজেডি-সংবিদকে ব্যাহত করে না। ট্র্যাজেডি-সংবিদ (Tragic impression) জাগানোই বড়ো কথা। তা' যেখানে জাগে, সেখানে—বিস্ময়কর ভয়ানক বা করুণ যে-কোন ঘটনাই তার মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। বিস্ময়, শোক বা ভয়, ট্র্যাজেডি-সংবিদকে আচ্ছন্ন না করা পর্যন্ত, যে-কোন মাত্রায় থাকতে পারে।

পরবর্তীকালে—অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বলা যেতে পারে—'প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি'কে সমালোচকরা হেয়জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছেন এবং ক্রমে এমন কথাও উঠছে যে 'প্যাথেটিক' আর যা' হোক 'ট্র্যাজিক' নয়। "প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি" কথাটা যেন পাথুরে সোনারবাটি গোছের কথা। প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি না বলে "প্যাথেটিক ড্রামা" বলাই ভাল। এই প্রবণতাই, মনে হয়, অধ্যাপক নিকল মহাশয়ের—ট্র্যাজেডির রস-বিচারে (আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) মতবাদের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বেই আমরা অধ্যাপক নিকলের মতের আলোচনা করেছি এবং ট্র্যাজেডিতে "pity"-যে অপরিহার্য এই মত স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি। এখানে শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে—প্যাথেটিক হওয়া সত্ত্বেও নাটক ট্র্যাজেডি হতে পারে অর্থাৎ "প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি"র নাম শ্রেণী-বিভাগ থেকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। কেন হবে না একটু আগেই তা' আলোচনা করেছি। এ' প্রসঙ্গে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—প্যাথেটিক ট্র্যাজেডির সংখ্যা খুব কম নয় এবং গ্রীক-ট্র্যাজেডি লেখকগণ, এলিজাবেথ-যুগের নাট্যকারগণ এবং আধুনিক যুগের নাট্যকারগণ "প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি" রচনা করতে কুণ্ঠিত হননি। এই সব নাটকে করুণের (pathos) আধিক্য বেশী থাকে বটে, কিন্তু ট্র্যাজেডি-সংবিদও (tragic impression) যথেষ্ট থাকে।

তৃতীয় শ্রেণী—এথিকাল ট্র্যাজেডি ["where the motives are ethical—such as the phthiotides and the Peleus"]। এই জাতীয় নাটকে কোন রসকে সুনিষ্পন্ন করা অপেক্ষা বিশেষ একটি নৈতিক-সমস্যাকেই

মুখ্য লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেই সমস্যার সমাধানেই নাটক সার্থক সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় নাটককে আমরা 'ভাব'-রসাত্মক নাটক বলতে পারি। এই জাতীয় ভাব-রসাত্মক নাটকের উপযোগিতা বা আবশ্যকতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিদেরো বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। নাটকের শ্রেণী-বিভাগ করার প্রসঙ্গে তিনি "Philosophical Drama", Ethical Drama-র অর্থাৎ (Drama of Ideas)—ভাবরসাত্মক নাটকের রূপ-রস নিয়ে প্রথম আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন—ভবিষ্যদ্‌বাণী করার মতই করেই বলেছেন —ক্রমে নাটকে জীবনের নৈতিক ও দার্শনিক সমস্যা আলোচিত হবে এবং নাটক উন্নততর পদবীতে আরোহণ করবে। এথিকাল ট্র্যাজেডিকে আমরা পরবর্তী ভাব-প্রধান নাটকের সূচনা বলে মনে করতে পারি।

চতুর্থ শ্রেণীর ট্র্যাজেডি = 'সরল" (simple), অর্থাৎ সরল গঠনের ট্র্যাজেডি যাতে 'পরিস্থিতি-বিপর্যাস' বা 'প্রত্যভিজ্ঞান' থাকে না এবং ঘটনা-বিন্যাসেও কমপ্লেকস্ বৃত্তের মত 'probable or necessary sequence' থাকে না। রসের বৈশিষ্ট্য—বোধ হয় এই যে এই জাতীয় নাটকে প্রথম শ্রেণীর 'awe and grandeur' থাকে না প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি সুলভ—করুণের প্রাধান্যও থাকে না এবং 'fear and pity' উভয়ই প্রয়োজনীয় মাত্রায় উদ্রিক্ত হয়।

এরিস্টটলের এই শ্রেণী-বিভাগ পর্যালোচনা করে দেখা যায়—প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণী কল্পিত হয়েছে—বিশেষতঃ গঠন-বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে—(রস-বৈশিষ্ট্য গঠন বৈশিষ্ট্য থেকেই উপজাত), দ্বিতীয়টির ভিত্তি—রস-বৈশিষ্ট্য এবং তৃতীয়টির ভিত্তি—ভাব-বৈশিষ্ট্য। আর দেখা যায়, 'স্পেকটাকুলার এলিমেণ্ট'-যুক্ত অর্থাৎ দৃশ্য-প্রধান নাটককে এরিস্টটল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। এই না-করাটুকু তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধানতঃ দৃশ্য-সজ্জা দ্বারা যেখানে রস-সৃষ্টি করা হয় সেখানে কবিকর্মের মর্যাদা বা কবি-কৃতিত্ব কম। "phorcides" এবং "prometheus"—নাটকে রস প্রধানতঃ দৃশ্য-সাপেক্ষ বলে এরিস্টটল—নাটক দু'খানিকে বড় স্থান দেননি। এই বড়-স্থান না-দেওয়ার মনোভাবের মূলে যে কারণটুকু রয়েছে সেইটিই পরবর্তীকালে

প্রবল হয়ে—ট্র্যাজেডি-জাতিদেহে "মেলোড্রামা" নামক অন্ত্যজ শ্রেণী কল্পনা করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। পূর্বেই "উপাদান"-আলোচনা প্রসঙ্গে "গান" ও দৃশ্যের গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে—গানও রসসৃষ্টির বাহ্য উপায়। প্রধানতঃ এই দুই উপায়ের সাহায্যেই যেখানে রসসৃষ্টি করার চেষ্টা হয় সেখানে নাটকে জীবন-সমালোচনা গভীর হতে পারেনা ; ঘটনা-চমৎকার অন্তর্দ্বন্দ্বের অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার স্থান অধিকার করে বসে। যাঁরা বড় স্রষ্টা (superior poet) তাঁরা 'inner structure of the piece' দ্বারাই ভয় ও করুণা জাগ্রত করতে পারেন আর যাঁরা অল্পশক্তির অধিকারী তাঁরা "spectacular means" অবলম্বনে রস-সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা হেয় বলেই গণ্য হয়েছে এবং এখনও তা' হয়।

এই প্রসঙ্গেই ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার সম্পর্ক নিয়ে দু'একটা কথা বলা দরকার। আমি এ কথা বলেছি যে ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগ করতে গিয়ে এবং গানের ও দৃশ্যর ঔপাদানিক গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল—স্পষ্টভাবেই দেখাতে চেষ্টা করেছেন—"সিরিয়াস ইমিটেশন" করতে গিয়ে অনেকে দৃশ্য-সজ্জাদি বাহ্য উপায়কেই প্রয়োগ করে থাকেন—এই মন্তব্যের তাৎপর্য এই যে ঘটনা-চরিত্র-কল্পনা-ভাবনা থেকে এই সব স্রষ্টারা স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে তীব্র সংবাদী আবেদন তথা জীবনের রূপ সৃষ্টি করতে পারেন না। ফলে এঁদের রচনায় আশানুরূপ গভীর জীবন-সমালোচনার রূপও ব্যক্ত হয় না। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—এরিস্টটলের মতে—ট্র্যাজেডি জীবনের যে-সে অনুকরণ নয়—"সিরিয়াস ইমিটেশন"। বলা বাহুল্য জীবনের রূপ সৃষ্টিতে যে অনুপাতে গভীরতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পায় সেই অনুপাতেই রচনার "সিরিয়াসনেস" বৃদ্ধি পায়। আর যে পরিমাণে এই গভীরতা কমে যায় সেই পরিমাণেই রচনা লঘু হয়ে পড়ে। "স্পেক্‌টাকুলার এলিমেণ্ট" প্রধান ট্র্যাজেডিতে "inner structure of the piece" থেকে রস নিষ্পন্ন হয় না এবং তা' হয় না বলেই সার্থক 'সিরিয়াস ইমিটেশন' হতে পারে না। এই জাতীয় লঘু-প্রকৃতির গুরু-বিষয়ক নাটককেই পরবর্তীকালে

আর একটা কথাও বলা দরকার—"মেলোড্রামাটিক" ও মেলোড্রামা এই কথা দুইটি প্রয়োগে, সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। মেলোড্রামা গোটা নাটক সম্পর্কে প্রযোজ্য আর মেলোড্রামাটিক—ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য। যেখানে অঙ্গীরসের আলম্বন-বিভাব অর্থাৎ মুখ্য পাত্র-পাত্রী এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনা মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়ে, সেখানেই নাটকের মেলোড্রামা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। পারিপার্শ্বিক কোন চরিত্র বা ঘটনা মেলোড্রামাটিক হলেও, অথচ অঙ্গীরস বিশেষভাবে ব্যাহত না হলে—নাটকের ট্র্যাজেডি হওয়ার পক্ষে কোন বাধা উঠতে পারে না। এই কথাটি মনে রাখলে, আমার মনে হয়, নাটক মেলোড্রামা কি ট্র্যাজেডি এ বিচারে কম বিভ্রাট হবে। ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য-বিচার এই পর্যন্ত।

মেলোড্রামাকে অপাংক্তেয় করে সরিয়ে রেখে, ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগ পরবর্তীকালে কি রূপ নিয়েছে এবার সেই আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। এরিস্টটলে যে শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়, পরবর্তীকালের শ্রেণী-বিভাগে তার প্রভাব বড়ো একটা দেখা যায় না। অধ্যাপক নিকল তাঁর "দি থিওরি অফ্ ড্রামা"-গ্রন্থে ট্র্যাজেডির প্রকার-ভেদ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন—তাকে বিংশশতাব্দীর শ্রেণীবিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে এ কথা আগেই বলে রাখছি—এই শ্রেণী-বিভাগ বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগের মর্যাদা দাবী করতে পারে না। অধ্যাপক নিকল ট্র্যাজেডির প্রকাশ নির্দেশ করেছেন নিম্নলিখিত রূপ :—

(ক) গ্রীক ট্র্যাজেডি : বৈশিষ্ট্য (১) কোরাস (chorus)
(২) ঐক্য (unities)

(খ) প্রথম পর্বের এলিজাবেথীয় ট্র্যাজেডি

(গ) মার্লোকৃত ট্র্যাজেডি

(ঘ) শেকৃসপীয়র-কৃত "

(ঙ) হিরোয়িক "

(চ) হরর "

(ছ) ডোমেস্টিক "

আমার মনে হয়—অধ্যাপক নিকল যে-ভাবে ট্র্যাজেডির শ্রেণী-পরিচয় দিয়েছেন তাকে খুব পরিপাটি বলা যায় না। কারণ শ্রেণী-বিভাগের বিশেষ ভিত্তি অনুসারে যে যে শ্রেণী কল্পনা করা উচিত তা' তিনি করেন নি। যেমন ধরা যাক্—ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডির কথা। এই শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি—বিষয়-বস্তুর উৎস-বৈশিষ্ট্য (subject matter)। এখন বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে—নাটককে (ক) পৌরাণিক (খ) ঐতিহাসিক (গ) সামাজিক (ঘ) ডোমেস্টিক প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা উচিত। অধ্যাপক নিকল এভাবে অগ্রসর হননি।

তারপর—বিশেষ রস-প্রাধান্যের ভিত্তিতে ভাগ করতে গেলে, ট্র্যাজেডিকে শুধু "হরর ট্র্যাজেডি" শ্রেণীতে ভাগ করলেই চলবে না। ট্র্যাজেডিতে যে যে রস প্রধান হতে পারে, সেই সেই ভাবের নাম অনুসারে শ্রেণী কল্পনা করতে হবে। ভাবের ভিত্তিতে ট্র্যাজেডিকে আমরা—(ক) বিস্ময়প্রধান (খ) ভয়-প্রধান (গ) শোচনা-প্রধান (ঘ) উৎসাহ-প্রধান প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভাগ করতে পারি। প্রথমটিকে ইংরাজীতে বলা যেতে পারে—Wonderful, দ্বিতীয়টিকে বলা হয়েছে—Horror Tragedy, তৃতীয়টিকে এরিস্টটলের ভাষায় বলা যাক—Pathetic Tragedy চতুর্থটিকে—সাধারণ ভাবে Heroic Tragedy (যদিও হিরোয়িক ট্র্যাজেডিতে প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয়ে থাকে) বলা যেতে পারে।

আমার মনে হয় নিম্নলিখিত শ্রেণী-বিভাগ স্বীকার করলে যথাসম্ভব পরিপাটি শ্রেণী-বিভাগ পাওয়া যেতে পারে :—

(ক) বিষয়বস্তুর উৎসের ভিত্তিতে—

(১) পৌরাণিক বা পৌরাণিককল্প (Mythological or semi-mythological)

(২) ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিককল্প (Historical or semi-historical)

(৩) সামাজিক (Social)

(৪) পারিবারিক (Domestic)

(৫) চরিতমূলক (Biographical)

(৬) অতিকাল্পনিক (Fantastical)

(খ) **রসের ভিত্তিতে—**

(১) বিস্ময়-প্রধান (Wonderful)

(২) ভয়-প্রধান (Horror)

(৩) শোচনা-প্রধান (Pathetic)

(৪) উৎসাহ-প্রধান (Heroic)

(গ) **ভাবের ভিত্তিতে—**

(১) ধর্ম-মূলক (Religious)

(২) প্রেমমূলক (Romantic)

(৩) নীতি-মূলক (Ethical)

(৪) রাজনীতি মূলক (Political)

(৫) অতি-প্রবৃত্তিমূলক (Tragedy of passion)

(ক) বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের অভিঘাত-জন্য কৃতঘ্নতার ট্র্যাজেডি (Tragedy of Ingratitude)

(খ) আত্মাকাঙ্ক্ষার ট্র্যাজেডি (Tragedy of Ambition)

(গ) (কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য)—রিপু প্রাবল্যের ট্র্যাজেডি

(৬) নিয়তি-কৃত ট্র্যাজেডি (দৈবশক্তি + পরিবেশ + চরিত্ররূপী)

আমার মনে হয়—উল্লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা—গ্রীক ট্র্যাজেডির থেকে আধুনিক ট্র্যাজেডি পর্যন্ত, সকল রকম ট্র্যাজেডির শ্রেণী-পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভব। তবে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা উচিত···শ্রেণী-পরিচয় দিতে প্রধান লক্ষণটির দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ একের মধ্যে অন্যের ধর্ম মিশে থাকলেও—প্রধানতঃ যে ধর্মটি ব্যক্ত সেই ধর্মকেই বিলক্ষণ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন, 'নিয়তি-কৃত' ট্র্যাজেডিতে প্রবৃত্তির অতিরেক থাকতে পারে, কিন্তু ঐ অতিরেক অপেক্ষা নিয়তির প্রাধান্য বেশী পরিস্ফুট বলে—জাতিটিকে "Tragedy of Fate" নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। আর

একটা কথা বলে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাক্। কথাটি এই যে বিষয়বস্তুর উৎস-গত বৈশিষ্ট্য, রস বৈশিষ্ট্য এবং কাহিনীর মূল ভাব-গত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেই শ্রেণী বিভাগ মোটামুটি সুসম্পন্ন করা হয় এবং এই তিন দিকের হিসাব করেই শ্রেণী পরিচয় দেওয়া উচিত।

মহাকাব্য (Epic)

গ্রীস ধন্য!—এরিস্টটল ভাগ্যবান!—গ্রীসের কাব্যজগতে 'অণোরণীয়ান' থেকে মহতো মহীয়ানের বিস্ময়কর সমারোহ ঘটেছে—গ্রীক সভ্যতার প্রথম প্রভাতেই। গীতি-কবিতাকে আমরা (উপমার খাতিরে) যদি 'অণীয়ান' বলতে পারি, হোমার-রচিত ইলিয়াড-অডিসিকে আমরা অবশ্যই 'মহীয়ানের' আসন ছেড়ে দিতে পারি। এরিস্টটল ভাগ্যবান শিল্পদার্শনিক—যাঁর সামনে হোমারের মহাকাব্য এবং ঈস্কিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডির মতো মহামুল্য শিল্পের নিদর্শনরাজি বিরাজ করেছে। তাই তো এরিস্টটল শুধু ট্র্যাজেডি-কমেডিরই প্রথম সূত্রকার ন'ন, মহাকাব্যেরও স্বরূপ তিনিই প্রথম বিচার করেছেন।

পোয়েটিক্স্-গ্রন্থে মহাকাব্য-লক্ষণ

(ক) মহাকাব্য, ট্র্যাজেডির মতোই, "সিরিয়াস ইমিটেশন"—"imitaion in verse of characters of a higher type".

(খ) (ট্র্যাজেডি দৃশ্যকাব্য); মহাকাব্য = শ্রব্যকাব্য (narrative in form), তবে বৃত্তটিকে অনেকটা নাট্য-রীতিতেই গঠন করতে হবে।

(গ) মহাকাব্য একবৃত্তময় (employs a single metre)—"হিরোয়িক মিটার"ই মহাকাব্যের উপযুক্ত বৃত্ত বা ছন্দ।

(ঘ) নাটকের মতোই—"It should have for its subject a single action, whole and complete with a beginning, middle and end.

It will thus resemble a living organism in all its unity······ অর্থাৎ মহাকাব্যেও "বিষয়-ঐক্য" রক্ষা করা আবশ্যক। ঐতিহাসিক রচনার সঙ্গে মহাকাব্যের মূল পার্থক্য এখানেই যে ঐতিহাসিক রচনায়—একটা সমগ্র যুগ এবং সেই যুগে এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনে যত ঘটনা ঘটেছে তাদের সবগুলি উপস্থাপিত হয়; আর মহাকাব্যে উপস্থাপিত হয় একক একটি বিষয় (single action)। অবশ্য সকলেই যে তা' করেছেন তা' নয়। হোমার ছাড়া—"All other poets take a single hero, a single period or an action single indeed but with a multiplicity of parts". (Cypria ও Little Illiad—কাব্য দু'খানি দৃষ্টান্ত)

(ঙ) ট্র্যাজেডির উপাদান—(১) বৃত্ত (২) চরিত্র (৩) বচন বা ভণিতি (৪) চিন্তা (গান ও দৃশ্য বাদ)।

(চ) ট্র্যাজেডির যত প্রকার, মহাকাব্যের প্রকারও তত অর্থাৎ মহাকাব্যও (১) সরল (simple) (২) জটিল (complex) (৩) নীতিমূলক (ethical) এবং (৪) করুণ-রসাত্মক (pathetic) হতে পারে। যেমন, ইলিয়াড গঠনের দিক দিয়ে 'সরল', কিন্তু রসের দিক দিয়ে—'করুণ, (pathetic); অডিসি গঠনের দিক দিয়ে—জটিল (complex), ভাবের দিক দিয়ে নীতি-মূলক (ethical)।

(ছ) ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের বড়ো পার্থক্য—বিশালতায়—in the scale on which it is constructed"—(XXIID) দৈর্ঘ্য—(in their length—V)। দৈর্ঘ্য-মাত্রা সম্পর্কে আগে বলা হ'য়েছে—আদি এবং অন্ত যেন এক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে (the beginning and the end must be capable of being brought within a single view.) কিন্তু ঐ মন্তব্য খণ্ডকাব্য এবং নাটকাদি অল্পায়তনের কাব্য অর্থাৎ এক-বৈঠকে-সমাপ্য (presented at a single sitting) কাব্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য; মহাকব্যের মত বৃহদায়তন রচনা সম্পর্কে ঠিক খাটে না। মহাকাব্য বিশাল হতে পারে কেন, এরিস্টটল তা' ব্যাখ্যা ক'রেই বলেছেন—বলেছেন মহাকাব্যের আয়তন বৃদ্ধির বিশেষ এবং উদার সুযোগ রয়েছে। নাটকে একই সময়ে ঘটিত

ঘটনাদের একটিকে ছাড়া উপস্থাপিত করার সুযোগ নেই। তারপর সবরকম ঘটনাকে ঔচিত্য বজায় রেখে নাটকে রূপ দেওয়া যায় না—যেমন একিলিস কর্তৃক হেক্টরের পশ্চাদ্ধাবন—এই ঘটনা রূপ দিতে গেলে তা' হাস্যোদ্দীপক হ'য়ে উঠবে। কিন্তু মহাকাব্য—শ্রব্যকাব্য বলে, একই কালে'সংঘটিত ঘটনাদের এবং সব রকম ঘটনাকেই রূপ দিতে পারে এবং তা পারে বলেই —"The epic has here an advantage, and one that conduces to grandeur of effect, to diverting the mind of the hearer and relieving the story with varying episodes"—মহাকাব্যে ঘটনা বৈচিত্র্য, রস-বৈচিত্র্য তথা বিশাল গাম্ভীর্যের অবকাশ অধিক। যেহেতু 'Epic has no limits of time'. এপিসোড্-যোজনার অবকাশ মহাকাব্যে বেশী; এবং বেশী বলেই মহাকাব্যের আয়তন বড হতে পারে। তাই তো মহাকাব্যিক গঠন (epic structure) বলতে বুঝায়—"One with a multiplicity of plots" (XVIII). শুধু তাই নয়—"In the epic poem, owing to its length, each part assumes its proper magnitude"—তার ফলেই মহাকাব্যের আকৃতি হয় বৃহত্তর আর প্রকৃতি হয় মহত্তর। মহাকাব্য—দেহে বিরাট, আত্মায় মহান, এক কথায়—কায়-মনো-বাক্যে মহান।

মহাকাব্যের এত বড়ো বিরাট মহত্ত্ব সত্ত্বেও, এরিস্টটল ট্যাজেডিকেই "higher form of art" বলে ঘোষণা করেছেন এবং ট্র্যাজেডিকে ছোট প্রমাণ করবার জন্য, ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে এইভাবে যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে :—যা অধিকতর সূক্ষ্ম বা পরিমার্জিত তা'ই উন্নতর এবং যা' বিশিষ্ট শ্রোতাদের তৃপ্তি দেয় তাকেই সূক্ষ্মতর বলা যায়। এই যুক্তিতে, যে রচনায় সব-কিছুই উপস্থাপিত হয় তা' অবশ্যই অতি স্থূল। নাটকে অভিনেতারা সব রকম অভিনয় করে, রস সঞ্চার করে অর্থাৎ রসাস্বাদনে সাহায্য করে। অভিনয়ের সাহায্য ছাড়া দর্শকরা রস উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং ট্র্যাজেডির আবেদন সেই স্থূল-রুচি দর্শকদেরই কাছে—যারা অঙ্গ-ভঙ্গী না

দেখে রস আস্বাদন করতে পারে না ; আর মহাকাব্যের আবেদন উন্নতবুদ্ধি-সূক্ষ্মগ্রাহী দর্শকের কাছে—যাদের অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যের কোন প্রয়োজন থাকে না। অতএব মহাকাব্যই উন্নততর সৃষ্টি। এই যুক্তির বিরুদ্ধে এরিস্টটলের বক্তব্য এই—

(ক) অঙ্গ-ভঙ্গী নাটকেও যেমন হয়, মহাকাব্য-পাঠেও হয়ে থাকে (gesticulation may be equally overdone).

(খ) অভিনয় ছাড়াই ট্র্যাজেডির রস আস্বাদন করা যায় ; শুধু পাঠ করলেই রস পাওয়া যায়।

(গ) অন্যদিক দিয়ে, নাটকই উন্নততর। মহাকাব্যের উপাদান চারটি, নাটকের ছয়টি, সুতরাং আনন্দের উপাদান বেশী।

(ঘ) মহাকাব্যের ছন্দেও নাটক লেখা সম্ভব।

(ঙ) কি পাঠে, কি অভিনয়ে উভয়ত নাটকের—রূপাভিব্যক্তি (vividness of impression) স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয়।

(চ) রস-সংবেদনার তীব্রতাও নাটকের বেশী ; কারণ অল্পপরিসরে রসনিষ্পত্তি ঘটে (* concentrated effect is more pleasurable than one which is spread over a long time and so diluted.)

অতএব :—"Tragedy is the higher art". শ্রব্যকাব্য মহাকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্য ট্র্যাজেডি উন্নততর শিল্প-প্রতিভার কাজ কি না, এ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন থাকলেও অবকাশ এখানে কম। আমাদের আসল কাজ—মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ধারণ করা। এরিস্টটল যে যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তা' আমি উপরে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছি। এবার এরিস্টটলের পরবর্তী আলোচনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাক। মধ্যযুগে, রেনাসাঁ-যুগে, মহাকাব্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাক

রেনাসাঁ-যুগে মহাকাব্য-লক্ষণ

প্রাক্ রেনাসাঁ-যুগে এবং রেনাসাঁ-যুগে মহাকাব্যের মাহাত্ম্য সকলেই মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন এবং এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে ট্র্যাজেডি অপেক্ষা মহাকাব্য মহত্তর সৃষ্টি। এই স্বীকৃতি এরিস্টটল-বিরোধী —বলাই বাহুল্য। কেন এরিস্টটল-বিরোধী স্বীকৃতি—তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে :—(ক) গ্রীক সাহিত্যের সহিত অপরিচয়, (২) ভার্জিলের মহাকাব্য—'এনিড্'-এর প্রতি ঐকান্তিক সম্ভ্রমবোধ (গ) মধ্যযুগের ভ্রাম্যমান অভিনেতাদের (histriones & vagantes) অভিনয়ে, নাট্যের প্রেতরূপের সঙ্গে লোকের পরিচয়।

(ক) (ইতালীতে) Vida তাঁর 'Ars poetica'-গ্রন্থে (১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের-পূর্বে রচিত, ১৫২৭ প্রকাশিত) ভার্জিলের 'এনিড' মহাকাব্য সামনে রেখে মহাকাব্যের রচনা-রীতি ও দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মহাকাব্যের লক্ষণ কি, উপাদান কি কি, কি তার উদ্দেশ্য—এ সব প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। ডেনিয়েল্লো (১৫৩৬ খ্রীঃ) প্রথম মহাকাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেন এবং তা'তেই রেনাসাঁ-যুগীয় সংজ্ঞার মূল ধারণা পাওয়া যায়। হোরেসের মতই তিনি বলেন—মহাকাব্য রাজ রাজাধিরাজদের এবং উদার প্রকৃতি বীর যোদ্ধাদের বিখ্যাত ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা। ত্রিস্‌সিনো (Trissino)—প্রথম, এরিস্টটলের ধারণাকে, আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় প্রবেশ করান বটে, কিন্তু তিনিও বলেছেন—ভার্জিল এবং হোমার যে যে-কোন ট্র্যাজেডি-নাট্যকার অপেক্ষা বড়ো স্রষ্টা—এ বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীই একমত।

মিণ্টুর্নো (Minturno) মহাকাব্যের যে লক্ষণ দিয়েছেন তা' এরিস্টটলের ট্র্যাজেডি-লক্ষণের হুবহু নকল—(ইংরেজী অনুবাদে :—Epic poetry is an imitation of a grave and a noble deed perfect, complete and of proper magnitude with embellished language, but without music or dancing : at times simply narrating and at other times, introducing persons in words or actions ;

—অনেক পরবর্তী কালে—'মেলোড্রামা" নাম দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এই নামটি এরিস্টটলের দেওয়া নয়।

'মেলোড্রামা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই :—মেলোস্ = গান + ড্রেম = নাট্য; অর্থাৎ গানযুক্ত নাট্য। ইতালীদেশে, গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুরূপ গান-যুক্ত নাটক সৃষ্টির চেষ্টা দেখা দেয়—ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে। "দাফ্নে" (১৫৯৯) নাটকখানি এই জাতির প্রথম নিদর্শন। তারপর এক শতাব্দী পর্যন্ত অপেরা ও মেলোড্রামা একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। ক্রমে "মেলোড্রামা" কথাটির অর্থ দাঁড়ায় = গানযুক্ত, আকস্মিক ও রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রধান 'সিরিয়াস ড্রামা' এবং পরে অর্থসঙ্কোচ ঘটে অর্থ হয় :—ট্র্যাজেডির—"a cruder and more popular kin" (Dictionary of World Lireraturе.)

অধ্যাপক নিকল যখন মেলোড্রামাকে ট্র্যাজেডির "plebeian relative" বলেন, তখন শেষোক্ত অর্থেই শব্দটিকে প্রয়োগ করেন। অধ্যাপক নিকল মহাশয়ের সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত রূপে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে :—

(ক) মেলোড্রামায়—"song, show and incident prevailing eharacteristics"—গান, দৃশ্য ও ঘটনা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(খ) ঘটনা দ্বারা চমৎকার সৃষ্টির দিকে অনুচিত ঝোঁক ("undue insistence upon incident.") ['ক'-এর অনুসিদ্ধান্ত]

(গ) ('খ'-এর অনুসিদ্ধান্ত) = have nothing or practically nothing that makes an inward appeal—এক কথায়—"stressing of spiritual" থাকে না অর্থাৎ এমন কিছু থাকে না বা কমই থাকে যা'তে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। মোলোড্রামায় স্থূল ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে, মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না।

(খ) অবশ্য নাটকে 'মেলোড্রামা'-সুলভ আকস্মিক ও রোমাঞ্চকর ঘটনা বা চরিত্র থাকলেই যে নাটকে 'মেলোড্রামা' বলতে হবে, এমন কোন কথা নেই। চরিত্র-সৃষ্টি ব্যাপারে এবং ভাবব্যঞ্জনায় গভীরতা (inwardness)

তথা সর্বজনীনতা (universalness) ব্যক্ত হলে, মেলোড্রামা-সুলভ ঘটনাদি থাকা সত্ত্বেও, নাটককে ট্র্যাজেডির তালিকাতেই স্থান দিতে হবে।

অধ্যাপক নিকলের সিদ্ধান্তটি প্রণিধানযোগ্য—'It is then some inner quality—the stressing of the spiritual as opposed to merely physical that makes Tragedy out of melodrama and Comedy out of farce". তবে এই inner quality—সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। কোথায় নিছক দৈহিক ক্রিয়া-কলাপের কৌতূহল সৃষ্টি করার মধ্যে নাটক সীমাবদ্ধ হয়ে আছে এবং কোথায় সে সীমা অতিক্রম করে নাটক গভীর স্তরের জীবনের রূপকে প্রকটিত করছে—এ সম্যকভাবে না ধরতে পারলে, ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এখানেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—উঠছেও—তবে কি মেলোড্রামা ট্র্যাজেডি-রচনারই ব্যর্থ চেষ্টার নিদর্শন? ট্র্যাজেডিরই অপভ্রংশ বিশেষ? ট্র্যাজেডি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে পরিণত হতে না পারলেই কি মেলোড্রামা হয়? —Understanding Drama গ্রন্থে—ব্রুক্স ও হিলম্যান প্রশ্নটি তুলে আলোচনা করেছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন—শুধু ট্র্যাজেডিই যে রচনার দোষে মেলোড্রামার স্তরে নেমে যায়, তা' নয়, যে কোন সমস্যা-মূলক নাটকও 'মেলোড্রামার স্তরে নেমে যেতে পারে এবং মেলোড্রামা লেখার উদ্দেশ্য নিয়েও মেলোড্রামা রচনা সম্ভব।

এঁরা লিখেছেন—'We should however, guard against seeing melodrama merely as tragedy which does not come off. Tragedy may fail to come off and yet not be melo-drama. Viz. Dr. Johnson's Irene, or an author may aim only at melodrama and what he does may be good or bad melodrama. মোট কথা মেলোড্রামা একটা স্বতন্ত্র জাতি—এর পরিস্থিতি 'physical", এতে "good atheletic contest"-এর মতো "excitement, tension, suspense for their own sake" থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত—"it means nothing".

in order that though pity and fear of the things imitated such passions may be purged from the mind with both pleasure and profit—নকলই বটে।] মিণ্টুর্নোর কাছেও মহাকাব্য ট্র্যাজেডি অপেক্ষা বড় সৃষ্টি। বর্ণনাত্মক তিন প্রকার কাব্যের মধ্যে— মহাকাব্যই শ্রেষ্ঠ [শ্রব্য কাহিনী-কাব্যের কবিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) বুকোলিকি (bucolici) (২) এপিকি (epici) (৩) হিরোয়িকি (heroici = life of a single hero in noble verse) মহাকাব্যে বিষয়-ঐক্য (unity of action) অবশ্যই থাকা চাই। কারণ বিষয়-ঐক্যই মহাকাব্যের প্রধান কৌলিন্য]

বিষয়-ঐক্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি তুলেছেন রেনাসাঁ যুগের অন্যতম বিখ্যাত সমালোচক—কস্টেলভেত্রো (১৫৭০)। কস্টেলভেত্রোর বক্তব্য এই—কাব্য আসলে কল্পনা-ক্রিয়া-রচিত ইতিহাস (imaginative history) সুতরাং ইতিহাসের মতোই কাব্যের স্বাধীনতা আছে। ইতিহাস যেমন ঐক্যের খাতির না করে একজন বীরের সমগ্র জীবনের ঘটনা বর্ণনা করে, কাব্যও তেমন করতে পারে। বস্তুতঃ মহাকাব্য—"many actions of one person, one action of a whole race or many actions of many people"—রূপ দিতে পারে।

এই ঐক্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ইতালীয় সমালোচকদের মধ্যে রীতিমত একটি খণ্ড মসীযুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধটি শুধু যুদ্ধটির জন্যই উল্লেখযোগ্য তা' নয়। এই যুদ্ধের মধ্যেই—মহাকাব্য ও রোমান্স জাতীয় রচনার স্বরূপ বিচার পাওয়া যায়। এরিয়োস্টো-রচিত 'ওরল্যাণ্ডো ফুরিয়োসো' এবং বৈয়ার্দো-রচিত (Boiardo)—"ওরল্যাণ্ডো ইন্নামেরাতো'—কাব্য দু'খানি এরিস্টটলের প্রভাব-প্রাধান্যের আগেই রচিত। ফলে এরিস্টটলের সূত্র মিলিয়ে এদের বিচার করতে গিয়ে অনেক দোষ বেরিয়ে পড়ে। ত্রিস্সিনো (১৫৪৮) এরিস্টটল-অনুসারে "ইতালিয়া লিবারেটা" লিখে দেখান মহাকাব্য কাকে বলে এবং রোমাঞ্জি (Romanzi) জাতীয় রচনাগুলিতে বিষয়-ঐক্য-না থাকায়—'বেজম্মা' (bastard) বলে তাদের নিন্দা করেন। ত্রিস্সিনোর প্রতিবাদ করেন—

গিরালিডি সিন্থিয়ো। তিনি বলেন—(ক) রোমান্স-কাব্যের সঙ্গে এরিস্টটলের পরিচয় ছিল না, সুতরাং তাঁর বিধি-নিষেধ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (খ) টাস্‌কান-সাহিত্য ভাষায় এবং ভাবে স্বতন্ত্র; সুতরাং গ্রীক সাহিত্যের নিয়ম মেনে চলার কোন হেতু নেই। (গ) 'রোমাঞ্জি'—একটি প্রজাতি।—The Romanzi aim at imitating illustrious act ions in verse with the purpose of teaching good morals and honest living··· সমস্ত হিরোয়িক কাব্যই বিখ্যাত ঘটনার উপস্থাপনা বটে কিন্তু উপস্থাপ্য ঘটনার প্রকৃতি-ভেদে হিরোয়িক কাব্য তিন প্রকার। একে—উপস্থাপ্য 'One action of one man' এবং এই জাতির নাম—মহাকাব্য (এপিক), দ্বিতীয়ে উপস্থাপ্য—'many actions of many men'—এই জাতির নাম—রোমান্টিক কাব্য এবং তৃতীয়ে উপস্থাপ্য—'many actions of one man'—এই জাতির নাম—চরিত-কাব্য (বাওগ্রাফিকাল পোয়েম)। শেষোক্ত দুই শ্রেণী 'রোমাঞ্জি'-র অন্তর্ভুক্ত।

রোমাঞ্জি-সাহিত্যের সমর্থকদের (গিরাল্‌ডি, পিগ্‌না) যুক্তি খণ্ডন করতে স্পেরোনি, মিণ্টুর্নো প্রমুখ পণ্ডিতগণ চেষ্টা করেন। স্পেরোনি বলেন —সত্য বটে, রোমান্টিক কবিদের প্রাচীন নিয়ম মেনে লিখতেই হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু কাব্যের মৌলিক নিয়ম সব যুগেই মানতে হবে। রোমাঞ্জি-সাহিত্য হয় মহাকাব্য, না হয় তারা কাব্যই নয়—পদ্যে-লেখা ইতিহাস। মিণ্টুর্নোও বলেন—ইতিহাস ও কাব্যের মূল পার্থক্য এখানেই—কাব্যে থাকে 'organic unity'; ইতিহাসে তা' থাকে না। প্রত্যেক কাব্যের পক্ষে 'ঐক্য' অপরিহার্য—'first essential of every of form poetry'. বিখ্যাত মহাকবি টোরকোয়াটো ট্যাসো—মহাকাব্য এবং রোমাঞ্চ-সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয় করতে চেষ্টা করেন। ট্যাসো এ কথা কিছুতেই মানতে রাজি নন যে মহাকাব্য ও রোমান্টিক কাব্য, কাব্যধর্মে এক নয়। রোমান্টিকের আদর বেশী তার আনন্দজনক বিষয়বস্তুর এবং রস-বৈচিত্র্যের খাতিরে। কিন্তু রোমাঞ্জি-সুলভ বিষয়বস্তুকেও ঐক্য-সমন্বিত রূপ দেয়া যায়। মহাকবি ট্যাসো সমন্বয় করতে গিয়ে, "ঐক্য" কাকে বলে

এই মূল প্রশ্ন তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন—প্রকৃতিতে এবং শিল্পে, দুই প্রকার 'ঐক্য' বর্তমান।—এক রাসায়নিক উপাদানের সরল ঐক্য, দুই উদ্ভিদ-দেহ বা জীবদেহের জটিল ঐক্য। হিরোয়িক কাব্যে দ্বিতীয় প্রকার ঐক্যই অপেক্ষিত। সুতরাং বিরোধের কারণ নেই।

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ট্যাসোর বক্তব্য বেশ একটু উল্লেখযোগ্য।

(ক) মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হবে ঐতিহাসিক বৃত্ত।

*(খ) ধর্মের ইতিহাস নিয়ে লিখতে হবে এবং 'খ্রীস্টধর্ম' নিয়েই লিখতে হবে। পেগান ধর্ম বিষয়বস্তু হওয়ার অনুপযুক্ত।

(গ) বিষয়বস্তু অতি প্রাচীন বা অতি-অর্বাচীন হবে না। অতি প্রাচীন সম্পর্কে কৌতূহল কম থাকে এবং অতি প্রাচীন বিষয়বস্তু রূপ দিতে গেলে অপ্রচলিত রীতি-নীতি প্রয়োগ করতে হয় আর অতি-অর্বাচীনে কল্পনার কাজ দেখানোর অবকাশ থাকে না।

(ঘ) ঘটনাগুলির স্বকীয় মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য থাকা আবশ্যক।

বিষয়বস্তু-সম্পর্কে ট্যাসো যা বলেছেন তা' খুব উঁচুদরের কথা নয়। এবং দুই একটি বিষয়ে ট্যাসো খুবই সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক ও রস সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে বেশ মৌলিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন—মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির ঘটনা (actions) বিখ্যাত বটে, কিন্তু ঘটনার প্রকৃতি সর্বাংশে এক নয়। ট্র্যাজেডির ঘটনা—ভয় ও শোচনা জাগায় মহাকাব্যের ঘটনা ভয় ও শোচনা জাগাতে বাধ্য নয়। ট্র্যাজেডিতে ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী রূপ দেওয়া হয়, মহাকাব্যে রূপ দেওয়া হয়—'undertaking of lofty martial virtue……deeds of courtesy, piety, generosity, none of which is proper to tragedy' অতএব ট্র্যাজেডির এবং মহাকাব্যের নায়ক বাহ্য পরিচয়ে রাজ-রাজাধিরাজ প্রভৃতি হলেও ভিতরে পৃথক। ট্র্যাজেডির নায়ক না-অতি ভাল না অতি মন্দ, আর মহাকাব্যের নায়ক—'must have the very height of virtue'—সম্পূর্ণ দোষ লেশহীন অতি-ভালোর চূড়ান্ত। (এত তত্ত্ব-বিচার শেষ করার পরে, মহাকবি ট্যাসো বিখ্যাত মহাকাব্য 'জেরুজালেম্ লিবারেটা' রচনা করেন।)

ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে

রেনাসাঁ যুগে, ফ্রান্সে বা ইংলণ্ডে মহাকাব্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা হয়নি। মহাকাব্য কাব্যের রাজা, মহাকাব্য না লিখলে কবি হওয়া না হওয়া সমান কথা, মহাকাব্য মহাসাগর আর অন্যান্য কাব্য নদী—এইজাতীয় অনেক মন্তব্য অনেকে করেছেন, কিন্তু মহাকাব্য-লক্ষণ নির্ধারণের পক্ষে নতুন কোন কথা কেউ বলেননি। ফ্রান্সে, Pleïade, Ronsard প্রমুখ কবিরা মহাকাব্য লিখে অমর হতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু 'সাধ যত ছিল সাধ্য ছিল না'। রোনসার্ড বিশ বছর চেষ্টা করেও "Franciade" শেষ করতে পারেন না। অবশ্য বই শেষ না করতে পারলেও ভূমিকা লেখেন দুই-দুটো। তাতে কোন নতুন কথা পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডেও মামুলি কথা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। Webbe—বলেছেন—মহাকাব্য—'that princely part of poetry, wherein are displayed the noble acts and valiant exploits of puissant captains, expert soldiers, wise men, with famous report of ancient times." Puttenham—বলেছেন মহাকাব্য—রাজা-অমাত্য প্রভৃতির দীর্ঘ ইতিহাস—সঙ্গে দেবতা-উপদেবতা—বীর যোদ্ধা প্রভৃতির কাহিনী এবং শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন গুরুতর গুরুতর ঘটনা তার মধ্যে মিশ্রিত। বলা বাহুল্য—খুবই মামুলি কথা।

পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশ করার আগে, প্রাচীন মত হিসাবে, ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের সূত্র উপস্থাপিত করা আবশ্যক। ভামহ-দণ্ডী প্রমুখ আলঙ্কারিকদের উপর ভিত্তি করে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্য-লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইরূপ :—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ
সদ্বংশঃক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা
শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে ॥

অঙ্গানি সর্বেঽপি রসা সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং লভেৎ
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দেশ এব বা
কচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্তনম্
একবৃত্তময়ৈ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘা সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গকশ্চন দৃশ্যতে
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ
সন্ধ্যা-সূর্যেন্দু-রজনী প্রদোষ-ধ্বান্তবাসরাঃ
সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনি-স্বর্গ-পুরাধ্বরাঃ
রণপ্রয়াণোপযম-মন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ
বর্ণনীয়া যথাযোগ্যং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ॥
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা
নামাস্য সর্গোপাদেয়-কথয়া স্বর্গনামতু॥

বলা বাহুল্য এই লক্ষণ-নিরূপণ প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক (Descriptive) Prescriptive বলাই ভাল। তবে মহাকাব্যের দেহ ও আত্মার পরিচয় যে যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবেই এখানে দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(১) প্রথম সূত্র—মহাকাব্য সর্গবন্ধ হবে। অর্থাৎ বিভাগগুলির নাম 'অধ্যায়' 'পরিচ্ছেদ' 'উচ্ছ্বাস' প্রভৃতির পরিবর্তে—"সর্গ" রাখতে হবে। এ লক্ষণ প্রথামাত্র হলেও উল্লেখযোগ্য। কারণ অধিকাংশ মহাকাব্যই এই সূত্র মেনে চলেছে। প্রতীচ্য "এপিক" ও "Book"—শব্দটি প্রথার মতোই মেনে নিয়েছে। তবে ভারতের—পৃথিবীরও বলা যেতো—প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, "সর্গ" ব্যবহার করার প্রথার ব্যতিক্রম হয়ে আছে। রামায়ণের প্রধান বিভাগ চিহ্নিত হয়েছে—"কাণ্ড" শব্দ দ্বারা (অবান্তর বিভাগ 'সর্গ' দ্বারা চিহ্নিত বটে) এবং মহাভারতের প্রধান বিভাগ হয়েছে—'অধ্যায়'

দ্বারা। যা' হো'ক কি শব্দ দ্বারা বিভাগ চিহ্নিত করতে হবে—এ অতিবাহ্য লক্ষণের নির্দেশ।

(২) দ্বিতীয় সূত্র—"নায়ক" সম্পর্কে। নায়ক, বৃত্ত ও রসের আলোচনা অনেকটা পরস্পর-সম্পৃক্ত। তবু নায়ককে পৃথক করে বিচার করা হয়েছে। এখনও হয়ে থাকে। নায়ক সম্পর্কে সূত্র এই যে নায়ক হবেন—(ক) ধীরোদাত্ত-গুণান্বিত সুর অর্থাৎ দেবতা বা দেবস্বভাব কোন ব্যক্তি, বা—ধীরোদাত্ত-গুণান্বিত সদ্বংশ ক্ষত্রিয় অথবা ক্ষত্রিয়েতর কোন ব্যক্তি,—বা কুলশীলসম্পন্ন এক বা বহু রাজা। *ধীরোদাত্ত কথাটির মধ্যে নায়কের আন্তর লক্ষণ নিহিত বলে কথাটির ব্যাখ্যা আবশ্যক। ধীরোদাত্তের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে :—

"অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ"।

১। 'অবিকত্থন'—অর্থ=যিনি নিজের প্রশংসা নিজে করেন না
২। "মহাসত্ত্ব"— „ =হর্ষ বা শোকতাপ যাকে অভিভূত করতে পারে না
৩। নিগূঢ়মানঃ— „ =বিনয়ী কিন্তু হীন বিনয়সম্পন্ন নয়
৪। দৃঢ়ব্রত — „ =যে সঙ্কল্প করেন, তাহা সিদ্ধ করেন।]

নায়কের যে গুণরাজি নির্দেশিত হয়েছে, তাতে এরিস্টটলের "of a higher type" এবং ট্যাসোর "must have the very height of virtue" সামান্য বচন বলেই মনে হয়। 'ধীরোদাত্ত নায়ক' এই একটি কথাতেই যেন মহাকাব্যের নায়কের সমস্ত ধর্মকে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ দৃঢ়ব্রত-মহাসত্ত্ব-অতিগম্ভীর নায়কের ক্রিয়াকলাপ মহত্ত্বপূর্ণ হবে—একথা বলাই বাহুল্য। নায়ক সম্বন্ধে অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, নায়ক একজনও হতে পারে, আবার বহুজনও হতে পারে। আর সুর বা ক্ষত্রিয় যেমন নায়ক হতে পারেন, তেমনি ক্ষত্রিয়েতর ধীরোদাত্তগুণান্বিত ব্যক্তিও নায়ক হতে পারেন। শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তিরাই যে নায়ক হতে পারেন তা' নয়—অনৈতিহাসিক সজ্জনও নায়ক হতে পারেন। নায়কের গণ্ডী এখানে ব্যাপকতর।

(৩) তৃতীয় সূত্র—রস সম্পর্কে। রস সম্পর্কে এরিস্টটলের সাধারণ

বক্তব্য এই যে ট্র্যাজেডির যে কয় প্রকার—মহাকাব্যেরও তত প্রকার। ট্র্যাজেডির চার প্রকার, মহাকাব্যেরও চার প্রকার। ট্যাসো এরিস্টটলের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেননি। ভয় ও শোচনা উদ্রেক করাই যে মহাকাব্যের উদ্দেশ্য এ কথা তিনি মানেননি। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে—"শৃঙ্গার-বীরশান্তানামেকোঽঙ্গী ইষ্যতে" অর্থাৎ মহাকাব্যে অঙ্গী বা প্রধান রস হতে পারে—শৃঙ্গার, বীর, শান্ত ও করুণের (করুণোঽপি, টীকায় বলা আছে) যে-কোন একটি। তা'হলে দেখা যাচ্ছে মহাকাব্য হতে পারে—(১) শৃঙ্গার রসাত্মক (২) বীররসাত্মক (৩) শান্তরসাত্মক (৪) করুণরসাত্মক। 'Pathetic' এবং Ethical ছাড়াও অন্য রসের মহাকাব্য সম্ভব। তারপর অঙ্গী রস ছাড়াও, অঙ্গ-রস হিসাবে, যেহেতু অন্যান্য রস থাকা চাই সেই হেতু রস-বৈচিত্র্যও অবশ্যম্ভাবী।

(৪) চতুর্থ সূত্র—"সন্ধি" সম্পর্কে। নাটকের মতো মহাকাব্যেও পঞ্চসন্ধি থাকবে, অর্থাৎ নাটকের বৃত্ত যেমন পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত—এরিস্টটলের ভাষায় বল্‌লে—"ঐক্য-যুক্ত" মহাকাব্যের বৃত্তকেও পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত—(মুখ+প্রতিমুখ +গর্ভ+বিমর্ষ+উপসংহৃতি) হতে হবে। এরিস্টটলও বলছেন—"The plot manifestly ought as in Tragedy, to be constructed on dramatic principles. It should have for its subjects single action with a beginning, middle and end. মোট কথা, বিষয়-ঐক্যের ওপর সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রকারগণও জোর দিয়েছেন। তবে, নাটক-সন্ধি বললে—নাটকীয় উপস্থাপনার কথাও পরোক্ষভাবে বলা হয় কিনা, বিচার্য বিষয়। এই বিষয়টির প্রতি এরিস্টটল জোর দিয়েছেন—বলেছেন—"The poet should speak as little as possible in his own person…পরবর্তীকালে W. P. Ker মহাশয়, তাঁর Epic and Romance গ্রন্থেও, এই বিষয়টির প্রতি আরো গুরুত্ব দিয়েছেন—লিখেছেন—"without dramatic representation of the characters Epic is history or romance, the variety and life of epic are to be found in the drama that springs up at every encounter of the personages" লক্ষ্য করবার বিষয়—

"কের" মহাশয় বলছেন—ঘটনার নাটকীয়তার মধ্যেই মহাকাব্যের প্রাণশক্তি নিহিত।

(৫) পঞ্চম সূত্র বৃত্ত সম্পর্কে। বৃত্ত দুই প্রকার হতে পারে:—এক ইতিহাস থেকে গৃহীত; দুই—সজ্জনচরিত্র-অবলম্বনে রচিত। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করতে হবে—এই মতই প্রাচীন এবং প্রচলিত। সজ্জনাশ্রয়বৃত্তের কথা নতুন কথা এবং আমাদের সাহিত্য শাস্ত্রেরই কথা।

(৬) ষষ্ঠ সূত্র—বর্গ (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ)—চতুর্বর্গ সম্পর্কে। জীবের বাসনা বহুমুখী। জীবের সাধনা সার্থক হয় বাসনাসমূহের পরিপূরণেই। এই বাসনাকে আমরা চারভাগে ভাগ করে নিয়েছি এবং নাম দিয়েছি—পুরুষার্থ। তাই পুরুষার্থ সিদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। এই সিদ্ধি কারো জীবনে ঘটে ধর্মলাভে, কারো অর্থলাভে, কারো কামে, কারো বা মোক্ষলাভে। বৃত্তে এই চার বর্গকে স্থান দিতে হবে এবং একটিকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দিতে হবে—এ কথার তাৎপর্য এই যে বৃত্তে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীকে বিভিন্ন প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রধান পাত্রের বা নায়কের জীবনের মাধ্যমে কোন একটি পুরুষার্থের ঐকান্তিক সাধনার রূপ দেখাতে হবে। এই বর্গ-উপস্থাপনা মহাকাব্যের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সাহায্য করে—এরিস্টটলের ভাষায় বলা যাক—"It adds mass and dignity to the poem"।

(৭) সপ্তম সূত্র—মহাকাব্য কিভাবে আরম্ভ করতে হবে—তারই সম্পর্কে। নির্দেশ এই—আরম্ভে (ক) নমস্কার (খ) আশীর্বাদ প্রার্থনা (গ) বস্তু নির্দেশ (ঘ) খলের নিন্দা, সৎলোকের গুণকীর্তন, এদের যে কোন একটি রাখতে হবে। (একের অধিকও থাকতে পারে)। বলা বাহুল্য—এটা বাহ্য লক্ষণ। তবে প্রত্যেক মহাকবিই এই নির্দেশ মেনেছেন। বাগ্‌দেবীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা, বাগ্‌দেবীকে নমস্কার এবং বস্তুনির্দেশ—এই কয়টি প্রায় প্রত্যেক বড় বড় মহাকাব্যেই আছে। হোমার থেকে মধুসূদন পর্যন্ত—তারপরেও অনেকে—প্রায় একইভাবে গ্রন্থারম্ভ করেছেন॥ A. W. Verity 'Paradise

Lost'-এর টীকা প্রারম্ভে লিখেছেন—The invocation of the Muse is an epic Convention। প্রথা সর্ববাদিসম্মত হলে লক্ষণের মর্যাদাই লাভ করে।

(৮) অষ্টম সূত্র—ছন্দ (বৃত্ত) সম্পর্কে। সমগ্র সর্গে একরূপ বৃত্ত ব্যবহার করতে হবে; শুধু সর্গের অবসানে অন্য ছন্দ ব্যবহার করতে হবে এবং ভাবিসর্গের বর্ণনীয় বিষয়ের সূচনা দিয়ে দিতে হবে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রমও যে না দেখা যায় এমন নয়; কখনো কখনো নানাবৃত্তময় সর্গও সম্ভব। (এরিস্টটলও এক-বৃত্তের কথা বলেছেন—তবে সে কথা সমগ্র কাব্য সম্পর্কে প্রযোজ্য, আর এখানে সর্গ সম্পর্কে প্রযোজ্য।

(৯) নবম সূত্র—সর্গের সংখ্যা সম্পর্কে। নাতি স্বল্প আট বা ততোধিক সর্গ থাকা চাই। বলা বাহুল্য, এই নির্দেশটি মহাকাব্যের আয়তন বা দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত (scale or length)। ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে এরিস্টটল লিখেছেন—মহাকাব্যের আয়তন বা দৈর্ঘ্য অনেক বড়ো হওয়া চাই—মূল বিষয়ের সঙ্গে উপকাহিনীর ধারা যোগ করে—"multiplicity of plots"—সৃষ্টি করে আয়তন বৃদ্ধি করা দরকার। সকলেই মহাকাব্যের আয়তন-গত মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন। মহাকাব্যকে যে "mass" ও "dignity" উভয়তঃ মহৎ হতে হবে—এই সংস্কারই প্রাচীন এবং প্রচলিত। W. P. Ker মহাশয়ও লিখেছেন—"The action of an heroic poem must be of a Certain magnitude".

(১০) দশম সূত্র—বর্ণনা-বৈচিত্র্য সম্পর্কে। এ সূত্রটিও আয়তনবৃদ্ধির উপায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আছে। প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করতে গেলে কলেবর অশ্যই বড় হবে আর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হবে—বৈচিত্র্য (variety) এবং 'ব্যাপকতা'। যে যে উপায়ে—"রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে"—(রবীন্দ্রনাথ), প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা তাদের অন্যতম। এই কারণেই মহাভারত সম্বন্ধে—"যা' নেই ভারতে তা' নেই ভারতে" প্রবাদটি

প্রচলিত হতে পেরেছে এবং ইলিয়াড ও অডিসি প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসের ইতিহাসের উৎস হয়ে আছে।

(১১) একাদশ সূত্র—'নামকরণ'—সম্পর্কে। মহাকাব্যের নাম হবে—(ক) কবি (খ) বৃত্ত (গ) নায়ক (ঘ) অন্য কোন চরিত্র—এদের যে-কোন একটির অনুসারে। আর সর্গের নামকরণ করতে হবে—যে বিষয়টি সর্গে উপাদেয়ভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে, তদনুসারে। এ সূত্রও সংজ্ঞা নির্দেশক নয়।

উল্লিখিত মহাকাব্য-লক্ষণে, মহাকাব্যের বহিরুপাধি এবং অন্তরুপাধি দুটোই নির্ধারণ করা হয়েছে তথা মহাকাব্যের আয়তন-গত এবং রস-গত উভয় মহত্ত্বকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তবিক, মহাকাব্য শ্রব্যকাব্য এবং বিশেষ কয়েকটি রসের কাব্য—এ কথা বললে মহাকাব্যের স্বরূপ ব্যক্ত হয় না—স্বরূপ ব্যক্ত হয় তখনই যখন বলা হয়—মহাকাব্য অষ্টাধিক সর্গের বিরাট কাব্য—অন্তরে-বাহিরে বিরাট—মহাসমুদ্রের মতো—যেমন গভীর তেমন অপার। যে কাব্যে, নায়ক = ধীরোদাত্ত, উপস্থাপ্য বিষয় = ইতিহাস-বিখ্যাত বা সর্বজনশ্রুত ঘটনা বা ব্যক্তি-জীবন, অঙ্গীরস = শৃঙ্গার বীর শান্ত ও করুণের একটি, অঙ্গরস = সব কয়টি রস, বৃত্তে—সমস্ত পুরুষার্থ-সাধনের সমারোহ—অষ্টাধিক সর্গের ব্যাপ্তি এবং প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা, সে কাব্যের মহত্ত্ব অস্বীকার করবে কে?

বাস্তবিক মহাকাব্যের লক্ষণ-নিরূপণে যদি কোন সমস্যা থেকে থাকে সে সমস্যা—আন্তর ধর্ম—মহাপ্রাণতার মহিমাকে এবং বাহ্যধর্ম—মহাকায়তার বিরাটতাকে এক সূত্রের আধারে প্রকাশ করার সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতে এরিস্টটল যা' করেছেন তা' প্রশংসনীয়। তিনি সিরিয়াস ইমিটেশন'কে সামান্য ধর্ম করে—শ্রব্যত্ব এবং বিরাটত্বকে বৈশেষিক লক্ষণ করেছেন। তাঁর প্রয়াসকে আমরা এই ভাবে গুছিয়ে নিতে পারি :—

(মহাসামান্য)—কাব্য (ইমিটেশন)

[বিশেষ লক্ষণ]

(সিরিয়াসনেস্)—(১) *সিরিয়াস ইমিটেশন *(মহাপ্রাণত্ব)

(ভ্যারেটিভিটি)—(২) *ন্যারেটিভ্ সিরিয়াস ইমিটেশন * (শ্রব্যত্ব)

(স্কেল্)—(৩) *বিগ্ স্কেল ন্যারেটিভ সিরিয়াস ইমিটেশন * (আয়তন বৃহত্ব)

রেনেসাঁর পরে, ফ্রান্স ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ক্লাসিকাল আদর্শে মহাকাব্য-সৃষ্টির এবং মহাকাব্যের স্বরূপনিরূপণের আবেগ কম দেখা যায় না; মহাকাব্যকে খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখা হয়েছে। কিন্তু মহাকাব্যের স্বরূপনির্ধারণের চেষ্টায়—এ কথা বলতেই হবে—খুব মৌলিক চিন্তা দেখা যায় না। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ড্রাইডেন (The author's Apology for Heroic poetry and poetic Licence—1677+An essay of Heroic plays—1672+preface to Annus Mirabilis—1666) এবং Hobbes (ইলিয়াড অডিসির অনুবাদের ভূমিকায়—১৬৭৬) Davenant, হিউম (উইল্‌কির এপিগোনিয়াডের আলোচনা প্রসঙ্গে (১৭৫৯), গিবন ও এডিসন (প্যারাডাইস লস্টের সমালোচনা) প্রমুখ অনেকেই মহাকাব্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু স্বরূপ নির্ণয়ে নতুন কোন কথা যোগ করতে পারেননি। মহাকবি গেটে—'মহাকাব্য ও নাটক'—নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাতে মহাকাব্যের মহাপ্রাণতার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোমান্টিক কবি সমালোচকদের কেউ কেউ মহাকাব্যের স্বরূপ বিচারের খণ্ড চেষ্টা করেছেন। যেমন কবি শেলী তাঁর—'ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি'-প্রবন্ধে মহাকাব্যের মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে—মহাকাব্যগুলির মধ্যে বর্ণভেদ সৃষ্টি করার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রথম মহাকাব্য হোমারের 'ইলিয়াড', দ্বিতীয় মহাকাব্য—দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' এবং তৃতীয় মহাকাব্য—মিলটনের "প্যারাডাইস লস্ট"। তিনি লিখেছেন—ভার্জিলের "এনিড"কেই যদি খাঁটি মহাকাব্য বলা না যায় তা'হলে 'ওরল্যাণ্ডো ফুরিওসো' 'জেরুজালেমে লিবারেটা' 'লুসিয়াড' বা 'ফেইরি কুইন' প্রভৃতির কথাই উঠে না। মহাকাব্যকে—"অথেন্টিক" এবং "লিটারারি'' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করার সূচনা এই সময়েই দেখা দেয় এবং পরে শতাব্দীর শেষপাদে নিও-রোমান্টিক সমালোচকদের হাতে শ্রেণী বিভাগটি স্পষ্ট আকার লাভ করে।

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে—মহাকাব্য সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

Hegel—The Philosophy of fine Art.

W. P. Ker—The Epic and Romance (1897)

W. M. Dixon—English Epic and Heroic poetry (1912)

L. Abercombie—The Epic (1914)

G. Murray—The Rise of Greek Epic (1924)

R. S. Conway—রচিত "The Architecture of the Epic"—প্রবন্ধ (1928)

H. M. & N. K. Chadwick—The growth of literrture (3 Vol. 1932. 36. 40)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল—'এস্থেটিক' বা 'ফিলজফি অফ্ ফাইন আর্ট' গ্রন্থের শেষ ভাগে 'মহাকাব্য' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সমাজের কোন্ অবস্থায় মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়, মহাকবির ধর্ম কি, মহাকাব্য সমষ্টির রচনা, না ব্যক্তির রচনা, খাঁটি মহাকাব্যের স্বরূপ কি—এই রকম নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনা করেছেন। খাঁটি মহাকাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন—"the epos, in as much as it makes what actually exists its object, accepts as such the happening of a definite action, which in the full compass of its circumstances and relations must be brought with clarity to our vision as an event enriched by its further association with the organically complete world of a nation and an age. It follows from this that collective world-outlook and objective presence of a national spirit, displayed as an actual event in the form of its self-manifestation, constitutes and nothing short of this does so, the content and form of the true epic poem."—(III Pages Vol. IV)। পরবর্তী

সমালোচকরা হেগেলের আলোচনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন—তবে, হেগেলের কাছে যতখানি কৃতজ্ঞতা দেখানো উচিত ছিল, তা' দেখান নি।

হেগেলের পরে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের কারো কারো আলোচনায়, মহাকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ সমাজের কোন্ অবস্থায় এবং কী কারণে মহাকাব্যের জন্ম সম্ভব হয়েছে—এই প্রশ্নটিই সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। ল্যাস্‌লি এবারকোম্বি মহাশয় 'দি এপিক' গ্রন্থের ভূমিকায়—মহাকাব্যকে যারা—sociology or archaeology or ethunology—বিভাগের বিষয় করে তুলেছেন, তাঁদের একটু কটাক্ষ করেছেন—বিশেষতঃ গিলবার্ট মারে মহাশয়ের—"দি রাইজ অফ্ গ্রীক এপিক" এবং এনড্রু ল্যাঙ্ মহাশয়ের "দি ওয়ার্ল্ড অফ্ হোমার" গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তিনি চ্যাড্‌উইক মহাশয়ের "দি হিরোয়িক এজ", ম্যাকনিল ডিকসন মহাশয়ের—"ইংলিশ এপিক এ্যাণ্ড হিরোয়িক পোয়েট্রি" এবং বিশেষতঃ জন ক্লার্ক মহাশয়ের—"হিস্ট্রি অফ্ এপিক পোয়েট্রি" গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হেগেলের আলোচনার কোন উল্লেখ করেন নি। হেগেল তিনি পড়েন নি—একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

যা'হোক মহাকাব্য কবে এবং কিভাবে উদ্‌ভূত হয়েছে—এ জিজ্ঞাসা পূরণ করবার প্রয়োজন আমাদের নেই ; আমরা জানতে চাই—মহাকাব্যের স্বরূপ। দেখা যাক এ বিষয়ে এবারকোম্বি মহাশয় কোন নতুন আলোকপাত করতে পেরেছেন কি না।

"দি এপিক" গ্রন্থের—প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার—মোটামুটি দুটি কথা বলেছেন :—একটি কথা এই যে "হিরোয়িক এজ"-এ, মহাকাব্য জন্মে এবং সমাজের নানা পর্যায়ে এই 'যুগ' দেখা দিতে পারে। এই যুগের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য "vehement private individuality freely and greatly asserting itself"। অন্যটি এই যে মহাকাব্যকে—"অথেন্টিক" এবং "লিটারারি" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যুক্তিযুক্ত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ

আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—তিনি 'লিটারারি এপিক' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রচলিত বিভাগ মেনে নিয়েই "অথেন্টিক" এবং "লিটারারি" এপিকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য মোটামুটি এই :—

(ক) অথেন্টিক মহাকাব্য স্বতঃস্ফূর্ত—অনেকটা পরিবেশ-জনিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি—"poetry which seems an immediate response to some general and instant need in its surrounding community —such poetry is "authentic epic." (২৫ পৃঃ), আর লিটারারি এপিকের—জন্ম হয়েছে কবির সচেতন প্রচেষ্টা থেকে—মহাকাব্য লেখার সংজ্ঞান সংকল্প থেকে। এই সৃষ্টি—"an act of conscious aesthetic admiration rather than of unconscious necessity."

দ্বিতীয় বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—'অথেন্টিক এপিক' সমগ্র সমাজের সৃষ্টি—বহুকবির সামষ্টিক প্রযত্নের ফল আর 'লিটারারি এপিক' একজন কবির সৃষ্টি—এ ধারণা ভুল। কারণ—"artistic creation can never be anything but the production of an individual mind"। সুতরাং রচয়িতা বহু এবং রচয়িতা এক—এ ভাবে 'অথেন্টিক' ও 'লিটারারি' এপিকের মধ্যে কোন পার্থক্য-রেখা টানা যায় না। (The folk origin of ballads and the multiple authorship of epics are heresies)। বলা বাহুল্য, বহু আগেই হেগেল এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এরূপ সিদ্ধান্তই করেছেন। উল্লিখিত ধারণা থেকেই—আর একটা ধারণা বেরিয়েছে—আদি মহাকাব্য সমগ্র সমাজের রচনা বলে—জনহৃদয়ের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। অতএব—জনসাধারণের মতোই তা' অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক। এরই অনুসিদ্ধান্ত —কৃত্রিম অংশ মাত্রই প্রক্ষিপ্ত। (তা'তেই আবার কিন্তু প্রমাণ হয় রচয়িতা একজন নয়)। যা'হোক, এবারকোম্বি স্বীকার করেন না—অথেন্টিক এপিক সমগ্র জন-সমষ্টির সৃষ্টি বা একাধিক কবির দ্বারা ধীরে ধীরে রচিত। (এই কারণে অথেন্টিক এপিককে বলা হয়েছে—"এপিক অফ গ্রোথ্")। অথেন্টিক ও লিটারারি এপিকের মধ্যে যে মূল পার্থক্য তা আগেই বলা হয়েছে।

এবার আমাদের মূল প্রশ্নের আলোচনা—"The nature of epic"। প্রথমেই তিনি—'Rigid definitions in literature are, however, dangerous" বলে মুখবন্ধ করে নিয়েছেন এবং মহাকাব্যের একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন—'an epic is a poem which produces feeling similar to those produced by Paradise lost or Iliad, Beowulf or the song of Roland''—অর্থাৎ প্যারাডাইজ লস্ট, ইলিয়াড বিউল্ফ বা সঙ অফ রোলাণ্ড' প্রভৃতি মহাকাব্য যে ভাব বা রস-সৃষ্টি করে, সদৃশ ভাব বা রস কাব্যে পাওয়া যায়, তাকেই মহাকাব্য বলা যায়। (আরো সহজে বোধহয় বলা যায়—মহাকাব্য হচ্ছে সেই কাব্য যাকে বলা যায় মহাকাব্য)। দ্বিতীয় বক্তব্য—মহাকাব্যসদৃশ কাব্যমাত্রই মহাকাব্য নয়। মহাকাব্যের একাধিক লক্ষণ থাকলেও, কাব্য মহাকাব্য নাও হতে পারে। তৃতীয় বক্তব্য—প্রত্যেক মহাকাব্যেই গল্প বলা হয় এবং পরিপাটি করে বলা হয়। চতুর্থ বক্তব্য—এপিকের সামান্য ধর্ম—"স্টাইল"—"the style of their conception and style of their imagination......" মহাকাব্য এমন একটি রাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে গুরুগম্ভীর ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু ঘটে না। প্রত্যেকটি মহাকাব্যে গভীর উদ্দেশ্য বিরাজ করে। পঞ্চম বক্তব্য—বিষয়বস্তু 'বাস্তব' (real) হওয়া চাই, কল্পিত হলে চলবে না। মনে হতে পারে—ঐতিহাসিক ঘটনাই মহাকবির উপজীব্য। অবশ্য হতে না পারে তা' নয়; কিন্তু যে ঘটনার কাব্যোপযোগিত্ব পৌরাণিক কাহিনী থেকে বেশী নয়, সে ঘটনা অপেক্ষা পৌরাণিক কাহিনী অধিকতর উপযোগী। ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে লেখা অনেক কাব্য—মহাকাব্য না হয়ে 'পদ্যে ইতিহাস' হয়েছে।

ষষ্ঠ বক্তব্য—সূক্ষ্মতর সংজ্ঞা দিতে যাওয়া দুঃসাহসের কাজ। যাঁরাই দিতে গেছেন তাঁরাই এমন ব্যাপক সংজ্ঞা করে বসেছেন, যা'র মধ্যে—যে কোন দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কাহিনীকাব্য-স্থান করে নিয়েছে। যা' হোক—"It will tell its tale both largely and intensely.........epic poetry must be an affair of evident largeness"। সপ্তম বক্তব্য—মহাকাব্যের

গুরুতাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যাঁকে কেন্দ্র করে ঘটবে, তাঁকে অবশ্যই 'big' হতে হবে। আর এ কথাও মনে রাখতে হবে—'It is of man and man's purpose in the world. that the epic poet has to sing ; not of the purpose of gods."

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন কোন নতুন চিন্তা নেই যা' মহাকাব্য-লক্ষণের ধারণাকে স্পষ্টতর করতে পারে। পূর্বে আমরা যে সমস্যার কথা তুলেছি, সে সমস্যার সমাধান এখানে পাওয়া যায় না। 'large এবং intense' কে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা কোথায় ?

বাংলা-সাহিত্যে 'মহাকাব্যের লক্ষণ' সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর নাম অগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ'-প্রবন্ধে মহাকাব্য সম্বন্ধে যা' লিখেছেন তা'তে মহাকাব্যের মহত্ত্ব-লক্ষণ সাধারণ ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতে—মহাকাব্য "বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা" এবং সেই শ্রেণীর কবির রচনা "যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করে তোলে।" মহাকবিরা "দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করেন" এবং "ইহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না।" রবীন্দ্রনাথের মতে—মহাকাব্যের অন্যতম এবং প্রধান লক্ষণ—"ব্যাপকতা।" —"আধুনিক কোন কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না।" "ইহারা প্রাচীন কালের দেব-দৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন। ইহাদের জাতি লুপ্ত হইয়া গেছে।" দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ "অথেন্টিক এপিক"-এর সংস্কার নিয়েই মহাকাব্য লক্ষণ আলোচনা করেছেন।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও—'মহাকাব্যের লক্ষণ'—আলোচনা করতে গিয়ে গোড়াতেই মহাকাব্যকে দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। 'অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য'কে (লিটারারি এপিক) মহাকাব্যের তালিকা থেকে খারিজ করে—রামায়ণ, মহাভারত এবং ইলিয়াড-অডিসি এই চারখানি গ্রন্থকে খাঁটি মহাকাব্য বলে স্বীকার করেছেন এবং তাদের

বিশ্লেষণ করে প্রধান লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন—"অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা" বলা বাহুল্য—ত্রিবেদী মহাশয়ের আলোচনার মূলেও অথেন্টিক-এপিকের সংস্কার রয়েছে এবং তাঁর মতেও—"মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে" অর্থাৎ যে যুগে মানব-সমাজে অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা বিরাজ করত, সে যুগ ফিরে না আসা পর্যন্ত খাঁটি মহাকাব্য আর জন্মাবে না। 'অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা' বা 'ব্যাপকতা'কে আদি মহাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা যায় বটে, কিন্তু শব্দদুটি মহাকাব্যের স্বরূপলক্ষণটি ঠিক ব্যক্ত করে না।

সাম্প্রতিক একটি আলোচনায়, মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণের মূল সমস্যাটি এবং সমাধানের চেষ্টা প্রশংসনীয় মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। ডাঃ শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয়—(মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) মহাকাব্যের আয়তন-গত মহত্ত্বকে এবং আত্মিক মহত্ত্বকে একটি সূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতে চান—মহাকাব্যের অঙ্গী রস শৃঙ্গার-বীর-শান্ত-করুণের যেটিই হোক না কেন, সব রসকেই শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত-রসের সঙ্গমে মিলতে হয়।

এরিস্টটল যেমন বলেছেন—মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডিতে বিস্ময়-জনক ঘটনা অর্থাৎ (বিস্ময় ভাব-মূলক) অদ্ভুত রস থাকা চাই, ডাঃ সেনগুপ্ত বলতে চান—সমস্ত কিছু দ্বারা বিস্ময়-ভাব জাগানোই মহাকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে মহাকাব্য যে বিস্ময় জাগায়, তা'র বৈশিষ্ট্য এই যে তা' বড় কিছুর দ্বারা উদ্বোধিত হয়। এই বড উভয়তঃ বড়—আকারে যেমন বড়, প্রকারেও তেমনি বড়। এই দুই বড়র অর্থ, তিনি মনে করেন—'বিশাল' শব্দটির তাৎপর্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং "বিশাল রস'কে" মহাকাব্যের বিলক্ষণ রস বলে ধরা যেতে পারে। রসের তালিকায় 'বিশাল-রস' নেই—কথাটা নতুন—এ সব আপত্তি যতই উঠুক, একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক—মহাকাব্যের দৈহিক এবং আত্মিক মহত্ত্ব (extensity and intensity) একসঙ্গে বুঝাতে পারে এমন একটা শব্দ আমাদের অবশ্যই চাই—সে শব্দ 'বিশাল'ই হোক আর "বিরাট"ই হোক, কি অন্যকিছু হোক—ভিন্ন কথা'।

ডাঃ সেনগুপ্তের আলোচনা—মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণের নতুন প্রয়াস, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরিস্টটল যেমন দেখিয়েছেন, "এপিক"—"প্যাথেটিক" বা "এথিকাল" যে শ্রেণীরই হোক—'element of the wonderful' থাকা চাইই চাই। ডাঃ সেনগুপ্ত বলতে চান—মহাকাব্যে যে রসই অঙ্গী হোক='বিশাল-রস' মহাকাব্যের বিলক্ষণ রস।

সমালোচনা

[Historically considered, no type of critic has ever established the principles of his school so irrefutably that the values of other types have become negligible—(Dic. of World. Lit)]

এই বিশ্ব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক বিরাট শক্তিক্ষেত্র। অবিরাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বশেই সেথানে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ঘটছে। অজৈব জগতে এর রূপ ব্যক্ত হয়—পাদার্থিক—রাসায়নিক (Physico-Chemical) ক্রিয়ার, আর জৈব-জগতে ব্যক্ত হয় দৈহিক-মানসিক অভিযোজনের রূপে। জীব আত্মরক্ষার অনুকূলকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছে, প্রতিকূলকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে—অনুকূলের দিকে আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রতিকূল থেকে ভয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। অনুকূলের পরে তার অনুরাগ প্রতিকূলের পরে বিরাগ। অভিযোজনের মূল কথাই হলো 'নির্বাচন'—হিতকরকে প্রীতিকর বলে গ্রহণ, অহিতকরকে অপ্রীতিকর বলে বর্জন—আনন্দদায়কের প্রতি প্রবণতা দুঃখদায়কের প্রতি বিমুখতা। এই নির্বাচন-ব্যাপারের মধ্যেই বলা যেতে পারে—মূল্য-বিচারের অবোধপূর্ব প্রচেষ্টা ব্যক্ত হয়েছে।—কথাটা যে কথার কথা নয়—সৌন্দর্য-বোধ-বিকাশে—মৌলিক বাসনার, যৌন-নির্বাচনের (sexual selection) প্রভাবের কথা ভেবে দেখলেই বুঝা যায়। ভাল-মন্দ বোধ, সুন্দর-অসুন্দর বোধ মূলতঃ যে বাসনা সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—একটু তলিয়ে দেখলেই সে সত্য উপলব্ধি করা যায়। অভিযোজনের ব্যাপারে

এই অবোধ-পূর্ব (instinctive) ভাললাগা-মন্দলাগা (সুন্দর বলে কোন কিছু গ্রহণ, অসুন্দর বলে বর্জন) সংজ্ঞান সমালোচনার পূর্ববর্তী অবস্থা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে যে অবোধপূর্ব ভাললাগা-মন্দলাগা—সুন্দর-অসুন্দর বিচার—দেখা যায়, মনুষ্য-প্রজাতির স্তরে—তা' সংজ্ঞান মূল্য-বিচারে বা সমালোচনায় পরিণত হয়েছে। মনুষ্যেতর প্রাণী আবেগে-আচরণে তার ভাললাগা-মন্দলাগা ব্যক্ত করেছে, আর মানুষ প্রকাশ করেছে—ভাষার দ্বারা। 'হাঁ' এবং 'না' বলেই সে মূল্য-বিচার শেষ করেনি ; নৈয়ায়িক বুদ্ধি প্রয়োগ করে—ভাল লাগা মন্দ লাগার হেতু নির্দেশ করেছে সূত্র রচনা করেছে—সবিস্তারে মূল্য-বিচার করেছে। এই সবিস্তার মূল্য-বিচারেরই পারিভাষিক নাম—'সমালোচনা'।

মানুষ দুই জগতের অধিবাসী। এক—প্রাকৃত জগৎ, দুই—শিল্প-জগৎ। প্রথমটি প্রকৃতির সৃষ্টি ; দ্বিতীয়টি মানুষের। এই মানুষের-সৃষ্টি শিল্প চারু-শিল্প এবং চারুশিল্প দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সমালোচনা ব্যাপক অর্থে প্রাকৃত এবং শিল্পিত বস্তু মাত্রেরই মূল্য-বিচার বটে, কিন্তু বিশেষ অর্থে শিল্পিত সামগ্রীরই বিচার—এক কথায় 'শিল্প-মূল্য' বিচার এবং আরো বিশেষ অর্থে —চারুশিল্পের মূল্য-বিচার। বলা বাহুল্য, শিল্পের যত প্রকার সমালোচনাতেও তত বিভাগ। সাহিত্য-সমালোচনা, চারুশিল্প সমালোচনারই অন্যতম বিভাগ ; কারণ সাহিত্য অন্যতম চারুশিল্প। আর যেহেতু সাহিত্য বাঙ্ময় শিল্প, সাহিত্য সমালোচনা বাঙ্ময় শিল্পের রূপ-রসের বিচার-বিশ্লেষণ তথা মূল্য-নিরূপণ। মোট কথা—সমালোচনা—শিল্পের মূল্য-বিচার এবং সমালোচক সেই বিচারক। I. A. Richard মহাশয়ের ভাষায় বলা যেতে পারে—'To set up as a critic is to set up as a judge of values.'

ইউরোপের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন 'ইলিয়াড'—আর প্রাচীনতম সাহিত্য-সমালোচনার—সমালোচনা না বলে খণ্ড সমালোচনা বলা ভাল—নিদর্শন, এরিস্টফেনিস রচিত 'দি ফ্রগ্‌স' নামক প্রাচীন কমেডির একটি বাদ-প্রতিবাদ। কাব্য নিয়ে—কাব্যের দোষগুণ নিয়ে—কবির লড়াই, এর আগে

আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। একপক্ষে বৃদ্ধ নাট্যকার ইস্কিলাস, অন্যদিকে বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু প্রথম—পুরস্কারপ্রাপ্ত ইউরিপিডিস। আরো কৌতূহলোদ্দীপক এই কারণে যে প্রতিযোগিতার স্থান—ইহলোক নয়,—পরলোক—প্লুটোর (যমরাজ) 'রয়াল বোর্ড'। ইহলোকের প্রতিযোগিতাতেই গ্রীকরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি—পরলোকেও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। ধন্য প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি! গ্রীকের দেবতারা গ্রীসবাসীদের চেনেন বলেই বোধ হয়—ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন—স্বীকার করেছেন—'there is a custom we have established in favour of professors of arts'। কাব্য-চর্চা গ্রীকদের শুধু জীবনেরই নয়—মরণেরও সঙ্গী।

প্লুটোর 'রয়ালবোর্ডে' শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আসন অধিকার করে আছেন—ঈস্কিলাস। ইউরিপিডিস গিয়ে সেই আসন দাবী করতেই মহাসমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার সমাধান করতে প্লুটো 'examination and trial in public'-এর ব্যবস্থা করেন। এরূপ বিচার-সভার সভাপতি খুবই দুর্লভ; যেখানে—'poetry weighed out and measured' হবে, কবিরা—'with their rules and compasses they will measure and examine and compare and bring their plummets and their lines and levels to take the bearing'—বিশেষতঃ ইউরিপিডিস যেখানে—'make survey word by word' সেখানে 'true learned judges' না হলে চলব কেন? বেকাস (Bacchus) ছাড়া আর কে বিচারক হতে পারেন?

বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। ইউরিপিডিস ইস্কিলাসের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ উত্থাপন করেন :—

(ক) আড়ম্বরপূর্ণ গঠন

(খ) আড়ম্বরপূর্ণ রচনারীতি

(গ) অবাস্তব ঘটনা-বিন্যাস

এবং নিজের democratic motives—সমূহ নিয়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ

করেন—বলেন :—(ক) তাঁর বিষয়বস্তু 'domestic and familiar' (খ) scenes and sentiments agreed with truth and nature—অর্থাৎ ঘটনা-দৃশ্য এবং ভাবাভিব্যক্তি খুব স্বাভাবিক—বাস্তব (গ) তাঁর রচনায়—"plain household phrase" প্রযুক্ত হয়েছে। অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে ইস্কিলাস প্রশ্ন করেন—কবি-কীর্তির প্রধান কারণ কি? প্রশ্নের উত্তর দেন ইউরিপিডিস—

The improvement of morals, the progress of mind.

When a poet by skill and invention.

'Can render his audience virtuous and wise' অর্থাৎ সৃষ্টির মূল্য একদিকে নির্ভর করে—রচনা-কৌশল বা পরিকল্পনা-শক্তির ওপর, অন্যদিকে নির্ভর করে নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সামর্থ্যের ওপর। ইস্কিলাস নৈতিক উদ্দেশ্যের ওপর খুব জোর দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেন—ইউরিপিডিস্ প্রেমকাহিনী নিয়ে যে সব বীভৎস-রসের নাটক রচনা করেছেন, সমাজের পক্ষে তারা হিতকর নয়।—"horrible facts should be buried in silence not bruited abroad, nor brought forth on the stage, nor emblazoned in poetry·····"। ইউরিপিডিসের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ—ইউরিপিডিস শুধু যে নৈতিক অপকর্ষের জন্যই দায়ী তা নয়; ট্র্যাজেডির উচ্চাদর্শকেও তিনি হীন করে ফেলেছেন। যা'হোক, শেষপর্যন্ত ইস্কিলাসেরই জয় হয়।

দুই নাট্যকারের বাদ-প্রতিবাদ থেকে সমালোচনা রীতির পরিচয় বেশ খানিকটা উদ্ধার করা যায়। সমালোচনা যে কাব্যকে সর্বতোভাবে পরিমাপ করে দেখা—বিচার-সূত্র দিয়ে মেপে মেপে দেখা—কাব্যের রূপ-রসকে পরীক্ষা করে দেখা—একের সঙ্গে অন্যের তুলনা করে উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারণ করা—প্রত্যেকটি অঙ্গ উপাদানের—(ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র-সৃষ্টি+বাক্‌শৈলী+চিন্তা+দৃশ্য+গীত) দোষ-গুণ বিচার করা—এ ধারণা এরিস্টফেনিসের সময়েও প্রচলিত। এরিস্টফেনিসের মধ্যে—সমালোচনার মোটামুটি নিম্নলিখিত রীতির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—

(ক) সূত্র-সাপেক্ষ বিচার (judicial criticism)
(খ) নৈতিক সমালোচনা (Ethical criticism)
(গ) বৈয়াকরণিক সমালোচনা (Textual criticism)

প্লেটোর মধ্যে উল্লিখিত রীতির দ্বিতীয়টির—অর্থাৎ নৈতিক সমালোচনার প্রাধান্য দেখা যায়। শৈল্পিক উৎকর্ষ যে রচনা-নৈপুণ্যে এবং কল্পনা-কুশলতায় প্রকটিত হয়-এ কথা প্লেটো স্বীকার করেছেন বটে; কিন্তু শিল্পকে, সামাজিক উপযোগিতার দিক দিয়ে না দেখে, নিছক শিল্প বা আনন্দের সামগ্রী রূপে দেখতে প্লেটো রাজি ন'ন। যে শিল্প সমাজের মঙ্গল সাধন করে না, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করে না, সে শিল্প শিল্পরূপে যত নিখুঁতই হোক, অশ্রদ্ধেয়—অপাংক্তেয়। প্লেটো সাহিত্যতত্ত্বের স্বতন্ত্র কোন বই লেখেননি। এই কারণে সমালোচনা-রীতি নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবার প্রয়োজনও তাঁর হয়নি। সুতরাং তাঁকে নিয়ে বেশী টানাটানি না করাই ভাল।

পোয়েটিক্‌স-গ্রন্থে সমালোচনা-সূত্র :

এরিস্টটল গ্রীসের প্রথম 'সাহিত্য-শাস্ত্র'কার বটে কিন্তু প্রথম সমালোচক ন'ন। সমালোচনার ধারা যে বহু আগে থেকেই বয়ে আসছে, এ শুধু অনুমানের বিষয় নয়, সত্য ঘটনা। এরিস্টটলের নিজের উক্তি থেকেই বুঝা যায়—'সমালেচক' নামক ভয়ঙ্কর এবং অতর্পণীয় জীবের সংখ্যা গ্রীক সমাজে কম নয় এবং তাঁদের রুচি এবং চাহিদাও বিচিত্র। "In face of the cavilling criticism of the day" কবিদের সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন—কাব্যের সমস্ত, অন্ততপক্ষে প্রধান প্রধান উপাদানগুলির সমাবেশ করা উচিত। কারণ—"the critics now expect one man to surpass all others in their several lines of excellence"—সমালোচক জাতটা কোনকালেই অল্পে সন্তুষ্ট নয়। একাধারে সব গুণ না পেলেই খুঁৎ খুঁৎ করে। এ

তো তবু ভাল ; কিন্তু গ্লৌকোন (glaucon) এমন একশ্রেণীর সমালোচকদের কথা বলেছেন যা'দের বংশধরের অভাব কোন কালেই হয়নি। মারাত্মক সমালোচক এরা। এই সকল—"Critics jump at certain groundless conclusions, they pass adverse judgment and then proceed to reason on it; and assuming that the poet has said whatever they happen to think, find fault if a thing is inconsistent with their own fancy"। খাঁটি সমালোচক হবেন, অবশ্যই, বিপরীত ধর্মী। যুক্তিহীন হঠাৎ সিদ্ধান্ত তিনি করবেন না। আগে থেকেই বিরূপ ধারণা করে শেষে যুক্তির অবতারণা করে তাকে সমর্থন করবেন না, কোন ব্যাপারেই নিজের অনুমানকে প্রশ্রয় দিয়ে, কবি যা বলেননি তা' আরোপ করবেন না এবং নিজের কল্পনার সঙ্গে মেলেনি বলেই কোন কিছুকে দোষদুষ্ট বলবেন না। বলা বাহুল্য এমন স্থিতধী সমালোচক খুবই দুর্লভ। এ কথা স্বীকার করতেই হবে—আদর্শ সমালোচক হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয় এবং এরিস্টটল যে আদর্শ রূপ কল্পনা করেছেন তা' আজও আদর্শ—একথা বলা যেতে পারে।

সমালোচনা রচনার দোষগুণ-বিচার। রচনা যেখানে রূপে রসে নিয়মসম্মত হয়—বিশেষতঃ 'effect' অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির দিক দিয়ে খুব সমর্থ হয়ে উঠে, সেখানেই রচনার সার্থকতা। রচনার রূপ যত নিখুঁত হয় এবং রস যত তীব্র-সংবাদী হয়, ততই রচনার গুণ। রচনা নানা উপাদানের সমবায়। সুতরাং রচনার দোষ-গুণ শেষপর্যন্ত উপাদানের এবং উপাদান-সংযোজনার দোষ-গুণের ফলেই ঘটে থাকে। যেমন, ট্র্যাজেডির উপাদান—(১) বৃত্ত (২) চরিত্র (৩) বাক্‌শৈলী (৪) ভাবনা বা চিন্তা (৫) গান (৬) দৃশ্য। এই উপাদান-সমবায়ে ট্র্যাজেডির "effect"—বা রস অর্থাৎ "fear and pity" জাগাতে হবে।

এরিস্টটল বৃত্তের গঠন বিশেষতঃ আদর্শ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং গঠনের দোষ-গুণও নির্দেশ করেছেন। সুতরাং, নির্দেশ-অনুসারে বৃত্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে, নিম্নলিখিত প্রশ্নের আলোচনা করা দরকার :—

(ক) (১) বৃত্তের গঠন জটিল না সরল ? (অর্গানিক না এপিসোডিক) ?
(২) বৃত্তে বিষয়-ঐক্য কতখানি আছে ? ঐক্যের রূপ কি ?
(৩) বৃত্তের আয়তন নিয়মসম্মত হয়েছে কি না ?
(৪) নায়ক উপযুক্ত হয়েছে কি না ?
(৫) ঘটনা-বিন্যাস রসানুকুল হয়েছে কি না ?

(খ) চরিত্র সম্পর্কে, চারটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন—
(১) চরিত্রকে ভাল (good) হতে হবে।
(২) চরিত্রে ঔচিত্য (propriety) থাকা চাই।
(৩) চরিত্রে বাস্তব (true to life) হওয়া চাই।
(৪) চরিত্রে সঙ্গতি (consistency) থাকা চাই।

সুতরাং এই গুণ যত কম থাকবে তত চরিত্র-সৃষ্টি নিন্দনীয় হবে। মোট কথা চরিত্র সমালোচনাকালে এই চারটি বিষয় বিচার করতে হবে।

(গ) বাক্‌শৈলী বা ভণিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে—The perfection of style is to be clear without being mean. প্রচলিত এবং উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করলে রচনা স্পষ্ট হয়। (১) ছন্দ, শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে ঔচিত্য বজায় রাখা দরকার। (২) Character and thought are merely obscured by a diction that is over brillant—অতিশয় আলঙ্কারিক ভণিতিতে চরিত্র ও চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

(ঘ) ভাবনা বা চিন্তা বলতে—"every effect which has to be produced by speech" বুঝায়। দুই পর্যায়ে একে ভাগ করা যায়—এক পর্যায়ে প্রমাণ খণ্ডন-মনন প্রভৃতি ব্যাপার ; অন্য পর্যায়ে—ভাবোদ্দীপন। এখানেও ঔচিত্য, বাস্তবতা, সঙ্গতি প্রভৃতি থাকা চাই।

(ঙ) গান ও দৃশ্য নাটকের রস সৃষ্টিতে কি অংশ গ্রহণ করেছে তাও বিচার্য।

(চ) কোন্ শ্রেণীর রচনা—এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

দেখা যাচ্ছে—এরিস্টটল প্রত্যেক কাব্যের অঙ্গ-উপাদানাদি নিয়ে যত দিক থেকে আলোচনা করেছেন এবং সূত্র রচনা করেছেন, তত দিক থেকেই সেই

রচনার সমালোচনা সম্ভব।—অবশ্য এরিস্টটল সে কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেননি।

তবে, 'দোষ' সম্পর্কে এরিস্টটল খুব স্পষ্টভাবেই আলোচনা করেছেন। দোষ, কোন্ অবস্থায় গুণ হতে পারে তা'ও দেখিয়েছেন এবং দোষ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রথমে এই সিদ্ধান্তের কথাই বলা যাক। সিদ্ধান্তটি এই যে—"within the art of poetry itself there are two kinds of faults—those which touch its essence and those which are accidental." অর্থাৎ দোষ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—এক = আত্মিক দোষ, অর্থাৎ যে দোষ শিল্পের আত্মাকে কলুষিত করে; দুই = আপাতিক দোষ—যে দোষ শিল্পের আত্মাকে স্পর্শ করে না—যে দোষ অস্থায়ী। সমালোচকদের দোষ বিচার করার সময়ে এ বিষয়ে অবশ্যই অবহিত থাকতে হবে। সমালোচকরা দোষ আবিষ্কার করলে—সেই দোষ খণ্ডন করার সময়েও কথাটি মনে রাখতে হবে। যা'হোক নিত্য এবং অনিত্য দোষের একটু ব্যাখ্যা দরকার। এরিস্টটল নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যখন কোন কবি কোন বিষয়কে উপস্থাপনা করতে গিয়ে, শক্তির অভাবে, যথাযথভাবে উপস্থাপনা করতে পারেন না—রূপ দিতে ভুল করেন (incorrectly রূপ দেন) তখন বুঝতে হবে—ভুলটি মর্মগত। কিন্তু যেখানে উপস্থাপ্য-বিষয়-নির্বাচনের ভুলের জন্য দোষ দেখা দেয়,—অন্যান্য শিল্পের বা বিজ্ঞানের সূত্র-সামগ্রী প্রয়োগের ত্রুটী দেখা দেয়, সেখানে দোষ বাহ্য। দোষের এই শ্রেণী-বিভাগ প্রশংসনীয়।

এরিস্টটলের মতে, মোটামুটি পাঁচটি দোষের জন্য সমালোচকরা রচনাকে নিন্দা করে থাকেন :—

(ক) অসম্ভব (impossible)

(খ) অবিশ্বাস্য (irrational)

(গ) নীতি-বিগর্হিত (morally hurtful)

(ঘ) স্বতোবিরুদ্ধ (contradictory)

(ঙ) অসঙ্গত (contrary to artistic correctness)

তবে, এই সব দোষ দেখলেই যে সঙ্গে সঙ্গে রচনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। এ কথা সত্য—'every kind of error should, if possible, be avoided' এবং কবি যখন 'describes the impossible he is guilty of an error'. কিন্তু যেখানে শিল্পের বিশেষ প্রয়োজনেই এই ত্রুটী ঘটবে, সেখানে তা দোষের হবে না। অবশ্য অন্যোপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে, 'অসম্ভব' প্রয়োগ 'দোষ' বলেই গণ্য হবে। তারপর এটাও বিবেচনা করতে হবে—দোষটি নিত্য কি অনিত্য।

এই প্রসঙ্গেই এরিস্টটল এমন একটি সমস্যার কথা তুলেছেন যা' পরবর্তীকালে—বিশেষতঃ আধুনিককালে বাস্তবতার (Realism) প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে—কবির অনুকার্য বিষয়—'things as they were or are, things as they are said or thought to be or things as they ought to be'. অনুকরণেও এই কারণে বিশিষ্টতা দেখা দিয়ে থাকে। কোন বর্ণনা ঠিক বাস্তবিক (true to fact) না হ'লে সমালোচনার উত্তরে কবি বলতে পারেন—আমি—"objects as they ought to be"-কে রূপ দিয়েছি। আর যেখানে বাস্তবিক বা আদর্শান্বিত দুটোর কোনটাই নয়, সেখানে কবি বলতে পারেন—'This is how men say the thing is' অর্থাৎ এই তো পৌরাণিক বার্তা। দেখা যাচ্ছে—পৌরাণিক ঘটনার ক্ষেত্রে বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন অবান্তর। ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনার ক্ষেত্রে—দুই রকম উপস্থাপনার অবকাশ রয়েছে—এক—'true to fact, অর্থাৎ 'বাস্তব'; দুই—'ought to be'—'যেমনটি-হওয়া উচিত' অর্থাৎ 'আদর্শান্বিত' (idealized)। বলা বাহুল্য হলেও বলা দরকার—সমালোচনায়—'রিয়ালিজিম'—'আইডিয়ালিজিম' নিয়ে দ্বন্দ্বের সূচনা এখানেই এবং উভয়ের লক্ষণও এখানে অল্পকথায় প্রকাশ করা হয়েছে। ইউরিপিডিসের অভিযোগে আমরা দেখেছি—ইস্কিলাসের বিরুদ্ধে আসল অভিযোগ—অবাস্তবতার অভিযোগ—ঘটনা-বিন্যাসের অবাস্তবতার, চরিত্রের অবাস্তবতার এবং বিষয়বস্তুর অবাস্তবতার অভিযোগ।

এরিস্টটল বাস্তব-অবাস্তব সমস্যাকে বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা দুই দিক থেকেই আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন, কবিদের মধ্যে বাস্তব-প্রবণতা এবং আদর্শ প্রবণতা এই দুটো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—যেমন সফোক্লিসের মধ্যে ছিল আদর্শ-প্রবণতা, ইউরিপিডিসের মধ্যে ছিল—বাস্তব-প্রবণতা। যা'হোক 'অসম্ভ'কে দোষ বলতে গেলে—কবি কোন্ বিষয় এবং কিভাবে রূপ দিচ্ছেন—এটাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

তারপর—আচরণের ও উক্তির ঔচিত্য বিচার করতে হলে আচরণ ও উক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। কে করেছে বা বলেছে, কাকে, কেন, কি অবস্থায় এবং কোন উদ্দেশ্যে করেছে বা বলেছে—বিচার করে দেখে দোষ-গুণ নিরূপণ করতে হবে।

অতিপ্রাকৃত বা অযুক্তিযুক্ত (irrational) এবং নীতি-বিগর্হিত সম্বন্ধে এরিস্টটলের মীমাংসাটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি বলেছেন—The element of the irrational and similarly depravity of character are justly censured when there is no inner necessity for introducing them." অর্থাৎ অযুক্তিসিদ্ধ উপাদান এবং চরিত্রের হীনতা (নীতিবিগর্হিত চরিত্র) তখনই নিন্দার যোগ্য যখন তারা অন্তরঙ্গ প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। যেখানে রূপ-রসের প্রয়োজনেই অযুক্তিসিদ্ধ বা নীতিবগর্হিত স্থান পায় সেখানে তারা দোষাবহ নয়। লক্ষণীয়—এরিস্টটল নীতির মুখ চেয়ে নীতি-বিগর্হিতকে নিন্দা করেননি—শিল্পের রূপ-রসের মুখ চেয়েই তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্লেটোর সঙ্গে এখানেই তার বড় পার্থক্য—প্লেটোর সমালোচনা যেখানে প্রধানতঃ নীতিমুখাপেক্ষী, এরিস্টটলের সমালোচনা সেখানে মুখ্যতঃ শিল্পমুখাপেক্ষী অর্থাৎ রূপ-রস-মুখাপেক্ষী।

পোয়েটিক্স গ্রন্থে 'সমালোচনা' সম্পর্কে যে সকল নির্দেশ পাওয়া যায় তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায়—সমালোচনার মূল-তত্ত্বে এরিস্টটল পৌঁছেছেন; কারণ সমালোচনা তাঁর কাছে—শিল্পের রূপ ও রসের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার। বাস্তবিক, রূপ-রসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারই আসল বিচার—যথার্থ শৈল্পিক-মূল্যের বিচার। শিল্পে রূপ উপায়, রস লক্ষ্য। তাই রসকে ব্যক্ত করার

সামর্থ্যের মধ্যেই রূপের সার্থকতা। আর একটা কথা—'effect' বা রস-সৃষ্টির জন্য যে রূপকল্পনা থাকে, সেই রূপ পর্যালোচনা করেই আদর্শ রূপের ধারণা—রূপ সম্বন্ধীয় বিধি-বিধান সমালোচকরা গঠন করে থাকেন—এটাই সনাতন রীতি। এরিস্টটল—'বিধি-নিষেধ' যা তৈরী করেছেন, এইভাবেই করেছেন। তবে —রূপকে কখনো রসের উপরে তিনি স্থান দেননি। রস-সৃষ্টি সার্থক হলে—রূপের ত্রুটী-বিচ্যুতি যে মার্জনীয়, ইউরিপিডিস-সম্পর্কিত মন্তব্যেই—(XIII-47) তা' ব্যক্ত হয়েছে। এ কথাটাও মনে রাখা দরকার—বিচারমাত্রই বিধি সাপেক্ষ। কি থাকলে উৎকর্ষ হয় আর কি না থাকলে অপকর্ষ হয়—এই 'কি'-র ধারণা না থাকলে বিচার অসম্ভব। এই কারণেই—বিচার প্রধানতঃ সূত্র-সাপেক্ষ। অবশ্য সূত্র নিত্য নয়—পরিবর্তনশীল। তবে পরিবর্তনশীল হলেও সূত্রের আবশ্যকতা লোপ পায় না। কিন্তু রূপের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারে সূত্রের যত প্রাধান্যই থাক, রসের মাত্রানিরূপণে বিধি-বিধান অক্ষম, কারণ রস হৃদয়বেদ্য। এবং আস্বাদন-শক্তিই সেখানে একমাত্র নিরূপক। অবশ্য কোন্ রস প্রধান কোন্ রস অপ্রধান—এ বিচার অনেকটা বুদ্ধিবলাপেক্ষী। এই কারণে —রূপ-বিচার প্রধানতঃ বিধি-নিষেধসাপেক্ষ হয়—'judicial' হয়, আর রস-বিচার হয় প্রধানতঃ আস্বাদন-সাপেক্ষ অর্থাৎ Impressionistic—[Impressionistic criticism = 'the adventures of a soul among master pieces',—পরবর্তীযুগের পরিভাষা এবং ঐ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত]।

এরিস্টফেনিস থেকে এরিস্টটল পর্যন্ত সমালোচনার যে যে রীতি পাওয়া যাচ্ছে—(উল্লেখে বা আলোচনায়), তাদের আমরা মোটামুটি এইভাবে সাজাতে পারি:—

*(ক) নৈতিক সমালোচনা (Ethical criticism)

(খ) রূপ-রসের সার্থকতার আলোচনা —(Impressionistic—Interpretative)

(গ) তুলনামূলক আলোচনা (Comparative)

(ঘ) বাগর্থ আলোচনা (Linguistic)

(ঙ) সূত্র-সাপেক্ষ সমালোচনা (judicial)

এই তালিকার শেষে আমরা গ্রীক-সমালোচনার একটা প্রবণতা জুড়ে দিতে পারি। এই প্রবণতাটিকে সংক্ষেপে বলা যায়—(চ) রূপকসন্ধানী সমালোচনা—(Allegorical interpretation)। খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী থেকে এর সূত্রপাত। পৌরাণিক কাহিনীর লঘু-কল্পনার মধ্যে গুরুতর আধ্যাত্মিক বা নৈতিক তত্ত্ব খোঁজার চেষ্টা তথা বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত থেকে প্রাচীন মত ও পথকে রক্ষা করাই ছিল এই ব্যাখার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। এই সমালোচনা-রীতির এমনি মূল্য যাই থাক, ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। রচনার তত্ত্ব বা তাৎপর্য নিয়ে গভীর আলোচনার সূত্রপাত এরাই করেন—এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। তবে এই সমালোচনাকে আমরা নৈতিক সমালোচনার'ই একটা বিশেষ রূপ বলে মনে করে নিতে পারি।

এরিস্টটলের পরে, সমালোচক এসেছেন অনেক কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এমন কেউ আসেননি যিনি নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমালোচনা-রীতির মধ্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন। এ কথা সত্য—রূপ-রসের আলোচনা ব্যাপকতর এবং গভীরতর হয়েছে ; রূপের আলোচনা-প্রসঙ্গে—কাব্য-দেহ শব্দার্থের দোষ-গুণ, ছন্দ-অলঙ্কারাদি প্রয়োগের দোষগুণ প্রভৃতি, বৈয়াকরণ-আলঙ্কারিকের ব্যাপক জ্ঞান নিয়ে আলোচিত হয়েছে, তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, রসের আলোচনায় নীতি-বিচারের স্থান আছে কি না, থাকলে কতটুকু আছে—এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে, প্রাচীন সূত্রের সমালোচনা করে নতুন সূত্র স্থাপনা করার চেষ্টাও যে না হয়েছে তা' নয়, কিন্তু বড় কথা এই যে মূল পদ্ধতি থেকে কেউ অন্যদিকে তেমন সরে যাননি। সমালোচকের তালিকা—হোরেস থেকে আরম্ভ করে—সেন্টেবুভে পর্যন্ত (1804-69)—এক বিরাট শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় অনেক বিরাট বিরাট পুরুষ আছেন—ভিন্ন ভিন্ন তাঁদের রুচি-নিষ্ঠা। কারো বা রস নিষ্ঠা, কারো বা নীতি-নিষ্ঠা বেশী, কারো কারো তুলনা করবার ক্ষমতা চমৎকার, কেউ কেউ সূত্রের অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি দোষ উদ্ঘাটনে সুপটু, নতুন সূত্র রচনা করতে চেষ্টিত। কারো অন্ধভক্তি বা অভক্তি পুরাতনে, কারো বা নতুনে, আবার কেউ কেউ পুরাতনকেও শ্রদ্ধা করেন, নতুনকেও

ভালবাসেন ; কিন্তু এত সব সত্ত্বেও, সমালোচনায় কোন নতুন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি।

সেণ্টেবুভে থেকে, একটা নতুন পদ্ধতির আরম্ভ হয়। কবি সমালোচক এলিয়ট "experiment in criticism"—প্রবন্ধে (Tradition and experiment—1929)এ কথার সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন—'we may say, roughly, that modern criticism begins with the work of the French critic Sainte Beuve, that is to say about the year 1826, এই সমালোচনা-পদ্ধতিকে বলা হয়েছে—ঐতিহাসিক (Historical)। Mme. de Stael (1776-1817) সাহিত্যকে সমাজেরই বিশেষ অভিব্যক্তি স্বরূপে দেখার প্রস্তাব করলেও, সেণ্টেবুভে (১৮০৪,৬৯) এবং তেইন (১৮২৯-৯৩) ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐতিহাসিক সমালোচনার মূল দৃষ্টি—কবি ও তাঁর কাব্যকে যথাক্রমে সমাজের একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং সামাজিক সামগ্রী হিসাবে দেখা। মূল বক্তব্য—কবি মানসের পরিচয় না জানলে, কাব্যের স্বরূপ সম্যক জানা যায় না। সুতরাং কাব্য-বিচারে কবি-মানসের বিচার অপরিহার্য আর কবি-মানসের স্বরূপ জানতে হলে—কবির জীবন-চরিত্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে। তিনি বলেন—"Literature, literary production, is not for me distinct or at least separable from the rest of man and human organisation. I can taste a work, but it is difficult for me to judge it independently of my knowledge of the man himself."

বুভে'র কনিষ্ঠ-সমসাময়িক তেইন, এই সমালোচনাকে, ঐতিহাসিক পদ্ধতিরই স্বাভাবিক পরিণতি—বৈজ্ঞানিক সমালোচনার স্তরে পৌঁছে দেন। বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকায়, সাহিত্য-সমালোচনা ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক সংস্কারের চাহিদা বাড়তে থাকে। সবক্ষেত্রে 'কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ' সূত্র সত্য হবে, আর সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঘটবে অকারণ কার্য—অহেতুক সৃষ্টি—এ ব্যাপার সম্ভব নয়। তেইন

দেখান—সাহিত্যও অন্যান্য সামগ্রীর মত কার্যকারণ নিয়মের অধীন—(resultant of circumstances—race, milieu and moment)। কবি যে প্রেরণায় কাব্য সৃষ্টি করেন তা' নিয়ন্ত্রিত করে—জাতি-চেতনা, সামাজিক পরিবেশ-চেতনা এবং সমসাময়িক ঘটনা। এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে কবিকে বা কাব্যকে দেখা—অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা।

সমালোচনার এই ধারাটি যে কবির ও কাব্যের সমাজসাপেক্ষতা বিচারের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়েছে, আশা করি একথা বলে বুঝাতে হবে না। মার্কস্‌বাদী সমালোচকদের কাছে এই প্রবণতা আরো প্রশ্রয় পেয়েছে। তাঁরা আরো গভীর স্তর থেকে, সমাজের উপরিতলের স্বরূপ গেঁথে তোলবার চেষ্টা করেছেন ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যার মূল সূত্র প্রয়োগ করে, তাঁরা সমাজের (আর্থনীতিক) ভিত্তি এবং (সাংস্কৃতিক) উপরিতলের মধ্যে যে যোগ রয়েছে; সেই যোগটিকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মূলে যে আর্থনীতিক সংস্থা বর্তমান সেই সংস্থাটির সঙ্গে উপরিবর্তী সমস্ত সংস্থার সম্পর্ক আলোচনা করে এঁরা ঐতিহাসিক আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করে থাকেন।

কিন্তু এই আর্থনীতিক ব্যাখ্যার রন্ধ্রপথেই মার্কসবাদী সমালোচনায় অনেক পাপ প্রবেশ করে থাকে। মার্কস্‌-এঙ্গেলসের নিষেধ সত্ত্বেও অনেকে আর্থনীতিক উপাদানকেই অনুচিত প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এঙ্গেলস-এর সম্পর্কে জোসেফ্‌ ব্লকের কাছে যা লিখেছেন (১৮৯০ খ্রীঃ ২১ সেপ্টেম্বর-পত্র) উল্লেখযোগ্য—If therefore somebody twist this into the statement that the economic element is the only determining one he transforms it into a meaningless, and abstract phrase'. এবং এই পত্রেই এঙ্গেলস জানিয়েছেন—অনেক recent Marxists lay more stress on the economic side than is due to it"—ফলে মার্কসবাদী সমালোচনার নামে 'most amazing rubbish' সৃষ্টি হয়েছে।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—অনেকের ধারণা 'মার্কসবাদী সমালোচনা'—মানেই খানিকটা আর্থনীতিক-রাজনীতিক-সামাজিক আন্দোলনের বিবরণ দেওয়া। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। শুধু পটভূমির ব্যাখ্যা করার মধ্যেই মার্কস্‌বাদী সমালোচনা সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্য-সমালোচনা মুখ্যত: সাহিত্যের রূপ-রসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার—এ মূল সিদ্ধান্ত এরিস্টটলের যুগেও যত সত্য ছিল, মার্কস্‌বাদীর কাছেও তত সত্য। মার্কস্ ১৮৫৯ খ্রী: ফার্ডিনাণ্ড্ ল্যাসেলকে যে পত্রখানি লেখেন, তা' থেকেই আমরা বুঝতে পারি, সমালোচনা শুধু আর্থ-রাজনৈতিক বা সামাজিক পটভূমির বিচার নয়—সাহিত্যের রূপ-রসেরই বিচার। ল্যাসেলের—"ফ্রানজ্ ভন সিকিঙ্গেন" নাটকখানির সমালোচনায় মার্কস্ নিম্নলিখিত বিষয়ের বিচার করেছেন—

(ক) Composition and action (গঠন)

(খ) Affecting power—very important side (রস)

(গ) Formal matter—verse, etc (রচনা)

(ঘ) বিষয় ও চরিত্র সৃষ্টি।

রূপে-রসে যে সৃষ্টি সার্থক হয় না, কোন যুগেই তার সমাদর নেই। কারণ সাহিত্য দর্শনও নয় বিজ্ঞানও নয়—আবার এক হিসাবে সমস্ত কিছু —'যাযাবরীয়া'। কিন্তু গোড়ার এবং আসল হিসাব—সাহিত্য হতে হবে। তা' না হলে—সব উপাদানই নিষ্ফল। চরিত্রকে হাজার 'mere mouthpieces of the spirit of time' করা হোক, বিষয়ের হাজার 'intellectual depth and conscious historical content' থাক—শেক্‌সপীয়রের 'vivacity and wealth of action' না থাকলে—মার্কস-এঙ্গেলসের মতে—নাটক ব্যর্থ সৃষ্টি। মার্কস-এঙ্গেলসের স্পষ্ট বিবৃতি থাকা সত্ত্বেও, মার্কস্‌বাদী সমালোচনাকে যাঁরা 'আর্থনীতিক ব্যাখ্যা' মাত্র বলে উপেক্ষা করতে চান তাঁরা ভুল করেন। অবশ্য যে-সব সমালোচকের সমালোচনা, শুধু আর্থনীতিক—রাজনীতিক—সামাজিক পটভূমি বিচারেই

সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, তাদের সমালোচনাকে অসম্পূর্ণ বলে নিন্দা করবার অধিকার—সকলেরই আছে।

সমালোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি বা মার্কসীয় পদ্ধতি—যে পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হোক, তা'তে মূল পদ্ধতির—রূপ-রসের বিচার করবার পদ্ধতির—মর্যাদা একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি। এখনও রূপের বিচার রসের বিচার না করে সমালোচনা-কার্য সম্পন্ন করা যায় না। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে—রূপ-রস সম্পর্কে এরিস্টটল যে আলোচনা করেছেন তার প্রয়োজন এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। গঠনে আজ 'বহু-সমবায়ে—একে'র ঐক্য থাকলেও, কাব্যের পক্ষে ঐক্য যে একটা চাইই চাই, এ কথা আজও সত্য। আজও গঠন-বিচারে 'arrangement of incidents' বিচার করা হয়। এবং তা' করা হয় রস অর্থাৎ "effect"-এর দিকে লক্ষ্য রেখেই।

সমালোচনায় বিশেষ প্রবণতা বা মেরু

সমালোচনা আসলে রূপ-রসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার বটে, কিন্তু গোড়া থেকেই দেখা যায়—সমালোচকদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই প্রবণতার মধ্যে প্রথম—(ক) নীতি-প্রবণতা—রূপ-রসের উৎকর্ষকেই যথেষ্ট মনে না করে, কাব্যের নৈতিক-উৎকর্ষ-সাধনের সামর্থ্য বিচার করা। এই নৈতিক সমালোচনা (ethical criticism) মেরুর বিপরীত মেরু—(খ) বিশুদ্ধ শৈল্পিক সমালোচনা (pure aesthetic criticism)—শিল্পকে নিছক শিল্প হিসাবেই দেখা এবং রূপ-রসের উৎকর্ষ থাকলেই শিল্পকে সার্থক সৃষ্টি বলে গণ্য করা। "নৈতিক-সমালোচনা"র ধারাই পরবর্তীকালে—নানা আন্দোলনের বাঁক ঘুরে আইভিঙ্ ব্যাবিট প্রবর্তিত মানবতা-বাদী (Humanism) সমালোচনার বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। "শিল্পে উদ্দেশ্যবাদ" (art with a purpose)—এই ধারারই বিশেষ একটি রূপ। যাঁরাই, শিল্পকে নিছক-শিল্প হিসাবে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি—শিল্পকে সমাজ-সেবকের দায়িত্ব পালন করতে দেখে আনন্দিত

হয়েছেন তাঁরা সকলেই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, নৈতিক সমালোচনার ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। আর যাঁরা শিল্পকে নিছক শিল্প রূপেই দেখতে চেয়েছেন—রূপ-রস বিচার করেই যাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাঁরাই কলাকৈবল্যবাদী (art for art's sake) নামে পরিচিত হয়েছেন। এঁদেরই কেউ কেউ "নিছক আনন্দ"কে কেউ কেউ "নিছক সৌন্দর্য"কে শিল্পের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন।

দ্বিতীয় প্রবণতা—সূত্র প্রবণতা (judicial criticism) বনাম ব্যক্তিগত আস্বাদন-নির্ভরতা (Impressionistic criticism)। বিচার সূত্রসাপেক্ষ বটে, কিন্তু সূত্র-নিষ্ঠা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে গোঁড়ামিতে পরিণত হয়। সৃষ্টির মাধুর্য ও মহিমা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও, সূত্রের সঙ্গে গরমিল হয়েছে বলে সৃষ্টিকে হেয় বলে ঘোষণা করা—এই গোড়ামিরই ফল। ঐরূপ গোঁড়ামি সাহিত্য-বিচারে বহুস্থলেই দেখা গিয়েছে এবং এখনও যে যায় না, সে কথা জোর করে বলা যায় না। তবে এই গোড়ামির বিপরীত মেরুতে ব্যক্তিগত খুসীর অবাধ খেয়ালের রূপটিকে পাওয়া যায়। এও একরকম গোঁড়ামি। সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তিগত আস্বাদনের স্থান অনেকখানি—রূপবিচারে যতটা থাক না থাক রস-বিচারে ব্যক্তিগত আস্বাদন-সামর্থ্যের স্থান যে অনেকখানি —এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তবু সমালোচনা ব্যক্তির খুসী বা খেয়াল-মাত্র নয়।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত প্রবণতাগুলি সংযত না রাখলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ বা বিকৃত হতে বাধ্য।

হ্যারল্ড্ ওসবোর্ণ—মহাশয় "এস্থেটিকস এ্যাণ্ড্ ক্রিটিসিজিম" গ্রন্থের (১৯৫৫) "এ্যানাটমি অফ্ ক্রিটিসিজিম"—অধ্যায়ের সমালোচকদের মূল ধারণা ও প্রবণতা এইভাবে গুছিয়ে দিয়েছেন ঃ—

1. Realist assumption
2. Emotional
3. Express onist
4. Transcendentalism
5. Configurational assumption.

সমালোচনায় মনস্তত্ত্ব উদ্ধারের প্রবণতা (Psychological criticism), ঐতিহাসিক কারণ—অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ নির্ধারণের প্রবণতা (Historical criticism), টীকা-ভাষ্যপ্রবণতা (Exegetical criticism), রস-সঞ্চারণ প্রবণতা (Expressionist criticism) প্রভৃতি প্রবণতায় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন :—It is for these reasons we insist that consideration of the ulterior functions which a work of art may be inducted to fulfil must be held separate from the assessment of its excellence as a work of art."

সাহিত্য-বিষয়ক মতবাদ বা "ইজিম"

এরিস্টটল-কৃত "পোয়েটিক্‌স" গ্রন্থে সাহিত্য-শিল্পতত্ত্বের নানা জিজ্ঞাসা ও সমাধান যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার মর্যাদা সম্যকভাবে নির্ধারণ করবার জন্য আমি, এ পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসেছি। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তের আলোকে এরিস্টটলের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলাই যে আমার এই চেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য বা বৈশিষ্ট্য—এ কথা সহৃদয় পাঠককে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। এই অধ্যায় এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় এবং এমন একটি অধ্যায় যার প্রযোজ্যতা নিয়ে অনেকের মনেই "কিন্তু" উঠবে বলে আমি আশঙ্কা করছি। এরিস্টটলের 'পোয়েটিক্‌স্'-গ্রন্থ থেকে "ইজিম" বের করতে যাওয়া অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে বই কি। "ইজিম"গুলির ইতিহাস দেখলেই দেখা যাবে—এদের অনেকেরই বয়স খুব বেশী নয়। প্রায়গুলিরই উদ্ভব—উনবিংশ শতাব্দী বিশেষতঃ—বিংশ শতাব্দীতে। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখলেই তাদের নাম-ধাম-বয়সের পরিচয় কিছুটা জানা যাবে। উল্লেখযোগ্য মতবাদের তালিকাটি ইংরেজি বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে পাঠকদের চোখের সামনে রাখা যাচ্ছে।

(১) **একমিইজিম্** (Acmeism)

বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় এই আন্দোলন দেখা দেয়। মরমিয়াবাদের প্রতিক্রিয়ায় এর জন্ম। বাস্তববাদ-প্রবণতারই বিশেষ এক রূপ।

(২) **এ্যাক্‌টিভিজিম্‌** (Activism)—(১৯৩৫)

জার্মানীতে—বিংশ শতাব্দীতে—এক্‌স্প্রেশানিজিমের প্রতিক্রিয়ায় এর জন্ম। বাস্তববাদ-প্রবণতার বিশেষ রূপ।

(৩) **অটোমেটিজিম্‌** (Automatism)

বিংশ শতাব্দীর কাব্যে—বিশিষ্ট রচনারীতি—"সুর-রিয়েলিজিম"-এর রীতি। "সাংকেতিক"—প্রবণতার বিশেষ ধারা—Gertrude Stein-প্রবর্তিত।

(৪) **এ্যাসোসিয়েশানিজিম্‌** (Associationism)

রীতি-বিশেষ। অটোমেটিজিমেরই স্বগোত্র।

(৫) **ক্লাসিসিজিম্‌** (Classicism)

লাতিন-লেখক—Aulus Gellius—(দ্বিতীয় শতাব্দী)—প্রথম "scriptor classicus" শব্দটি প্রয়োগ করেন। পরে শব্দ নানা তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয় এবং রোমান্টিসিজিমের—বিপরীতধর্মী মতবাদ—এই অর্থে প্রযুক্ত হয় আরো অনেক পরে।

(৬) **কিউবো-ফিউচারিজিম** (Cubo-futurism)

মস্কোয়, ১৯১২ খ্রীঃ, উদ্ভব। প্রচলিত নীতি-রীতি-ভাব-ভাষা না মানার উৎকট বাতিক। সত্যের রূপাতীত স্বরূপটি ধরবার জন্য—কিউবিস্টরা চেষ্টিত।

(৭) **ডাডাইজিম্‌** (Dadaism)

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভূত। ভাব ও ভাষার সহজ অন্বয় চেপে যাওয়া অন্যতম প্রবৃত্তি—Tristan Tzara প্রধান পাণ্ডা; ১৯২৪ খ্রীঃ এই রীতিই—"সুর-রিয়েলিজিম্‌"-এ পরিণত হয়।

(৮) **"ডাইডাক্‌টিজিম্‌** (Didactism)

আনন্দ বা সৌন্দর্য ছাড়াও সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য আছে—লোকশিক্ষা-নীতিশিক্ষাও শিল্পের পরোক্ষ উদ্দেশ্য—এই ধারণায় আস্থা।

(৯) **"ইগো-ফিউচারিজিম্‌** (Ego-futurism)

ফিউচারিজিমের রাশিয়ান সংস্করণ। ১৯১১ খ্রীঃ Severyanin-কর্তৃক উদ্ভাবিত।—সঙ্কল্প—"Striving of every egoist to realise the possibilities of to-morrow to day"। অহং-পূজার বিক্ষেপ।

(১০) **এক্স্প্রেশানিজিম্** (Expressionism)

ভাবকে 'সংকেত'-সাহায্যে ব্যক্ত বা সঞ্চারিত করার রীতি। সাংকেতিক রীতিরই অন্যতম প্রক্রিয়া। ১৯শ-২০শ শতাব্দীর আন্দোলন।

(১১) **এক্জিস্টেন্সিয়ালিজিম** (Exhistentialism]

বিংশশতাব্দীর দার্শনিক মনোভঙ্গী বিশেষ—শিল্পিমনোভঙ্গীও বটে। আস্তিক ও নাস্তিক দুই শ্রেণীতে এই মতবাদীরা বিভক্ত। উভয়ের ঐক্য এখানেই যে উভয়েই স্বীকার করে—"Existence comes before essence".—(১৯৪৬) (জাঁ-পল সার্ত্রে)। সাবজেকটিভিটি তথা ভাববাদের দিকেই এদের ঝোঁক।

(১২) **ফিউচারিজিম্** (Futurism)

১৯০৯ খ্রীঃ ফিলিপ্পো টোমাসো মেরিনিও আন্দোলনটি সুরু করেন। "আধুনিক"-উপাসনা (modernolatry)-এর ধর্ম। কর্ম হচ্ছে—প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গেচুরে দিয়ে অনাগতকে আহ্বান ও আদর করা।—ভাব-ভাষায় বেপরোয়ামি অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

(১৩) **হিউম্যানিজম্** (Humanism)

নানা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের জীবন, এবং তার ধর্ম কর্মের উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব স্থাপন করা—পরমপুরুষার্থ স্বীকার করা—এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য। Neo-Humanism. বিংশ শতাব্দীর আন্দোলন। আমেরিকার—পল এলমার মোর এবং আইর্ভিং ব্যাবিট্ এই আন্দোলনের পাণ্ডা। জীবনের স্বাধীন ইচ্ছার বা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য স্বীকার করা—সত্য-শিব-সুন্দরের সনাতন মর্যাদা মেনে নেওয়া—এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

(১৪) **আদর্শবাদ** (Idealism)

নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃতঃ—(ক) শিল্পে নৈতিক আদর্শের পরিপোষণ (খ) মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করা এবং তদনুসারে জীবনের রূপ

আঁকা (গ) চরিত্র-চিত্রণ যথাযথ না করে-আদর্শনিষ্ঠ করা (ঘ) আশাবাদী পরিণাম দেখানো।

(১৫) **ইমেজিজিম্** (Imagism)

আমেরিকার ও ইংলণ্ডের আন্দোলন। এজরা পাউণ্ড, লোয়েল প্রভৃতি প্রবর্তক। সাংকেতিক আন্দোলনেরই—নতুন সংস্করণ—প্রতিরূপকে (image) ভাবের বাহন করার চেষ্টা। সামান্যবচন যথাসম্ভব বর্জিত।

(১৬) **ইম্প্রেশানিজিম্** (Impressionism)

রিয়েলিজিম্ নেচারালিজিম-থেকেই এর উদ্ভব। অতিবাস্তব হওয়ার ঝোঁকে, বিষয়কে ছাড়িয়ে পরিবর্তনশীল বিষয়োপলব্ধি-ব্যাপারটিকেই রূপ দিতে এরা প্রবণায়িত। বস্তুর নয়, বস্তুধর্মের সন্ধানে এরা মত্ত।

(১৭) **নেচারালিজিম্** (Naturalism)

বাস্তববাদেরই রকমফের। বস্তুবাদীদর্শন, বিবর্তনবাদ এবং নির্দেশবাদের (diterminism) ভিত্তির উপর এই মতবাদের স্থিতি। বাস্তববাদ যেখানে বিষয়ের যাথার্থ্য এবং রূপের সামঞ্জস্য স্থাপনে ঐকান্তিক, নেচারালিজিম', সেখানে, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীব হিসাবে বুঝাপড়ার চেষ্টা—মানুষের প্রকৃতি ও বিকৃতি—বুর্জোয়া সমাজের বিকৃতি প্রভৃতি প্রদর্শনে চেষ্টিত। এমিলি জোলা—(১৮৬৮) এই মতবাদটির প্রবর্তক।

(১৮) **প্রিমিটিভিজিম্** (Primitivism)

অতীত-প্রবণতা—বর্তমান-বিমুখতা।

(১৯) **র‍্যাশানালিজিম্** (Rationalism) ও **"এ্যান্টির‍্যাশানালিজিম"**

প্রথমটিতে বুদ্ধির উপর বেশী আস্থা। দ্বিতীয়টিতে বোধি বা অনুভূতির উপর বেশী আস্থা! 'র‍্যাশানালিজিম্'—নিম্নলিখিত অর্থে প্রযুক্ত হয়—(ক) প্রত্যক্ষ প্রতীতি ছাড়াই বুদ্ধি নিজের থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারে—এম্পিরিসিজিমের বিপরীত। (১৭শ শতাব্দী) (খ) বুদ্ধি দ্বারাই সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। (গ) বিশ্বজগৎ নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ম বুদ্ধির দ্বারা জানা সম্ভব। (ঘ) স্বাধীনচিন্তা—বিচার প্রবণতা—অবিশ্বাসপ্রবণতা এর বৈশিষ্ট্য। "এ্যান্টি-র‍্যাশানালিজিম্" এই মতের বিপরীত।

'(২০) **রিয়েলিজিম্** (Realism)

দর্শনে বাস্তববাদ = বস্তুর পারমার্থিক সত্তা—উপলব্ধি-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা—স্বীকার।

জ্ঞানতত্ত্বে বাস্তববাদ = জ্ঞান বস্তুরই জ্ঞান অর্থাৎ প্রতীতি—বিষয়সাপেক্ষ এবং সেই বিষয়ের প্রতীতিনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

সাহিত্য সমালোচনায় বাস্তববাদ = ভাববাদের ও রোমান্টিসিজিমের বিপরীত—বাস্তববাদী সাহিত্য তাকেই বলা হবে যার বিষয়বস্তু প্রাকৃত জগৎ থেকে নেওয়া হয়েছে—এবং যার উপস্থাপনা অতি যথাযথ। অর্থাৎ বাস্তব সাহিত্যের—বিষয়বস্তু বাস্তব উপস্থাপনা—বাস্তবিক।

(২১) **"রিজিয়োনালিজিম্"** (Regionalism)

বিশেষ প্রদেশের অধিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি,—তার প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি রূপ দেওয়ার ঝোঁক।

(২২) **"রোমান্টিসিজিম্"** (Romanticism)

'রোমান্টিক শব্দটি এসেছে—প্রাচীন ফরাসী—'রোমাঞ্চ' কথাটা থেকে, ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে—"রোমাঞ্চের মতো" এই অর্থে ইংরেজি সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেই ফরাসীতে—'Romantique' শব্দটা প্রচলিত ছিল। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শব্দটি একাডেমি-কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে শব্দটি—বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক প্রবণতা অর্থে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু এত বিচিত্র অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে যে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা তৈরী করা সম্ভব হয়নি। রোমান্টিক প্রবণতাকে 'বিষয়বস্তু', "লেখকের মনোভঙ্গী" এবং "রচনানীতি"র ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে। গঠনরীতির বিচারে রোমান্টিক এবং ক্লাসিকাল বিভাগ ঐক্য-বিধি (unity) মানা না-মানার ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে।

(২৩) **সেন্টিমেন্টালিজিম্** (Sentimentalism)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। আদর্শ ও নীতি নিয়ে

আবেগোচ্ছ্বাসের অনুচিত আতিশয্য দেখানো। অনুচিতের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই—আবেগোচ্ছ্বাস—'আদিখ্যেতা' বলে মনে হয়।

(২৪) **স্যুররিয়েলিজিম্** (Surrealism)

ত্রিস্তান জারা—প্রবর্তিত। 'ডাডাইজিমের'ই বিশেষ পরিণতি। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ব্রেটন স্যুররিয়েলিজিমের ইস্তাহার প্রচার করেন। সংজ্ঞান-নির্জ্ঞান স্তর নিয়ে মনের সে সমগ্রতা—উপলব্ধির এককতা, সেই সমগ্রতা বা এককতা প্রকাশ করার দিকেই স্যুররিয়েলিস্টদের ঝোঁক। ফ্রয়েড, হেগেল ও মার্কস—এই তিন জনের প্রেরণা নিয়ে মতবাদটির জন্ম। ফ্রয়েড থেকে এসেছে—নির্জ্ঞান বা অবচেতন মন উদ্‌ঘাটনের প্রবণতা, হেগেল থেকে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সংস্কার এবং মার্কস থেকে এসেছে—"সোসালিস্ট রিয়েলিজিমে"র আবেগ।

(২৫) **সিম্বলিজিম্** (Symbolism)

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে—"Figaro"তে ইস্তাহার ঘোষিত হয়। এই রীতিতে শব্দ—বস্তু-সত্য, রূপ-সত্য বা চিন্তাসত্য ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় না—প্রযুক্ত হয় বিশেষ একটি মানসিক অবস্থাকে ব্যক্ত করবার জন্য। এ রীতিতে রূপের স্বতন্ত্র মহিমা নেই, ভাবই মুখ্য লক্ষ্য—রূপ ভাবের সংকেত মাত্র।

(২৬) **ট্র্যান্‌সেনডেণ্টালিজিম্** (Transcendentalism)

পরমাত্মা, আত্মা, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতির দেশকালাতীত পারমার্থিক সত্তা আছে—এই বিশ্বাসে আস্থা এবং সেই হিসাবে বাস্তববাদ-বিরোধী বিশেষ ধরনের ভাববাদ। দৈবসত্তায় এবং দিব্য অনুভূতিতে বিশ্বাস এই মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এমার্সন (১৮৮৬), গ্রে (১৯১৭) প্রমুখ এই মতবাদের প্রধান পৃষ্টপোষক।

(২৭) **আলট্রাইজিম্** (Ultraism)

বিংশশতাব্দীর বিশেষ এক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী—মানবতাবাদের বিরোধী। মানুষের অন্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য—এ মতবাদে স্বীকৃত নয়। মানুষ সমস্ত জগৎ-প্রবাহের সঙ্গে এক হয়ে আছে এবং একই নিয়মের অধীন।

(২৮) **ইউন্যানিমিজিম্** (Unanimism)

এমন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী যাতে মানুষকে কেবলমাত্র ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয় না—দেখা হয় বিশেষ গোষ্ঠীর একজন হিসাবেই—বিবর্তনশীল মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তি হিসাবেই। এই দৃষ্টিতে মানুষের ইতিহাস—নানাগোষ্ঠীর অভিযোজনের ইতিহাস—গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্কের, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ইতিহাস। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। যুদ্ধের পরে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য বাড়ায় এর প্রাধান্য কমে। এখন এই সংস্কার বেশ প্রবল।

(২৯) **ভর্টিসিজিম** (Vorticism)

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে, শিল্পী উইন্‌ধাম লিউইস কর্তৃক উদ্‌ভাবিত। আমেরিকার কবি-সমালোচক এজরা পাউণ্ড মহাশয় এই দলে যোগদান করেন। এঁদের আসল লক্ষ্য কি তা' স্পষ্ট করে বলা হয়নি—তবে এই মতবাদীরা নেচারালিজিম, ইম্প্রেশানিজিম এবং ফিউচারিজিমের—বিশেষতঃ ফিউচারিজিমের বিরোধী।—"The new vortex plunges to the heart of the present"-এঁদেরই বিঘোষিত সিদ্ধান্ত। ইমেজিজিমেরই স্বগোত্র।

উল্লিখিত মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—সংখ্যার দিক দিয়ে বহু হলেও, কয়েকটি মৌলিক প্রবণতাই নানা বেশে এবং নানা নামে আপনাকে প্রকাশ করছে। শিল্পকর্মকে বিশ্লেষ করলে দুটো মূল উপাদান পাওয়া যায়—এক বিষয়, দুই উপস্থাপনা বা প্রকাশ-রীতি। সব ইজিমেরই উদ্ভব এই দুই উপাদানকে কেন্দ্র করে। কোন ইজিমে বা মতবাদে—বিশেষ ধরনের বিষয়ের জন্য, কোন মতবাদে বিশেষ ধরনের প্রকাশরীতির জন্য প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের বিষয়ের চাহিদা রীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, কোন ক্ষেত্রে আবার বিশেষ ধরনের রীতির প্রতি আসক্তি উপযুক্ত বিশয খুঁজে নেওয়া প্রেরণা যুগিয়েছে। যা'হোক এই সব মতবাদের স্বরূপ বা পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এখানে তার অবকাশও নেই। এখনকার কাজ—এই মতবাদগুলির মধ্যে কোন কোনটির আভাস বা অস্তিত্ব পোয়েটিক্‌সে পাওয়া যায় তা' খুঁজে দেখা।

সাহিত্য-বিচারে,—সব চেয়ে পুরানো দ্বন্দ্ব,—বলা যেতে পারে—বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব এবং এরিস্টটলের অনেক আগেই এ দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে। গ্রীসদেশে শিল্প-সাহিত্যের যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে, তার তাৎপর্য যাই হোক, জগতের এবং জীবনের রূপকে যথাসম্ভব যথাযথভাবে উপস্থাপিত করাই যে শিল্পের উদ্দেশ্য এই কথাটাই বড় হয়ে আছে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই যে বাস্তববাদের মূল সংস্কারটি নিহিত আছে—এ কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই দেখা যায়, এরিস্টফেনিসের "দি ফ্রগ্‌স্" নামক কমেডি নাটকে, ঈস্কিলাস-ইউরিপিডিসের মুখে যমালয়ে যে সাহিত্য-বিচারের অবতারণা করা হয়েছে, তাতেই প্রথম বাস্তবিকতা ও কাল্পনিকতার ধর্ম নিয়ে প্রথম কথা উঠেছে। ঈস্কিলাসের বিরুদ্ধে ইউরিপিডিসের প্রধান অভিযোগ হয়েছে এই—যে, ঈস্কিলাস এমন সব উদ্ভট কল্পনা করেছেন (যেমন—flying-stages, griffin horses) এমন বাগাড়ম্বর দেখিয়েছেন, যা' স্বাভাবিক জগতে দেখা যায় না। ইস্কিলাসের সাহিত্য—'puffed and pampered with pompous sentences and terms a cunbrous huge virago'. অন্য পক্ষে তাঁর নিজের সাহিত্যে রয়েছে—'plain household phrase'—তাঁর 'scenes and sentiments agreed with truth and Nature'. লক্ষণীয়, ইউরিপিডিসের প্রধান লক্ষ্য—'truth and Nature'. আমাদের পরিভাষায়—বাস্তবতা। কাল্পনিকতার অভিযোগের বিরুদ্ধে উত্তর দিতে উঠে ঈস্কিলাস কবির সামাজিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—এবং যা' ঘটেছে নির্বিচারে তাকেই রূপ দেওয়া—এবং অতি যথাযথভাবে রূপ দেওয়াই যে কবির কাজ নয়—সে কথাও জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। তাঁর বক্তব্য—যে বিষয় রূপ দিলে সমাজের ক্ষতি হয়—সমাজের নৈতিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, সে সমস্ত বিষয়—যত বাস্তবই তা' হোক—প্রকাশ করা উচিত নয়। যে বিষয় ও উপস্থাপনা, সমাজের উন্নতির পথে অন্তরায় তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। সাহিত্য সমাজের কাম্য আদর্শকে পুষ্ট করবে—তবেই তার মহত্ব। মোটকথা সাহিত্য যথাযথ-অনুকরণ নয়, আদর্শায়িত অনুকরণ। ঈস্কিলাসের উক্তির মধ্যে আদর্শবাদের মূল কথাটি পাওয়া যাচ্ছে।

ইউরিপিডিসের কথায়, বাস্তবতার চাহিদার যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যেই বাস্তবতার স্বরূপ-লক্ষণটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছে। বাস্তব সাহিত্যের বিষয়কে যেমন কাল্পনিক হলে চলবে না, বিষয়ের উপস্থাপনাকেও তেমনি অসঙ্গত হলে চলবে না। ঘরে-বাইরে যে সব ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে, বাস্তব-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে সেই সমস্ত ঘটনাই, আর উপস্থাপনা—ঘটনা-বিন্যাস চরিত্র-সৃষ্টি, ভাবের অভিব্যক্তি ভাষার যোজনা—সব কিছুই হবে—'agreed with truth and Nature'—অর্থাৎ সুসঙ্গত—সমুচিত। এই দিক থেকে বাস্তবতা একদিকে কাল্পনিকতার বিপরীত, অন্যদিকে—আদর্শবাদের বিপরীত।

এরিস্টটলের মধ্যেও এই সংস্কার পাওয়া যায়। উপস্থাপনা-রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—রীতি দুই রকমের হতে পারে—এবং উপস্থাপনা যথাযথ—'as they are'-এর এবং অন্য উপস্থাপনা আদর্শায়িত—'as they ought to be' উপস্থাপনা। সফোক্লিস যে জীবন রূপ দিয়েছেন—তা' 'as they ought to be' আর ইউরিপিডিসের উপস্থাপ্য জীবন—'as they are', 'as they ought to be'—অর্থ এমন রূপ যা'—'true to life নয়—'as they are' নয়—যেমনটি সচরাচর দেখা যায় তেমনটি নয়—বেশ একটু কল্পনা মিশিয়ে আদর্শের ছকে ফেলে বড় ক'রে দেখানো। এরই নাম আদর্শায়ন (Idealisation)।

উপস্থাপনায় বাস্তবিকতার আবশ্যকতা এবং গুরুত্ব এরিস্টল খুব ঐকান্তিক ভাবেই বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। বৃত্ত-গঠনে 'irrational'-কে বর্জন করতে বলে, অতি প্রাকৃতকে বহির্ভূত করার নির্দেশ দিয়ে, ঘটনাবিন্যাসে—'necessity or probability'র নিয়ম মেনে চলার উপদেশ দিয়ে এবং চরিত্রকে সর্বতোভাবে—'true to life' করতে বলে—ভাবে-ভাষায় 'consistent' হতে বলে—এরিস্টটল প্রচলিত বাস্তববাদী সংস্কারকেই ব্যক্ত করেছেন। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে চরিত্রের 'true to life' হওয়া যে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক এক ধর্ম—goodness, propriety consistency প্রভৃতি ধর্ম থেকে 'distinct thing'—এ কথা এরিস্টটল বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করেছেন।

এও লক্ষ্য করবার যে—এই উল্লেখের গুরুত্ব আজও পর্যন্ত সম্যকভাবে উপলব্ধ হয়নি। বাস্তবতা যে রস ও রূপের সামঞ্জস্য ছাড়াও রচনার স্বতন্ত্র এক ধর্ম এবং রসনিষ্পত্তির সঙ্গেও তার নিবিড় যোগ আছে—এ কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য। 'সামঞ্জস্য' কাল্পনিক বিষয়ের উপস্থাপনায় থাকতে পারে, আদর্শায়িত উপস্থাপনাতেও যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে পারে, কিন্তু উপস্থাপনা যথার্থ বাস্তব হতে পারে তখনই যখন বিষয় হয় লৌকিক বা সামাজিক (rational) এবং প্রকাশ হয়—বাস্তবিক (true to life)। বস্তু, ভাব, ভাষা, ঘটনা—সব কিছুরই সত্যতার বা ঔচিত্যের সমবায়ে—রচনা যথার্থ বাস্তব হয়ে উঠে। এরিস্টটলের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বাস্তবতার এই ধারণাই পাওয়া যায়। পাওয়া যায়—সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য (coherence) থাকলেই রচনা বাস্তব হয়ে উঠে না, বাস্তবতায় coherence-এর সঙ্গে 'Correspondence'-ও থাকা চাই। জীবনের সঙ্গে অর্থাৎ অভিজ্ঞাত জীবনের সঙ্গে, মিল (Correspondence) আছে কি না 'true to life' কিনা এটাই বাস্তবতা-বিচারে বড় কথা। এ কথা মনে রাখা দরকার—এরিস্টটলের কাছে সেই বিষয়ই real—যা 'irrhtional' অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত নয় কাজেই অবিশ্বাস্য নয়। সেই চরিত্রই 'true to life'—যার সঙ্গে লৌকিক জীবনের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

যে রচনা serious হতে চায়, তাকে 'irrational' বিষয় বর্জন করতে হবে—যথাসম্ভব—'true to life'—চরিত্র অঙ্কন করতে হবে, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করে এরিস্টটল রসনিষ্পত্তিতে যে বাস্তবতার একটা অংশ আছে তার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরিস্টটলের পরে এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা না হয়েছে এমন নয়, তবে তাকে যথেষ্ট আলোচনা বলা চলে না। কাল্পনিক বিষয় এবং অসঙ্গত উপস্থাপনা দ্বারা রসনিষ্পত্তি—একরকমের হতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সুষ্ঠু বা নিবিড় রসাস্বাদন যে সম্ভব নয়, এরিস্টটল তা' ধরেছেন। তিনি দেখেছেন—কাল্পনিকতা বিষয়ের গুরুত্ব নষ্ট করে এবং ঘটনার অসামঞ্জস্য চরিত্রের ভাব-ভাষার অসঙ্গতি উপস্থাপনার গুরুত্ব নষ্ট করে। ফলে, অনৌচিত্য—সে বিষয়েই থাক আর উপস্থাপনাতেই থাক, রচনার গুরুত্বের—তথা রসেরও পরিপন্থী হয়ে পড়ে।

রসনিষ্পত্তির সঙ্গে বাস্তবতার কোন অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে কি না—এ প্রশ্নটি খুবই একটি জটিল প্রশ্ন। সম্প্রতি Harold Osborne—তার 'Aesthetics and Criticsm' গ্রন্থে (১৯৫৫) প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যেহেতু গান রচনায়, প্রাসাদ-নির্মাণে এবং চিত্রাঙ্কনে বাস্তবতার উপর শৈল্পিক উৎকর্ষ নির্ভর করে না এবং যেহেতু গান, চিত্র প্রভৃতিও শিল্প সেইহেতু শিল্পের পক্ষে বাস্তবতা আবশ্যক কোন উপাদান নয়। অর্থাৎ বাস্তবতা না থাকলেও শিল্প বড় শিল্প হয়ে উঠতে পারে এবং এক শিল্পের ক্ষেত্রে যা সত্য সব ক্ষেত্রেইই তা সত্য। ওস্‌বোর্ন মহাশয়ের মন্তব্যকে আমরা সেই সব বিশুদ্ধ কলাকৈবল্যবাদীর সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে পারি যাঁরা চিত্র বলতে বুঝেন—রঙ ও রেখার খেলা এবং সাহিত্য বলতে বুঝেন—ভাব ও কল্পনার বিচিত্র ভাষাবিহার—সব রকমের 'imaginative imprabilities'। যাঁরা এ দৃষ্টিতে শিল্পকে দেখেন না, তাঁরা অবশ্যই ওসবোর্ন মহাশয়ের কথায় সায় দেবেন না। তারা এরিস্টটলের নির্দেশ মেনেই চলবেন—স্বীকার করবেন—রসকে বিষয়-নিরপেক্ষ, রূপনিরপেক্ষ কোন কিছু বলে মনে করা ঠিক নয়; বিষয়ের বাস্তবতা-অবাস্তবতা, উপস্থাপনার বাস্তবিকতা, রসনিষ্পত্তিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করে। কোনক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বেশী, কোন ক্ষেত্রে কম।

কারণ, উপস্থাপ্য বিষয়ের প্রকৃতি ও রচনার রীতি অনুসারে বাস্তবতার চাহিদা তথা নিয়ন্ত্রণ কম বেশী হয়ে থাকে। বিষয় যেখানে—পৌরাণিক বা অতিকাল্পনিক, এরিস্টটলের ভাষায় "as they are said or thought to be", সেখানে ঘটনা "true to fact" কিনা—এ প্রশ্ন মনে আসে না এবং আসে না বলেই রস নিষ্পত্তিতে বাস্তবতার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তারপর, বিষয় যেখানে লৌকিক এবং উপস্থাপনা ভাবতান্ত্রিক (idealistic) অর্থাৎ বিষয়ের 'as they are'—রূপ প্রকাশ না করে "as they ought to be'—রূপ প্রকাশ করা হয়, সেখানে বিষয়ের লৌকিকত্বের জন্যই বাস্তবতার চাহিদা স্বাভাবিক কারণেই দেখা দেয়; কিন্তু এই রচনায় মানুষের আদর্শায়িত রূপ উপস্থাপিত—এই ধারণা সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে বলে, বাস্তবতার চাহিদা

তত ঐকান্তিক এবং সর্বব্যাপী হতে পারে না। কিন্তু বিষয়বস্তু যেখানে —"man as they are" সেখানে—ঘটনা চাই "True to fact"—চরিত্র চাই—"true to life" অর্থাৎ ভাবে-ভাষায় যথাযথ—যেমনটি-দেখা-যায়-তেমনটি। বাস্তবতার চাহিদা এখানে যেমন ঐকান্তিক তেমনি সর্বাত্মক। সর্বাঙ্গীন বাস্তবতা না পেলে রসবোধ ক্ষুণ্ণ হয়।

কিন্তু সর্বাত্মক বাস্তবতা সবক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। প্রায় ক্ষেত্রেই আংশিক বাস্তবতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। হয়তঃ কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু—জীবনের সমস্যা হিসাবেই বাস্তব, কিন্তু এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে তাকে কোন মতেই বাস্তবিক বলা চলে না—বলতে গেলে বলতে হয়—"ভাবতান্ত্রিক" (idealistic) অথবা "সাংকেতিক" (Symbolic)। এরূপ ক্ষেত্রে রচনাকে বাস্তব বলা হবে কি না সেও এক মহাসমস্যা। Piet Mondrian এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেছেন—তা' উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে—"Abstract art is therefore opposed to a natural representation of things. But it is not opposed to nature as it is generally thought. বলা বাহুল্য—মণ্ড্রিয়ানের সিদ্ধান্ত মানতে গেলে, বাস্তবতা অর্থাৎ সাংকেতিক রচনাকেও বাস্তব বলে মানতে গেলে, বাস্তবতা খুঁজতে হবে শুধু বিষয়বস্তুর মধ্যেই এবং এই সিদ্ধান্তই করতে হবে যে, যে রচনার "বিষয়বস্তু" বাস্তব—অর্থাৎ "sense of reality"—সম্মত, সেই রচনাই বাস্তব।

তবে "বিষয়বস্তু"র গণ্ডীর মধ্যে বাস্তবকে গুটিয়ে নিয়ে আসলে তার অনেকখানি মর্যাদাই যে নষ্ট হয়ে যায়—তাও ভেবে দেখা দরকার। সুতরাং এই কথাই মানতে হবে—সর্বাত্মক বাস্তবতার পক্ষে, বিষয়বস্তুর বাস্তব হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি উপস্থাপনার বাস্তবিকতাও কম আবশ্যক নয়। উপস্থাপনার বাস্তবিকতা বাস্তবতার অন্যতম সর্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য অন্যদিক থেকে বিষয়বস্তুর বাস্তবতার মধ্যে বাস্তবতার সন্ধান করতে নিষেধ জানিয়েছেন। তাঁর আপত্তি এখানেই—যে বিষয়বস্তুর মধ্যে বাস্তবতা খুঁজতে গেলে, চিরন্তন বাস্তব সাহিত্য বলে

কোন সাহিত্যকে পাওয়া যাবে না; কারণ বিষয়বস্তুর বাজার দর উঠানামা করে বলেই বাস্তবতার মাত্রাও স্থির মাত্রায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না— এককালের বাস্তব সাহিত্য অন্যকালে অবাস্তব হয়ে পড়বে। তারপর একের কাছে যে বিষয় বাস্তব বলে মনে হবে, অন্যের কাছে তা অবাস্তব হবে। এক কথায় বাস্তবতা যুগসাপেক্ষ—ব্যক্তিসাপেক্ষ হয়ে আপেক্ষিক হয়ে উঠবে— সাহিত্যের অনিত্য ধর্মে পরিণত হয়ে পড়বে।

বাস্তবতাকে নিত্য ধর্মে পরিণত করতে গিয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ— অবশ্য রসবাদীরা অনেকেই—সাহিত্যের নিত্যবস্তু রসের মধ্যেই বাস্তবতার লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এঁদের ধারণায়—বস্তুর বাজার দর উঠা-নামা করলেও রস (aesthetic pleasure) নিত্য সত্য, সুতরাং যা রসোত্তীর্ণ তাই চিরন্তনকালের জন্য বাস্তব। বলা বাহুল্য এই ধারণায় রসোত্তীর্ণতা ও বাস্তবতা এক হ'য়ে গেছে—যা বিশেষ ধর্ম তা' সামান্য ধর্মে পরিণত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে—যা' রসোত্তীর্ণ তাই যখন বাস্তব এবং যা' রসাত্মক তাই কাব্য, কাব্যমাত্রেই বাস্তব। সুতরাং 'where every-thing is true nothing is true'—অনুসারে, বাস্তব বলে কোন কিছুই নেই। অবশ্য এ সিদ্ধান্তের ভূমিতে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। দেখেছেন —এককালের রস অন্যকালে ফিঁকে হয়ে যায়—অর্থাৎ রসেরও বাজার দর উঠানামা করে—আস্বাদ সমান থাকে না। সুতরাং রসের সদ্ভাব থাকলেই সাহিত্য বাস্তব—এ ভূমিতেও দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

রসের ভূমি থেকে সরে গিয়ে তিনি নতুন এক ভূমিতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এই ভূমি—"চরিত্রে"র (character) ভূমি। তাঁর সিদ্ধান্ত হয়েছে—চরিত্রের প্রাণবত্তার মধ্যেই বাস্তবতার আসল লক্ষণ পাওয়- যায়। ব্যক্তি চরিত্রের তথা জীবনের অভিব্যক্তির মধ্যেই—অর্থাৎ Expression-এর মধ্যেই বাস্তবতা নিহিত। প্রকাশ যেখানে "Convincing"—সেখানেই বাস্তবতা। যাকে অঙ্গীকার না করে উপায় নেই—তাইতো "Convincing" এবং তাই বাস্তব।

রস বা নিছক ভাবাবেগ-আস্বাদজনিত আনন্দকে বাস্তবতার প্রমাণ

হিসাবে না দেখে এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশের মধ্যে বাস্তবতার লক্ষণ নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ যদিও খানিকটা মূল ধারণার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন তবু ভাববাদী দর্শনের প্রভাব—সম্পূর্ণ কাটাতে পারেননি। বাস্তব জগতের সাথে সারূপ্য-যোগ বা সাযুজ্য-যোগ না থাকলে, এক কথায় Correspondence না থাকলে, রচনা বাস্তবতা দাবী করতে পারে না—এ সিদ্ধান্তে পৌছতে তিনি পারেননি। তাঁর কাছে—(ভাববাদীদের সকলেরই কাছে)—বাস্তবতার প্রমাণ—"Internal Consistency", "Conformity with the actual"—নয়।

এখানে একটা কূট তর্ক উঠতে পারে—উঠে থাকেও—সাহিত্য-শিল্প প্রকৃতির আরশি নয়—প্রতিলিপি মাত্র নয়, সাহিত্য—শব্দ-সংকেতে, রূপ কল্পনার মাধ্যমে জীবনের উৎলব্ধিকে প্রকাশ করা। সুতরাং—"The only criterion of plausibility which you can apply is the criterion of internal consistency"—(I. A. Richard). সাহিত্য-শিল্প যেহেতু সাংকেতিক প্রকাশ আদর্শান্বিত অনুকরণ, যথাযথ বাস্তব হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সাহিত্যের জগৎ কল্পনার কৃত্রিম জগৎ—সংক্ষেপে অলৌকিক জগৎ। লৌকিক জগতের সঙ্গে মিলিয়ে তার মূল্য যাচাই করতে গেলে চলবে কেন? তা' করতে যাওয়াই ভুল। সাহিত্য কখনই extra replica of real actuality" হতে পারে না। সঙ্গতিতে (Correspondence) নয়, সামঞ্জস্যের (Co-herence or internal Consistency) মধ্যে তার সত্য নিহিত। আর সত্য যখন সঙ্গতির মধ্যে নিহিত নয়, তখন—বাস্তবতার কোন প্রশ্নই উঠে না। এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে—তাতে গলদ আছে। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন—সাহিত্য প্রকৃতির যথাযথ বা যান্ত্রিক অনুকরণ নয়, এ কথাও মানতে হবে—সাহিত্য কল্পনাময় সৃষ্টি। কিন্তু কল্পনাময় রচনা আর কাল্পনিক রচনা এক নয়। দুটোকে এক অর্থে ব্যবহার করার মধ্যে যুক্তির গলদ আছে। রূপকথা যেমন কল্পনার সৃষ্টি, নভেলও তেমনি কল্পনার সৃষ্টি বটে। কিন্তু রূপকথাকে বিশেষ কারণে কাল্পনিক বলা হয় এবং বিপরীত কারণেই নভেলকে বলা হয় বাস্তবকল্প

রচনা। রূপকথাকে কাল্পনিক সৃষ্টি বলা হয় এই কারণেই যে—রূপকথার পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ-পরিস্থিতি, পাত্রপাত্রীর আচরণ কোনটাই আমাদের "sense of reality"—বাস্তবতাবোধকে তৃপ্ত করে না। নভেল সাধারণতঃ এই বাস্তবতাবোধকে তৃপ্ত করে বলেই নভেলকে বলা হয়—বাস্তব রচনা। এই "sense of reality"-র সঙ্গে সঙ্গতি থাকলেই বিষয়বস্তুকে বলা হয় বাস্তব এবং উপস্থাপনকে বলা হয় বাস্তবিক (realistic)। "Sense of reality"—জন্মে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে এবং বাস্তব জগৎ-সম্পর্কিত ধারণা থেকে।

সুতরাং বাস্তববোধের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার অর্থ—অভিজ্ঞাত বস্তু এবং ধারণার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখা—মোটামুটি—"Correspondence" আছে কিনা তাই হিসাব করা। 'True to life'—কিনা এ বিচার—শেষ পর্যন্ত 'Correspondence'-এর হিসাব—"internal consistency"-র হিসাব নয়। কারণ রূপকথাতেও "internal consistency" থাকে—শুধু থাকে না —"Correspondence with reality", অবশ্য 'Correspondence' কথাটিকে এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হচ্ছে। আভিধানিক অর্থে 'Correspondence' বলতে বুঝায়—বাস্তবিক কোন বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে নামে-ধামে-ধর্মে-কর্মে হুবহু মিল। যাকে বলা হয়—"Realy true"। এখানে —শব্দটিকে লাক্ষণিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং 'probably true' এই অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ উপস্থাপিত জীবনের Corresponding reality আছে এ কথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই—যে জীবনের রূপ দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে দেওয়া হয়েছে তা' সংসারে সম্ভব। এইবার এরিস্টটলের কথা স্মরণ করে উপসংহার করা যাক—বাস্তবতা (reality) এবং "propriety" ও "Consistency"—এক বস্তু নয়—বাস্তবতা "distinct thing"— অর্থাৎ বাস্তবতার হিসাব—শেষ পর্যন্ত উপস্থাপনার বাস্তবিকতার মাত্রার হিসাব।

তবে উপসংহারে আর একটা কথাও বলা দরকার—বাস্তবতা অবাস্তবতা ব্যক্তির বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ—অর্থাৎ আপেক্ষিক, এ কথা ভুলে

গেলে চলবে না। অলৌকিক জগৎ যাঁর কাছে সত্য, অতি প্রাকৃত যাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রকৃত, তার কাছে অলৌকিক ঘটনা অতি প্রাকৃত সত্তা অবাস্তব নয়। এই কারণে, একের কাছে যা' অবাস্তব, অন্যের কাছে তা' বাস্তব বলে প্রতিভাত হতে পারে। উপস্থাপনার বাস্তবিকতা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। অভিজ্ঞতা থেকেই ঔচিত্য-বোধ গড়ে উঠে। তাই, পরিস্থিতির ঔচিত্য কায়-মনো-বাক্যের ঔচিত্য—সব ঔচিত্যের শেষ আপীল অভিজ্ঞতারই কাছে। সুতরাং অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক বলে—"বাস্তবতা"—আপেক্ষিক। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বাস অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সঙ্গে বাস্তবতার সংস্কারও বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

পরিশিষ্ট

(ক) "মাইমেসিস"কে শিল্পের নির্দোষ বৈশেষিক লক্ষণ বলা চলে কি ?

(খ) শিল্পের প্রেরণা হিসাবে—অনুকরণ বৃত্তি এবং "ছন্দ-সুষমা-বৃত্তি।

(গ) Art is more philosophical than History—ব্যাখ্যা

(ঘ) 'ক্যাথারসিস্'

(ঙ) বৃত্ত ও চরিত্রের প্রাধান্য সম্পর্কে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত।

(চ) ট্র্যাজেডি ও করুণরসাত্মক নাটক

(ছ) ট্র্যাজেডির নায়ক

(ক) "মাইমেসিস"কে শিল্পের নির্দোষ বৈশেষিক লক্ষণ বলা চলে কি ?

"মাইমেসিস"কে শিল্পের 'বৈশেষিক লক্ষণ ব'লে স্বীকার করা চলে কি না —এই প্রশ্নটি একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার এবং তা আলোচনা করতে গেলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিচার ক'রে করতেই হবে।

(১) "মাইমেসিস" শব্দটির খাঁটি অর্থ কি ?

(২) মাইমেসিস"-এর সঙ্গে কল্পনার (ইমাজিনেশান) এবং ক্রোচে-কথিত প্রতিভানের (ইণ্টুইশান), এক কথায়—সৃজনশীল কল্পনার কোন পার্থক্য আছে কি না ? মাইমেসিস রূপকল্পনার চেয়ে ব্যাপকার্থক শব্দ কি না ?

(৩) 'মাইমেসিস' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে—অর্থাৎ কল্পনার সমার্থক বলে গ্রহণ করলেও, রূপকল্পনাকে (ইমেজ-মেকিং) শিল্পের সার্থক বৈশেষিক লক্ষণ বলা চলে কিনা। সংগীতের ও গীতি কবিতার ক্ষেত্রে তার অব্যাপ্তি দেখা যায় কি না ? শিল্পের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মাইমেসিসের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কি না।

(৪) আনন্দবাদ, সৌন্দর্যবাদ, রসবাদ, সঞ্চারবাদ, প্রদর্শনবাদ, সমীক্ষাবাদ, সংবাদবাদ প্রভৃতি মতবাদগুলির সঙ্গে 'মাইমেসিসের' কোন মৌলিক বিরোধ আছে কি না।

বলা বাহুল্য এই প্রশ্নগুলি বিচার শেষ করবার আগে প্রশ্নটির উত্তরে হাঁ বা না কিছুই বলা সম্ভব নয়, কিন্তু বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করতে গেলে যে অবকাশ আবশ্যক তা এখানে পাওয়া যাবে না।

এখানে আমি শুধু পথ-নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হব।

'মাইমেসিস' শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে তা' থেকে এই সারটুকু সংগ্রহ করা যেতে পারে যে 'মাইমেসিস-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ "ইমেটেশান"-এর এবং বাংলা প্রতিশব্দ "অনুকরণ"-এর সংকীর্ণতা থাকলেও, 'মাইমেসিস' শব্দটি সংকীর্ণ অনুকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এবং পোয়েটিক্‌স-গ্রন্থেই তার বহু প্রমাণ আছে। 'শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ' অধ্যায়ে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি—ক্রোচে যাকে "মেকানিকাল ইমিটেশান" বলেছেন—মাইমেসিস সেই ধরনের কোন 'যান্ত্রিক

অনুকরণ' নয়। গ্রীক শব্দ "poiein" (যা থেকে পোয়েট্রি কথাটা এসেছে) যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই ব্যাপকতর "মেকিং অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে, এবং কল্পনা বা সৃজনশীল কল্পনার সঙ্গে "মাইমেসিস"-এর নামগত পার্থক্য থাকলেও তাৎপর্যগত কোন পার্থক্য নেই। মাইমেসিস-ব্যাপারটি—একদিকে সম্ভব বস্তুর বা পরিদৃশ্যমান বস্তুর যথাযথ (as they are) উপস্থাপন, অন্যদিকে সম্ভাব্যের (as they ought to be) উদ্‌ভাবনা, একদিকে বস্তুর বা ব্যক্তির রূপকল্পনা অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবাবেগের স্বরূপটি বস্তুতঃ প্রকাশ করবার চেষ্টা। এরিস্টটল খুব জোর দিয়েই বলেছেন—মাইমেসিস কোন-কিছু সম্বন্ধে মনন বা তত্ত্বচিন্তা করা নয়, কোন কিছুর বিবরণ মাত্র নয়—বিশেষ বস্তুকিঞ্চিৎ-এর রূপ নির্মাণ, বস্তুস্বরূপকে প্রকাশ করার চেষ্টা। এই বস্তু কিঞ্চিৎ শুধু যে বস্তুই হবে এমন কোন কথা নেই, ব্যক্তি-জীবন এবং ভাবাবেগও এই 'বস্তুকিঞ্চিৎ'-এর মধ্যে অন্তর্গত।

মাইমেসিস-এর প্রথম এবং শেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—রূপ-বৈলক্ষণ্য—রূপ গড়ার ক্ষমতা—বস্তুকে স্বরূপতঃ ব্যক্ত করার চেষ্টা। এই দিক থেকে দেখলে —'মাইমেসিস'-বাদ রূপকল্পনা-বাদেরই রকমফের মাত্র।

অবশ্য রূপকল্পনা শব্দটি এখানে আমি ব্যাপক অর্থেই প্রয়োগ করছি, 'রূপ' বলতে শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য দৈশিকসত্তাসম্পন্ন বস্তুকেই ধরছিনে, অর্থাৎ সাধারণতঃ "ইমেজ" কথাটা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে ব্যবহার করছিনে। "ইমেজ-মেকিং" শব্দটিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্র অর্থে ব্যবহার করলে এ কথা বলতেই হবে—মাইমেসিস "ইমেজ-মেকিং"-এর চেয়ে ব্যাপকতর অর্থের অধিকারী। সে শুধু বস্তুর ইমেজ (প্রতিরূপ) সৃষ্টিই করে না, ভাবাবেগের অদৃষ্টিগ্রাহ্য স্বরূপকেও শব্দ-সংকেতের সাহায্যে অনুকরণ করতে—ভাবাবেগের অনুরূপ রূপ গড়তে—চেষ্টা করে। সংগীতের রাগ-রাগিণী সৃষ্টিকে আমরা "ইমেজ-মেকিং" বলতে পারি কি না, ভেবে দেখার কথা বটে, কিন্তু তাদের আমরা অবাধেই ভাবের অনুকরণ বলতে পারি— —ধ্বনি সংকেতে ভাবাবেগের উপলব্ধ সত্তাটিকে অনুকরণ তথা প্রকাশ করবার চেষ্টা হিসাবে দেখতে পারি। তারপর গীতি-কবিতার ক্ষেত্রেও সবক্ষেত্রে

"ইমেজ-মেকিং" (কথাটি আগেই বলেছি—সংকীর্ণ অর্থে) বৈশেষিক লক্ষণ হতে পারে কিনা এ সন্দেহ জাগতে পারে। বিশেষতঃ সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে কোন আবেগকে নিরাভরণ রূপে অর্থাৎ বিনা উপমা উৎপ্রেক্ষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে; যেখানে রূপকল্পনার চমৎকারিত্ব দেখানোর চেয়ে একটি বিশেষ আবেগকেই শব্দার্থের সাহায্যে—ব্যক্ত করবার প্রয়াস ফুটে উঠে।

অবশ্য, 'ইমেজ-মেকিং'কে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে অর্থাৎ—ইমেজ দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং শ্রুতিগ্রাহ্য—দুই রূপেই সম্ভব, একথা স্বীকার করলে, ভাবাবেগের ধ্বনিময় রূপকেও 'ইমেজ' বলে গণ্য করলে—"ইমেজ-মেকিং" শেষ পর্যন্ত—মাইমেসিস-এর সমগোত্রীয় ব্যাপার হয়েই দাঁড়াবে—form making ও mimesis making-একই ব্যাপারে পরিণত হবে, 'ইমেজ-মেকিং' বলতে শুধু চিত্ররচনাই বুঝাবে না, ভাব-সংকেতনও বুঝাবে। এই প্রসঙ্গে "এস্থেটিকস্ এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম, গ্রন্থের রচয়িতা হেরোলড ওসবোর্ন মহাশয়ের একটি উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য—Art as semantic এর সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"In the context of a general theory of semantics it does then seem moderately sensible to say that both literary art and representational visual art are mimetic ; both communicate experienced situations real or imaginal by means of symbols, literature mainly by means of conventional symbols and visual art mainly by natural symbols. Nor does it seem so completely nonsensical as before to say that literature imitate that which it describes" মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে আধুনিকদেরও কোন কোন সম্প্রদায় শিল্পকে 'অনুকরণ' বলে স্বীকার করেছেন—স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—শিল্প আসলে বস্তুসংকেতে অথবা শব্দ-সংকেতে বাস্তব পরিস্থিতির অথবা কাল্পনিক পরিস্থিতির অনুকরণ। বাস্তবিক, শিল্পকে যতক্ষণ আমরা কোন বিষয়ের প্রকাশ বলে মনে করব, শুধু প্রকাশ মাধ্যমের কৌশলপূর্ণ

প্রয়োগ বলে মনে করব না, ততক্ষণ অনুকরণবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে না।

কল্পনার ও প্রতিভানের সঙ্গে মাইমেসিসের পার্থক্য আলোচনা কালে এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য আরো বেশী করে বুঝতে পারা যাবে। সকলেই জানেন—অনুকরণবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে এই একটি মাত্র যুক্তিতেই যে কোন শিল্পই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়, যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং কোন ব্যাপার নয়, শিল্প হচ্ছে—কল্পনাবৃত্তির ব্যাপার, নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির ব্যাপার—অপূর্ব বস্তু নির্মাণের ব্যাপার। কল্পনাবৃত্তির স্বরূপ নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই। এখানে শুধু এই কথাটা বললেই যথেষ্ট হবে যে—মাইমেসিস যদি যান্ত্রিক অনুকরণ না হয় তা'হলে অবশ্যই সে আইডিয়ালাইজড্ অনুকরণ হবে এবং তা' হলে কল্পনার সঙ্গে মাইমেসিসের মৌলিক কোন পার্থক্য থাকবে না। উভয়েরই এক পরিচয়—রূপ-কল্পনাশক্তি। উভয়েই—mental manipulation-এর ক্ষমতা তথা অপূর্ববস্তু নির্মাণের ক্ষমতা। এই রূপ-কল্পনা সবিকল্পক অথবা নির্বিকল্পক মানসিক ব্যাপার এ নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদরা মাথাভাঙ্গাভাঙ্গি করতে পারেন কিন্তু তাতে "রূপ-কল্পনা" ব্যাপারটির গায়ে কোন আঁচড় লাগে না। যেমন, কি কারণে অরলেপ মাটিতে পড়ে, তা' নিয়ে নিউটনের সঙ্গে আইনস্টাইনের শত বাদবিতণ্ডা হলেও, আপেলের মাটিতে পড়া ব্যাপারটি মিথ্যা হয়ে যাবে না। মাইমেসিস রূপকল্পনা—রূপের উপস্থাপনা—নব নব রূপের উদ্‌ভাবনা—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে কি করে মনে সেই রূপের সংগঠন বা সংশ্লেষ ঘটে, সেই রূপ সবিকল্পক বা নির্বিকল্পক সৃষ্টি—এ প্রশ্ন নিয়ে জল ঘোলা করে কোন লাভ নেই। যে প্রশ্নটি এখানে সব চেয়ে প্রধান সেটি এই—'যান্ত্রিক অনুকরণ' অর্থেই 'মাইমেসিস' কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে কি না। এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরেই সব সমাধান নির্ভর করছে। যদি বলি—হাঁ, তবে 'মাইমেসিস'কে কিছুতেই আমরা শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলে স্বীকার করতে পারিনে, আর যদি বলি—না, তবে মাইমেসিসের সঙ্গে কল্পনার (এবং প্রতিভানেরও) মৌলিক কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মাইমেসিসকে কল্পনা বলে মেনে নিলে—ক্রোচের সঙ্গে এরিস্টটলের যে পার্থক্য পাওয়া যাবে সে এই যে এরিস্টটল এবং সাধারণ কল্পনাবাদীরা রূপকল্পনাকে যতখানি সবিকল্পক ব্যাপার বলে স্বীকার করেন, ক্রোচে তা' করেন না, তাঁর মতে প্রতিভান নির্বিকল্পক কল্পনা। এই প্রসঙ্গে ক্রোচের—neither we can will it, nor not will it. কথাটি স্মরণ করলেই যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হবে। মাইমেসিস = রূপ কল্পনা, কল্পনাও = রূপকল্পনা এবং প্রতিভানও = রূপকল্পনা; প্রথম দুইটির সঙ্গে তৃতীয়টির পার্থক্য—কল্পনার নির্বিকল্পকত্ব প্রতিষ্ঠায়। মনে রাখতে হবে—ক্রোচের প্রতিভান—"imaginative knowledge, knowledge through imagination i,e image-making" অর্থাৎ ইন্টুইশানও রূপরচনা (image-making)। প্রতিভান বিশেষের (concrete) জ্ঞান।

এই রূপ পূর্বদৃষ্ট রূপেরই সদৃশ কোন রূপ হোক অথবা অদৃষ্ট বা অপূর্ব বস্তুরই রূপ হোক—স্বরূপে বস্তুরূপই তো বটে।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার—অনুকরণ এবং প্রতিরূপকরণ এই দুটি শব্দের মধ্যে—যে পার্থক্য রয়েছে তা' বিশেষভাবে অনুধানযোগ্য। অনুকরণকে আমরা বলতে পারি—'আইডিয়ালাইজড্ ইমিটেশান'—কোন কিছুর (অভিজ্ঞাত অথবা কল্পিত) রূপের অনুরূপ রূপই রচনা করা। "অনু" = অনুযায়ী বা অনুসারী এবং 'অনুকরণ' অর্থ = কোন বস্তুর অনুযায়ী রূপ বা সদৃশ রূপ রচনা করা। এই অর্থে সৃষ্টিমাত্রেই—অনুকরণ হতে বাধ্য। কারণ, এমন কোন সৃষ্টি নেই—যা' কোন-না-কোন অভিজ্ঞতার সদৃশ নয়। এমন কি যে সব অতি আধুনিক শিল্পীরা শিল্পকে বিশুদ্ধ শিল্পকর্মে অর্থাৎ প্রকাশ মাধ্যম প্রয়োগের কৌশলে পরিণত করতে ব্যগ্র তাঁরাও অনুকরণের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। যত কিম্ভূত-কিমাকার সৃষ্টিই তারা করুন শেষপর্যন্ত তা' কোন-না-কোন বস্তুরই অনুকরণ হয়েছে। চিত্র রচনা করতে যেয়ে যাঁরা জ্যামিতিক ক্ষেত্র রচনা করেন তাঁরাও ক্ষেত্রের সম্ভাব্য রূপ তৈরি করতে তথা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে থাকেন—কোন বস্তুর ধ্যানকে বা উপলব্ধিকে, এক কথায় রূপ-চেতনাকেই ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে থাকেন।

তাঁরা যাই সৃষ্টি করুন বিশেষ বস্তুর কোন না কোন একটির সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সারূপ্য থাকবেই।

পোয়েটিক্‌স গ্রন্থে অনুকরণ শব্দটিকে এরূপ ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই অর্থে অনুকরণ ও কল্পনা (সবিকল্পক এবং নির্বিকল্পক) এক। আমরা দেখছি—এরিস্টটলের মতে—সংগীত গীতিকবিতা, নৃত্য মহাকাব্য, নাটক—সবই অনুকরণ, সব শিল্পই মূলতঃ অনুকরণ—বিশেষকে ব্যক্ত করার চেষ্টা। এ কথা আগে বলেছি যে যে "ইমেজ-মেকিং" কথাটি থেকে মাইমেসিস শব্দটি ব্যাপকতর সংজ্ঞা। 'ইমেজ' শব্দটিতে যেখানে দৃশ্যধর্মিতার প্রাধান্য 'মাইমেসিস'—সেখানে দৃশ্যত্ব শ্রব্যত্ব উভয় ধর্মই নিহিত রয়েছে। সংগীতকে 'ইমেজ-মেকিং' বললে সংগীতের বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করা হয় কি না সন্দেহ, কিন্তু সংগীতকে ভাবের ধ্বনিময় অনুকরণ বললে, অনেক স্পষ্টতর ধারণা করা হয় বলেই মনে করা যেতে পারে। অনুকরণ শব্দটি—প্রাকৃতিক বস্তু, ব্যক্তি এবং ভাব—প্রকাশ্য বিষয়ের সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে সুপ্রযোজ্য কিন্তু রূপ-কল্পনা শব্দটি অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুর এবং ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে যতটা সুপ্রযোজ্য ভাবের ক্ষেত্রে—সংগীতের ক্ষেত্রে এবং আত্মবিষয়ক গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে তত সুপ্রযোজ্য নয়। সে যা' হোক, মাইমেসিসকে কল্পনার বা প্রতিভানের সমর্থক প্রতিপন্ন করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না রূপকল্পনাবাদের অব্যাপ্তি দোষ আছে কি না—সব সৃষ্টিকেই আমরা অনুকরণ বলতে পারি কিনা, এই প্রশ্নটিও আলোচনা করতে হবে।

এ সম্বন্ধে আগেই খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে এবং তাতে এই কথাটিই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে সংগীত এবং গীতি-কবিতাকে—'image-making' বা অনুকরণ বলা যুক্তিসঙ্গত কি না এই প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধানের উপরেই কল্পনাবাদের এবং অনুকরণবাদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে। ভাস্কর্য ও চিত্র, অনুকরণাত্মক রচনা এ কথা প্রমাণ করতে খুব কষ্ট করতে হয় না। তারপর, বর্ণনাত্মক কাব্য শিল্পকে বা দৃশ্য-কাব্যকেও আমরা সহজ অনুকরণ বলে চালিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয় তখনই যখন "গীতি-কবিতা'কে—কবির আত্মগত ভাবের অভিব্যক্তিকে

অথবা সংগীতের রাগ-রাগিণীকে বা স্বরলিপিকে অনুকরণ বা রূপ-কল্পনা বলে ব্যাখ্যা করবার দায়িত্ব এসে ঘাড়ে চাপে। রামপ্রসাদের—

মাগো, আমার এই ভাবনা।
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম
কোথায় যাব নাই ঠিকানা।—

এই গানটিকে—'image-making' বা "mimesis-making"এর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা চলে কি? চল্‌লে এই কথাই বলতে হবে যে—গীতি-কবিতা এই অর্থেই অনুকরণ যে প্রত্যেক গীতি-কবিতায় ব্যক্তি বিশেষের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে আমরা একটি বিশেষ ভাবানুভূতির সামান্য রূপটিকেই ব্যক্ত বা অনুকৃত হতে দেখি। বলতে হবে—রামপ্রসাদের ঐ গানটিতে রামপ্রসাদ নামক ব্যক্তির উপলব্ধির মারফৎ। ব্যক্তি জীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি বিশেষ অবস্থা অনুকৃত হয়েছে—রামপ্রসাদ ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে সার্বজনীন একটি ভাবেরই অনুরূপ রূপ গডবার চেষ্টা করেছেন। এই ভাবটি ব্যক্তি-আবেগের রূপ নিয়ে আত্মগত ভাবে ব্যক্ত হলেও আসলে একটি সার্বজনীন সামান্য ভাব; রামপ্রসাদ নিমিত্তমাত্র হয়ে ঐ সামান্য ভাবটিকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। একদিক থেকে দেখলে যা' আত্মপ্রকাশ বা সৃষ্টি, অন্যদিক থেকে দেখলে তাই অনুকরণ—ব্যক্তি উপলব্ধির ভিতর দিয়ে ভাবেরই রূপ-কল্পনা। রামপ্রসাদ তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা আবেগকে প্রকাশ করবার জন্য যে শব্দার্থ প্রয়োগ করেছেন, তারা শুধু রামপ্রসাদেরই আবেগকে প্রকাশ করেনি—বিশেষ ভাবের উদ্দীপক অনুকারী হয়ে রয়েছে বলেই গীতিকবিতা পদবাচ্য হয়েছে। গীতিকবিতায় আমরা ব্যক্তিগত আবেগের আধারে মানবিক সামান্য আবেগেরই বিচিত্র রূপ দেখতে পাই—এবং সেই অর্থেই গীতিকবিতাকে আবেগের অনুকরণ বলা যায়। সংগীত কোন অর্থে অনুকরণ—তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—বাইরের দিক থেকে যা সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, এই সাতটা ধ্বনির বিচিত্র ঠাট, আসলে তা' আবেগেরই সমর্থ সংকেত, আবেগেরই অনুকরণ। সমস্ত তান বিস্তার ঐ মূল ভাবাবেগটিরই বিচিত্র অভিব্যক্তির ধ্বনি-সংকেত।

(গ্রন্থকারের "শিল্পতত্ত্বের"র কথা দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য এতখানি ব্যাপক অর্থে 'অনুকরণ' শব্দটিকে কেউই ব্যবহার করতে রাজি হবেন না। বিশেষ করে গীতিকবিতাকে ভাবের অনুকরণ বলে মেনে নিতে, অনেকেই আপত্তি করবেন আর এ কথাও সত্য যে এই ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করলে—নতুন সৃষ্টি বলে কোন কিছু থাকবে না, বা থাকলেও তা সূক্ষ্ম অনুকরণ ব্যাপারেই পর্যবসিত হয়ে যাবে। সূক্ষ্ম অনুকরণ বললাম এই কারণে যে অপূর্ব রূপ-কল্পনাকে—নতুন নতুন রূপের উদ্‌ভাবনাকে—স্থূল—অনুকরণ—দৃষ্টবস্তুর যথাযথ অনুকরণ—বলতে সকলেই কুণ্ঠিত হবেন, এ কথা ঠিক, কিন্তু এ কথাও সকলকে মানতে হবে যে যেহেতু নতুন নতুন সৃষ্টিও শেষ পর্যন্ত বস্তুর বা ভাবের অনুরূপ রূপের কল্পনা এবং অনুরূপ রূপ কল্পনা মানেই অনুকরণ, অপূর্ববস্তুনির্মাণও শেষ পর্যন্ত—অনুকরণ—সূক্ষ্ম অনুকরণ—চেতনায় সম্ভাব্য বস্তুরূপের বা অব্যক্ত ভাবাবেগের আদর্শ রূপের প্রতিভাসন। বলা বাহুল্য, এই ধারণা প্লেটোর ভাববাদী চিন্তার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। এবং এই ধারণা অনুসারে প্রকাশন ও অনুকরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ রূপ গড়তে বা প্রকাশ করতে গেলেই রূপের অনুকরণ করতে হবেই। সুতরাং বিষয়কে ব্যক্ত করতে যাওয়া আর বিষয়ের অনুকরণ করা একই কথা। উপসংহারে আমরা এই কথাই বলব—কল্পনাবাদকে আমরা যদি সত্য মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি, তা' হলে মাইমেসিসকেও শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়। আর একটি কথা বলেই এই আলোচনা শেষ করছি। আনন্দবাদ রসবাদ সৌন্দর্যবাদ প্রভৃতি মতবাদের সঙ্গে মাইমেসিস-বাদের কোন বিরোধ নেই। বরং অন্যান্য মতবাদ যেখানে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ-দুষ্ট, মাইমেসিস-বাদ সেইখানে যথেষ্ট পরিমাণে নির্দোষ। (শিল্পতত্ত্বের কথা—দ্রষ্টব্য)। বস্তুজগৎ, ব্যক্তি জীবন এবং ভাবজগৎ—সব সকিছুই মাইমেসিসের বিষয় হতে পারে এবং তা পারে বলেই মাইমেসিসবাদ শিল্পের সব ক্ষেত্রেই সুপরিব্যাপ্ত।

(খ) শিল্পের প্রেরণা

শিল্পের প্রেরণা সম্বন্ধে এরিস্টটল যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা কতখানি সমর্থনযোগ্য—এই প্রশ্নটি বিশেষ আলোচনা দাবী করতে পারে। সেই আলোচনা করতে হলে প্রথমতঃ আমাদের দেখতে হবে—শিল্পের প্রেরণা হিসাবে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত বর্তমানে প্রচলিত ও স্বীকৃত আছে এবং দ্বিতীয়তঃ বিচার করতে হবে—সেই সব ধারণা থেকে এরিস্টটলের ধারণার কোন মৌলিক পার্থক্য আছে কি না। প্রচলিত সিদ্ধান্তের পরিচয় দিতে যেয়ে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আজকাল দৈবপ্রেরণাবাদকে পণ্ডিতরা কেউই স্বীকার করেন না এবং প্রচলিত ধারণার তালিকায় প্রকাশ-বৃত্তি, সৌন্দর্য-বোধ এবং সঞ্চার-বৃত্তি—এই তিনটিই প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। শিল্পীরা সৃষ্টি করেন কেউ বলেন প্রকাশের প্রেরণায়, কেউ বলেন সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায়, কেউ কেউ বলেন—সঞ্চার করার প্রেরণায়। প্রকাশের প্রেরণা ও সঞ্চার করার প্রেরণাকে আমরা যদি মোটামুটি একই প্রেরণা বলি তা' হলে প্রচলিত ধারণা হয় মোট দুটি—একটি প্রকাশন তথা সঞ্চারণ বৃত্তি অন্যটি—সৌন্দর্যবোধ। প্রথমটির বক্তব্য এই যে শিল্পীরা নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ না করে পারেন না বলেই শিল্পের সৃষ্টি হয়, আর দ্বিতীয়টির বক্তব্য এই যে শিল্পীরা রূপকার বটে কিন্তু তাদের আসল লক্ষ্য—রূপকে সুন্দর করে তোলা। ছন্দে-লয়ে সুষমায় রূপকে উপভোগ্য বা দর্শনীয় করে তোলা। তথা সৌন্দর্যতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা সুন্দর রূপ সৃষ্টির আবেগেই শিল্পী রচনা করেন—সৌন্দর্যবাদীদের মুখ্য সিদ্ধান্তই এই।

এবার দেখা যাক এরিস্টটলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির ঐক্য বা পার্থক্য কোথায়। এরিস্টটল বলেছেন—শিল্পের প্রেরণা দুটি বৃত্তি—(১) অনুকরণ বৃত্তি (২) সঙ্গতি বোধ বা সুষমা বোধ। অনুকরণ বৃত্তিকে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে—অভিজ্ঞতার অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টি করা—চেতনায় উপলব্ধ কোন কিছুর অনুরূপ রূপ তৈরি করা। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই দেখা যাবে—অনুকরণ প্রকাশনেরই নামান্তর। একটা বস্তু অনুকৃত হচ্ছে অথচ প্রকাশিত হচ্ছে না এমন ঘটনা সম্ভব নয়। অনুকরণ করতে গেলেই

প্রকাশ করতে হবে। এই দিক থেকে দেখলে, যার নাম অনুকরণ বৃত্তি তারই নাম প্রকাশ বৃত্তি এবং তারই নাম সঞ্চার-বৃত্তি। সুতরাং এরিস্টটল যখন শিল্পের প্রেরণা হিসাবে—অনুকরণ বৃত্তির নাম করেন তখন মিথ্যা কিছু বলেন না। দ্বিতীয়তঃ ছন্দ ও সুষমা বোধকে প্রেরণা রূপে গণ্য করায়, সৌন্দর্য বোধ ও প্রেরণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সৌন্দর্যের তত্ত্ব নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটি কথা স্মরণ করাতেই হবে এবং সেই কথাটি এই যে—সৌন্দর্য-বোধ সুষমা বোধেরই নামান্তর।

সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা আসলে কোন বস্তুরূপকে সুষমামণ্ডিত করারই চেষ্টা—বাস্তবরূপে, 'রিদিম এণ্ড হারমনি' সৃষ্টির চেষ্টা। এরিস্টটল মনে করেছেন—শিল্পী একদিকে যেমন মনের অভিজ্ঞতা বা ধ্যানকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে থাকেন অন্যদিকে সেই প্রকাশকে—সুষমামণ্ডিত করতে সচেষ্ট থাকেন। এই দুই চেষ্টার সমন্বয়ে শিল্পের সৃষ্টি সম্ভব হয়। শিল্প শুধু রূপ কল্পনাই নয়—সুষম বা সুন্দর রূপ কল্পনা। অতএব এ সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তি সঙ্গত যে শিল্প সৃষ্টির মূলে দুটি বৃত্তি কাজ করছে—একটি প্রকাশের আবেগ অন্যটি প্রকাশকে সুন্দর করবার আবেগ। বলা বাহুল্য, এরিস্টটলের ভাষা পুরানো হলেও, সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তার কোন অনৈক্য নেই। বরং এই কথা বলাই ঠিক যে প্রচলিত ধারণা যত একদেশদর্শী, এরিস্টটলের ধারণা তত একদেশদর্শী নয়।

('শিল্পের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য—অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(গ) শিল্প ও ইতিহাস

"Art is more philosophical than History" এই উক্তিটি করে শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়ে এরিস্টটল নৈয়ায়িক প্রতিভার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমতঃ তিনি 'তত্ত্ব-চিন্তা' বা শাস্ত্র থেকে শিল্পকে পৃথক করেছেন এবং তা' করতে যেয়ে দেখিয়েছেন—'শাস্ত্র প্রকাশ করে—'ইউনিভার্সাল'কে—সামান্যকে

—নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বকে আর শিল্প ব্যক্ত করে—'পার্টিকুলার'কে—বিশেষের রূপকে —'বিশেষ'কে। কিন্তু এ কথা বলাই যে সংজ্ঞা নির্ণয়ে যথেষ্ট নয়, সে বিষয়েও তিনি সঙ্গে সঙ্গে অবহিত হয়েছেন। দেখেছেন—শিল্প পার্টিকুলারকে রূপ দেয়, একথা বললে শিল্পের সংজ্ঞা ইতিহাস-জাতীয় রচনাতে অতিব্যাপ্ত হয়ে যায়। কারণ ইতিহাসও তো বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বর্ণনা করে থাকে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করে থাকে। সুতরাং ইতিহাস থেকে শিল্পকে পৃথক করতে না পারলে, শিল্পের নির্দোষ সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব হবে না। এই কাজ করতে যেয়েই এরিস্টটল বলেছেন—ইতিহাস রূপ দেয় 'বিশেষ'কে আর শিল্প রূপ দেয়—বিশেষের আকারে 'সামান্যকে' অর্থাৎ ইতিহাস শুধু যা ঘটেছে তারই বর্ণনা করে কোন 'আইডিয়া'কে ব্যক্ত করবার জন্য ঘটনার পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করে না। 'অন্যপক্ষে শিল্প যে 'বিশেষ'কে রূপ দেয় তার ভিতর দিয়ে একটি আইডিয়াকে (সামান্যকে) ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে এক কথায়—শিল্প ঘটনাগুলি অর্থাৎ বিশেষকে—'আইডিয়ালাইজ্‌' করে—আদর্শায়িত করে। বিশেষের আদর্শায়নই—শিল্পের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য এবং সেখানেই শিল্প ইতিহাস থেকে পৃথক। যেহেতু বিশেষের মাধ্যমে সামান্যকে ব্যক্ত করা শিল্পের উদ্দেশ্য, শিল্প বিশেষের সামান্যীকরণ যেহেতু—শিল্প 'আইডিয়ালাইজ' করে এবং আইডিয়ালাইজ করা এবং 'ফিলসোফাইজ করা একই কথা, সেই হেতু শিল্প ইতিহাসের চেয়ে অধিকতর দার্শনিকতাপূর্ণ রচনা'।

(ঘ) ক্যাথারসিস্‌

'ক্যাথারসিস' শব্দটির অর্থ নিয়ে—বিশেষ করে through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions বাক্যাংশটি তাৎপর্য নিয়ে বহু বাদ-বিতণ্ডা হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে। এ বিষয়ে গবেষণা করে সেদিন আমাদের বাংলাদেশরে জনৈক অধ্যাপক—সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীরামেন্দ্র কুমার সেন ডি. লিট উপাধি পেয়েছেন।

এত বাদবিতণ্ডার বা গবেষণার অবকাশ এরিস্টটল নিজেই করে দিয়ে গেছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা বিশ্লেষণের সময় তিনি আর সব কথারই ব্যাখ্যা করেছেন, শুধু—'ক্যাথারসিস্' কথাটি বাদ দিয়ে গেছেন ; ফলে পণ্ডিতরা তাদের ভাষ্যবৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের একটা সুন্দর সুযোগ পেয়েছেন। বেচারা এরিস্টটল! তিনি হয়তো মনে করেছিলেন—কথাটি এত স্পষ্টার্থক যে টীকা যোজনা করার কোন অর্থই হবে না, তার সব ছাত্রই শব্দটির অর্থ জানে—এবং জানা কথার ব্যাখা দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু হায়! আজ সেই কথাটি কি ঝড়ই না তুলেছে। কি অর্থে কে শব্দটি গ্রহণ করেছেন তার ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যেই দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি তার পুনরাবৃত্তি করব না। এখানে আমি শুধু একটি বিষয়েই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করব।

অনেকেই স্বীকার করেছেন—শব্দটি চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরিভাষা এবং "মানসিক পরিশোধন" অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। এঁদের ধারণা এরিস্টটল বলতে চেয়েছেন ট্র্যাজেডি ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনার অনুকরণের দ্বারা আমাদের মনে ভয় ও শোচনা জাগায় তথা কুপ্রবৃত্তিকে রচিত ও প্রশমিত করে এবং সামাজিক ব্যক্তিদের নৈতিক মান উন্নত করে। কেউ কেউ বলেছেন—কুপ্রবৃত্তিকে নিষ্কাশিত করে তা' নয়, ট্র্যাজেডি ভয় এবং শোচনা এই দুই বৃত্তির আতিশয্য থেকে মনকে মুক্ত করে এবং তার দ্বারা সামাজিক মানুষকে দৃঢ়চেতা, সাহসী ও বীর করে তোলে। ট্র্যাজেডির ভয়ংকর ঘটনা দেখে ভয় ভেঙ্গে যায় এবং শোচনীয় ঘটনা দেখতে দেখতে শোচনার প্রবৃত্তি কমে যায়—স্পর্শকাতরতা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে ব্যক্তিচরিত্রে দৃঢ়তা ও সাহস আসে। তারপর যাঁরা ট্র্যাজেডিকে মানসিক বিকারের দাওয়াই হিসাবে ব্যবহার করতে চান না, থিয়েটারকে "হাসপাতাল" বলতে চান না—তাঁরা "ক্যাথারসিস" শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। কেউ বলেছেন—'ক্যাথারসিস' হচ্ছে ভয় ও শোচনা এই দুই ভাবের শৈল্পিক আনন্দে বিপরিণত হওয়া ভয় ও শোচনা যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আনন্দে পরিণত হয় সেই বিশেষ প্রক্রিয়াটি। এঁদের মতে—ক্যাথারসিস ভাব মোচনের সাহায্যে মানসিক পরিশোধন নয় অথবা মনে ভয় ও শোচনায় সঞ্চার করে শোচনায়

প্রতিষেধ তৈরি করা নয়, "ক্যাথারসিস"—একটি শৈল্পিক প্রক্রিয়া—ভয় ও শোচনার রূপান্তর গ্রহণের ব্যাপার—আনন্দে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া।

কেউ বলেছেন—ক্যাথারসিস আসলে ভয় এবং শোচনা এই দুই প্রতিমুখী ভাবাবেগের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে ভারসাম্যে পৌছানো—অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রশমন। ভয় বিকর্ষণ ধর্মী শোচনা আকর্ষণ ধর্মী—এই দুই বিপরীত ধর্মী আবেগের উদ্রেক ঘটায় মনে যে বিক্ষোভ জাগে, শেষ পর্যন্ত সমন্বয়ের মধ্যে সেই বিক্ষোভের উপশম হয়—মন শান্ত হয়। এই শান্তির নামই ক্যাথারসিস্।

শেষোক্ত সম্প্রদায়টি ক্যাথারসিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যেও অস্পষ্টতা কম নেই। তাঁরা যতটা 'ক্যাথারসিস' ব্যাপারের স্বরূপ বিচার না করেছেন—তার চেয়ে বেশী করেছেন ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনা দেখে আনন্দ হয় কেন?—এই বহু প্রাচীন সমস্যার আলোচনা। ট্র্যাজেডির আনন্দ যে ক্যাথারসিস জনিত আনন্দ নয়, ট্র্যাজেডি জনিত আনন্দের স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে এরিস্টটল যা' বলেছেন তা' থেকেই অনায়াসে অনুমান করা চলে। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—ট্র্যাজেডির আনন্দ ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনার অনুকরণ দেখার আনন্দ—'that which comes from pity and fear through imitation। অনেক স্থলেই তিনি আনন্দের কারণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু কোন স্থলেই তিনি 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। সুতরাং আমরা এ কথা বলতে পারিনে যে তিনি ভয় ও শোচনার আনন্দে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটিকেই ক্যাথারসিস বলেছেন। তারপর এ কথাও বলা চলে না—ভয় ও শোচনা দুই প্রতিমুখী ভাবাবেগ। অন্ততঃ এরিস্টটল যে সেই অর্থে গ্রহণ করেননি, তা' তাঁর নিজের ব্যাখ্যা থেকেই জানা যায়। অতএব, যাঁরা দুই প্রতিমুখী ভাবের সমন্বয় বা ভারসাম্যকে ক্যাথারসিস বলতে চান, তাঁরা এরিস্টটল থেকে অনেক দূরেই আছেন। আর এ কথাও বলা চলবে না যে দর্শকরা নায়কের ভাবদ্বন্দ্বের সঙ্গে একাত্মক হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হন এবং নাটকের উপসংহারে নায়কের দ্বন্দ্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে শান্তি পান।

তাই যদি না হয়, তবে প্রশ্ন উঠবে—কেন ঐ কথাটি তিনি বললেন? 'effecting proper purgation of these emotions'—ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত করলেন কেন? ট্র্যাজেডি ভয় ও শোচনার 'ক্যাথারসিস' করবে—এ কথা না বললে কি ক্ষতি হতো?

(এ কথা হয়তো সত্য যে এরিস্টটল ক্যাথারসিস শব্দটি চিকিৎসা-শাস্ত্র থেকে গ্রহণ করেছেন এবং 'রেচন' অর্থেই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাই বলে এ কথা সত্য নয় যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে 'রেচন' ক্রিয়া যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ট্র্যাজেডির ঘটনাগুলি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। একথা সকলেই মানবেন যে ট্র্যাজেডি—অভিনয়ের নৈতিক প্রভাব আছে, নায়কের ভয়ংকর কাজ ও নিদারুণ পরিণাম দেখে দর্শকের চিত্ত পরিশোধিত হয়—অতি অল্পক্ষণের জন্য হলেও হয়। কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে ট্র্যাজেডি আমাদের মন থেকে ভয় ও শোচনা-জনিত বিকারকে নিষ্কাশিত করে। ভয় ও শোচনা নিশ্চয়ই কোন বিকার নয়। কারণ আমরা জানি—শোচনা জাগে অনুচিত দুঃখ দুর্ভোগ দেখে আর ভয় জাগে আমাদের মতো কোন লোকের শোচনীয় বিপত্তি দেখে। এই দুটি বৃত্তিকে নিশ্চয়ই আমরা অসামাজিক বৃত্তি বলতে পারিনে। একথা বলতে পারিনে যে—সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি ভয় ও শোচনা রূপ আধিতে ভোগে, ট্র্যাজেডি ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনার অভিনয়ের ভিতর দিয়ে পরোক্ষ ভাবে সেই ভয় ও শোচনার মোক্ষণ ঘটিয়ে থাকে। আর এ কথাও বলা সাজে না—ভয় ও শোচনা এই দু'টি প্রবৃত্তি মানুষকে সুস্থ নাগরিক হতে দেয় না, সামাজিক ব্যক্তিকে দুর্বল ও ভীরু করে তোলে, এবং ট্র্যাজেডি ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনার আঘাত সইয়ে সইয়ে মানুষকে নির্ভয় ও শোচনা বিমুখ তথা সবল ও সাহসী করে তোলে।

এখন, চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা—এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বাদ দিলে বাকী থাকে—শৈল্পিক ব্যাখ্যা। কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে—লুকাস প্রমুখ সমালোচকরা ক্যাথারসিস শব্দটিকে ভয় ও শোচনার আনন্দে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ঐ অর্থে গ্রহণ করার বাধা কোথায় আগেই বলেছি এবং এখানেও বলছি—ট্র্যাজেডির-আনন্দ যে ভয় ও শোচনা-

ভাবের পরিণমন-জনিত আনন্দ নয়, এ কথা এরিস্টটল স্পষ্ট করেই বলেছেন। ট্র্যাজেডির আনন্দ প্রথমতঃ—অনুকরণ-উৎকর্ষ দেখার আনন্দ, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের আনন্দ। বাস্তবিকই, ট্র্যাজেডি দেখে যে আনন্দ হয় তা' ভয় ও শোচনার প্রশমন জনিত বা তিরোধান জনিত কোন মানসিক অবস্থা নয়, এবং এই কথাই বলা চলে—ভয় ও শোচনার রেচন যত বেশী হয় তত বেশী আনন্দ হয়। আনন্দের কারণ এই নয় যে ভয় ও শোচনা রূপান্তরিত হয়ে যায়, আনন্দের কারণ ভয় ও শোচনার রূপের আস্বাদন—অর্থাৎ অনুকরণ-চমৎকারিত্ব। সুতরাং লুকাস প্রমুখ সমালোচকগণ যে সিদ্ধান্ত করেছেন তাও গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের সঙ্গে আমি একমত শুধু এখানেই যে আমিও 'ক্যাথারসিস'-ব্যাপারটিকে শিল্পসূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই। আমি বলতে চাই—"effecting" proper purgation of these emotions"—কথাটি এরিস্টটল মানসিক পরিশোধন, নৈতিক উন্নয়ন, চরিত্র-সংগঠন বা ভয় ও শোচনার পরিণমন—এর কোন অর্থেই ব্যবহার করেননি। যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তা'—'he who hears the tale told will thrill with horror and melt to pity'—এই উক্তিটির মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। —ক্যাথারসিস শব্দটি তিনি এখানে সাধারণভাবে রেচন বা উদ্রেক অর্থেই ব্যবহার করেছেন, বলতে চেয়েছেন—ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে দর্শকের মনে ভয়ের শিহরণ এবং শোচনার দ্রবণ উপস্থিত হয়—যাতে ভয় শিহরণের মাত্রায় এবং শোচনা দ্রবীভাবের মাত্রায় পৌছায়। এই মাত্রায় পৌছানোর নামই—"purgation of these emotions"। এই হিসাবে 'ক্যাথারসিস' শব্দটি রসনিষ্পত্তির মাত্রা নির্দেশ করবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এরিস্টটলের শিল্প-চেতনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে গেলে এই সিদ্ধান্তে ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না।

(ঙ) চরিত্র ও বৃত্ত

চরিত্রের এবং বৃত্তের মধ্যে কোন্‌টির স্থান নাটকে বড়—ঐ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। এই আলোচনায় প্রবেশ করলে দেখা যাবে—একদল নাটক রচনায় ঘটনা-বিন্যাসের উপরে বেশী ঝোঁক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যদল জোর দিয়েছেন 'চরিত্রের' উপরে। প্রথম দলের মুখপাত্র হিসাবে আমরা এরিস্টটলকে দাঁড করাতে পারি। বৃত্ত, চরিত্র, রীতি, চিন্তা, দৃশ্য ও গান এই ষডঙ্গের মধ্যে, তাঁর মতে—"most important of all is the structure of the incidents……For Tragady is an imitation not of men but of an action and of ·life and life Consists in action and its end is a mode of action, not a quality. Now character deternmines men's qualities but it is by their action they are happy or the reverse Dramatic action, therefore is not with a view to the representation of character. Character comes in as subsidiary to the actions. Hence the incidents ·and the plot are the end of a tragedy. বিসংবাদের সূত্রপাত এখানেই। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ উঠেছে রেনাসাঁস-যুগে। বিখ্যাত ভাষ্যকার কস্টেলভেত্রো এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদসূচক মন্তব্য করেছেন ;—বলেছেন—চরিত্র ও চিন্তা বাদ দিয়ে যাঁরা ট্র্যাজেডি লিখতে চেষ্টা করেন, তারা মানবজীবনের রূপ আঁকেন না ; কারণ মানুষের আচরণে চরিত্র ও চিন্তাই ব্যক্ত হয়ে থাকে—I fail to see how there could be a good tragedy without character. ভাষ্যকার বোধ হয় মনে করেছেন—এরিস্টটল চরিত্রের প্রয়োজন বা গুরুত্ব স্বীকারই করেননি। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ। আচরণ দেখাতে গেলে চরিত্র দেখাতেই হবে এবং চরিত্র থেকেই আচরণের উৎপত্তি—এ কথাটি এরিস্টটল অস্বীকার করেননি। তিনি অতি স্পষ্টভাষাতেই লিখেছেন—"an action implies personal agents, who necessarily possess certain distinctive qualities both of character and thought ; for

it is by these that we qualify action themselvees and these thought and character—are the two natural causes from which actions spring and on actions again all success or failure depends."—অর্থাৎ কাজের কথা বললেই ব্যক্তির বা কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং এও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হয় যে ঐ ব্যক্তির চিন্তার ও চরিত্রের কতকগুলি বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে। কার্যের বিশিষ্টতা ঐ সব বৈশিষ্ট্যের উপরেই নির্ভর করে; কারণ কার্যের উৎপত্তি হয় চিন্তা ও চরিত্রের উৎস থেকেই এবং কার্যের উপরেই জীবনের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। এরিস্টটলের বক্তব্য এই যে কার্য কর্তা-নিরপেক্ষ কোন ব্যাপার নয়। কর্তা মাত্রই সামাজিক ব্যক্তি; প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশিষ্টতা আছে এবং সেই বিশিষ্টতার কারণ তার বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বভাবের বিশেষ প্রকৃতি। ব্যক্তির স্বভাবের দ্বারাই তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। চরিত্র সমস্ত আচরণের মূলকারণ, আচরণমাত্রই চরিত্রসাপেক্ষ—এ কথা সত্য বটে, কিন্তু নাটকের মুখ্য লক্ষ্য চরিত্রের রহস্য ব্যক্ত করা নয়, মুখ্য লক্ষ্য জীবনের সুখাবহ বা দুঃখাবহ পরিণাম দেখিয়ে রসসৃষ্টি করা। সুখজনক বা দুঃখজনক পরিণাম ঘটে ব্যক্তির আচরণের ফলেই। অতএব চরিত্র-রহস্য অপেক্ষা আচরণ বা ঘটনার দিকেই নাট্যকারকে বেশী এবং সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এরিস্টটল জানতেন—ঘটনা ব্যক্তিজীবনেরই ঘটনা এবং ঘটনার উৎস ব্যক্তিস্বভাব বা চরিত্র সুতরাং চরিত্রনিরপেক্ষ হয়ে কোন ঘটনা ঘটতেই পারে না।

তাঁর বক্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য এই যে নাটকে অর্থাৎ যেখানে নানা ঘটনার সাহায্যে ব্যক্তিজীবনের আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত একটি বৃত্ত রচনা করার চেষ্টা করা হয়, যেখানে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে ব্যক্তিজীবনের সুখাবহ বা দুঃখাবহ পরিণাম সৃষ্টি করা হয়, সেখানে চরিত্রের নিরপেক্ষ বা নিরঙ্কুশ আচরণ দেখানোর অবকাশ থাকে না—ঘটনার কাঠামোর মধ্যে থেকে যতটুকু চরিত্র-রহস্য দেখানো সম্ভব তা দেখিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাঁর বক্তব্যের এই বিশেষ তাৎপর্যটুকু কেউ কেউ উপলব্ধি করেননি বা করেও

উপেক্ষা করেছেন। আবার কেউ কেউ জোরালো যুক্তি তুলে এরিস্টটলকেই সমর্থন করেছেন।

বিখ্যাত সমালোচক উইলিয়াম আর্চার মহাশয় যখন লেখেন—"The story which is independent of character—which can be carried through by a given number of readymade puppets is essentially a trivial thing………… ………… ………… The difference between a live play and a dead one is that in the former characters control the plot, in the latter the plot controls the characters. তখন তিনি চরিত্রের গুরুত্বের উপরেই বেশী দৃষ্টি রাখতে বলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত লক্ষণীয়—যে নাটকে বৃত্ত বা ঘটনা-বিন্যাস চরিত্রদের চালিত করে সেই নাটক মৃত; আর যে নাটকে চরিত্রবল বৃত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই নাটক—জীবন্ত। বলা বাহুল্য ঘটনা ও চরিত্রকে বিশ্লিষ্ট করে দেখার ফলেই আর্চারের মুখ থেকে এই সব কথা বেরিয়েছে।

আবার অন্যপক্ষে ডবলু, টি, প্রাইস মহাশয় লিখেছেন—"Characters in a play can only exist with reference to the action and character can be brought out in no other way than by throwing people into given relations……the plot grows out of character but the plot must be fixed before any use can be made of character." অর্থাৎ কার্য সিদ্ধ করার জন্যই চরিত্রের প্রয়োজন—চরিত্র কার্যাধীন। ব্যক্তিসম্পর্কের ক্ষেত্রে না দাঁড় করিয়ে অন্য কোন উপায়ে চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেখানো সম্ভব নয়। বৃত্ত চরিত্র থেকেই উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু বৃত্ত রচনা না করা পর্যন্ত অর্থাৎ কোন্ ঘটনার পরে কোন্ ঘটনা দিতে হবে তা স্পষ্টভাবে ধারণা না করা পর্যন্ত, চরিত্র-রহস্য ব্যক্ত করার কোন অবকাশই পাওয়া যাবে না। শ্রদ্ধেয় প্রাইস মহাশয়, বলা বাহুল্য, ✓এরিস্টটলের সিদ্ধান্তকেই নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সুবিখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ জন হাউয়ার্ড লসন মহাশয়ও এরিস্টটলপন্থী। এই প্রসঙ্গের

আলোচনা করতে যেয়ে তিনি লিখেছেন—"The theatre is haunted by the supposition that character is an independent entity..." Not only is character, as Aristotle said, subsidiary to the action "but the only way in which we can understand character is through the actions to which it is subsidiary." অর্থাৎ থিয়েটারে চরিত্রকে নিরপেক্ষ মর্যাদা বা গুরুত্ব দেওয়ার দিকে অনেকেরই ঝোঁক আছে। কিন্তু চরিত্র যে কেবল বৃত্তের বা কার্যেরই অধীন, তাই নয়, চরিত্রকে বুঝতে হলেও একমাত্র বৃত্তের অধীন করেই, বা কার্যসাপেক্ষ করেই বুঝতে হবে। কিন্তু অন্যতম নাট্যবিধি-রচয়িতা শ্রদ্ধেয় লাজোস এগ্‌রি মহাশয়, এরিস্টটলের ভাষ্যকার এফ, এল লুকাসের মতোই উগ্র এরিস্টটল-বিরোধী। লসনকেও তিনি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—এরিস্টটলের ভুল সিদ্ধান্তকে সত্য বলে মনে করাতেই লসন ভুলের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খেয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত—Character creates plot not vice versa···no live play ever was or ever will be written without it."—চরিত্রই বৃত্ত সৃষ্টি করে, বৃত্ত চরিত্র সৃষ্টি করে না; কোন জীবন্ত নাটকই বিনা চরিত্রে লেখা হয়নি, কোনকালে লেখা হবেও না। কিন্তু এহেন উগ্র সমালোচক যখন লেখেন—"The moment you decide upon a premise, you and your character become its slave. Each character must feel 'intensely' that the action dictated by the premise is the only action possible,"—তখন তিনি কি চরিত্রকে বৃত্তের অধীন ব'লে মনে করেন না? প্রেমিজ যদি হয়—"thumbnail synopsis of······play"—অর্থাৎ বৃত্তের সূক্ষ্ম শরীর, তা' হলে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে—চরিত্রকে প্রেমিজের অধীন বলে মনে করা আর বৃত্তের অধীন বলা একই কথা। যদি অনেক সিদ্ধান্তের বা উপায়ের মধ্যে characters are permitted to choose only those which will help to prove the premise"—তা' হলে—"characters plotting their own play" কথাটাকে সর্বতোভাবে সত্য ব'লে গ্রহণ করা চলে না। এ কথা

স্বীকার করতেই হয়—চরিত্র প্রেমিজ-মুখাপেক্ষী—প্রেমিজ ও চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচারে শ্রদ্ধেয় এগ্‌রি প্রেমিজেরই তথা বৃত্তেরই প্রাধান্য স্বীকার করেছেন।

আর বাদ-প্রতিবাদ উদ্ধৃত করতে চাইনে। আশা করি, ইতিমধ্যেই পাঠকরা বুঝতে পেরেছেন—খনিকটা অকারণেই যেন পণ্ডিতরা এত কথা কাটাকাটি করেছেন—যাদের পৃথক করে দেখা সম্ভব নয় তাদের পৃথককরে দেখতে যেয়েই ভুলের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। ঘটনা-নিরপেক্ষ চরিত্র এবং চরিত্র-নিরপেক্ষ ঘটনা দুটোই সমান অসৎ। তবে এ কথা যদি সত্য হয় যে চরিত্র-রহস্যের নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি দেখানো—মনস্তত্ত্বের দৃষ্টান্ত তৈরী করা—নাটকের উদ্দেশ্য নয়, নাটকের উদ্দেশ্য চরিত্রের আচরণ ও পরিণাম দেখানো, তা' হলে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে লসনের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যেতে পারে—Character is subordinate to the action, because the action, however, limited it may be, represents a sum of 'given relation' which is wider than the action of any individual and which detrmines the individual actions,"

চরিত্র সমগ্র কার্যের অধীন। কারণ, কার্যটি, (action) যত সীমাবদ্ধই হোক, তা কতকগুলি ব্যক্তিসম্পর্কের বা ব্যক্তি-আচরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে গঠিত 'সমষ্টি' এবং এই সমগ্র ক্ষেত্রটি বিশেষ ব্যক্তি আচরণের চেয়ে অবশ্যই বড় এবং সেই হিসাবে তা' প্রত্যেক আচরণেরই নিয়ন্তা। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের অর্থ এ নয় যে চরিত্র ছাড়াই বৃত্তের পরিকল্পনা করা যায় অর্থাৎ ব্যক্তির সম্পর্ক, সঙ্কল্প, সংগ্রাম এবং পরিণতি না দেখিয়েই বৃত্ত-রচনা করা সম্ভব। প্রতিপাদ্য বাক্য তো সামান্য বচন। প্রতিপাদ্য-বাক্যকে (proposition or premise) ব্যক্তি-জীবনের ঘটনায় পরিণত করতে না পারা পর্যন্ত ইতিবৃত্ত বা 'নাটকের শরীর'ই তৈরী হয় না। প্রেমিজে তো শুধু কার্যের গতি-পরিণতিই সূচিত হয় না, প্রেমিজের প্রথম পর্বে কেন্দ্রীয় প্রধান চরিত্রের স্বভাবটিও আভাষিত থাকে। যেখানে চরিত্রই নিজের আচরণ দিয়ে নিজের ভাগ্য গঠন করে থাকে, যেখানে চরিত্রের আচরণ সাজিয়ে গুছিয়ে বৃত্ত রচনা

করা হয়, সেখানে চরিত্র ও আচরণকে সম্পূর্ণ পৃথক করে বিচার করতে যাওয়া উচিত কাজ বলা চলে না। এ কথা যেমন অবশ্য স্বীকার্য যে, যেহেতু বৃত্ত-গঠন ঘটনার বিন্যাস—"arrangement of incidents", অতএব বৃত্ত-গঠন ব্যাপারে ঘটনার গ্রহণ-বর্জনের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা দরকার, তেমনি এ কথাও সমান স্বীকার্য যে, আচরণ যেহেতু চরিত্রপ্রসূত এবং আচরণের উপরেই যেহেতু ব্যক্তির গতি ও পরিণতি নির্ভর করে, ব্যক্তির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ঠিক করে নেওয়া বৃত্ত-রচনার প্রারম্ভিক কাজ। অতএব প্রতিপাদ্য-বাক্য গঠন করার পরেই নাট্যকারকে দুইটি বিষয়ে সদা সচেতন থাকতে হবে। একটি বিষয় 'চরিত্র' অন্যটি—ঘটনা বা পরিস্থিতি; এক কথায়, কার্যের বিভিন্ন পর্যায় বা সন্ধি। সংক্ষেপে এই দুই চেতনাকে আমরা 'চরিত্র-চেতনা' এবং 'সন্ধি-চেতনা' বা 'ঘটনা-চেতনা' বলতে পারি। মূল ভাবটি প্রতিপাদিত করবার জন্য যে সব ব্যক্তি ও ব্যক্তি-সম্পর্কের কল্পনা অপরিহার্য নাট্যকারকে অবশ্যই সেই সব ব্যক্তির বিশিষ্টতা অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব (চরিত্র) নির্ধারণ করতে হবে এবং তাদের আচরণ ও পরিণতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে এই সমস্যাটির স্বরূপ বুঝানো যাক। ধরা যাক শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের কথা। ধরেই নেওয়া গেল—নাট্যকারের ইচ্ছা হল একখানি 'ট্র্যাজেডি' লিখবেন এবং ট্র্যাজেডি 'থিম্‌' হবে—উচ্চাকাঙ্ক্ষা। থিমকে প্রতিপাদ্য-বাক্যে পরিণত করলেন—'বেপরোয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণতি সর্বনাশ'। এই বাক্য থেকে 'কার্যের' (action) যে ক্রমপর্যায়ের রূপটি পাওয়া গেল তা এই যে কোন একজন ব্যক্তির মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগবে এবং ক্রমে ক্রমে তা' বাড়তে বাড়তে লোকটাকে বে-পরোয়া করে তুলবে—অর্থাৎ লোকটা নিষ্ঠুর এবং অন্যায় কাজ করে বসবে—পথের সমস্ত বাধা দূর করতে মরিয়া হয়ে উঠবে, আরো অন্যায় কাজ করবে; কিন্তু কাম্য লক্ষ্যে সে পৌঁছতে পারবে না। ভিতরে-বাইরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং প্রতিক্রিয়া প্রবলতর হয়ে তার সর্বনাশ সাধন করবে—ভিতরের এবং বাইরের আক্রমণে সে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

এইভাবে কার্যের ক্রমপর্যায় অনুসরণ করে চললে নাট্যকারকে প্রথমেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগানোর পরিস্থিতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরি-

পূরণের পথে যে বাধা রয়েছে সেই বাধা অপসারণ করবার জন্ম সঙ্কল্প ও চেষ্টা অগত্যা নিষ্ঠুর হত্যাদি ঘটনা কল্পনা করতে হবে, বেপরোয়া নিষ্ঠুরতা প্রতিপাদন করবার জন্য একাধিক হত্যার পাপে ব্যক্তিটিকে লিপ্ত করতে হবে। ক্রমে ভিতরকার ও বাইরের প্রতিক্রিয়ার বিশেষ রূপটি কল্পনা করতে, ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে প্রক্রিয়ার প্রবলতা দেখাতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত ভিতরের বাইরের দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি—অপমৃত্যু—কল্পনা করতে হবে। অবশ্য কার্যের আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত যতগুলি ক্রম বা পর্যায় আছে তাদের রূপ দিতে অবশ্যই নাট্যকার কতকগুলি পাত্রপাত্রী নির্বাচন করবেন। প্রথমতঃ যার ট্র্যাজেডি দেখাতে চান তাকে নির্বাচন করতে হবে—উচ্চকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করার জন্য পার্শ্ব চরিত্র কল্পনা করতে হবে—উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ হাওয়ার পথে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বাধা তাদের কল্পনা করতে হবে—যাদের সাহায্যে ভিতরকার ও বাইরের প্রতিক্রিয়া রূপ দেবেন তাদেরও কল্পনা করতে হবে। এই দিক থেকে দেখলে, নাটক লেখার প্রাথমিক কাজ—প্রতিপাদ্য-বাক্যের ভিতরে বৃত্তের যে 'সূক্ষ্ম শরীরটি' পাওয়া যায়, তাকেই স্থূল ঘটনা-পরম্পরায় সাহায্যে ব্যক্ত করে তোলা; প্রারম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে যাওয়া। অন্যভাবে বললে বলা যেতে পারে, নাটক হচ্ছে একটি ঘটনাতন্ত্র (system of events)। উপসংহারক ঘটনাটি (root-action) যেন সমস্ত ঘটনার পরিণাম-কারণ (final cause)—সেই আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাকে টেনে তুলে নিয়ে আসে (pull করে)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে—নাটক আসলে ক্রমান্বয়সম্পন্ন ঘটনাপরম্পরা এবং চরিত্র বা পাত্র-পাত্রী কার্য উপস্থাপনার উপায় বিশেষ। কার্য-প্রতিপাদন করবার প্রয়োজনেই পাত্র-পাত্রীর পরিকল্পনা, এক কথায়, পাত্র-পাত্রীর পরিকল্পনা বৃত্ত পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

চরিত্র বৃত্ত নিয়ন্ত্রিত করে, না বৃত্ত চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করে—এ প্রশ্নের আলোচনায় আর কালক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। কার্যের সঙ্গে চরিত্রের যোগ যেখানে অবিচ্ছেদ্য, সেখানে কার্য ও চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে মারামারি করা বৃথা শ্রম করা ছাড়া আর কিছুই না।

(চ) ট্র্যাজেডি ও করুণরস

প্রথমতঃ **ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ** নিয়ে সাহিত্য-শাস্ত্রকাররা যে আলোচনা করেছেন তা উপস্থাপিত করা যাক। সকলেই জানেন—ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন—গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পরবর্তী আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ। ট্র্যাজেডির স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার সারাংশ এই :—

ট্র্যাজেডির হচ্ছে "সিরিয়াস একশান"এর অনুকরণ অর্থাৎ সেই সব ঘটনার উপস্থাপনা যা' আমাদের মনে ভয়ের এবং শোচনার উদ্রেক করে—"events inspiring fear and pity"—actions which excite pity and fear"—এই সব ঘটনা তাঁদেরই জীবনে দেখা যায় যাঁরা—have done or suffered something terrible" অর্থাৎ সাংঘাতিক কোন কাজ করেছেন অথবা ভয়ঙ্কর দুঃখযন্ত্রনা ভোগ করেছেন। ট্র্যাজেডি আসলে শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের ও দুঃখদুভোর্গের (misfortune) কাহিনী।—সাংঘাতিক কোন কাজের অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই সেই শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় ঘটুক, অথবা নিয়তির ইচ্ছায় বা ঘটনাচক্রেই ভাগ্যবিপর্যয় ও দুঃখদুর্ভোগ ঘটুক।

ট্র্যাজেডির ঘটনা এমন হওয়া চাই—যা' শুনে বা দেখে পাঠক 'will thrill with horror and melt to pity" অবশ্য "fear and pity"—কে "sepectacular means" দ্বারা উদ্রেক করলে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া হবে না, তেমনি—"Those who employ spectacular means to create a sense of not of the terrible, but only of the monostrous are stranger to the purpose of Tragedy"—অর্থাৎ শুধু দৃশ্যের সাহায্যে যাঁরা ভয়ংকরকে সৃষ্টি করতে যেয়ে বীভৎসকে সৃষ্টি করেন তাঁরা ট্র্যাজেডির খাঁটি রসের স্বরূপ বুঝতে পারেন না। মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে সেই বিশেষ ধরনের "সিরিয়াস এ্যাকশান"—যা ভয়ংকর এবং করুণ।

ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে এরিস্টটলের যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা' এই যে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য "fear and pity"-র উদ্রেক করা ; (fear and pity—

this being the distinctive mark of tragic imitation)। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠবে ট্র্যাজেডি—কি তবে একাধারে ভয়ানক এবং করুণরসের নাটক? অথবা ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসের অথবা করুণরসের দুই রসের নাটক? অন্যভাবে বললে, ট্র্যাজেডি কি ভয় এবং শোচনা দুটি ভাবকেই সমান মাত্রায় উদ্রেক করবে, অথবা কোনটিতে ভয়কে এবং কোনটিতে শোচনাকে মুখ্যভাবে উদ্দীপ্ত করবে। এরিস্টটল বহুস্থলে "fear or pity" ব্যবহার করায় এ কথা যেমন মনে আসতে পারে যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে ভয়ানক অথবা করুণ এই দুই রসের কোন এক রসের নাটক, তেমনি pity and fear ব্যবহার করায় এ কথাও মনে আসতে পারে যে ট্র্যাজেডি একাধারে ভয়ানক ও করুণরসাত্মক নাটক অর্থাৎ ভয়ানকমিশ্র করুণ কিংবা করুণমিশ্র ভয়ানক রসের নাটক। এও এক সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান করতে হলে এরিস্টটল 'fear এবং pity শব্দ দুটি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা অবশ্যই জানতে এবং বুঝতে হবে। শব্দ দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"pity is aroused by the unmerited misfortune and fear by the misfortune of a man like ourselves" অর্থাৎ শোচনা জাগে তখনই যখন কোন ব্যক্তির দুঃখদুর্ভোগ দেখে এই কথা মনে হয় যে ঐ দুঃখদুর্ভোগ ঠিক তার প্রাপ্য নয় এবং ভয় জাগে এই মনে করেই যে আমাদেরই মতো একজন মানুষ এত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। বলা বাহুল্য, ভয় এবং শোচনা উভয়ই জাগে—"misfortune" দেখে—উভয় ভাবই ভাগ্যবিপর্যয়জনিত প্রতিক্রিয়া বিশেষ। আত্মসম্পর্কে চিন্তা থেকে ভয়, ব্যক্তিসম্পর্কে চিন্তা থেকে শোচনা। এরিস্টটল যে ভাষ্য করেছেন তা' গ্রহণ করলে এ কথা মানতেই হবে যে ভয় এবং শোচনা নামতঃ যত পৃথকই হোক আসলে তত পৃথক নয়। ভয় ও শোচনা পরস্পরসম্পৃক্ত—ভয় শোচনারই অন্যতম নিমিত্তকারণ—কারণ প্রত্যেক শোচনার মূলে এই ভয় ভাবটি সক্রিয় থাকে—এই ভয় অনুকম্পার সহজ ভিত্তি।

'ভয়' শব্দটিকে এরিস্টটল যে এই বিশিষ্ট অর্থেই প্রয়োগ করেছেন—তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে যেখানে তিনি 'utter villain' কে নায়ক করতে

নিষেধ করেছেন। সেখানে তিনি এই যুক্তিই দেখিয়েছেন যে—অতি শয়তানের পতন দেখালে নীতিবোধ পরিতৃপ্ত করা যায় বটে কিন্তু ঐরূপ বৃত্ত শোচনা অথবা ভয় উদ্রিক্ত করতে পারে না। ভয়ংকর' শব্দটিকে সাধারণ "ভয়ংকর ঘটনা"র অর্থে ব্যবহার করলে নিশ্চয়ই তিনি এই সিদ্ধান্ত করতেন না; কারণ অতিশয়তানের ক্রিয়াকলাপের এবং পরিণামের ভয়ংকর হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকতে পারে না। শয়তানও can do or suffer something terrible"। কিন্তু এরিষ্টটলের কাছে—utter vallain এর "misfortune"—"neither pitiful nor terrible; তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে অতি শয়তানের পতন দেখে আমরা এ কথা মনে করিনে যে তার পতন—misfortune of a man like ourselves বা তা "unmerited misfortune"। অতিশয়তানকে আমরা "man like ourselves" বলে মনে করিনে—এ কথার তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে শয়তানের উপর আমাদের কোন সহানুভূতি থাকে না এবং তা থাকে না বলেই তার পতনে আমাদের মনে কোন ভয় তথা শোচনা জাগে না। তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে সহানুভূতির যোগ না থাকলে ভয় জাগতে পারে না এবং ঐ ভয় শোচনারই অব্যবহিত ও নিয়তপূর্ব একটি কারণ এবং শোচনা এই ভয়েরই অনিবার্য পরিণতি। এই দিক থেকে দেখলে ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাব—"শোচনা" এবং আমাদের পরিভাষায় ট্র্যাজেডি করুণরসেরই নাটক।

তারপর 'ভয়' শব্দটিকে ভয়ংকর ঘটনা জনিত 'ভয়াবেগ' অর্থে ব্যবহার করলেও এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে ট্র্যাজেডি নিছক ভয়ানক রসের নাটক, কারণ 'utter villain দিয়ে করুণরস সৃষ্টি করা না গেলেও ভয়ানক রস সৃষ্টি করা সম্ভব এবং তা করলে আর যাই করা যাক ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করা যাবে না। অতএব ট্র্যাজেডি যখন মূলতঃ change of fortune বা 'calamity'র ঘটনা তখন তার উপসংহারে ভাগ্যবিপর্যয়ের দৃশ্য বা বিপত্তির রূপ দেখে ভাগ্যহত ও বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ একটি মনোভাব জাগবেই এবং এই বিশেষ মনোভাবটি শোচনাত্মক না হয়ে পারে না। আসল কথা, ট্র্যাজেডির আদিতে মধ্যে অন্তে যত

ভয়ংকর ঘটনাই থাক, ভাগ্যহত বিপন্ন বা বিনিষ্ট ব্যক্তির জন্য শোচনা জাগানোতেই ট্র্যাজেডির সার্থকতা। শোচনানিরপেক্ষ হয়ে ভয় যখন ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব হতে পারে না তখন এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই প্রসঙ্গে জেমস্ জয়েস স্মরণীয়—"the tragic emotion, in fact is a face looking two ways towards terror and towards pity, both of which are phases of it. এবং pity এবং terror শব্দ দুটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"pity is the feeling which arrests the mind in the presence whatsoever is grave in human sufferings and unites it with the human sefferer"—আর—Terror is the feeling which arrests the mind in the presence of whatsoever is grave and constant in human sufferings and unites it with the secret cause" এখানেও দেখা যাচ্ছে—pity এবং terror একই অবস্থার ফল—মানুষের গুরুতর সঙ্কট এবং দুঃখদুর্ভোগ দেখে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। মন "পিটি" অনুভব করে যখন সংকটাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দিকে চায় এবং ভয় অনুভব করে যখন কারণের কথা চিন্তা করে। কারণ—চেতনা ও কার্যচেতনা যেহেতু পরস্পর নিরপেক্ষ নয় এবং ব্যক্তির পরিণামটিই শেষপর্যন্ত মনের কাছে বড হয়ে দেখা দেয়, সেইহেতু ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ শোচনা জাগানোই। এ কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয়ে থাকে যে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত 'শোচনা' জাগানো—মানুষের শোচনীয় পরিণামের বৃত্ত উপস্থাপিত করা, তা' হলে এ সিদ্ধান্তও অনিবার্য যে **ট্র্যাজেডির সঙ্গে করুণ রসাত্মক নাটকের অন্ততঃ স্থায়িভাবের দিক থেকে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।** কথাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং বিশেষ ব্যাখ্যাই দাবী করতে পারে।

ট্র্যাজেডির সঙ্গে করুণরসাত্মক নাটকের সম্পর্ক কি এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক এবং পরিপাটি আলোচনা হয়নি। হয়নি বোধ হয় এই কারণেই যে হিন্দুকলেজে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়ার সময় থেকেই এই ধারণাটি বদ্ধমূল হ'য়ে আছে যে ট্র্যাজেডি-রস সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র একটি রস, জাতীয় সাহিত্য শাস্ত্রকারগণ এ রসের স্বরূপ জানতেন না এবং ট্র্যাজেডির সঙ্গে নব রসের কোনটিরই কোন সম্পর্ক নেই। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই সংস্কারই কাজ করছে এবং করছে বলেই ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপক ও সমালোচকরা 'রসে'র নাম শুনলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন এবং তাঁদের দেখাদেখি বাংলা-সমালোচকরাও নাসিকা কুঞ্চন ব্যাপারে আরো দু' এক ধাপ এগিয়ে যেয়ে থাকেন। এই সমস্ত-কিছুর মূলে রয়েছে—ট্র্যাজেডি এবং করুণরসের স্বরূপ সম্বন্ধে পরিপাটি ধারণার অভাব। সমস্ত গ্রীক ট্র্যাজেডি, এলিজাবেথিয়ান যুগের ট্র্যাজেডি, এবং আধুনিক ট্র্যাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে ট্র্যাজেডির স্বরূপ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তাদের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আমাদের নেই, তেমনি নেই রসের এবং বিশেষতঃ করুণরসের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। সমালোচকরা ভুলে গেছেন যে ট্র্যাজেডি বলতে যেমন কেবলমাত্র "হাই ট্র্যাজেডি"ই বুঝায় না, করুণ রস বলতেও তেমনি শুধু খানিকটা বিলোপোক্তিই বুঝায় না। ট্র্যাজেডিতে যেমন বহুভাবের সংযোগে একটি বিশেষ ভাবকে স্থায়ী করা হয়, করুণরসেও তেমনি বহু অনুভাব সঞ্চারিভাবের সংযোগে একটি ভাবকে ব্যক্ত করা হয়। ট্র্যাজেডিতে যেমন বীর-ভয়ানক-রৌদ্র রসের মাত্রা বেশি মিশে ট্র্যাজেডির দীপ্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে, তেমন করুণরসের নাটকেও অঙ্গরস হিসাবে বীর-ভয়ানক-রৌদ্রাদি রস থাকতে পারে। ভুল ধারণাটির সংশোধন করার অভিপ্রায়েই আমি ট্র্যাজেডির এবং করুণরসাত্মক নাটকের মৌলিক ঐক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এবার **করুণরসের স্বরূপের** কথা বলা যাক। রসবাদের যিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং যিনি প্রথম রসের সংজ্ঞা দিয়েছেন—বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তি"—প্রথম নাট্যশাস্ত্রকার সেই ভরত করুণরসের স্বরূপ এইভাবে নির্দেশ করেছেন :—

অথ করুণো নাম শোকস্থায়িভাবপ্রভবঃ। স চ শাপক্লেশবিনি-পতিতেষ্টজনবিপ্রযোগবিভবনাশবধবন্ধবিদ্রবোপঘাতব্যসনসংযোগাদিভির্বিভাবৈঃ সমুপজায়তে। অর্থ :—করুণের স্থায়িভাব হচ্ছে "শোক" (শোচনা)।

শাপ ক্লেশ বিনিপতিত—ইষ্টজনবিপ্রয়োগ—বিভবনাশ-বধ-বন্ধ-বিদ্রব-উপঘাত-ব্যসন প্রভৃতি নিমিত্ত কারণের ফলে উৎপন্ন হয়। করুণ ত্রিবিধঃ—(১) ধর্মোপঘাতজ (২) অর্থাপচয়োদ্ভব এবং (৩) শোককৃত। ভরতের বিবরণ থেকে জানা গেল—(ক) করুণ রসের স্থায়িভাব শোক বা শোচনা। (খ) তার নিমিত্ত কারণ বা বিভাব নানারকম হতে পারে—যে কয়েকটি বিভাব উল্লিখিত হয়েছে তারা ছাড়াও আরও অন্যান্য যত কারণে শোচনা উপজাত হতে পারে "আদি শব্দ দ্বারা তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোট কথা এখানে এই যে যত কারণে ব্যক্তির জীবনে শোচনীয় ঘটনা ঘটতে পারে তাদের সব কিছুই বিভাব। (গ) করুণ ত্রিবিধ—(১) ধর্মোপঘাতজ করুণ—ধর্মের উপঘাত ঘটায় যেখানে ব্যক্তি-জীবন শোচনীয় পরিণাম লাভ করে, সেখানে ধর্মোপঘাতজ করুণ (২) অর্থাপচয়োদ্ভব করুণ—অর্থের অপচয় ঘটায়—অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও সুখসম্ভোগ থেকে দারিদ্র ও দুঃখ-দুর্দ্দশায় পতিত হওয়ার ফলে যেখানে শোচনা জাগে সেখানে অর্থাপচয়োদ্ভব করুণ এবং (৩) শোক-কৃত করুণ—ইষ্টজন বিপ্রয়োগ ঘটায় যেখানে শোচনা জাগে সেখানে শোককৃত করুণ। বলা বাহুল্য ধর্মোপঘাতজ করুণের পক্ষে অর্থাপচয়োদ্ভব করুণের এবং শোককৃত করুণের প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকবেই। তেমনি অর্থাপচয়োদ্ভব করুণের সঙ্গে শোককৃত করুণেরও পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। এবং এ কথাও বলা বাহুল্য যে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ঘটে অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সংযোগ-বিয়োগের তারতম্যের ফলেই। যে করুণরসে বীর, রৌদ্র এবং ভয়ানক রসের মাত্রা বেশী মিশে থাকে, তার আস্বাদ এবং যাতে নির্বেদ, গ্লানি, চিন্তা, বিষাদ, দৈন্য, জড়তা, আলস্য, বিলাপ, প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব বেশী মিশে থাকে তার আস্বাদ ভিন্ন হবেই। একের আস্বাদনকালে চিত্ত যে পরিমাণে উদ্দীপিত ও শুষ্ক থাকবে, অন্যের আস্বাদনকালে চিত্ত সেই পরিমাণে উদ্দীপিত ও শুষ্ক থাকবে না—বেশ খানিকটা দ্রবীভূত হবে। প্রথম শ্রেণীর নাটক দীপ্তি-গুণপ্রধান ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক দ্রুতিগুণপ্রধান হবে।

এই আলোচনার পরে প্রথমেই যে কথা মনে হবে সে এই যে—ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব এবং করুণরসের স্থায়িভাব যখন একই—ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব—

'pity' এবং করুণরসাত্মক নাটকের স্থায়িভাব—'শোচনা'—তখন উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য সম্ভব তা' হবে উপাদানগত পার্থক্য—অর্থাৎ বিভাবগত এবং সঞ্চারিভাবগত পার্থক্য। কিন্তু প্রশ্ন এই বাস্তবিকই সেরূপ কোন পার্থক্য আছে কি? ট্র্যাজেডির বিভাব বিশ্লেষণ করে যত রকম পরিস্থিতি পাওয়া যায়, করুণরসের বিভাবের তালিকার মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না কি? তারপর যেটা বড় প্রশ্ন—ট্র্যাজেডির সেই বিলক্ষণ লক্ষণটি কি, যা' করুণরসের নাটকে পাওয়া সম্ভব নয়? যা শুধু ট্র্যাজেডিতেই আছে করুণরসের নাটকে নেই? আমরা জানি ট্র্যাজেডির মধ্যে 'what is common to all is the element of Calamity and suffering" (জন এস, স্মার্ট—'ট্র্যাজেডি প্রবন্ধ'), কিন্তু করুণরসের উপাদানও তো ঐ "element of Calamity and suffering"!...তারপর একথাও বলা চলে না যে, ট্র্যাজেডিতে যে অদ্ভুত, ভয়ানক ও রৌদ্র রসাত্মক ঘটনার উপস্থাপনা সম্ভব করুণরসের নাটকে তা' সম্ভব নয়। কারণ, অঙ্গরস হিসাবে করুণরসের নাটকেও ভয়ানক বা বীর ও অদ্ভুত, রৌদ্র রস উল্লেখযোগ্য মাত্রায় থাকতে পারে। তারপর এ কথাও বলা চলে না—যে ট্র্যাজেডির নায়ক সর্বত্র এবং সর্বদাই সবল, সক্রিয় ও সংগ্রামশীল ও অন্যপক্ষে, করুণরসের নায়ক সর্বত্র এবং সর্বদাই দুর্বল, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব এবং পলায়নপরায়ণ। ট্র্যাজেডির নায়কের পতন যে যে কারণে ঘটে, সেই একই কারণে করুণ রসাত্মক নাটকের নায়কের পতন ঘটতে পারে এবং তা পারে বলেই উভয়ের অনুভাব সঞ্চারিত ভাবের মধ্যেও কোন পার্থক্য কল্পনা করা চলে না।

(ছ) ট্র্যাজেডির নায়ক

(ছ) ট্র্যাজেডির নায়ক কে হ'তে পারে এবং কে পারে না—এ বিষয়ে একটু বিশেষ আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। কারণ ট্র্যাজেডিত্ব বিচারের সময় নায়ক-বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে এবং ভুল ধারণার ছিদ্রপথে অনেক পাপ প্রবেশ করে থাকে। ট্র্যাজেডি

ভাগ্যবিপর্যয়ের ঘটনা—এই সিদ্ধান্ত করার পরে এরিস্টটল কোন্ কোন্ ব্যক্তির পতন 'ট্র্যাজিক' পদবাচ্য হবে আর কোন্ কোন্ ব্যক্তির পতন তা' হবে না—তা নিয়ে আলোচনা করছেন। তার নির্দেশ এই—

(ক) অতিধার্মিক ব্যক্তির সৌভাগ্য থেকে দুর্দশার পতনের দৃশ্য দেখাবে না, কারণ তা'তে ভয় বা শোচনা জাগে না, শুধু মনে আঘাতই লাগে।

(খ) অতি শয়তান ব্যক্তির পতনের দৃশ্য দেখাবে না। কারণ তা'তে নৈতিক বাসনা চরিতার্থ হয় বটে কিন্তু ভয় বা শোচনা জাগে না।

(গ) উল্লিখিত দুটি অতিকোটিক চরিত্র বাদ গেলে অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ একটি চরিত্র যে অতি ভাল বা অতিধার্মিক নয়—যার ভাগ্য বিপর্যয় কোন পাপের বা নীচতার ফলে ঘটে না, ঘটে—বুদ্ধিগত বা স্বভাবগত ত্রুটির ফলে।

(ঘ) ব্যক্তিটি অতি বিখ্যাত ও ঐশ্বর্যশালী হবে।

এরিস্টটলের উল্লিখিত নির্দেশ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং অনেকেই ত্রুটি দেখানোর বা মত খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। **প্রথমতঃ নায়কের খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের কথাই ধরা যাক।** নায়ককে বহুখ্যাত এবং ঐশ্বর্যশালী হতে হবে—এ নির্দেশ আজ অচল; কারণ অতিসাধারণ সাধারণ ব্যক্তিকে নায়ক করে বহু ট্র্যাজেডি লিখিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং নায়কের খ্যাতির ও ঐশ্বর্যের মহত্ত্ব আজ আর কোন বিচার্য বিষয় নয়। আজ একমাত্র বিচার্য নায়কের—"greatness of spirit" আছে কি নেই। **দ্বিতীয়তঃ অতিনির্দোষ অতিধার্মিক ব্যক্তির যোগ্যতার প্রশ্নটি।** এরিস্টটল যে যুক্তিতে অতিনির্দোষ বা অতিধার্মিক ব্যক্তিকে বাদ দিতে বলেছেন তার বিরুদ্ধেও কথা উঠেছে। কথা তুলেছেন জন. এস্. স্মার্ট মহাশয়। তিনি প্রশ্ন করেছেন—Is it really true that when we read a work which describes the undeserved sufferings of an innocent man or woman we find it too terrible and lay it aside because we cannot endure it ? এবং প্রশ্নাকারেই উত্তর দিয়েছেন—Is it not rather the case that such descriptions have a peculiar and intense interest of

their own…" বলেছেন—অতিনির্দোষ ও অতিনিরীহের দুঃখদুর্ভোগের কাহিনী পাঠ ক'রে মানুষ আনন্দ পায় তা'র দৃষ্টান্ত—'Four Gospels' সুতরাং এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত যে ঠিক নয় "ফোর গসপেল্‌স"ই তার প্রমাণ। **তৃতীয়তঃ নির্দোষ বা ত্রুটিহীন চরিত্রের যোগ্যতার প্রশ্ন।** এরিস্টটলের 'গ' চিহ্নিত নির্দেশ পাঠ করলে এ ধারণা খুব স্বাভাবিকভাবেই জন্মাবে যে ট্র্যাজেডির চরিত্রে Vice বা depravity" থাকলে চলবে না—কিন্তু "error বা frailty" কিছু থাকবেই। অর্থাৎ চরিত্রের পতনের মূলে চরিত্রের নিজের কোন বুদ্ধিগত বা স্বভাবগত ত্রুটি থাকা আবশ্যক। এই নির্দেশ সম্বন্ধেও নানা কথা উঠেছে। উঠেছে এই কারণেই যে গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে এমন এমন ট্র্যাজেডি আছে যেখানে নায়কের দুঃখদুর্ভোগের মূলে তার নিজের 'error বা frailty" কোন কাজ করেনি, যেখানে নির্দোষ নায়ক অবস্থার চাপের তলে নিরুপায়ভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে—যেখানে "চরিত্রই নিয়তি" এই সূত্র কোনভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে না এবং যেখানে চরিত্রের পরিবেশের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামের প্রশ্নও বড় কথা নয়। এই সব নাটকে তাঁদেরই বৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে যাঁরা "have suffered something terrible"। ইউরিপিডিসের 'ট্রোজান উইমেন' নামক ট্র্যাজেডিতে হেকুবা, এণ্ড্রোমেকী প্রভৃতি যে শোচনীয় দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছে তার জন্য তাদের কোনরূপ দায়িত্ব নেই—তাদের বুদ্ধির কোন ভুলে অথবা স্বভাবের কোন অতিপ্রবণতার জন্য তারা গ্রীকদের হাতে বন্দী হয়নি এবং দুঃখযন্ত্রণা পায় নি। তাদের ট্র্যাজেডি অসহ্য দুঃখযন্ত্রণা ভোগের তীব্রতার মধ্যেই নিহিত। সুতরাং ট্র্যাজেডি নায়কের বুদ্ধিগত বা স্বভাবগত ত্রুটি না থাকলেই চলবে না—এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। এই প্রসঙ্গেই স্মার্ট বলেছেন—"A general principle applicable to all tragedy is not to be found in the old saying that 'character is destiny', and in the notion that tragedy reveals the influence from within which work unconsciously on outward events ; whilst some tragic dramas may thus be interpreted there are others which can not

be approached in this way without forced exegesis and departures from the author's own evident purpose"। স্মার্ট বলতে চান—এবং ঠিক কথাই বলেন—'চরিত্রই নিয়তি' অথবা ট্র্যাজেডিতে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামের দৃশ্যই ব্যক্ত হয়—এরূপ কোন একটি সাধারণ সূত্র সব ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। বাস্তবিকই, যে ক্ষেত্রে terrible doing-এর দৃশ্য এবং তার পরিণাম দেখানো হয় সেখানে যেরূপ সক্রিয় সংগ্রামের তীব্ররূপ ফুটে উঠে, যে ক্ষেত্রে শুধু terrible suffering এর দৃশ্য দেখানো হয় সেখানে সক্রিয় সংগ্রামের রূপ তেমন থাকে না; সেখানে নিরুপায় দুঃখদুর্ভোগেরই বিচিত্র রূপ দেখা যায়। এখানেই আসছে আর একটি সমস্যার কথা—**ট্র্যাজিক চরিত্রের সক্রিয়তার—নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন।** এরিস্টটল এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেন নি এবং দেন নি বোধ হয় এই কারণেই যে তাঁর চোখে—'those who have done something terrible'—তাদের সক্রিয়তার রূপটি যেমন প্রতিভাত হয়েছিল, তেমনি প্রতিভাত হয়েছিল তাদেরও নিষ্ক্রিয়তার রূপটি—যারা "have suffered something terrible।" তিনি দেখেছিলেন—ট্র্যাজেডির আত্মা নিহিত থাকে—'incidents arousing pity and fear'-এর মধ্যে, unmerited misfortune-এর মধ্যে এবং সেই সব ঘটনা যেমন সক্রিয় ও সবল ব্যক্তির জীবনে ঘটতে পারে তেমনি নিষ্ক্রিয় ও দুর্বল ব্যক্তির জীবনেও ঘটতে পারে। বাস্তবিকই unmerited misfortune-এর উপস্থাপনাই যদি ট্র্যাজেডির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তা'হলে নায়কের সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তার—মাত্রা বিচার করা অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না। যদি একমাত্র সক্রিয় চরিত্রেরই অর্থাৎ যে চরিত্র, বাধা অতিক্রম করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সচেতন সংগ্রাম করছে—ক্রুনেতিয়ের ভাষায়—'conciously striving towards a goal'—সেই চরিত্রেরই 'misfortune' 'unmerited' হ'তো—নিষ্ক্রিয়ের 'misfortune' 'unmerited' হ'তো না, তা হলেই এ কথা বলা যেতো যে ট্র্যাজেডি-নায়ককে 'সক্রিয়' হ'তেই হবে—

প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করতেই হবে। ট্র্যাজেডি জীবনের অলৌকিক দ্বন্দ্বক্ষেত্র—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এ কথাও সত্য যে দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও পরিণাম এবং যুযুধান পক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সর্বক্ষেত্রে এক নয়।

এরিস্টটল নায়কের সক্রিয়তার উপরে সংলক্ষ্যভাবে কোন জোর না দিলেও তাঁরই—একটি কথাকে ভিত্তি ক'রে পরবর্তীকালে চরিত্রের নিজের দায়িত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বলাভ করেছিল এবং দায়িত্বের প্রশ্নটি ধীরে ধীরে সক্রিয়ত্বের প্রশ্নে পরিণত হয়েছিল। (ট্র্যাজিক চরিত্রের পতনের মূলে নিজ দায়িত্ব থাকবে—এবং দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষই নাটকের প্রাণ—জার্মান দার্শনিক হেগেল, এ কথা খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। ফলে এই সংস্কার বদ্ধমূল হতে থাকল যে চরিত্র নিজের কাজের দ্বারাই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ সৃষ্টি করে এবং নিজের শোচনীয় পরিণামের জন্য নিজেই শেষ পর্যন্ত দায়ী।) জার্মান সমালোচকরা বিশেষ ক'রে—Gervinus এবং Ulrici শেক্সপীয়র সমালোচনায় এই সূত্র প্রয়োগ করলেন—এবং 'চরিত্রই নিয়তি' এই কথা প্রচার করতে থাকলেন এরই ফল—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ফার্ডিনাণ্ড ব্রুনেতিয়ে—নাটকের মূলসূত্র খুঁজে পেলেন—সক্রিয় ও সচেতন সংগ্রামী নায়কের মধ্যে এবং ঘোষণা করলেন—খাঁটি নাটকের নায়ককে 'acted upon' হ'লে চলবে না—acting হতে হবে ; খাঁটি নাটকের নায়ক বাধা অতিক্রম করার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করবে এবং লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। ব্রুনেতিয়ের এই সিদ্ধান্ত সব নাট্যতত্ত্ববিদ মেনে নেননি—আর্চার, জোনস্, স্মার্ট প্রভৃতি নাট্যবিদ তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন—এমন বহু সার্থক নাটক আছে যেখানে নায়ক "acted upon' অর্থাৎ passive ; এমন কি নায়কের ইচ্ছাশক্তি একেবারেই শুকিয়ে গেছে। এঁরা বলতে চান—নায়ক সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দু'রকমেই হ'তে পারে, সক্রিয়তার ও নিষ্ক্রিয়তার মাত্রা চরিত্রে চরিত্রে ভিন্ন হয়। বড় বিচার্য ট্র্যাজেডি রস আর সবই ঐ রস সৃষ্টির উপায় মাত্র।

নায়কের সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নটি আরো একটু বিশেষ সবিস্তারে

আলোচনা করা আবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে—ট্র্যাজেডি আসলে মানুষের unmerited misfortune-এর কাহিনী অর্থাৎ মানুষের দ্বন্দ্ব সংকট ও শোচনীয় পরিণামের কাহিনী। এ কথা ঠিকই বটে যে ট্র্যাজেডিতে আমরা মানুষের সত্তাকে তীব্রতম উত্তেজনা নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের দুর্নিবার চাপের বিরুদ্ধে প্রাণপণ বুঝাপড়া করতে দেখি—মানুষের সত্তার 'জৈবিক ও মানসিক সংকটের জটিল ভীষণ ঐকান্তিক এবং শোচনীয় পরিণতির রূপ দেখি কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ট্র্যাজেডিতে আমরা যে দ্বন্দ্বক্ষেত্র দেখি, সেখানে শুধু যে সক্রিয়ের ও সবলের বুঝাপাড়ার দৃশ্যই দেখা যায়, তা' নয়, নিষ্ক্রিয় ও দুর্বলকেও পরিবেশের চাপের তলে তিলে তিলে ক্ষয় পেতে দেখা যায়; দেখা যায়—কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবেশকে প্রতিকূল করে তুলেছে—পরিবেশের উপরে তীব্র চাপের সৃষ্টি করে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে এবং প্রবলতর চাপের বিরুদ্ধে নিস্ফল সংগ্রাম ক'রে শোচনীয় পরিণতি লাভ করেছে; আবার কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি মহৎ প্রবৃত্তির প্রেরণায় অন্যায়ের গতি রোধ করতে যেয়ে প্রবলতর পরিবেশের নিষ্ঠুর আক্রমণের আঘাতে শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারিয়েছে, কোনক্ষেত্রে বা আকস্মিক কারণে বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় ব্যক্তি প্রতিকূল পরিস্থিতির আবর্তে পতিত হয়ে অসহায়ভাবে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছে এবং পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া আর কোন কিছুই করতে পারছে না। সব ক্ষেত্রই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র এবং একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য শুধু চাপের বণ্টন ব্যাপারে। কোথাও ব্যক্তি-চাপ পরিবেশের উপরে বেশী মাত্রায় কাজ করে, কোথাও বা পরিবেশ ব্যক্তির উপরে বেশী চাপ সৃষ্টি করে—এই যা পার্থক্য। কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিবেশকে চাপতে চাপতে সংকুচিত করে কোণঠাসা ক'রে ফেলে, শেষপর্যন্ত পরিবেশের হঠাৎ আক্রমণে পরিবেশের কাছে পরাজিত হয়; কোনক্ষেত্রে বা পরিবেশই ব্যক্তিকে চেপে ধরে এবং চাপতে চাপতে নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেলে—কায়িক প্রতিক্রিয়ার পথকে এমন কি ইচ্ছাটুকুও বন্ধ ক'রে দেয় এবং শেষে শোচনীয় পরিণতির আবর্তে তলিয়ে দেয়। দুই ক্ষেত্রেই চরিত্র "up against something" বটে

কিন্তু দ্বন্দ্বের গতি ও প্রকৃতি দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন। সুতরাং এ কথা মনে রাখতে হবেই যে ট্র্যাজেডির চরিত্র সর্বত্র এবং সর্বদাই 'acting' হবে এমন কোন কথা নেই,—"acted upon" বা passive"ও সে হতে পারে। যে ক্ষেত্রে চরিত্র সক্রিয় সে ক্ষেত্রে দর্শকের ঔৎসুক্য—দর্শকের ঔৎসুক্যই বড় কথা—চরিত্রের ক্রিয়াপরম্পরাকে অনুসরণ করে এবং যে ক্ষেত্রে চরিত্র নিষ্ক্রিয় সে ক্ষেত্রে চরিত্রের দুঃখদুর্ভোগের ক্রমবিনিপাত এবং পরিণতি দেখার জন্য দর্শকরা উৎসুক থাকে। মনে রাখতে হবে—ঔৎসুক্যের উদ্‌বোধনে নাটকের আরম্ভ ঔৎসুক্যের ক্রমবৃদ্ধিতে নাটকের অগ্রগতি এবং ঔৎসুক্যের—অবসানেই নাটকের উপসংহার। যতক্ষণ এ সিদ্ধান্ত করা না যাবে যে একমাত্র সক্রিয় চরিত্রেরই ক্রিয়াকলাপ ঔৎসুক্যের জনক, নিষ্ক্রিয় চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ঔসুক্যজনক নয়, ততক্ষণ এ সিদ্ধান্তও করা যাবে না যে সক্রিয় চরিত্রই একমাত্র নাটকীয় চরিত্র, নিষ্ক্রিয় চরিত্র নাটকীয় নয়—শুধু সক্রিয় চরিত্রের ক্রিয়াই দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে সমর্থ, নিষ্ক্রিয় চরিত্রের প্রতিক্রিয়া দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়। লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে উপলক্ষ্য নিয়ে বিবাদ ক'রে কোন লাভ নেই। লক্ষ্য—ট্র্যাজেডি রস আর সবই ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় মাত্র। সক্রিয় চরিত্র অবলম্বনেই রস সৃষ্টি করা হোক আর নিষ্ক্রিয় চরিত্র অবলম্বনেই রস সৃষ্টি করা হোক—রসসৃষ্টিই আসল লক্ষ্য। রস নিষ্পন্ন হ'লে 'ট্র্যাজিক ইম্প্রেশান' সৃষ্টি হ'লে, উপাদান যোজনার সূত্র নিয়ে চুল চেরা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন কি ?

এই প্রসঙ্গেই সক্রিয়তার প্রত্যক্ষতা ও পরোক্ষতা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। 'সক্রিয়' বলতে বুঝায় সেই চরিত্রকেই যে পরিবেশের চাপের বা বাধার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পরাঙ্মুখ হয় না—প্রতিকূল পরিবেশের আক্রমণের মুখে, পালিয়ে না যেয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যেখানেই চরিত্রে এই চেষ্টা থাকবে সেখানেই চরিত্রকে "সক্রিয়" বলতে হবে। যে ক্ষেত্রে এই চেষ্টা প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ চরিত্রের প্রত্যক্ষ আচরণের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত, সেখানে সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ আর যেখানে তা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অন্যান্য চরিত্রের বর্ণনার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত সেখানে

সক্রিয়তা পরোক্ষ। আমরা অনেক সময় পরোক্ষ সক্রিয়তাকে নিষ্ক্রিয়তা ব'লে ভুল ক'রে থাকি—এবং প্রত্যক্ষতাকে ও সক্রিয়তাকে এক বলে মনে করি। নীলদর্পণ নাটকের নবীনমাধব চরিত্রটি এর ভাল দৃষ্টান্ত। নবীনমাধবকে নিষ্ক্রিয় বলার পক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নেই। কারণ নবীনমাধব নীলকর সাহেবদের অত্যচারের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে—যেখানেই এবং যে ভাবেই অত্যাচার আসুক—তার প্রতিবিধানে তৎপর হ'য়েছে—নীলকরদের অত্যাচার ও অন্যায় জুলুমের সামনে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছে। তবে এই কথা বলা যেতে পারে যে নবীনমাধবের ক্রিয়াগুলি যতটা পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ততটা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়নি। অতএব নবীনমাধব পরোক্ষ সক্রিয় চরিত্র বটে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়। দৃশ্য কাব্যে মুখ্য মুখ্য ঘটনাকে দৃশ্য করা, চরিত্রের আচরণকে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ ক'রে তোলা বাঞ্ছনীয়—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু এ কথাও অবশ্য লক্ষণীয় যে নাটকে সব কিছুকে দৃশ্য করার অবকাশ থাকে না, অনেক কিছুকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত করতে হয়। অবশ্য পরোক্ষতার মাত্রা বেশী থাকলে নাট্যলক্ষণে ঘাটতি পড়ে, চরিত্রের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার মাত্রা কম হয়। তা'ই বলে এ কথা ঠিক নয় যে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হ'লেই চরিত্র স্বভাবে নিষ্ক্রিয় হ'তে বাধ্য।

চতুর্থতঃ—অতি মন্দ লোকের প্রশ্ন। কোন কোন সমালোচক অতি মন্দকেও (villain) ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়ার যোগ্য ব'লে বিবেচনা করেছেন। "দি প্যারাডক্স্ অফ ট্র্যাজেডি-গ্রন্থে ডিঃ ডিঃ রাফেল মহাশয়—স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—I have already allowed that a villain may be a tragic hero"—(২৪ পৃঃ)। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন—'greatness of spirit'ই হচ্ছে আসল গুণ; এই গুণটি থাকলে 'villain বা "wicked men like Macbeth and Richand III" ট্র্যাজিক নায়ক হতে পারে।

॥ নির্ঘণ্ট ॥

ঈ

উ

এ

ও

ক

থ

দ

ন

প

ব

ভ

ম

স

হ